REGISTERED No. C. 1[illegible]

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

সপ্তদশ খণ্ড,—১ম সংখ্যা
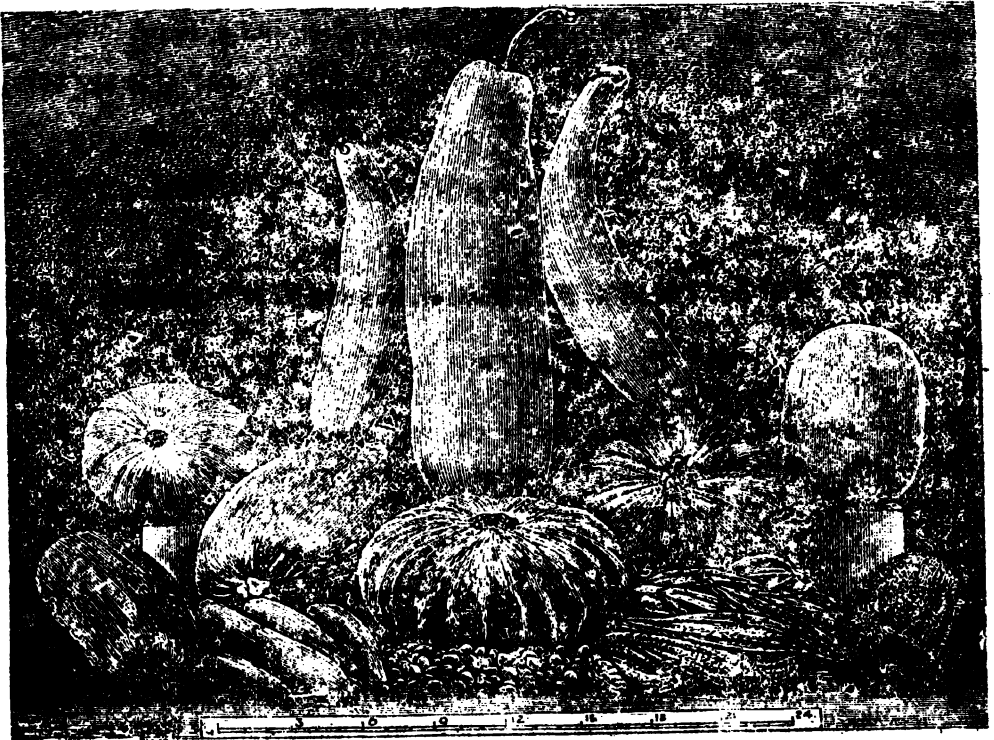
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম, আর, এ, এস্

বৈশাখ, ১৩২৩

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীকালীপদ নস্কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৃষক।

সূচীপত্র।

বৈশাখ ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। { বৈশাখ, ১৩২৩ সাল। { ১ম সংখ্যা।

শর্করা ও খর্জ্জুর

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার,

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সদস্য, উকীল (হাইকোর্ট কলিকাতা) লিখিত।

শর্করা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য। ইহা যে কেবল রসনার তৃপ্তিকর তাহা নহে, ইহা শরীরেরও পুষ্টিকর। কিন্তু আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সঙ্গে ইহার ব্যবসা ও উৎপাদন বিদেশীর করতলগত। যাহাদিগের অপর দেশ হইতে জীবন রক্ষার জন্ম আহার সংগ্রহ করিতে হয় তাহাদের পক্ষে যেমনই হউক না কেন, কিন্তু একদিন যে ভারতবর্ষই অন্য দেশকে মিষ্ট রসের আস্বাদ দিয়াছে, আজ মিষ্ট রসের আশায় তাহাকেই ভিক্ষা পাত্র হস্তে অপরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইতেছে, আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জার কথা।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদান সমুহ হইতে পৃথিবীতে শর্করা উৎপাদিত হয়—

১। ইক্ষু। ২। খর্জ্জুর। ৩। বিট। ৪। মেপল। ৫। তাল, নারিকেল প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে ইক্ষু ও খর্জ্জুরই শর্করার প্রধান উপাদান। তাল ও নারিকেল হইতে কিছু কিছু শর্করা এদেশে জন্মে বটে কিন্তু তাহা গণনার যোগ্য নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে খর্জ্জুর সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

খেঁজুর

খেঁজুর সম্বন্ধে গত কয় বৎসর কৃষকে লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ কলিকাতা গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। মধ্যভারতের খাণ্ডোয়া নিবাসী বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও গাছীর অভাবে সেই দেশের খেঁজুর গুলিকে কাজে আনিতে পারিতেছেন না। বুন্দেলখন্দ, রিওয়া, প্রভৃতি কাছাকাছি জায়গায় বহু বন্য খেঁজুর গাছ জন্মায়। এইগুলি হইতে বেশ গুড়ের ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু কেবল গাছির অভাবে তাহা লাভজনক করা যাইতেছে না। আমার বন্ধু বাবু গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় খেঁজুর ও খেঁজুর গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাগ বিজ্ঞান পত্রিকায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে স্থানে স্থানে কৃষক পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সমুহে পুনর্মুদ্রিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে পিণ্ড খেঁজুরের চাষ প্রবর্ত্তন করিলে মন্দ লাভজনক হয় না। রস খেঁজুরের মত পিণ্ড খেঁজুরেরও চাষ।

এ প্রদেশে শর্করার জন্য ইহার আবাদ হয়। অন্যত্র ইহা পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে। অথবা কোন কোন স্থানে ইহা তাড়ির জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই দেশী খর্জ্জুর বৃক্ষই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শর্করা ব্যতীত খর্জ্জুর বৃক্ষে মনুষ্যের আরও অনেক কাজ হইয়া থাকে। খর্জ্জুর পত্রে ঝুড়ি ব্যাগ মাজুরী হাত পাখা এবং টানা পাখার ঝালর হইতে পারে। উপযুক্ত শিল্পীর হস্তে ঐ সকল দ্রব্য কারুকার্য্যযুক্ত হইয়া সৌখীনদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারে সুতরাং মুল্যের হিসাব নগণ্য বলা যায় না। আমি আমার বাসগ্রামের চাষার জাতীয় একজন শিল্পীদ্বারা ষ্ট্র হ্যাটের (Straw hat) মত টুপী খর্জ্জুর পত্রের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া যশোহর প্রদর্শনী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশংসা পত্র পাইয়া ছিলাম। ঐ শিল্পীর মৃত্যু হওয়ায় আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। অপর লোককে উৎসাহ দিয়া বা অর্থ প্রলোভনেও এতাবৎ ঐ কর্ম্মে ব্রতী করিতে পারি নাই। খর্জ্জুর পত্র পাকাইয়া এক প্রকার রজ্জু প্রস্তুত হইতে পারে। উহা কূপ হইতে জল উত্তোলনের উপযোগী।

লিস্‌বা (Lisba) বলেন খর্জ্জুর পত্র হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ সংগ্রহ করা যায়। রাসায়নিক উপায়ে উহা সুন্দররূপে বর্ণহীন হয়। ঐ আঁশ কাগজ প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট উপাদান।

খর্জ্জুর শস্য বাদামাদি সহযোগে উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিণত হইতে পারে। শিশু খর্জ্জুর বৃক্ষের মূল দন্তরোগের উপকারী। Major Thomas এবং Dr. Parker প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া যে শাঁস পাওয়া যায় তাঁহাকে সাধারণতঃ খেজুরের "মাতী" বলে, উহা মেহ রোগ, হিক্কা এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের জন্য ব্যবহৃত হইলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

সমগ্র বঙ্গ প্রায় ১৫০ বর্গমাইল ব্যাপী খর্জ্জুরের আবাদ দেখা যায়; যশোহর জেলায় প্রায় ৩০ বর্গমাইল ব্যাপী খেঁজুরের আবাদ আছে সমগ্র ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন গুড় উৎপাদিত হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ টন খর্জ্জুর গুড়। এক বঙ্গদেশে ইহার অধিকাংশ জন্মে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বুঝা যায় যে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ গুড় খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন।

বহুদিবসাবধি যশোহর, খেজুর গুড় ও চিনি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল যশোহর জেলায় এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়া ডাঙ্গা মহকুমায় অনেকগুলি চিনির কারখানা ছিল। যশোহর জেলার তারপুর নামক স্থানেই কেবলমাত্র পূর্ব্বে বৈদেশিক প্রথায় গুড় হইতে চিনি উৎপাদিত হইত। ইদানীং স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপার ঘটিলে, তারপুরের বহুকাল পরিত্যক্ত কুঠি আবার পনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল কিন্তু এখন আর তাহার সাড়া পাওয়া যায় না। চিনি ব্যবসায় যে কেন লোপ পাইল, তাহা প্রবন্ধের সম্যক আলোচ্য নহে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কেবল বৈদেশিক প্রতিযোগিতার দোষ দেওয়া যায় না। প্রধানতঃ শর্করা উৎপাদন এবং ব্যবসায়ের প্রতি এদেশবাসীর ঔদাসীন্য ও কর্ম্ম বিমুখতাই কারণ। প্রতিযোগিতা থাকিবেই তাহা বলিয়া অলস কাপুরুষের মত কাঁদুনী গাহিলে চিরকালই পদদলিত হইতে হইবে। কমলা নারায়ণকেই আশ্রয় করেন।

সাধারণ কৃষকের হস্তেই খর্জ্জুরের আবাদ ন্যস্ত। একারণ বহু বিঘা ব্যাপী খর্জ্জুর ক্ষেত্র দেখা যায় না। গাছগুলি প্রায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ১০ কাঠা, ৫ কাঠা কখনও বা এক বিঘাব্যাপী খেজুর বাগান সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। কদাচিত ৮।১০ বিঘা ব্যাপী বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। বহুজনসম্পন্ন গৃহস্থ ব্যতীত এরূপ বাগান রাখা অপরের পক্ষে অসম্ভব। তাহার উপর খাদ্য শস্যের চাষ চালাইয়া তবে ইহার কার্য্য করা সকল কৃষকের সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে অসমর্থ কৃষক নিজের খেজুর বাগান অপর কৃষকের নিকট বিক্রয় করে। টাকায় ৮।১০টা গাছ ভাল মন্দ অনুসারে বিক্রীত হয়।

ভারতবর্ষে দুই প্রকারের খর্জ্জুর দেখা যায়। পিণ্ড খর্জ্জুর (Phoenix dacty lifera) এবং দেশী খর্জ্জুর (Phoenix Sylvestris)।

উদ্ভিদ বিদ্ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে মনে করিতেন যে উভয় জাতির বংশ এক এবং ইহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে। কিন্তুপরবর্ত্তী অভিজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, Phoenix

Splvestris জাতি ভারতের আদিম নিবাসী। পিণ্ড খর্জ্জুর বৃক্ষের গোড়ায় কলাগাছের ন্যায় তেউড় বাহির হয়। ঐ তেউড় হইতে নূতন বৃক্ষ জন্মিতে পারে। এদেশীয় খেজুরের তাহা হয় না। পিণ্ড খর্জ্জুর, পঞ্জাব গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে দেখা যায়। কথিত আছে যে সেকেন্দরের ভারতাভিযানের সময় পিণ্ড খর্জ্জুর সৈনিকগণের রসদের সহিত প্রথমে আমাদের দেশে আনীত হয়। খর্জ্জুর ফল ভোজনান্তর নিক্ষিপ্ত বীজ হইতে উহার জন্ম হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের অপর প্রদেশে ইহা দেখা যায় না। এমন কি কোনও সৌখীন লোকও যে উহার আবাদ করিয়াছেন এমত শুনা যায় নাই। ইদানীং অনেক সৌখীন লোক বহুজাতীয় (Palm) পামের গাছ করিয়াছেন, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষায় পিণ্ড খর্জ্জুরের আবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। (Phœmix Sylvestris) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন্মে। বাঙ্গালা ব্যতীত অপরাপর প্রদেশে প্রধানতঃ ইহা সচ্ছন্দ বনজাত বৃক্ষ। বাঙ্গালার মধ্যে যশোর নদীয়া ২৪ পরগণা ফরিদপুর এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর।

সরস দোআঁশ পলিমাটি খর্জ্জুর ক্ষেত্রের উপযোগী। সাধারণতঃ ইহা লক্ষ্য করিয়াই যে কৃষকেরা কার্য্য করে তাহা নহে। নিকৃষ্ট ভূমিতেও ইহার আবাদ দেখা যায়, সুতরাং ঐরূপ স্থলে ফলও তদ্রূপ হয়। প্রধানতঃ খর্জ্জুর ক্ষেত্রে সার দিবার প্রথা নাই; তবে যবক্ষার এবং ফস্‌ফেট্ সংযুক্ত সার উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে ফলও যে ভাল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হাড়ের গুঁড়া খৈল গোবর অশ্বের মল মূত্র প্রভৃতি ইহার সার রূপে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

খর্জ্জুর বৃক্ষের পুং স্ত্রী ভেদ আছে। তবে পুষ্পিত না হইলে তাহা বুঝা যায় না। পুং পুষ্পস্তবকের পুষ্পগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে, স্তবকগুলিও লম্বা এবং বেশ বড় বড় হয়। স্ত্রী স্তবকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং খুব ঘন সন্নিবিষ্ট।

উৎকৃষ্ট চারা প্রস্তুত করিতে হইলে সতেজ সুপুষ্ট স্ত্রীবৃক্ষ পুষ্পিত হইবার পর অনুরূপ গুণ সম্পন্ন পুং বৃক্ষের সুপুষ্ট পুষ্পস্তবক কাটিয়া আনিয়া স্ত্রীবৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিতে হয়। পুং পুষ্পস্তবক কাটিয়া অনিলে তাহার জনন শাক্তি লুপ্ত হয় না।

জ্যৈষ্ঠমাসে সুপক, সুপুষ্ট খর্জ্জুর, বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ভাবে কর্ষিত সারযুক্ত দোআঁশ পলিমাটি যুক্ত ক্ষেত্রে যথা সম্ভব পাতলা করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া উচিত, এবং বীজগুলি যাহাতে বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া না যায় এমতভাবে পুতিয়া মৃত্তিকা চাপা দেওয়া আবশ্যক। পরে গাছ বাহির হইলে ক্ষেত্র নিড়াইয়া আগাছা শূন্য করিয়া দিবার আবশ্যক হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ পাট করিতে হয়। এক বৎসর পরে অথবা কাহার মতে দুই বৎসর পরে গাছগুলি স্থায়ী ক্ষেত্রে রোপণের উপপুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় স্থায়ী ক্ষেত্র উত্তরূপে কর্ষণ করিয়া আগাছা শিকড়-আদি বাছিয়া ফেলিয়া প্রস্তুত করা উচিত। বর্ষার পূর্ব্বে ফাল্গুন চৈত্রমাসে ক্ষেত্র একবার কোপাইয়া দিলে আরোও ভাল

হয়। এই সময় গোবরের সঙ্গে হাড়ের গুঁড়া মিলাইলা সার দিলে ভাল হয়। বিঘপ্রতি একমণ হাড়ের গুঁড়া যথেষ্ঠ। জৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত রাখা চাই। পরে আষাড় মাসের বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রে একবার লাঙ্গল দিয়া মই দেওয়া উচিত। ক্ষেত্র এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন চারার গোড়ায় বেশী জল জমিতে না পারে। এখন ৯।১০ ফিট অন্তর সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বেশ সতেজ ও সুপুষ্ট চারা পুঁতিয়া যাও। পুঁতিবার সময় চারার গোড়ায় রেড়ীর খৈলের সহিত হাড়ের গুঁড়া মিলাইয়া এক এক মুষ্টি করিয়া দেওয়া মন্দ পরামর্শ নহে। এই প্রকারে দেখাযায় যে, একার প্রতি প্রায় ৫০০ শত বৃক্ষজন্মে। বৃক্ষ ৬।৭ বৎসরের হইলে তবে রস গ্রহণের যোগ্য হয়। এই কয়েক বৎসর খর্জ্জুর ক্ষেত্র খুব অবধানের যোগ্য। যাহা ভবিষ্যতে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ধ রস প্রদানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত তাহার শৈশব উপযুক্তভাবে পরিরক্ষিত করা কর্ত্তব্য। কারণ (Child is the father of man) এইকাল যাহাতে বৃথা না যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিবে। ক্ষেত্রে আগাছা না হয় তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

খর্জ্জুর ক্ষেত্রে ধান্য কলাই প্রভৃতির আবাদ করাও উত্তম লাভজনক। ইহাতে আবাদের খরচের যথেষ্ট সাহায্য হয়। আবশ্যক অনুসারে চারার গোড়া কোপাইয়া দিতে হয়। সমস্ত ক্ষেতে সার না ছড়াইয়া গাছের গোড়ায় প্রতি বর্ষে কিছু সার দেওয়া মন্দ নহে।

৬।৭ বৎসরের পরে রস প্রদানের যোগ্য হইলেও খর্জ্জুর বাগানের ঐ প্রকার কারকিং মেরামত করা উচিত কারণ উহাতে বৃক্ষের সাস্থ্য ভাল থাকে এবং উপযুক্ত সার প্রযুক্ত হইলে রসের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

খর্জ্জুর বাগানে ফাঁক ফাঁক চারা রোপিত হইলে তলস্থ জমিতে আদা ও কোন কোন রবিখন্দ প্রভৃতির আবাদে লাভের ভাগও বাড়িবে। খর্জ্জুর বাগানে সুনিয়মে চারা রোপিত হইলে তলস্থ জমিতে তুলার আবাদ হইতে পারে। করিতে পারিলে উভয় কৃষিই পরস্পরের সহায়তায় দেশের দুইটী প্রয়োজনীয় পদার্থের যোগান দিতে পারে।

রস সংগ্রহার্থে নিম্নলিখিত উপাদান আবশ্যক—

১। দুই তিনপ্রকার কর্ত্তরি বা দা।

২। ১॥০ ইঞ্চি মোটা ৬ হাত লম্বা শক্ত দড়া একগাছা।

৩। মৃত্তিকা নির্ম্মিত নাগরী বা ছোট কলসী।

৪। দা রাখিবার ঠোঙ্গা, দা ধার করিবার কাষ্ঠ, একখণ্ড ছাগচর্ম্ম ইত্যাদি।

যে গাছ কাটে তাহাকে গাছী, শিউলী বা পাশী বলে। গাছী পশ্চাৎভাগে কোমরের সঙ্গে ছাগচর্ম্ম বাঁধিয়া পরে তদুপরি অস্ত্রের ঠোঙ্গা বাঁধে। পরে দড়া দিয়া গাছ ও আপনাকে বেষ্টন করিয়া হাতের সাহায্যে দড়া বৃক্ষের উপর দিকে সারাইয়া দেয়,

এবং পদদ্বয় দ্বারা গাছে উঠে। গাছীর খেজুর গাছে উঠা দেখিতে বড় সুন্দর। তাহারা যখন ২৫।৩০ ফিট লম্বা গাছের মাথায় উঠিয়া দড়া দ্বারা গাছ ও আপনাকে বেষ্টন করিয়া গ্রন্থি দিয়া আপনাকে আবদ্ধ করে এবং দুই পায়ে গাছের গুড়ির উপর ভর করিয়া দুই হাত আলগা রাখিয়া গাছ কাটে তাহা যাহারা দেখে তাহাদেরও পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ নভেম্বর বাঙলা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত রস, সংগ্রহ ও গুড় প্রস্তুতের কাল। এই সময়কে লোকে গুড়ের আয়াম বলিয়া থাকে। তবে গাছের কর্ত্তনাদি আরম্ভ অক্টোবরের শেষ হইতে করা হয়।

এই আয়াম কাল মধ্যে প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে প্রত্যহই রস সংগ্রহ করা হয় না। খর্জ্জুর বৃক্ষের জীবনী শক্তি স্বরূপ রস আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং বৃক্ষকে সুস্থ রাখিয়া তাহার সুস্থ রস গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই প্রত্যহ রস গ্রহণ করিবার জন্য বৃক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে বৃক্ষ কেমন করিয়া বাঁচিবে, তাই নিয়ম আছে যে তিন দিন রস গ্রহণ করিয়া আবার ৩।৪ দিন বিরাম দিতে হয়। এই তিনদিনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন গাছ কাটিতে হয়। তৃতীয় দিন পূর্ব্বে কর্ত্তিতাংশ মুছিয়া ও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় মাত্র।

গাছের যেখানে সেখানে কাটিলে রস পাওয়া যায় না। রস গ্রহণ অভিপ্রায় নিম্নলিখিত প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়।

প্রথমতঃ খেজুর গাছের মস্তকের বেষ্টনীর অর্দ্ধেক পারিমিত স্থানের পুরাতন পত্রগুলি সব কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল নবোদ্ভিন্ন কোমল পত্র রাখিতে হয়। এতদ্রূপে মস্তকের নিকট পত্র আচ্ছাদিত বৃক্ষকাণ্ড বাহির হইয়া পড়ে ঐ কাণ্ডের ত্বক কোমল। বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এই যেন ত্বকাংশ ভিন্ন হইয়া না যায়। কেবল কন্দের ত্বকমাত্র উন্মুক্ত করিয়া পাতাকাটিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে গাছঝোড়া বলে। এই কার্য্য একখানি তীক্ষ্ণধার ভারী দা দিয়া করিতে হয়। গাছ ঝুড়িবার পর ৭।৮ দিন বিরাম দিতে হয়। এই কাল মধ্যে বহিঃস্থ ত্বক কিছু কঠিন হয়, এবং একটু একটু ফাটিয়া যায়। পরে গাছী সমগ্র কর্ত্তিতাংশের বহিস্থ ত্বক একখানি সুতীক্ষ্ণ অথচ হালকা দা দিয়া চাঁচিয়া দিয়া থাকে। সেইসময় সে দৃষ্টি রাখে যে অভ্যন্তরস্থ ত্বক আঘাত প্রাপ্ত না হয়। বহিঃস্থ ত্বক চাঁচিয়া ফেলিয়া কেবল অভ্যন্তরাংশ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হয় মাত্র। ইহাকে চাঁচ দেওয়া বলে। এখন আবার প্রায় ১২।১৪ দিন গাছের কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়।

এই সমস্ত প্রকরণে নভেম্বরের প্রায় প্রথম সপ্তাহ অতিত হয়। এই সময় গাছী একদিন দুই প্রহরের পর বেলা ২টা বা ৩টার সময় বৃখের উন্মুক্তাংশের মধ্যস্থ হইতে দুই পার্শ্বে ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা করিয়া প্রায় সিকি ইঞ্চি গভীর করিয়া দুইটি নয়নাকৃতি আঘাত করে। এই দুই নয়নাকৃতি উদ্ভিন্নাংশের মধ্যবিন্দুমিলিত করিয়া দেয়, যেন পরস্পর মিলিত

ভ্রূযুগল। এই মিলন বিন্দুর সামান্য নিম্নে কঞ্চি চিরিয়া ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একটী নলী বৃক্ষে পুতিয়া দিতে হয়। নলিটী এমনস্থানে পোতা আবশ্যক যেন নয়নাকৃতি উদ্ভিন্নাংশের মিলনবিন্দুর ঠিক নিম্নে পড়ে, এবং নলির সহিত একটী অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা সরল রেখার সহিত মিলিত হয়। এই প্রকার কাটা হইলে একটা নাগরীর গলায় দড়ি বাঁধিয়া নলিটী নাগরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গাছের সম্মুখ ভাগের একটা অকর্ত্তিত শাখার সহিত ঝুলাইয়া দিতে হয়। এখন ঐ কর্ত্তিতাংশ দিয়া রস গড়াইয়া নাগরীতে সঞ্চিত হয়। বিকালে ২।৩টা ৩টায় গাছ এই প্রকারে বাঁধিয়া তৎপর দিবস প্রত্যুষে নাগরী খুলিয়া রস সংগ্রহ করিতে হয়। মোটামুটী ইহাই রস গ্রহণের প্রথা। এ একপ্রকার গাছের জীবন লইয়া ব্যবস্থা করা, সুতরাং দায়িত্ব জ্ঞানহীন অসাবধানগাছীর কাছে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী।

প্রত্যহই একগাছ কাটীতে হয় না বলিয়া গাছী নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন গাছগুলি সুবিধামত কয়েকটী পালায় ভাগ করিয়া লয়। একজন গাছী একাদিনে ৫০।৬০ গাছের কার্য্য করিতে পারে সুতরাং একজন গাছী সমগ্র আয়ামে ৩০০।৪০০ গাছের কার্য্য চালাইতে পারে। বিরামান্তে প্রথম দিনের কর্ত্তনকে জিড়ান কাট বলে। দ্বিতীয় দিনের কির্ত্তন দোকাট নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় দিনকে তেকাট কহিয়া থাকে। আয়ামের প্রথম ভাগে দোকাটের দিনও না কাটিয়া মুছিয়া ঘসিয়া রস সংগ্রহ করা হয়। তৃতীয় দিনে কোন বাধা নাই। ক্রমে ক্রমে নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। দিন যত যায় ততই গাছের ক্ষত প্রশস্ত ও গভীরতর করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ নবেম্বর মাসে তেকাট রস লওয়া হয় না। এমন কি প্রথম দুই তিনবার জিড়ান কাট ভিন্ন অন্য কাটে রস সংগ্রহ হয় না।

ডিসেম্বরের মধ্যভাগ হইতে রীতিমত আয়ামের শেষ পর্য্যন্ত তিন দিন করিয়া রস সংগ্রহ করা হয়। প্রথম বৎসর বৃক্ষের যে অংশ কর্ত্তিত হয় পরের বৎসর আবার তাহার বিপরীত দিকের অর্দ্ধাংশ রসের জন্য কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

নাগরী হইতে রস ঢালিয়া লইয়া, নাগরী শুকাইয়া মধ্যভাগে ধোঁয়া খাওয়াইয়া রাখিবার রীতি আছে। ভাণ্ড হইতে রস ঢালিয়া লইলে যে রস লাগিয়া থাকে তাহা মাতিয়া (Ferment) উঠে। সকলেই জানেন যে উহা একপ্রকার জীবাণুর ক্রিয়া। এই জীবাণুযুক্ত ভাঁড়ে পুনর্ব্বার রস সংগৃহীত হইলে রস "শীঘ্র শীঘ্র মাতিয়া" নষ্ট হইয়া যায়। ঐ "মাতা" রসের গুড়ে দানা বাঁধে না কারণ শর্করার ভাগ মাতে পরিণত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ধূম্র শোধিত ভাণ্ড অপেক্ষা অশুদ্ধ ভাণ্ডের রস শীঘ্র মাতিয়া যায় এই জন্য ভাণ্ড বা নাগরী শোধিত করা আবশ্যক। কেহ বলেন উত্তাপহেতু মাতন জনক জীবাণু মরিয়া যায় এবং ধুমে ক্ষার জনক পদার্থ থাকায় রস জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। কিন্তু ৩।৪ মিনিটের ধুমে ভাণ্ড উত্তপ্তই হয় না। সুতরাং জীবাণু

মরেনা। খর্জ্জুর শর্করা তত্ত্বের অনুসন্ধানকারী Mr. H. E. Annett বিবেচনা করেন যে ধূম্রে Formaldehyde নামক জীবাণু রোধক পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে এই প্রকার ফল পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

মালদহের আম্র প্রসঙ্গ

গুরুদাস রক্ষিত লিখিত।

আঁটির চারা ও রোপণ প্রণালী

এদেশে আম্রের আঁটির চারা রোপণ করিবার প্রথাই আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু অধুনা আঁটির চারা অপেক্ষা কলমের চারাই অনেকে অধিক পছন্দ করিয়া থাকেন। দোষ গুণ উভয় চারাতেই আছে। (১) ভাল আমের আঁটি পুতিলেই যে উহার চারা ভাল হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। অনেক স্থলেই আঁটির চারায় উৎপন্ন আম নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। (২) আঠির চারা বিলম্বে ফল ধরে। (৩) বঙ্গদেশে চৈত্র ও বৈশাখমাসে প্রবল ঝড় হইয়া থাকে, এই ঝড়ে আঁঠির চারর বড় গাছের যত অনিষ্ট সাধিত হয়, কলমের চারার ছোট গাছে তত হয় না, কারণ বড়গাছ অপেক্ষা ছোট গাছে ঝড় কম লাগে। (৪) কলমের চারার ফল যেমন জনক বৃক্ষের অনুরূপ হয়। তদ্রুপ আঁঠির চারা গাছে উৎপন্ন ফল অধিকাংশ সময়ই আঁঠির ফলের মত বড় হয় না। (৫) যে সকল আম অত্যুৎকৃষ্ট তাহাদের আঁঠিতে প্রায়ই চারা হয়না। (৬) আঁঠির চারার আম অষাঢ় মাসেই একরূপ নিঃশেষ হইয়া যায় কিন্তু কলমের আম ভাদ্র মাসে পাকে। কোন জাতীয় কলমের গাছে আশ্বিন মাস পর্য্যন্তও ফল পাওয়া যায় এই ছয়টী কারণেই লোকে ক্রমশঃ কলমের চারারই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। কলমের চারার উল্লিখিত গুণ দেখিয়াই অনেকে কলমের আদর করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু কলমের চারা রোপণের অনেক দোষ আছে; তন্মধ্যে (১) কলমের গাছ আঁটির গাছের মত সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। (২) আঠির চারায় যেরূপ প্রচুর ফলন হইয়া থাকে, কলমের চারার তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। (৩) আঠির চারার গাছ অত্যন্ত বড় হয় বলিয়া ফলের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু কলমের গাছ অনেক সময়ে

তাহা হয় না। (৪) আঁঠির চারা গাছ বিনা যত্নে ও নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু কলমের চারার জন্য যত্নের আবশ্যক। বিশেষতঃ নানা কারণেই কলমের চারা হইতে সুফল লাভে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। (৫) চারা গাছের কাণ্ড অত্যন্ত বড় হয় বলিয়া তাহার মূল্য অধিক হয়, এই পাঁচটীই উল্লেখযোগ্য। কলমের চারা প্রস্তুত করিতে এবং চারা লাগাইয়া তাহা বাঁচাইবার নিমিত্ত যতটা খাটিতে হয়, আঁঠির চারা তুলিতে তাহার অর্দ্ধেক খাটিতে পারিলেও সুফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। কিন্তু আঁঠির চারা তুলি-তেও যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়, তাহা অনেকেরই ধারণাতীত, সাধারতঃ যে আমটী সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও সুরস হয়, তাহারই আঁঠি হইতে চারা উৎপাদনের জন্য আম খাইয়া আঁঠি কোন এক স্থানে ফেলিয়া রাখা হয় যে আঁঠি হইতে চারা তুলিতে হইবে, তাহা সুপক্ক আমের কি না, যে স্থানে আঠি ফেলিয়া দেওয়া হইল, সে স্থানে জল বায়ু ও উত্তাপের অভাব ঘটিবে কি না এবং সেস্থানের মৃত্তিকা কিরূপ, এই সব সামান্য বিষয়ের প্রতি কাহারও বড় দৃষ্টি নাই। উৎপন্ন চারার সুফল লাভের আশা থাকিলে বীজ রোপণে এত তাচ্ছল্য করা উচিত নহে। আঠি হইতে চারা জন্মাইতে হইলে দোঁয়াশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট স্থান উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া লইতে হয়। কারণ ভূমি হইতে ইটের ভগ্নাংশ বা তদনুযায়ী কঠিন পদার্থ এবং আগাছা ঘাস ও তৃণ প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া উহা বীজ রোপণ উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। জমি প্রস্তুত হইলে পর, তথায় সারিবন্দ করিয়া অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে নির্ব্বাচিত আঁঠিগুলি রোপণ করিতে হইবে। আঁঠিগুলিকে মাটীতে না পুতিয়া রোয়াকের মেঝের উপর অথবা মৃত্তিকার উপর ৪।৫ ইঞ্চি পুরু চূর্ণাকৃত মৃত্তিকা (দোঁয়াশ হইলে ভাল হয়) ফেলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে আঁঠি রোপণ করা যায়। কর্ষিত মৃত্তিকায় রোপণ না করিয়া রোয়াকের বা মৃত্তিকার উপর আঠি পুতিয়া দিলে চারা তুলিবার সময় শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে। যে সকল চারা "চারা চৌকাতেই" শীর্ণ অথবা নিস্তেজ বোধ হইবে, তাহা স্থানান্তরে রোপণ না করাই ভাল। রোপণ করিবার সময় বীজের বুকেরদিকে অর্থাৎ যে দিক হইতে অঙ্কুর বহির্গত হইয়া থাকে। সেই দিকই উপরে রাখিতে হইবে। আঠিগুলি অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে রোপিত হইলে চারা তুলিবার সময়, গোড়ার মাটী সমেত তুলিয়া লইতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাইয়া চারা জন্মিলে তাহা আশ্বিন বা কাত্তিক মাসে তুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি বাগানে রোপণ করিতে পারা যায়। এই সময় মৃত্তিকা সরস না থাকিলে আঠি রোপণের পর বৎসর জৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই চারা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করা কর্ত্তব্য। চারা চৌকায় বড় করিয়া অর্থাৎ রোপণের এক বৎসর পরে তাহা স্থানান্তরিত করিতে হইলে, একটু বেশী সতর্কতা আবশ্যক। কারণ এক বৎসরের চারা যতদূর পর্য্যন্ত শিকড় বিস্তার করে, ততদূরের মৃত্তিকা গভীররূপে খুঁড়িয়া গোড়ার মাটী সমেত চারা উঠাইতে হইবে, সেকারণ

শিকড়ে আঘাত পাইলে চারার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইলে দুই তিন বৎসরের বড় চারাও স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। বড় চারা তুলিবার আরও একটী সহজ উপায় আছে, এক বৎসরের চারা হইলে উহার পার্শ্বে একটী গর্ত্ত করিয়া সাবধানে মূল শিকড়টীর উপরের দিকে অর্দ্ধ হস্ত রাখিয়া উহা নিম্নের অংশ হইতে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তৎপরে কর্ত্তিত শিকড়ের তলদেশে একখানি হাঁড়ির ভগ্নাংশ স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তটী বুজাইয়া ফেলিবে। এইরূপ করিতে পারিলে মূল শিকড়টী বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং চারা তুলিবার সময় তাহা অল্প আয়াসেই তুলিতে পারা যায়।

চারাগুলি চারা চৌকা হইতে উঠাইয়া, বাগানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবার সময় ২০।২৫ হাত ব্যবধান রাখিবে, ঘনভাবে রোপণ করিলে গাছগুলি বড় হইয়া সমুদায় বাগান আঁধার করিয়া ফেলে, ইহাতে গাছের গোড়ায় ভালরূপে রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পারে না। গাছের গোড়ায় যথোচিত রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে না পারিলে, কোন ফলবান বৃক্ষ হইতেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না ফলগুলি সুপুষ্ট হয় না এবং উহার স্বাদেরও ব্যাতিক্রম ঘটে। এই জন্যই ঘনভাবে না বসাইয়া আঁটির চারা গাছ অন্ততঃ ২০।২৫ হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়, তদপেক্ষাও অধিক ব্যবধানে অর্থাৎ ৩০।৩৫ হাত অন্তরে বসাইবার প্রথাও প্রচলিত আছে। যত অধিক ব্যবধানে গাছ বসান যায়, তত অধিক সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে, কারণ গাছে যত অধিক পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস লাগিবে, গাছ ততই বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ও বিস্তৃত ঝাড়ের মত হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাহাতে ফলের সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে অনেক সময় ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ ফলোৎপাদন শক্তি বিহীন হইয়াও পড়ে। কলম গাছের অন্তর ২০।২৫ হাত হইলেই যথেষ্ঠ হইতে পারে, কারণ কলম গাছ বেশী বড় হয় না।

যে স্থানে স্থায়ীরূপে চারা রোপিত হইবে তথায় ৩।৪ মাস পূর্ব্বে গর্ত্ত করিয়া রাখিতে হয়, গর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ উদ্ভিজ্জ সার ও পচা পাঁক মিশাইয়া রাখিতে হইবে। গর্ত্তটী এরূপভাবে করিতে হইবে যেন মূলের মাটী সমেত চারাটী যেন তথায় নির্ব্বিঘ্নে বসান যাইতে পারে এবং গর্ত্তের গভীরতা অধিক হইয়া চারার কাণ্ডের কিয়দংশও মৃত্তিকায় প্রোথিত না হয়। অনেকে কলমের চারার জোড়স্থানে কিয়দংশ পর্য্যন্তও মৃত্তিকা গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ঐ ড়োড়ে প্রায়ই উই ধরে। পক্ষান্তরে জোড় অধিক উচ্চ থাকাও ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে প্রবল বাতাস বা ঝড়ে গাছ দুলিবার সময় জোড় ছিড়িয়া গিয়া চারার অনিষ্ঠ ঘটিতে পারে। সুতরাং চারার একেবারে মস্তকের দিকে জোড় বান্ধিয়া কলম করা উচিত নহে। চারা পুতিয়া গোড়ার দিকে মাটী বেশী ঠাসিবে না, অধিক চাপা পাইলে গোড়ার জমাট মাটি আলগা হইয়া শিকড়ে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে।

যতদিন পর্য্যন্ত রোপিত চারার নূতন শিকড় বহির্গত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এক দিবস অন্তর বৈকালে গাছের গোড়ায় জল দিতে হইবে। কিন্তু বৃষ্টি হইলে পর, স্বতন্ত্রভাবে জলদিবার আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে যে স্থানে জল দাঁড়ায় বা যে স্থানে পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা অধিক উচ্চ বলিয়া রসশূন্য (ভূমি সমতল না হইলে অদন্তর্গত উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে স্বতঃই রস চলিয়া গিয়া উচ্চ ভূমি নীরস করিয়া ফেলে বৃষ্টির জলের সহিত উচ্চ ভূমির সার পদার্থ ধৌত হইয়াও নিম্ন ভূমিতে চলিয়া যায়, উচ্চ ভূমি নীরস হইবার ইহাও অন্যতম কারণ) তথায় চারা রোপণ করিবে না, চারার গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

কলমের চারার অতি শীঘ্র মুকুল উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রথম দুই এক বৎসর মুকুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা তাহাতে ফল জন্মিলে চারা অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু আঠির চারায় বিলম্বে মুকুল ধরে বলিয়া উহার মুকুল নষ্ট করিতে হয় না। গাছ বড় হইলে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে কিছু দিন পর্য্যন্ত জল খাওইবার জন্য মাটী খুড়িয়া গোড়ায় আলবাল (বৃক্ষমূহে জল দিবার বাঁধ) প্রস্তুত করিয়া দিবে। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে পুনরায় খুড়িয়া শিকড়গুলি বাহির করিয়া তাহাতে রৌদ্র বাতাস শিশিরাদি লাগিতে দিবে! ২০।২২ দিন পরে পুরাতন শিকড়গুলি ঢাকিয়া দিবে, এইরূপ করিতে পারিলে বৃক্ষ অত্যন্ত সতেজ ও প্রচুর ফল প্রসূ হইয়া থাকে।

এক জাতীয় আম্র বৃক্ষের বৎসরে দুইবার মুকুল হয়, তাহাকে "দোফলা" আম্র বলে। কোন কোন জাতীয় আমগাছে তিনবার মুকুল ও ফল ধরে উহাকে "তেফলা" বা বারমাসিয়া বলে, কিন্তু এরূপ অম্রবৃক্ষ খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যবসা।

এক্ষণে আমের ব্যবসা ও আম্রাস্বাদ পাইবার উপায় বর্ণনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমচুর (আমসী)—অসময়ে আম্ররক্ষার জন্য আমচুরের আবশ্যক। ইহাকে কোন কোন স্থানে আমসীও বলিয়া থাকে। তেতুল কাগজীলেবু করঞ্জা, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমড়া প্রভৃতিও অম্লাস্বাদের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল এই প্রবন্ধের আলোচনা নহে। আম্রের অম্লই আলোচ্য বিষয়।

যখন আম্রগুলি কচি অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ভিতরে আঁঠি হইবার পূর্ব্বে আম্রগুলির খোসা ছাড়াইয়া চারিখণ্ড করিতে হয়, ভিতরের কোশীটী ফেলিয়া দিবে। এইরূপে কতকগুলি আম্র খুব শুষ্ক করিয়া নীরস করিয়া লইলেই আমচুর প্রস্তুত হইল। ইহাতে আর কোনই পরিশ্রম নাই বৈশাখ মাসেই, সাধারণতঃ এই কার্য্য করিতে হয়। আমচুর প্রস্তুতের জন্য বৃক্ষ হইতে টাটকা আম্র তুলিবার কোনই আবশ্যক নাই, ঐ সময় প্রাই মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং পশ্চিমে বাতাসও প্রবাহিত হইতে থাকে।

সুতরাং তাহাতেই বিস্তর আম্র পতিত হয় ঐগুলি পরিশ্রম পূর্ব্বক কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলেই অনায়াসে আমচুর প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে বৃক্ষের আম্রেরও ক্ষতি হইল না, অথচ অকেজো যেগুলি ঝরিয়া পড়িল, তাহাতেই অন্য একটী কার্য্য সাধিত হইল। কিন্তু গাছ হইতে টাটকা আম পাড়িয়া আমচুর যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা বলাই বাহুল্য জৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত যে অবধি অম্র না পাকিয়াছে সেই পর্য্যন্ত আঁঠিযুক্ত আম্রেরও অমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে চতুঃপার্শ্বের শাঁস গ্রহণ করিয়া আঁঠি ফেলিয়া দিতে হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে আঁঠির (গুঁটীর) সকল প্রকার অম্রেরই আমচুর হয়। তদ্‌ব্যতীত মোহনভোগ, লম্বাভাদুরিয়া, কুয়া পাহরিয়া, জালিবান্ধা ইত্যাদি যত প্রকার আম্র আছে সকলেরই হইতে পারে। ফজলীর না হইবার কারণ ফজলী আম্র কাঁচা অবস্থায়ও কাঁচামিঠা আম্রের তুল্য কিছু মিষ্ট, তবে কাঁচামিঠা আম্রে দাঁত টকে না, ফজলীতে দাঁত টকিয়া যায় অন্যান্য আম্র সমস্তই অম্লাস্বাদ। সুতরাং ফজলীতে আমচুর প্রস্তুত করিলে অম্লের অভাব তো পূরণ হয় না। অধিকন্তু বর্ষার সময় আপনা হইতেই উহাতে এক প্রকার সাদা পোকা জন্মিয়া আমচুরগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে।

আমচুরগুলি রৌদ্রে খুব উত্তমরূপে বিশুষ্ক হইলে তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণ সর্ষপ তৈল মাখাইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী মৃত্তিকার বড় পাত্রে রাখিবে, ও উহার মুখে সরা দিয়া ঢাকিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুখ বান্ধিয়া দিবে। পরে প্রতি মাসেই একবার করিয়া বাহির করতঃ রৌদ্রে শুখাইয়া রাখিবে। তাহা হইলে আমচুরগুলিতে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হইবে না, বা আস্বাদনেরও কোন ইতর বিশেষ হইবে না। পরে ইচ্ছামত ইহা বিদেশে চালান দেওয়াও যাইতে পারে।

পাকা আম্রেরও আমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে অম্লাস্বাদের অভাব পূরণ হয় না, ইহা মধুর স্বাদই হয়। খুব সুপক্ক আম্রের আমচুর হয় না। কারণ উহার খোসা ছাড়াইতেই গলিয়া যায় সুতরাং দেখিতে হইবে যে, আমটী টিপিলে কিছু শক্ত বোধ হয় অথচ বার আনা রকম পাকিয়াছে, সেই অবস্থায় খোসা ছাড়াইয়া চতুঃপার্শ্বের শাঁস কর্ত্তন করিয়া লইয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইতে হয়, পরে কাঁচা আমের আমচুরের প্রক্রিয়ানুযায়ী রাখিতে হয়।

আম্র হইতে আরও এক প্রকার অম্লাস্বাদ খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে "আমের আচার" বলে ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিতানুযায়ী,—কচি অবস্থাতেই কতকগুলি আম্র যখন আঁঠি বান্ধে নাই, অথচ আঁঠির খোসা কিছু শক্ত হইয়াছে উপরের খোসা সমেত চারিখণ্ড করিয়া ও কোশী ফেলিয়া একটী বড় পাথরের পাত্রে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, যখন দেখিবে উপরের খোসাগুলিসহ শাঁস চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে ও শক্ত হইয়াছে, তখন তাহাতে অল্প সর্ষপবাটা ও এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি কিছু মশলা বেশ উত্তমরূপ মাখাইয়া আবার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে একটী মৃৎপাত্রে

এরূপ পরিমাণে সর্ষপ তৈল ঢালিয়া দিবে, যেন তন্মধ্যে আচারগুলি বেশ নিমজ্জিত হইয়া থাকে। পাত্রের মুখ একটী সরা দিয়া ঢাকিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে ও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন ইচ্ছামত ব্যবহার বা বিক্রয় করা যায়। আচারগুলি মৃৎপাত্রে না রাখিয়া কোন কাচপাত্রে বা চীনেমাটীর পাত্রে রাখিলে আরও ভাল হয়, কারণ তাহাতে মৃৎপাত্রের ন্যায় তৈল শোষণ হইয়া যায় না। মৃৎপাত্রে তৈল শোষণ হইয়া গেলে পুনরায় তৈল ঢালিয়া দিয়া আচারগুলিকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ যেগুলি উপরে থাকে তাহাতে "ছাতাধরা" রোগ জন্মিতে পারে, এবং ক্রমে সমস্ত আচার গুলিই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আমসত্ত্ব।—আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিতে বেশ সুপক্ক ও সুমিষ্ট আম্রের প্রয়োজন। টক আমের আমসত্ত্ব কোন কাজেরই নহে। অনেকে টক আমে গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া আমসত্ত্ব করে, কিন্তু তাহা ততদূর ভাল হয় না, এবং আস্বাদনেও কিছু অম্লমিষ্ট স্বাদযুক্ত হয়। সুতরাং উৎকৃষ্ট আমেরই আমসত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বেশী দরে বিক্রয় হয়। আঁঠির আমেরই আমসত্ত্ব হয়। কেবল কলম আম্র মধ্যে গোপালভোগের আমসত্ত্ব হয়। আঁঠির আম্রগুলি ও গোপালভোগ সাধারণতঃ শেষ জ্যৈষ্ঠ হইতে পাকিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আষাঢ় মাস থাকে, কিন্তু কলম আম্র শ্রাবণ মাসে পাকে। আর আঁঠির আম্রে যেরূপ রস বাহির হয়, কলমে তত সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ তখন বর্ষাকাল পড়িয়া যায়, প্রখর রৌদ্রোত্তাপ না হইলে আমসত্ত্ব হয় না। ইহার প্রস্তুত প্রনালী এইরূপ,—

প্রথমে বাঁশের কিম্বা নলের ছোট ছোট চেটাইয়ের (অন্ততঃ ৩ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ হইলেই হয়, কারণ তাহাতে তোলা তুলির পক্ষে সুবিধা হয়) চতুষ্কোণে শক্ত করিয়া বাঁশের বাখারি বান্ধিবে, যেন উঠাইতে হেলিয়া না যায়, তৎপরে উহার উপরে একখণ্ড পরিষ্কার অথচ মোটা রকম বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া দিবে, এবং তাহাতে সামান্য পরিমাণ সর্ষপ তৈল মাখাইয়া লইবে। অনন্তর কতকগুলি সুমিষ্ট ও সুপক্ক আমের খোসা ছাড়াইয়া রস গালিয়া লইয়া সরু চালুনীতে উক্ত রস ছাঁকিয়া লইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যে সকল আমের রস ঘন তাহারই আমসত্ত্ব শীঘ্র শীঘ্র পুরু হয়। পাতলা রসযুক্ত আমের আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিতে বেশী বিলম্ব লাগে। তৎপরে উক্ত চেটাইগুলি কোন একটী উচ্চস্থানে (যেমন কোন বাঁশর মাচায় ইত্যাদি) স্থাপিত করিয়া তদুপরি অল্প রস ঢালিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা সমান করিয়া রৌদ্রে খুব শুষ্ক করিবে। তবে হস্তদ্বারা সমান না করিয়া বাঁশের চেয়াড়ি দ্বারা নাড়িয়া শুষ্ক করা ভাল, কারণ খাদ্যদ্রব্যে যত কম হাত লাগান যায়, ততই ভাল। আমের রস বাহির করিবার সময়ও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পরে যখন দেখিবে বেশ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাতে হাত দিলে হাতে রস লাগিতেছে না, তখন পুনরায় কিছু রস ঢালিয়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপে প্রতিদিন ৩।৪ বার করিয়া রস ঢালিবে ও শুকাইবে।

রৌদ্রের তেজ বেশ প্রখর থাকিলেই এইরূপ রস দিবে, যে দিবস সূর্য্য মেঘাবৃত হইয়া থাকে সেদিন রস দিবে না। বরং পূর্ব্বদিনের যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই বাহিরে রাখিয়া বিশুষ্ক করিবে। যদি রৌদ্রাভাবে কিম্বা বৃষ্টির জন্য রস বেশ বিশুষ্ক হইতে না পায়, তাহা হইলে সেই আমসত্ত্ব ভ্যাপ্‌সা গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ হয়। এজন্য সাবধানে রৌদ্রের দিবসে রস ঢালিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। বৃষ্টি বাদলার দিনে উত্তাপযুক্ত ঘরে রাখিয়া শুকান যায়। ইহা কিন্তু রৌদ্রে শুষ্ক আমসত্ত্বের মত সুস্বাদু হয় না।

এইরূপে ৭।৮ দিবস রস ঢালিয়া শুষ্ক করিতে পারিলেই অন্ততঃ শিকি ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠিবে। এতদপেক্ষা বেশী পুরু করিবার ইচ্ছায় রাখিবে না কারণ তাহাতে যদি কোনরূপে ভিতরে সামান্যও কাঁচা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পচিয়া নষ্ট হইতে পারে ও দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ হইবে। সিকি ইঞ্চ পুরু হইলেই একদিবস খুব ভালরূপ শুকাইয়া প্রস্থের দিকে দৈর্ঘ রাখিয়া ৪ অঙ্গুলি বিস্তৃত করত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন করিয়া ছোট ছোট খণ্ড করিবে ও চেঁঠাই হইতে তুলিয়া লইবে। পরে তাহাতে সামান্যরূপ সর্ষপ তৈল উভয় পৃষ্ঠায় মাখাইয়া ২।১ দিন আবার রৌদ্র দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। কোনও মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া তন্মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে, এবং ২।১ মাস অন্তর রৌদ্রে দিবে ও সামান্য সামান্য তৈল মাখাইবে।

আরও এক প্রকারের আমসত্ত্ব প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু তাহা খুব পুরু হয় না। ১৬ পাউণ্ডের বালী কাগজের তুল্য মোটা হয়। প্রথমে একখানি কিম্বা ততোধিক থালা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। যখন থালাগুলি একটু গরম হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট আমের রস ঢালিয়া দিয়া থালাখানি ধরিয়া ঝোঁকাইয়া ঝোঁকাইয়া সমস্ত থালায় সমান করিয়া দিবে, হস্ত দ্বারা নাড়িবে না। পরে রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। প্রাতঃকালেই এইরূপ করিতে হয়। তাহা হইলে সমস্ত দিবসে বেশ বিশুষ্ক হইয়া যাইবে ও বৈকালে তুলিয়া লইয়া পরদিবস আবার উভয় পৃষ্ঠায় সামান্য সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গোপালভোগ, নেঙ্গরা, হাজিপুরে নেঙ্গরা, বোম্বাই প্রভৃতি আমের এইরূপ আমসত্ব অতি উৎকৃষ্ট হয়। কাঁঠালের আমসত্বও এই প্রণালীতে করা যায়। কিন্তু উহা বেশী দিন থাকেনা, খারাপ হইয়া যায়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে তেঁতুল ও কুলের আমসত্ব প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিলে অনেক দিন থাকে। তেঁতুল ও কুলের আমসত্বে গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে তাহা বেশ মিষ্ট অম্ল হয় ও মুখরোচকও হইয়া থাকে।

আম্রের এই ব্যবসা সম্বন্ধে এতদঞ্চলের পুরুষকে কোন পরিশ্রমই করিতে হয়না, তাহারা বাগান হইতে আম্র আনিয়া দিলেই তাহাদের কার্য্যের অবসান হইল। অপর

সমস্ত কার্য্যই স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া, বিস্তৃত ব্যবসায়ের উপযোগী দ্রব্য প্রস্তত হইতে পারেনা। যদি তাহাতে পুরুষের সাহায্য করা যায়, এবং ২।৪টী বিস্তীর্ণ বাগান খরিদ করিয়া লইয়া ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোগী হওয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসে একটী বিস্তৃত কারবার চলিতে পারে ও তাহাতে বেশ লাভবান হওয়া যায়। নচেৎ স্ত্রীলোকে নিজের পরিশ্রমে ও উৎসাহে যাহা করে, তাহাতে সাংসারিক খরচ বাদে দু দশ টাকার কেহ কেহ বিক্রয় করে।

বঙ্গদেশীয় গরু ও মহিষ

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু M.R.A.C. লিখিত।

বঙ্গদেশে গবাদি পশুর অবস্থা যে ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে, দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, চাষ আবাদের বলদের অভাব হইয়াছে, এ সমস্ত বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গো, মহিষ, বলিবর্দ্দাদি গণনার জন্য কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত জে, আর, ব্লাকউড্ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। কিয়দ্দিবস হইল ব্ল্যাকউড্ সাহেবের আলোচনা ও মন্তব্যাদি সমন্বিত "Survey and censces of the cattles of Bengal" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদিগের পাঠক বর্গের অবগতির জন্য উক্ত পুস্তক হইতে কতিপয় অঙ্ক ও তথ্যাদি উদ্ধৃত করিব।

গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। (১) প্রত্যেক জেলায় চাষের ও গাই গরু ও মহিষ উক্ত জেলার পক্ষে যথেষ্ঠ কি না; (২) স্থানীয় ও অন্য স্থানীয় পশুর আপেক্ষিক গুণ ও দোষ ও উহাদের উৎকর্ষ সাধনের উপায় (৩) গোজননের জন্য কোন প্রকার ষণ্ড দেশের পক্ষে উপযুক্ত এবং তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায় (৪) পশুখাদ্যের ব্যবস্থা (৫) দুগ্ধ সরবরাহের উপায় বিশেষতঃ বড় বড় নগর সমূহের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সমুদয় গরু ও মহিষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের উৎপত্তি কি প্রকারে হইল তাহা বুঝিতে হইলে স্থূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর পশু হইতে ইদানিন্তন গৃহপালিত পশুর জনন হইয়াছে যথা—(১) বন্য (২) পার্ব্বত্য ও (৩) নিম্ন প্রদেশের পশু। বন্য পশুর মধ্যে হিমালয়ের তরাই প্রদেশে প্রাপ্ত Gonæus Gourus নামক মহিষই অন্যতম। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে কেহ পালন করিতে পারে নাই। তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল ইহাদিগকে পালিত অবস্থায় বাঁচিয়া

থাকিতে দেখা যায় না। মিঠুন নামক পশু ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব অঞ্চলে আসাম ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে যথেষ্ট পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অনেক স্থানীয় লোকে পালন করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য পশুর মধ্যে সিরি জাতীয় গরুই অন্যতম। ইহা দার্জ্জিলিং সিকিম ও ভুটান প্রদেশে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ভুটানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিরি গাভী পাওয়া যায়। পাহাড়ী স্থানের অন্য জাতীয় গরু—নেপালী। এক্ষণে কতিপয় স্থানে সিরি অপেক্ষা নেপালী জাতিই অধিক পরিমাণে প্রালিত হয়। দার্জ্জিলিং জেলায় নেপালী গরুর সংখ্যা সিরি গরুর সাতগুণ। নিম্নপ্রদেশে কোন বিশেষ জেলায় যে বিশেষ জাতি আছে তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের গরুর মধ্যে কতকটা পার্থক্য আছে। বর্ত্তমান বিবরণীতে রঙ্গপুর, মেদনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় কয়েক শ্রেণীর গরু উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে রঙ্গপুরের গরু বলিয়া যে কয়েকটি উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি সমস্ত স্থানীয় নহে। উক্ত স্থানে সরকারী গোশালায় প্রচলিত কয়েকটি জাতিও রঙ্গপুরের গরু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে গবাদি পশুর অবস্থা যে অত্যন্ত হীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববিদিত। প্রতিকারের প্রধান উপায় গোজাতীর উন্নতি সাধন। কিন্তু এক্ষণে সমস্যা এই যে উন্নতি সাধন কি প্রকারে হইবে—স্থানীয় গরুর মধ্যে উৎকৃষ্টতর নির্দ্ধারণ করিয়া—কিম্বা স্থানীয় ও ভিন্নদেশীয় গরুর শঙ্কর উৎপাদন করিয়া। এতৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণের মধ্যে যথেষ্ট মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। Veterinary Departmentএর ভূতপূর্ব্ব Inspector-general Colonel Morgan বলেন যে স্থানীয় জাতীয় উৎকর্ষ সাধনই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সম্পূর্ণরূপে পৃথক লক্ষণ যুক্ত এবং ভিন্ন গোত্রের পশ্বাদির শঙ্কর উৎপাদন করিয়া কখনও স্থায়ীত্ব অথবা অধিক উন্নতির আশা করিতে পারা যায় না। অপর পক্ষে ইদানীন্তন অনেক ব্যক্তিই পশ্চিমাঞ্চল হইতে ষণ্ডাদি আনাইয়া দেশীয় গরুর উৎকৃষ্টতর জাতি প্রচলন করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বঙ্গীয় গবাদির সহিত বৃহৎ জাতীয় গবাদীর শঙ্কর উৎপাদিত হইলে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশীয় গবাদি অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে। এই বিশ্বাসটা যে অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি নিদ্ধারিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়।—(১) অন্য দেশ হইতে আনীত গাভির প্রত্যেকবার প্রসবের পর দুগ্ধ কমিয়া যায়। পশ্চিম প্রদেশে গাভী ক্রয় করিবার সময় যে সমস্ত গরু দশ বার সের দুগ্ধ দিয়াছে তাহারা এতদ্দেশে আসিয়া ৫।৬ সের দুগ্ধ দিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় একটি গোয়ালার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিতে পারা যায়। সোনপুরের হরিহর ছত্রের মেলায় উক্ত গোয়ালা ৩০০৲ টাকায় দুইটি গাভী ক্রয় করে। ক্রয় করিবার সময় নিজ হস্তে দোহন করিয়া দেখে যে উহারা প্রত্যহ ৭।৮ সের দুধ দেয়। দেশে আসিয়া কিন্তু উহারা ২॥—৩ সের দুগ্ধ দিতে আরম্ভ করে এবং সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও

১নং চিত্র—সিরি ষাঁড়
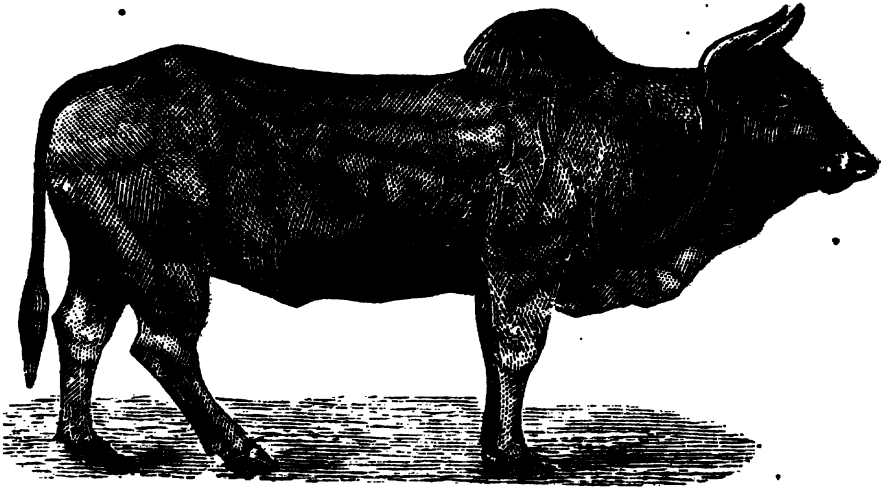
বয়স ৬ বৎসর, রঙ কাল, উচ্চতা ৫০ ইঞ্চ, বেড় বা ঘের ৭৩৷৷০ ইঞ্চ, সম্মুখের পদদ্বয় ১৭ ইঞ্চ।

২নং চিত্র—সিরি গাভী
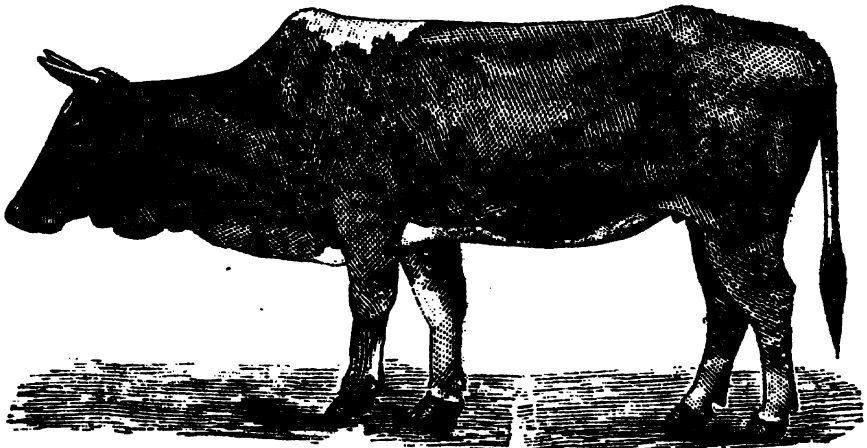
বয়স ৬ বৎসর, উচ্চতা ৫০ ইঞ্চ, বেড় বা ঘের ৬৭ ইঞ্চ, দৈর্ঘ্য ৭৬ ইঞ্চি সম্মুখের পদদ্বয় ১৩ ইঞ্চ।

৩নং চিত্র—নেপালী ষাঁড়
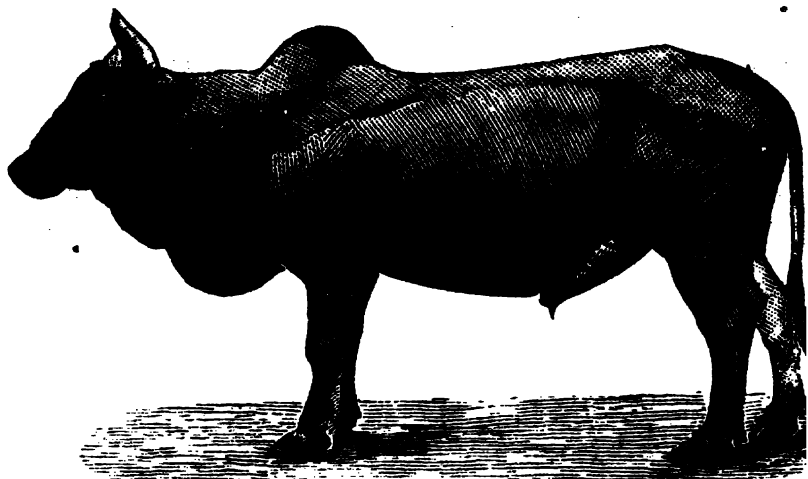
বয়স ৫ বৎসর, রঙ লাল, পৃষ্ঠ ও লেজ সাদা উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চ বেড় বাঘের ৬২ ইঞ্চি, সম্মুখের পদদ্বয় ১৪ ইঞ্চ।

৪নং চিত্র—নেপালী গাভী
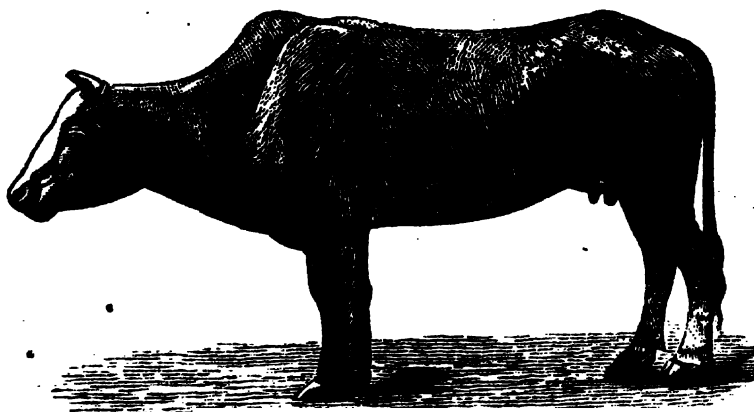
বয়স ৬ বৎসর, রঙ কাল, উচ্চতা ৪৬ ইঞ্চ, দৈর্ঘ্য ৬৮ ইঞ্চ, বেড় বাধের ৬১ ইঞ্চ, সম্মুখের পা ১৪ ইঞ্চি।

প্রয়াস সত্ত্বেও পুনর্ব্বার প্রসব হওয়ার পর কেবলমাত্র ১॥ হইতে ২ সের দুধ দেয়। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বস্তুতঃ মোটের মাথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশীয় গরু আনিয়া এতদ্দেশে বিশেষ সুবিধা নাই। সাধারণতঃ দুগ্ধত কমিয়া যায় এবং যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় সে স্থলে খরচ খরচাদির অনুপাতে লাভের জন্য গোপালনে কোন ফল নাই। সখের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশীয় অমিশ্র অথবা দেশীয় শঙ্কর জাতীয় গরুর প্রচলনে অনেক অসুবিধা আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সমগুণসম্পন্ন ষণ্ড পাওয়া অনেক সময়ে অসুবিধাজনক এবং যে কোন প্রকার আপাততঃ প্রাপ্য ষণ্ড দিয়া সন্তান প্রজনন করাইলেও উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভীর কোন সার্থকতা থাকে না। এই সমুদয় কারণে প্রতীয়মান হয় যে স্থানীয় জাতীর উৎকর্ষ সাধনা উন্নতির প্রধান উপায়। যদি শঙ্কর উৎপাদন করিয়া গবাদি পশুর উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষ অথবা জননী ও জনক যতদূর সম্ভব সম ধর্ম্ম ও গুণ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অনেক তথ্যাদি উল্লেখের পর ব্ল্যাকউড্ সাহেব বলিয়াছেন যে "Selection of indigenous animals must be the stout anchor of any scheme of improvement and that crossing should only be resorted to as a from of selection. In making any crossing care should be taken to see that the two species are similar and are not the products of essentially different sets of conditions." অর্থাৎ উন্নতি বিধানের প্রধান ভিত্তি দেশীয় গবাদির নির্ব্বাচনই হওয়া উচিত। নির্ব্বাচনের উপায় বিশেষ হিসাবেই শঙ্কর প্রজনন হওয়া উচিত। শঙ্কর প্রজননের সময় বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত যে দুইটি জাতি সমগুণ বিশিষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত পৃথক পৃথক পশু না হয়। দেশীয় গোয়ালাদের অভিজ্ঞতাও উক্ত উক্তির যুক্তি যুক্ততা প্রমাণ করে।

এতদ্দেশে গোজাতির উন্নতির আর একটি গুরুতর সমস্যা গোচারণের জমির ও পশুখাদ্যের অভাব। বিচালীই অধিকাংশ স্থলে প্রধান খাদ্য। এতদ্ভিন্ন জেলা বিশেষে গবাদির আহারের জন্য শ্যামা, কলাই, মটর, গোহামা (?), জোয়ার, খেঁসারি ও মাষকলাই অল্পবিস্তর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। দুগ্ধবতী গাভী ও ভারবহণ অথবা চাষে নিযুক্ত বলীবর্দ্দের জন্য অন্যান্য খাদ্যের সহিত তুলার বীজ, বাবুলের পাতা ও ফল, সিমুলফুল, অশ্বথ ছাল, ধান ও ভুট্টা ও গোধূমের ভূষিও স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমুদয় বন্য অথবা কর্ষিত ঘাস পশুখাদ্যরূপে কার্য্যে আইসে সেগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলায় খরজা ঘাস, জলপাইগুড়িতে কুষ, মৈমনসিংহে ঝার ও খাগুয়াল, ফরিদপুরে মালিয়া, বাখরগঞ্জে লতা এবং নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় ডাল নামক ঘাসের চাষ হইয়া থাকে। মালিয়া ঘাস জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জলপ্লাবিত স্থানে ইহাদের চাষে সুবিধা আছে।

গবাদি পশুর সংখ্যার অনুপাতে গোচারণ ভূমির পরিমান যে কত কম তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত তালিকার ৩ ও ১০ নং স্তম্ভ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। মোট গবাদির সংখ্যা হইতে বাছুর প্রভৃতি বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ, চারণভূমি সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ফরিদপুর জেলার সর্ব্বাপেক্ষা গোচরণ ভূমির অভাব। এখানে গড়ে ৬৯টি পশুর জন্য মোট এক একর জমি আছে। অন্যদিকে দার্জ্জিলিং, বাঁকুড়া ও বিরভূম জেলায় একর প্রতি পশুর সংখ্যা যথাক্রমে ·৩, ·৪ ও ১·৬। অবশিষ্ট জেলা-সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ৫টি জেলায় উক্তরূপ পশুর সংখ্যা ১০ অপেক্ষা কম। আর সর্ব্বত্রই ১০ অপেক্ষা অধিক। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে একটি গরুর দিনে দশসের শুষ্ক খাদ্য আবশ্যক হয় এবং ঐ হিসাবে এক বৎসরের খাদ্য উৎপাদন করিতে প্রায় এক একর জমি আবশ্যক হয়। আবার সে সমুদয় জমি উক্ত তালিকায় গোচারণ ভূমি বলিয়া ধরা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে সামান্য মাত্র জমিতে পশুখাদ্য উৎপাদিত হয়; অধিকাংশই পতিত জমি মাত্র। গোচারণের ভূমির পরিমান ও পশু খাদ্যের উপরই উৎকৃষ্ট জাতীয় গো জনন ও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এস্থলে প্রধান সমস্যা এই যে গোচারণের জন্য আরও অধিক পরিমাণে জমি পতিত রাখা সুব্যবস্থা কিম্বা পশুখাদ্য উৎপাদন করা সুব্যবস্থা। দেশের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পতিত জমি আবাদ হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময় অধিক জমি পতিত ফেলিয়া রাখার আশা করা বৃথা। এতএব পশুখাদ্য উৎপাদন করাই অন্যমত উপায়। আয়কর ফসলের হিসাবে এখনও পর্য্যন্ত পশুখাদ্যের চাষ হয় নাই। পর্য্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন ও পতিত রাখার ব্যবস্থাও (মিশ্রচাষ) অধিক পরিমাণ জমি লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং পশুখাদ্য ও গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এই দুই উপায়ের উপর বঙ্গে গো জাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

কৃষকের বর্ষ সমালোচনা

ভারতীয় কৃষি-সমিতির কার্য্য

ভারতীয় কৃষকের পক্ষে বড়ই শঙ্কট সময় উপস্থিত। চারিদিকে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিহেতু অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও পানীয় জলের অভাবহেতু মনুষ্য গবাদি অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষে তাহারা রাজ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না কারণ রাজার সমুদয় রাজশক্তি এক্ষণে য়ুরোপীর মহাসমরে নিযুক্ত। এমতাবস্থায় কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? 'কৃষকে' বিগতবর্ষে পুনঃ পুনঃ এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে। 'কৃষক' দেশবাসীকে সচেষ্ট হইতে বলিতেছে। জমিদার ও প্রজাগণকে, আঢ্য ও মধ্যবিত্তগণকে দেশের জন্য প্রাণপণ করিতে বলিতেছে, তাহাদের সমুদয় আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে বলিতেছে। বর্ত্তমান মহাসমরে সকলেই বিপন্ন, কৃষি, ব্যবসায় সমুদয়ই বিশৃঙ্খলভাব ধারণ করিয়াছে। বাঙলায় চাষীরা পাটের চাষে বেশ দু পয়সা লাভ করিত। রপ্তানি কমহেতু সেই পাটের বাজার নামিয়া যাওয়ায় অনেক পাট-চাষী ও পাট-ব্যাপারী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বাঙলায় বহুতর চাষী খাদ্য শস্যের চাষ ছাড়িয়া পাট চাষ লইয়া মত্ত হইয়াছিল এক্ষণে তাহারা তাহার ফলভোগ করিতেছে। চাউলের গমেরও অবাধ রপ্তানি বন্ধ। অধিকাংশ চাষী এক্ষণে এক সঙ্গে বেশী পয়সার মুখ দেখিতে পাইতেছে না, অথচ তাহাদিগকে অগ্নিমূল্যে বস্ত্রাচ্ছাদনাদি, ছুরি, কাঁচি শুচ সুতা দেশালাই, রোগীর পথ্য ও ঔষধ কিনিতে হইতেছে। অবাধ বাণিজ্যের অনন্ত প্রসারহেতু দেশের সমস্ত শিল্প নষ্ট প্রায়। ভারতীয় কৃষি সমিতি ভারতের কুটীর শিল্পগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ দেশের লোককে সচেষ্ট হইতে বলিতেছে। কিন্তু কে তাহাদের কথা শুনিবে, তাহাদের কথা বিদেশীয় বাণিজ্য বন্যায় স্রোতে এতাবৎকাল ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু

মহা বিপদকালেও শুভ সূচনা দৃষ্ট হয়—দেখা যায় অমঙ্গলই মঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া আনে। মানুষ সম্পদে যাহা দেখিতে না পায় বিপদ তাহা দেখাইয়া দেয়। অভাব না হইলে অভাব পূরণের চেষ্টা হয় না। আমরা এক্ষণে সমুদয় কাচা মাল বিদেশে পাঠাইতে পারিতেছি না বিদেশী মাল অবাধে আমদানী হইতেছে না। এখন আমরা বুঝিতেছি আমাদের শিল্পাদি নষ্ট হইয়া আমরা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ বিদেশীয় বাণিজ্য স্রোতে কথঞ্চিৎ ভাঁটার টান ধরিয়াছে; এই সুযোগে দেশবাসী তাঁহাদের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করুন নতুবা দেশের হাহাকার কোন কালে তাঁহারা ঘুচাইতে পারিবেন না।

ভারতে ধান, গম এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান খাদ্য শস্য। এই দুইটি শস্য যাহাতে সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙলাদেশ ধান চাষের এবং উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব গমের চাষের কেন্দ্র। বিহারে ধান গম প্রায় সম পরিমাণেই উৎপন্ন হয়। বাঙলা দেশের প্রায় দশভাগের এক ভাগ জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জেলায় জল হাওয়া ও মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া তদুপযুক্ত বীজ ধান নির্ব্বাচন করিয়া ও উপযুক্ত সার সংযোগে চাষ করিতে পারিলে অচিরে আবার বাঙলাদেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইতে পারে। সুপ্রণালীমত চাষ করিয়া যদি প্রত্যেক চাষী বিঘা প্রতি ২৲ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত ধান ফলাইতে পারে তবে বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ বিঘা ধান জমি হইতে কত কোটী টাকা মুনফা হইবে এবং তাহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা সকলেই লাভবান হইবেন। ধান চাষের উন্নতির প্রতি "কৃষক" একাগ্র দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে এবং বিগতবর্ষে ইহার যথোচিত আলোচনা করিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩ কোটি একর জমিতে গমের আবাদ হয়। রুসিয়াতেও গমের বিস্তৃত আবাদ, অষ্ট্রীয়া জার্ম্মনি, ইটালিতেও গম কম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমরহেতু, য়ুরোপে চাষের জমি আছে কিন্তু চাষ করিবার লোক নাই। আবার মহাবিপ্লবহেতু কত উৎপন্ন শস্য উভয়পক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এমতাবস্থায় ভারত যদি প্রচুর গম উৎপাদন করিয়া তাহার নিজের খাইবার সংস্থান রাখিয়া উদ্বৃত্ত শস্য কোন ক্রমে বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিত তবে দীন ভারতের দৈন্য অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ঘুচিত।

লোকে বলে কাহার বা সর্ব্বনাশ কাহার বা পৌস মাস, উপস্থিত ক্ষেত্রে জাপান মহাসুযোগ পাইয়াছে—জাপানি তুলাজাত দ্রব্যে ভারতের বাজার ছাইয়া গিয়াছে। জাপানি কাঁচ ও কাঁচজাত দ্রব্য ভারতের কাঁচের বাজার নামাইয়া দিয়াছে, জাপানি মদ্য য়ুরোপীয় মদ্যের স্থান অধিকার করিয়াছে, জাপানি দেশালাই, সুতা, সুই, ছুরী, কাঁচি ভারতের বাজারকে ঠাণ্ডা রাখিয়াছে, আর আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছি। কবে আমরা দেশবাসীকে ভাল বাসিতে শিখিব, কবে চাষী মজুরগণকে

আপনার বলিয়া জানিব এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া একযোগে মনুষ্য গবাদির অন্ন পানীয় সংস্থানে সচেষ্ট হইব! ভূমির উপসত্বভোগী অথচ ভূমির সহিত সম্পর্কশূন্য, চাষীর মা-বাপ অথচ তাহাদের ত্রাণ সহনাক্ষম ভারতের আকাশ পটে এরূপ জমিদার কি প্রকারে ফুটিয়া উঠিল, কোনখানকার এই বিলাতী বীজ আনিয়া ভারতের আকাশে কে ছড়াইয়া দিল—কে বলিবে! তোমরা এক্ষণে রাজ সুখ্যাতি, রাজ সম্মান লাভ কবিতেছ, রাজা তোমাদিগকে তোমাদের কুটীর শিল্পোদ্ধারে উৎসাহ দিতেছেন, তোমাদের ভাঙ্গা ঘরে জোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছে। এইবার তোমাদের কি আছে কি গিয়াছে দেখিয়া লও। নিদ্রা আলস্য ত্যাগ কর—দেখিবে কোন কিছুই অসম্ভব নহে—যাহা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহা অতি সহজসাধ্য; রাজা প্রজা এক হইয়া কাজ করিলে কোন কাজ অসিদ্ধ থাকে? তোমার শত চেষ্টা বিফল হইতে পারে কিন্তু তবুও চেষ্টা ছাড়িলে চলিবে না। অজ্ঞানের মত যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ এই মহাবাক্যের কদর্থ করিও না—তোমার নিষ্ফল প্রয়াস হইলে তুমি তোমার যত্নের দোষ অনুসন্ধান করিও। যত্নপূর্ব্বক রাজা প্রজা একমত হও। 'কৃষক' প্রজা জমিদারের মধ্যে এই সখ্যতা বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প।

গো বংশের উন্নতি না হইলে চাষের উন্নতি করা সহজ সাধ্য হইবে না। হালকর্ষণের উপর ভূমির উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টতা নির্ভর করে। গাভী পরিচর্য্যা উত্তমরূপে না শিখিলে হালবাহী বলদ মিলিবে না। গাভী পরিচর্য্যার বিষয় কৃষকে বিগত বর্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতি তাঁহাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে কত প্রকার রাসায়নিক সারের পরীক্ষা করিয়াছেন, সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে পরিক্ষীত সারের কত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার ফলে কৃষক বলিতে চায় যে, গোময় সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—দামের তুলানায় ইহা সস্তা, অপর সারের তুলনায় ইহা সহজ প্রাপ্য, ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী, ইহা "সম্পূর্ণ" সার, যে হেতু ইহাতে উদ্ভিদ খাদ্য নাট্রোযেন, ফস্ফরিকাম্ল ও পটাস এই কয়েকটি মৌলিক পদার্থ উদ্ভিদের খাদ্যোপযুক্ত ভাবে সর্ব্বদাই বিদ্যমান। "কৃষক" বলিতেছে তোমারা সোণা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থী বাঁধ কেন? তোমরা গোবর পুড়াইয়া ফেলিয়া অপর সারের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছে কেন? জ্বালানীর জন্য কাঠ বা কয়লার ব্যবস্থা কর, গোময়ের অপব্যবহার করিও না—তোমার ঘরের দুয়ার হইতে লক্ষ লক্ষ মণ হাড়ের গুঁড়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। "কৃষক" বলিতেছে যে তুমি সেই হাড়গুলি কুড়াইয়া নিজের কাজে লাগাও—আপনার ধন পরকে দিয়া দেবকীর মত মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিও না। 'কৃষকের' উত্তেজনার কিছু ফল না হইতেছে এমন নহে, যে সকল চাষী ভারতীয় কৃষি সমিতির সংশ্রবে আসিয়াছে তাহারা সকলেই এক্ষণে গবাদির মলমূত্রের সাতিশয় যত্ন করিতেছে, প্রত্যেক হাড় খানির উপর নজর রাখিতেছে, ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে বুনিয়া তাহাদ্বারা জমির উর্ব্বরতা

বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এত দিন তাহারা নিজের অভাব বুঝিয়াও বুঝিত না এবং এতাবৎকাল তাহাদিগকে সুবীজ ও উপযুক্ত সারের কথা এরূপ সরল ভাষায় বুঝাইবার কেহ ছিলনা। প্রজার কথা জমিদারের কাছে এবং জমিদারের কথা প্রজার কাছে বলিবার জন্য, এতদুভয়ে মধ্যস্থতা করিবার কাহারও মাথা ব্যথা করিত না। 'কৃষক' এই অভাব মোচনের প্রয়াসী। ব্যাপারীগণ, ব্যবসায়ীগণ, মহাজনগণ কিয়ৎ পরিমাণে মধ্যস্থতায় ব্রতী বটে কিন্তু ইঁহাদের মধ্যস্থতা প্রায়ই স্বার্থ বিজড়িত সুতরাং তাহাতে সময় সময় অমৃতের উদ্ভব না হইয়া হলাহলই উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভারতের তুলা চাষের ও বয়ন শিল্পের সম্পূর্ণ অধোগতি হইয়াছে। আমরা বিগত পূর্ব্ব বর্ষের বর্ষতালিকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু বর্তমান বর্ষে দেখিতেছি পঞ্জাব প্রদেশে মার্কিণ তুলা মন্দ হয় নাই। মার্কিণ তুলা দেশী তুলা অপেক্ষা ভাল। পাঞ্জাবের চাষীরা তুলা বেচিয়া দু পয়সা পাইতেছে। বাঙলার তুলার একদিন সুদিন ছিল—বাঙলার তুলা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই তুলার অধঃপতনের কারণ কি? কারণ আছে বৈ কি—বস্ত্র শিল্পের অবনতি তাহার প্রধান কারণ। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় নানাস্থানে, গারো পর্ব্বতে, ত্রিপুরা ও চট্টোগ্রামে অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিত। বাঙ্গলার সকল গৃহস্থ পরিবার উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে চরকার সুতা কাটা গৌরবের বলিয়া মনে করিত এবং উহা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইত। এই নিয়ম ছিল বলিয়া বাজারে বস্ত্র শিল্প এত উন্নত ছিল এবং শিল্প পরিচালকগণের অন্য পরমুখাপেক্ষা করিতে হইত না। চরকাই স্ত্রীলোক মাত্রেরই ধন দৌলত বিশেষতঃ বিধবা হিন্দু স্ত্রীগণের প্রধান অবলম্বন ছিল।

ভারতীয় কৃষি সমিতি বিগত বর্ষের উদ্যান চর্য্যায় লিপ্ত থাকিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহার কথঞ্চিত পরিচয় দিব—

১। আম গাছের প্রতিবৎসর গোড়া খোলা, গোড়ায় নূতন মাটি ও সার দেওয়া চাই—গোলাপের পাইটের মত আম গাছেরও পাইট। অধিকন্তু কুজ্ঝটিকা হইলে অম্র মুকুল ও অম্র গুটী রক্ষা করিবার জন্য গাছের তলায় সকাল সন্ধ্যায় আম পাতার ধোঁয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এতটা করিয়া তবে প্রতি বৎসর আমের ফসল লাভ করা যায়, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তিন বৎসর অন্তর এক বৎসর তোমার পক্ষে ফল লাভের সম্ভবনা থাকিবে মাত্র।

২। বেগুণ, আলু পটল, সিম, ঝিঙ্গা লঙ্কা, প্রভৃতির চাষ চাষীগণের পক্ষে উপযুক্ত। যে সকল চাষে নিড়ানি ও কোদাল উভয় প্রকারের সাহায্য লইতে হয় তাহা চাষীর পক্ষে সম্ভব। ভদ্রলোকের কোদালের চাষই সঙ্গত কারণ প্রতি হাত নিড়ানি প্রভৃতি কার্য্যে মজুরী খরচ করিয়া ভদ্র লোকের লাভ করা দুঃসাধ্য কিন্তু চাষীর স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই তাহার চাষের সহায়। কলাই, সরিষা ঝাড়া মাড়া চাষীর অন্য অপেক্ষা কম

খরচে হয় কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় কথায় খরচ। পাট, শণ কাচা, ছাড়ান চাষী নিজেই করিয়া লয় কিন্তু ভদ্রলোকের একার্য্যে মজুর নিলান দায়। ভদ্রলোকের এই কারণে কলা, পেঁপে, আনারস লেবু পেয়ারা, আখ, আলু, ওল, আম, কচু, মটর প্রভৃতি ফল ও শস্যের চাষই সঙ্গত।

৩। সামান্য গৃহস্থালী চাষ ও ব্যবসায়ের জন্য চাষ সতন্ত্র—আখ, তামাক, আলু প্রভৃতির মোটা রকম চাষ করিতে হইলে উপযুক্ত মূলধন আবশ্যক। এরূপ স্থলে জমিদার, কৃষক, মহাজন তিনে মিলিয়া কাজ করিলে কাজটা ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধা জনক হয়। ইচ্ছা করিলে জমিদার মূলধন যোগাইতে পারেন। আখ চাষের সহিত আখমাড়া কল ও গুড় প্রস্তুতের কারখানা থাকা আবশ্যক, তামাক চাষের সহিত, তামাক ও চুরুটের কারখানা থাকিলে ভাল হয়।

বিস্তৃত ফলের বাগানের সহিত ফল সংরক্ষণ ও ফল রপ্তানির ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবে সকল দিক শোভন হয়।

৪। ফুলের চাষে উত্তরোত্তর লাভ দেখা যাইতেছে—নানাদেশ বিদেশের লোক ভারতে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের ফুলের ব্যবহার অত্যধিক। তাহারা যেমন রোজগার করে তেমনি সখের জন্য পয়সা ব্যয় করে। তাহাদের দেখা দেখি আমরাও পেটে ভাত না থাকিলেও সখে মাতিয়াছি এবং ফুল ও পাতাবাহার গাছের জন্য সময় সময় অকাতরে পয়সা খরচ করি। তখন মালিরা কেবলমাত্র পূজার ফুল উৎপাদন করিত এবং দেব পূজা ও মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য ফুল যোগাইত। তখন এত গোলাপ, এত রকমের চম্পক, এত রঙ বেরঙের আকারের ফুলের কেহ সন্ধান রাখিত না, এখন নৃত্যগীতাদি উৎসবে, ছেলে মেয়ের বিবাহ ও অন্নপ্রাশনে ফুলের খরচ একটা প্রধান খরচ। ভারতীয় কৃষি সমিতি নানা দিগ্দেশ হইতে গোলাপাদি নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষও আনাইয়া সরবরাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। অর্কিড্ সরবরাহের জন্য উক্ত সমিতি কর্তৃক দার্জ্জিলিঙে একটী শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ফার্ণ পাম ও পাতা বাহার গাছের সমাবেশ রাখিতে হইয়াছে। এই সকল গাছ হইতে যদি বিদেশীয়গণের নিকট হইতে ধনাগম হয় তাহাতে দেশের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই কিন্তু যে সমুদয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম হইতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার আয়ের সম্ভাবনা নাই সেই সকল বৃক্ষাদি দ্বারা দেশটা ছাইয়া ফেলা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।—আমাদের দেশীয় তাল, গুপারী, নারিকেল খর্জ্জুর প্রভৃতি পামগুলি দেখিতে কুদৃশ্য নহে। কেবল শোভন দর্শন লইয়া তুমি দরিদ্র তোমার কাজ চলিবে না তোমাকে রূপ গুণ দুই দেখিতে হইবে।—"কৃষক" প্রতিনিয়ত এই কথাই বলে।

কৃষি-যন্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি সমিতির অভিজ্ঞতা এই যে এঞ্জিন বা ইলেক্ট্রিক মোটর পরিচালিত কলের লাঙ্গলের ব্যবহার এদেশে বড় সুবিধাজনক হইবে না। এদেশের

চাষীদের কলের লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত প্রশস্থ ক্ষেত্র নাই বা পয়সা নাই। যদি বিদেশীয় মূলধনে বা যৌথ মূলধনে এবম্প্রকার কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে অধিকাংশ চাষী পরিবায় ঐ সকল ফলের ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ কুলী মজুরের কার্য্য করিবে মাত্র, তাহাদের সতন্ত্র সত্বা লোপ পাইবে। ছোট খাট কৃষিযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা মন্দ নহে—

১। হস্তচালিত প্লানেট জুনিয়র হো বেশ কাজের জিনিষ।

২। সদাসিধা মাটি ওল্টান মেষ্টন লাঙ্গলখানি কাজের উপযুক্ত।

৩। বিম হ্যারো বা জিগজ্যাগ হ্যারো একপ্রকার বিদা বিশেষ। ইহা দ্বারা জমির উপরিভাগ খুসিয়া দিবার সুবিধা হয় আউস ধান, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিড়ান ও ঘন চারা উঠাইয়া পাতলা করিয়া দিবার কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়। ইহাতে বলদ যোতা চলে সুতরাং হাতে নিড়ানি করা অপেক্ষা কম খরচে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪। জলত্তোলন যন্ত্রের মধ্যে যেন পম্প মন্দ জিনিষ নহে। ইহা পশ্চিমাঞ্চলে সুগভীর কুপাদি হইতে জল উঠাইবার পক্ষেই অধিক উপযুক্ত। বাঙলা দেশে সিউনি যথোপযুক্ত কার্য্য করে। গাছ বা ক্ষেতে জল ছিটাইবার জন্য পিচকারীর বিশেষ আবশ্যক। বকেট স্প্রেয়ার ও সাধারণ পিচকারী প্রভৃতি জল ছিটাইবার বহুতর যন্ত্র আছে কিন্তু সেগুলি সমস্তই দিদেশ হইতে আসিত এবং বর্ত্তমান সময়ে দুই একটাও মিলান ভার হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে 'কৃষকের' বক্তব্য এই যে আমাদের দেশী লাঙ্গল অকেজো জিনিষ নহে এবং যেখানে যেমনটি আবশ্যক সেইথানে সেইরকম লাঙ্গলেরই প্রচলন আছে। ঐ সমস্ত লাঙ্গলের একটু ইতরবিশেষ করিয়া লইলে, একটু অদল বদল করিয়া লইলেই সময়োপযোগী হইবে। ডাল ছাঁটা কাঁচি, ফুল তোলা কাঁচি, উইড ফর্ক, হাত বিদা, হাত কোদাল, হাত খোন্তা প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশীয় উদ্যান যন্ত্র বিদেশ হইতে আনাইতে হয় কিন্তু তাই বলিয়া আমদের কোদাল, কাঁটারি, খোন্তা কুঠার, কাস্তে, ছুরীগুলি হতাদর করিবার জিনিষ নহে। ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্যোগে এমন কতকগুলি উদ্যান যন্ত্র এখানে নির্ম্মিত হইতেছে যে বিলাতী তাহার নিকট হার মানিয়া যায়। তন্মধ্যে কলম বাঁধা ছুরী, হাতখোন্তা, নিড়ানি, ডাল ছাটা ছুরী জল সিঞ্চনের বোমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু 'কৃষক' বলে যে কৃষির উন্নতি কল্পে এই সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সুখের বটে কিন্তু ইহাও বাহ্য। আসল কথা কিন্তু সুবীজ সংস্থান। ভারতের লোকে এখন সুবীজের সন্ধান লইতে শিখিয়াছে, বিদেশ হইতে নানাপ্রকার শাক সব্জী, শস্যবীজ আনাইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর বহুটাকার বীজ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এই সমুদয় বীজই ভারতের জল মাটিতে একটু তদ্বির করিলে অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে এবং ভারত অতি সহজে তাহার বীজ সংগ্রহ করিতে পারে ও ক্রমশঃ এখান হইতে বীজ রপ্তানি করিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতেও

পারে। ভারতীয় কৃষি সমিতি লাউ, কুমড়া, শসা বেগুণ, মূলা, সীম প্রভৃতি সব্জী বীজের উন্নতি করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। বিলাতী বীজ সালগম, বীট, ফুলকপি বীজ কিছু পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন। কিন্তু প্রয়োজন অনুরূপ বীজ উৎপন্ন করার মত বিপুল আয়োজন করার সামর্থ তাঁহাদের নাই। এ কার্য্যে কৃষক জমিদার মহাজন তিনে মিলিয়া যোগদান না করিলে কার্য্য সুকর হইবে না। "কৃষক" বলিতেছে যে অতি বাহ্য জিনিষ লইয়া হৈ চৈ করিয়া এবং পয়সার অপব্যয় করিয়া আর কতকাল আত্ম প্রবঞ্চনা করিবে—কালক্ষেপ না করিয়া কাজের কথা কও, কাজে হাত দাও, পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া দাও।

দেশের গোময় সারের অপব্যবহার না হয়, দেশের হাড়ের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া না যায়, শস্য বীজের খৈল যেন প্রয়োজন মত মাটিতে প্রযুক্ত হয়, ভারতের মাটি হইতে অধিক না হউক যেন ভারতের প্রয়োজন মত সুবীজ উৎপন্ন হয়, ইহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে ইহার জন্য সমস্ত শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিতে হইবে তবেই আবার ভারতের মাটি শস্য শ্যামলা হইবে তবেই আবার লোকের মুখে মুখে হাঁসি ফুটিয়া উঠিবে অনশন ক্লিষ্ট দেহে প্রাণটা কোন ক্রমে থাকে বটে কিন্তু সে প্রাণে উত্তেজনা থাকে না, দেহ ক্লিষ্ট হইলে মনও ক্লিষ্ট হয়, মনের দৃঢ়তা নষ্ট হয় সে মন লইয়া কোন কাজ করা যায় না; সেই জন্য "কৃষক" বলে যে দেশের অন্ন পানীয়ের অগ্রে সংস্থান কর তার পর সভাসমিতি করিয়া বড় কথা কহিও।

বাঙ্গলায় কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা—ইতিপূর্ব্বে ঢাকা ফার্ম্মে বৎসরে ৮ জন লোককে ১৫৲ টাকা বৃত্তি দিয়া শিক্ষানবীশ লওয়া হইয়াছিল। এক বৎসর কাল শিক্ষা করিয়া ইহারা কৃষিবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এ বৎসর উক্ত ফার্ম্মে ১৬ জন ছাত্রকে হাতে কলমে কৃষি-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজসাহী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ফার্ম্মেও কৃষি-শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে কিন্তু এরূপ সামান্য শিক্ষায় বিশেষ কোন কাজ হইবে না। কৃষি-শিক্ষার জন্য রিতিমত স্কুল পাঠশালা ও পরীক্ষাক্ষেত্র আবশ্যক।

ভারতীয় কৃষি-সমিতি বিগত বৎসর "কৃষক" প্রচার ও বড় বড় পুস্তক প্রচার ব্যতীত সাধারণের, বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকার সুবিধার্থ সহজ বোধ্য ভাষায় মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তিকার দাম ⁄০ এক আনা মাত্র; ইতিমধ্যে দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা।

২। মশালা—রন্ধনে, পানে, পানীয়ে, তৈলে আমরা যে সমুদয় মশলা ব্যবহার করি তাহাদের চাষাবাদ সম্বন্ধে ও ব্যবসা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী। আলু চাষ, আখ চাষ, ধান চাষ, কলাই চাষ, ফলের বাগান প্রভৃতি বিষয় বিশেষ লইয়া এইরূপ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইবে।

বর্ষশেষ—আর একটি বর্ষ পরিমাণ কাল অনন্তকাল গর্ভে লীন হইল। যে কাল যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। গত কাল সুখ দুঃখের কোন্ স্মৃতি রাখিয়া গেল বা কোন আশা জাগাইয়া দিয়া গেল তাহাই একবার খতাইয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বর্ষ ফল

ভারতবর্ষের বাণিজ্য—আমদানী ও রপ্তানির পথ সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে বলিয়া ভারতীয় বাজারে প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে; সেজন্য ঐ সকল দ্রব্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ এমন কি চতুর্গুণ মূল্যেও বিক্রীত হইতেছে।

এ দেশে যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের উপায় নাই, অন্যান্য দেশ হইতে সেই সমুদায় দ্রব্য এখন এ দেশে আমদানি হইতেছে এবং ভারতের জনসাধারণকে বাধ্য হইয়া অধিক মূল্যে তাহাই ক্রয় করিতে হইতেছে। এ দেশে শিল্প দ্রব্য সমূহের উৎপাদন সুসাধ্য করা কর্ত্তৃপক্ষের সহায় সাপেক্ষ।

বঙ্গদেশে কাপড়ের কল, চিনির কারখানা, দেশলাইয়ের কারখানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সহায়তা না পাওয়ায় বৈদেশিক বণিকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ঐ সকল কারখানা লাভজনক হয় নাই; কাজেই উহার প্রসারও ঘটে নাই। মহাসমরের ফলে এদেশে আমদানি রপ্তানি সুকর না হওয়াতে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন পরে ভারতে শিল্প পণ্যের উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন এবং দেশের জনগণকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন।

শুভ সূচনা—পণ্য প্রদর্শনী—কলিকাতায় এবং বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহামের স্মৃতিরক্ষার্থ বোম্বায়ে বাণিজ্য কলেজের প্রতিষ্ঠা ইহারই অভিব্যক্তি মাত্র। যে সকল দ্রব্য জার্ম্মানি অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আসিত, সেই সমুদয় পণ্য এদেশেই প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। এদেশের শিল্পীগণ যাহাতে জার্ম্মনি বা অষ্ট্রীয়ার ন্যায় পণ্য সকল উৎপাদনে মনোযোগী হয়, তজ্জন্য পণ্যপ্রদর্শনীতে সর্ব্ববিধ দ্রব্য সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রদর্শন দেখিবার পর ভারতের কোনও প্রদেশে নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা শুনি নাই। কেবল উত্তর ত্রিবাঙ্কুরে ইত্তুমানুর নামক স্থানে একটি

চিনির কারখানা—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই কারখানার পরিচালনে কোনও প্রকার সহায়তা করিতেছেন কি না, তাহা জানা যায় না,

বঙ্গদেশে তারপুরে যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা জভা ও বিট্ চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুরের কারখানা সজ্জনকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় উন্নতি লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা। কেবল পণ্য দ্রব্য নহে,

খাদ্য দ্রব্যও দুর্ম্মূল্য—হইয়াছে। ১৩২০ সালে বর্দ্ধমান, মেদনীপুর ও হাওড়া জেলায় জলপ্লাবনের ফলে শস্যহানি ঘটিয়াছিল; তাহার পর ১৩২১ সাল হইতে মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে; ইহার উপর নৈসর্গিক কারণে এই কয় বৎসরই এ দেশে অজন্মা হইয়াছে। গত বৎসরও পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে।

এ রকম জলপ্লাবন—এতদঞ্চলে বহুকাল হয় নাই। কোন কোন গ্রামে বাসগৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রাণহানির সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই কিন্তু গবাদি গৃহপালিত পশু অনেক মরিয়াছিল। ক্ষেত্রের শস্য ডুবিয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একে যুদ্ধের জন্য গত বৎসর পাটের বাজার মন্দ ছিল, তাহার উপর, পাটের বাজার চড়িবে বলিয়া আশা করিয়া যাহারা পাটের আবাদ করিয়াছিল, তাহাদেরও জলপ্লাবনে সকল আশা সমূলে ধুইয়া যায়—ফলে পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকগণ মহাজনের দেনা শোধ করিতে পারে নাই এবং নুতন পাট গৃতজাত করিয়াও অর্থচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টির ফলে যেমন শস্যহানি ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় ও অন্যান্য স্থানে সেইরূপ

অনাবৃষ্টির জন্য—ক্ষেত্রের শস্য রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়াছে। এক দিকে অতিবৃষ্টি ও অপর দিকে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বঙ্গদেশে গত বৎসর অতি অল্পই শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ফলে প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে ও পরে বাঁকুড়া জেলায়

ভীষণ দুর্ভিক্ষ—উপস্থিত হইয়াছে প্রজা সাধারণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা যে সকল রাজকর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে দুর্ভিক্ষের কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, শস্যহানির জন্য বঙ্গদেশে সামান্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে পারে, দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কাই নাই। কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে যখন দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বিবৃত হইতে লাগিল, মিশনারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্র যখন শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, তখন আর দুর্ভিক্ষের সংবাদ চাপা রহিল না। নানাস্থানে

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—খোলা হইল। রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়াড়ী এসোসিয়েসন, সোশ্যাল লীগ, বামা মিশন প্রভৃতির পরহিতব্রত মহানুভব কর্ম্মীগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানসমূহে, গমন করিয়া জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় বুভুক্ষু জনগণকে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাই সর্ব্বপ্রথমে চাঁদপুরে অন্নকষ্টের সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেশের

জনগণকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলাম আমাদিগের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই ইহা অতিশয় সুখের বিষয়। দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া আমরা দুর্ভিক্ষফণ্ড খুলিয়াছিলাম—হিতবাদীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ দেশের দুরবস্থা বুঝিয়া,

কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা—করিয়া এবং স্থল বিশেষে অর্থ ও চাউল প্রভৃতি দান করিয়া দেশের লোকের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বাকুড়ার অবস্থা এখনও শোচনীয়। অন্ততঃ শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণকে আহার্য্য ও পরিধেয় প্রদান করিতে না পারিলে অনেকেরই প্রাণবিয়োগ হইবে। এবারও বৃষ্টির অভাব হইতেছে দেখিয়া অনেকে আরও বিপৎপাতের আশঙ্কা করিতেছে। দুর্ভিক্ষ ফণ্ডেও অর্থাভাব ঘটিয়াছে, চাঁদা আর পাওয়া যাইতেছে না অথচ কর্ম্মীগণ প্রায়ই আমাদিগের নিকটে অর্থের জন্য লিখিতেছেন।

চিনির আমদানি শুল্ক—শতকরা পাঁচ টাকার স্থলে দশ টাকা করা হইয়াছে, ইহাতে দেশীয় চিনির কারখানাওয়ালাদিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে। ডাল কলাই, চা'র বাক্স উহা প্রস্তুত করিবার জন্য সিসার পাত, কার্পাস বয়নের কল ভিন্ন অন্যান্য কল, রেলনির্ম্মাণের দ্রব্যাদি, রেলে ব্যবহারের জন্য টেলিগ্রাফের দ্রব্যাদির উপর পূর্ব্বে মাশুল ছিল না, এখন শতকরা ২৷৷৹ টাকা মাশুল ধার্য্য হইয়াছে। কয়লার মাশুলও প্রতি টনে আট আনা হিসাবে বাড়িতেছে। সুতরাং দরিদ্র স্কন্ধে—ডাল লবণ ও কয়লার শুল্কজনিত চাপ পড়িবে। তবে অর্থ-সচিব মহাশয় বলিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ যতদিন থাকিবে, ততদিন ডাল কলাইয়ের উপর শুল্ক লওয়া হইবে না। ইহা শুনিতে মলায়েম বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, কর্ত্তৃপক্ষ সব সময়ে তাহা যে বুঝেন না, ইহাই ত দুঃখ। তাঁহারা অসংখ্য প্রাণহানির সংবাদ না পাইলে দেশের দুর্ভিক্ষ ধারণাই করিতে পারেন না। ইহা অধিকাংশ স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের সময়োচিত অনবধানতায় বা অবহেলায় ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষ যে দরিদ্র প্রজার মুখ চাহিয়া কার্য্য করিতেছেন, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। হিতবাদী।

পত্রাদি

প্লানেট জুনিয়র হো—

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, আহার বেলুনা বর্দ্ধমান।

প্রশ্ন—প্লানেট জুনিয়র লাঙল দ্বারা আলুর ভাটিতে মাটি দেওয়া কার্য্য চলিতে পারে কি না?

উত্তর—আলুতে মাটি দেওয়া কার্য্য সুন্দররূপ চলিতে পারে। কিন্তু এই লাঙল দ্বারা কার্য্য করিতে হইলে আলুর সারি অপেক্ষাকৃত ফাঁক ফাঁক করিতে হয়। সরু হাত কোদালে কার্য্য হইলে এতদপেক্ষা ঘন সার হইলে চলে। এক দিকে যেমন জমির অপচয় হেতু ফসল কিঞ্চিত কম হয় কিন্তু এই লাঙল ব্যবহার করিলে মাটি দিবার যে খরচ বাঁচিয়া যায় তাহাতে মোটের উপর লাভই থাকে।

গোজনন—

প্রশ্ন—চাষী ও সাধারণ গৃহস্থগণ আমাদিগকে জানাইতেছেন যে গাভীকে বলদ দেখাইবার পক্ষে বড়ই মুস্কিল হইয়াছে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাব। ভারতীয় কৃষি-সমিতি সরকারী পশুচিকিৎসা বিভাগে পত্র লিখিয়া জানিয়াছেন যে সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগে মোট ২৮টী বৃষ আছে এবং বেলগাছিয়ায় ৮টী বৃষ আছে। সরকারী বৃষের সংখ্যা আরও অধিক হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপযুক্ত বৃষের ব্যবস্থা না থাকিলে গো বংশে উন্নতি কখন হইবে না। আমরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যাহাতে পড়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

লটকান (BIXA ORELLANA)—

শ্রীমন্মথ নাথ ত্রিবেদী, পথাগড় লোকনাথপুর, জয়রামপুর নদীয়া

প্রশ্ন—লটকানের বীজ রঙের জন্য ব্যবহার, কোথায় ইহার চাষ অধিক? বাঙলার কার্পাস ব্যবসা, বিলাতী আনারসের ব্যবহার।

উত্তর—আজ কাল নানা প্রকার কৃত্রিম রঙের আমদানী হেতু এই সকল রঙ উৎপাদনকারী বৃক্ষাদির আবাদ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অধুনা ইয়ুরোপীয় মহাসমর হেতু বাণিজ্য বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় আবার লোকে উদ্ভিজ্জ রঙের তল্লাস লইতেছে। আমরা কিন্তু ঠীক বলিতে পারিলাম না কোথায় ইহার স্বতন্ত্র আবাদ হয়। বাগানের আশে পাশে, বেড়ার ধারে সব্জী ক্ষেতের কোণে বাঙলা, বিহারের সর্ব্বত্রই দু দশটা লটকান গাছ দেখা যায়। লটকান বীজ ইয়ুরোপের বাজারে রপ্তানি হইত, তখন ইহার দর ছিল ।০ চারি আনা হইতে ১।০ পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত পাউণ্ড। এখন বাঙলার কোন বাজারে উহার বীজ বিক্রয় হইতে দেখি না সুতরাং বীজের দর ঠিক বলা যায় না। ভারতীয় কৃষি-সমিতির অফিসে লটকান বীজ নাই।

মুর্শীদাবাদে লটকান দ্বারা বস্ত্র রঞ্জনের ব্যবস্থা অদ্যাপিও দেখা যায়।

উত্তর—বাঙলার বাজারে কাপাস তুলার খরিদ বিক্রয় নাই। আপনি এই জন্য বাণিজ্য ব্যাপারের ডিরেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিবেন। তাঁহার ঠীকানা—

The Director of Commercial Intellegence, Commercial Museum, Council House street, Calcutta.

উত্তর—উক্ত প্রকার গাছকে মুর্গা (Agave) বলে। এগেভ নানা জাতীয় আছে। ইহাকে বিলাতী আনারসও বলে। ইহার আঁস খুব শক্ত উহা দ্বারা দড়ি ম্যাটিং প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

সার সংগ্রহ।

কামিয়া

পালামৌ বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের অন্তর্গত ছোটনাগপুর জেলায় অবস্থিত ইহা একটি পরগণা। আয়তন প্রায় ৪,৫৩৫ চারি সহস্র পঞ্চশত পঞ্চত্রিংশ বর্গমাইল। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ সমগ্র ভূভাগ মধ্যে ইহার ন্যায় অনুর্ব্বর ভূমি কোথাও নাই। এখানে নদী নাই—কূপ হইতে সকলে জল সংগ্রহ করে। দেশের সর্ব্বত্র শালবৃক্ষসমাচ্ছন্ন গভীর অরণ্য। এ দেশ এত অনুর্ব্বর যে, সর্ষপ, তিল, কলাই, মকাই প্রভৃতি রবিশস্য কখনও আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং চাষীদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানের জমীদারগণ জমীর আয়ের উপর শতকরা ছয় টাকা হইতে বারো টাকা পর্য্যন্ত কর-স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পালামৌ-এর জমীদারগণ শতকরা ৪০৲ টাকা হইতে ৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত লইয়াও সন্তুষ্ট নহেন। ইহার উপর বলপ্রয়োগে কর সংগ্রহের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ভারতে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা হয় না সত্য, কিন্তু পালামৌ-এর এই হতভাগ্য কৃষকগণের ন্যায় এত অধিক দুর্দ্দশাভোগ বোধ হয় কেহ করে না। সদাশয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে ইংরাজ রাজত্ব হইতে ক্রীতদাস-প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা একবার পালামৌএর অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন যে, প্রকাশ্যে বিপণী সজ্জিত করিয়া অসংখ্য ক্রেতার সম্মুখে নরনারী-বিক্রয়ের দৃশ্য লুপ্ত হইয়া যাইলেও, ভিন্ন আকারে এই ঘৃণিত ব্যবসায় এখনও অনেক স্থলে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

পালামৌতে "কামিয়াতী" আখ্যায় এইরূপ দাসত্বপ্রথা পূর্ণবিক্রমে চলিতেছে। কোনও বৎসর পর্জ্জন্যদেবের বিরাগহেতু উপযুক্ত শস্য না জন্মিলে, বা পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে সারাবৎসরের পরিশ্রমলব্ধ শস্যরাশি জমীদারের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে, নিরন্ন প্রজাদিগকে ক্ষুধার জ্বালায় উদর পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ করিতে হয়। তখন তাহারা স্থানীয় জমীদারের নিকট এই সর্ত্তে ঋণগ্রহণ করে যে, যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজা মহাজনের নিকট দাস-রূপে অবস্থান করিবে। অবশ্য তদবধি জমীদার তাহার ভরণপোষণের ভারগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু বেচারী অন্য কোনও স্থানে মজুরী করিতে পায় না। সুতরাং সে নিজ পরিজনবর্গকেও প্রতিপালন করিতে পারে না, এবং ঋণপরিশোধের কোনও উপায়ও করিতে পারে না। ইহার উপর যদি এই সকল দাসের বিবাহযোগ্য পুত্র থাকে, তাহা হইলে, বরের জনক অকূল পাথারে পতিত হয়।—পুত্রের বিবাহদান ইহাদের সমাজে অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

শুধু পালামৌ নহে, সমগ্র ভারতের কৃষকগণ চিরন্তন প্রথা অনুসারে অতি অল্প-বয়স্ক পুত্রকন্যার বিবাহদান কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করে। পুরাকালে উর্ব্বর হিন্দুস্থানের বক্ষে কর্ষণ করিলেই "সোনা ফলিত," সুতরাং তখন কৃষককুল লোকবলই প্রধান বল জ্ঞান করিত। আজিও বোধ হয় সেই প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে গিয়া দেশের কৃষককুল পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হয়। সুতরাং পালামৌ-এর নিরক্ষর কৃষকগণ যে স্বয়ং ঋণপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও অল্পবয়স্ক পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য, তাহার প্রভু সানন্দে বিবাহের ব্যয় জন্য ধার দিয়া থাকে। ঋণদাতা এই সর্ত্তে ঋণ দেন যে, বিবাহের পর দাসের পুত্রও তাহার নিকট 'কামিয়াতী' অর্থাৎ দাসত্ব করিবে। মহাজনকে নগদ এক কপর্দ্দকও বাহির করিতে হয় না। চাউল, ডাইল, আটা, তৈল, লবণ, মিষ্টান্ন, কিঞ্চিৎ মাদকদ্রব্য ও কয়েকখানি রৌপ্যালঙ্কারের বিনিময়ে ঋণদাতা একটি নূতন ক্রীতদাস লাভ করে। এই ভাবে কৃষকগণ বংশানুক্রমে দাসত্ব করিতে থাকে। প্রভুরা ইহাদিগকে অতীব পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য করাইয়া লইয়াও ক্ষান্ত হয় না, তাহারা সময়ে সময়ে তুচ্ছ কারণে বা অকারণে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় ইহাদিগকেও নির্য্যাতিত করে। এ জন্য অনেক 'কামিয়া' বা দাস এতদ্র উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দর বন ও আসাম প্রদেশে পলায়ন করে। কিন্তু ইহাদের প্রভুগণ পলাতক-দিগের সন্ধান পাইলে আবার তাহাদিগকে ধরিয়া আনে, অথবা ইহাদের নূতন প্রভুর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে।

সচরাচর ২৮৲ টাকা প্রদান করিলেই একটি কামিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল কার্য্য করিবার পর উক্ত কামিয়া যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে, তাহার প্রভু নানা উপায়ে পূরা টাকা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা গ্রহণ করিয়া তবে তাহাকে পরিত্যাগ করে। অনেক সময়ে এমন দেখা গিয়াছে যে, সামান্য দুই চারিটি মুদ্রার অভাবে অনেক কৃষক কামিয়াতী গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ও নিজ জমী হইতে উৎপন্ন শস্য প্রদান দ্বারা উক্ত টাকার বিশগুণ প্রকারান্তরে প্রত্যর্পণ করিয়াও মুক্তি পায় নাই। যে নিজ ব্যর্থ জীবনের বিনিময়ে প্রভুকে সম্পদশালী করিয়া তুলে, তাহাকে সারাজীবন কঠিন দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ হইয়া পথের ধূলিকণা অপেক্ষাও অনাদৃত অবস্থায় কাঁদিয়া কাল কাটাইতে হয়। আর সেই হতভাগ্যগণের রুধিরে উদরপূর্ত্তি করিয়া জমীদারনগুলী প্রজাদের দারিদ্র্যের কথা উঠিলে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়া থাকেন,—ইহাই কৃষককুলের বিধিলিপি! ইংরেজ রাজ্যে ইহার প্রতীকার কি অসম্ভব?

দেশলাই—যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ১,৮৩,৯৪,০০০ গ্রোস দেশলাই ভারতবর্ষে আমদানি হইত। গত বৎসর এক জাপান হইতেই ১,৫২,৭৮,০১৮ গ্রোস দেশলাই আমদানী

সার সংগ্রহ।

কামিয়া

পালামৌ বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের অন্তর্গত ছোটনাগপুর জেলায় অবস্থিত ইহা একটি পরগণা। আয়তন প্রায় ৪,৫৩৫ চারি সহস্র পঞ্চশত পঞ্চত্রিংশ বর্গমাইল। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ সমগ্র ভূভাগ মধ্যে ইহার ন্যায় অনুর্ব্বর ভূমি কোথাও নাই। এখানে নদী নাই—কূপ হইতে সকলে জল সংগ্রহ করে। দেশের সর্ব্বত্র শালবৃক্ষসমাচ্ছন্ন গভীর অরণ্য। এ দেশ এরূ অনুর্ব্বর যে, সর্ষপ, তিল, কলাই, মকাই প্রভৃতি রবিশস্য কখনও আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং চাষীদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানের জমীদারগণ জমীর আয়ের উপর শতকরা ছয় টাকা হইতে বারো টাকা পর্য্যন্ত কর-স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পালামৌ-এর জমীদারগণ শতকরা ৪০৲ টাকা হইতে ৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত লইয়াও সন্তুষ্ট নহেন। ইহার উপর বলপ্রয়োগে কর সংগ্রহের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ভারতে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা হয় না সত্য, কিন্তু পালামৌ-এর এই হতভাগ্য কৃষকগণের ন্যায় এত অধিক দুর্দ্দশাভোগ বোধ হয় কেহ করে না। সদাশয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে ইংরাজ রাজত্ব হইতে ক্রীতদাস-প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা একবার পালামৌএর অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন যে, প্রকাশ্যে বিপণী সজ্জিত করিয়া অসংখ্য ক্রেতার সম্মুখে নরনারী-বিক্রয়ের দৃশ্য লুপ্ত হইয়া যাইলেও, ভিন্ন আকারে এই ঘৃণিত ব্যবসায় এখনও অনেক স্থলে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

পালামৌতে "কামিয়াতী" আখ্যায় এইরূপ দাসত্বপ্রথা পূর্ণবিক্রমে চলিতেছে। কোনও বৎসর পর্জ্জন্যদেবের বিরাগহেতু উপযুক্ত শস্য না জন্মিলে, বা পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে সারাবৎসরের পরিশ্রমলব্ধ শস্যরাশি জমীদারের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে, নিরন্ন প্রজাদিগকে ক্ষুধার জ্বালায় উদর পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ করিতে হয়। তখন তাহারা স্থানীয় জমীদারের নিকট এই সর্ত্তে ঋণগ্রহণ করে যে, যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজা মহাজনের নিকট দাস-রূপে অবস্থান করিবে। অবশ্য তদবধি জমীদার তাহার ভরণপোষণের ভারগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু বেচারী অন্য কোনও স্থানে মজুরী করিতে পায় না। সুতরাং সে নিজ পরিজনবর্গকেও প্রতিপালন করিতে পারে না, এবং ঋণপরিশোধের কোনও উপায়ও করিতে পারে না। ইহার উপর যদি এই সকল দাসের বিবাহযোগ্য পুত্র থাকে, তাহা হইলে, বরের জনক অকূল পাথারে পতিত হয়।—পুত্রের বিবাহদান ইহাদের সমাজে অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

শুধু পালামৌ নহে, সমগ্র ভারতের কৃষকগণ চিরন্তন প্রথা অনুসারে অতি অল্প-বয়স্ক পুত্রকন্যার বিবাহদান কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করে। পুরাকালে উর্ব্বর হিন্দুস্থানের বক্ষে কর্ষণ করিলেই "সোনা ফলিত," সুতরাং তখন কৃষককুল লোকবলই প্রধান বল জ্ঞান করিত। আজিও বোধ হয় সেই প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে গিয়া দেশের কৃষককুল পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হয়। সুতরাং পালামৌ-এর নিরক্ষর কৃষকগণ যে স্বয়ং ঋণপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও অল্পবয়স্ক পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য, তাহার প্রভু সানন্দে বিবাহের ব্যয় জন্য ধার দিয়া থাকে। ঋণদাতা এই সর্ত্তে ঋণ দেন যে, বিবাহের পর দাসের পুত্রও তাহার নিকট 'কামিয়াতী' অর্থাৎ দাসত্ব করিবে। মহাজনকে নগদ এক কপর্দ্দকও বাহির করিতে হয় না। চাউল, ডাইল, আটা, তৈল, লবণ, মিষ্টান্ন, কিঞ্চিৎ মাদকদ্রব্য ও কয়েকখানি রৌপ্যালঙ্কারের বিনিময়ে ঋণদাতা একটি নূতন ক্রীতদাস লাভ করে। এই ভাবে কৃষকগণ বংশানুক্রমে দাসত্ব করিতে থাকে। প্রভুরা ইহাদিগকে অতীব পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য করাইয়া লইয়াও ক্ষান্ত হয় না, তাহারা সময়ে সময়ে তুচ্ছ কারণে বা অকারণে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় ইহাদিগকেও নির্য্যাতিত করে। এ জন্য অনেক 'কামিয়া' বা দাস এতু উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সুন্দর বর্ন ও আসাম প্রদেশে পলায়ন করে। কিন্তু ইহাদের প্রভুগণ পলাতক-দিগের সন্ধান পাইলে আবার তাহাদিগকে ধরিয়া আনে, অথবা ইহাদের নূতন প্রভুর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে।

সচরাচর ২৮৲ টাকা প্রদান করিলেই একটি কামিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল কার্য্য করিবার পর উক্ত কামিয়া যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে, তাহার প্রভু নানা উপায়ে পূরা টাকা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা গ্রহণ করিয়া তবে তাহাকে পরিত্যাগ করে। অনেক সময়ে এমন দেখা গিয়াছে যে, সামান্য দুই চারিটি মুদ্রার অভাবে অনেক কৃষক কামিয়াতী গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ও নিজ জমী হইতে উৎপন্ন শস্য প্রদান দ্বারা উক্ত টাকার বিশগুণ প্রকারান্তরে প্রত্যর্পণ করিয়াও মুক্তি পায় নাই। যে নিজ ব্যর্থ জীবনের বিনিময়ে প্রভুকে সম্পদশালী করিয়া তুলে, তাহাকে সারাজীবন কঠিন দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ হইয়া পথের ধূলিকণা অপেক্ষাও অনাদৃত অবস্থায় কাঁদিয়া কাল কাটাইতে হয়। আর সেই হতভাগ্যগণের রুধিরে উদরপূর্ত্তি করিয়া জমীদারমণ্ডলী প্রজাদের দারিদ্র্যের কথা উঠিলে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়া থাকেন,—ইহাই কৃষককুলের বিধিলিপি! ইংরেজ রাজ্যে ইহার প্রতীকার কি অসম্ভব?

দেশলাই—যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ১,৮৩,৯৪,০০০ গ্রোস দেশলাই ভারতবর্ষে আমদানি হইত। গত বৎসর এক জাপান হইতেই ১,৫২,৭৮,০১৮ গ্রোস দেশলাই আমদানী

হইয়াছে। এই দেশলাই বিক্রয় করিয়া জাপান ভারতবর্ষ হইতে ১,০৫,২৭,৫১৩ টাকা পাইয়াছে। ভারতবর্ষে যত দেশলাই আমদানি হয়, জাপান তাহার শতকরা ৮৩ ভাগ পাঠাইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক লোক বৎসরে গড়ে ৭ বাক্স দেশলাই খরচ করিয়া থাকে। দেশলাইর অনেকগুলি জ্বলে না, তাই বোধ হয়, প্রতি জনে এত বাক্স খরচ করিয়া থাকে। চুরুট খাওয়ার বাহুল্য হেতুও দেশলাইর খরচ অনেক বাড়িয়াছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যেক বাড়ীতে ২৪ ঘণ্টা কাঠের কয়লা বা তুষ ঘুটের আগুণ রাখা হইত, এখন সুবিধার জন্য লোকে দেশলাই ব্যবহার করে কিন্তু ইহাতে যে ক্রমে কাঙ্গাল হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। এক জাপানই এক কোটি টাকার বেশী লইয়া যাইতেছে। অপব্যয়ও বিলাসিতাতে ভারতবর্ষের বহু ক্রোর টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের চৈতন্য হইতেছে না।—মুর্শীদাবাদ

গম রপ্তানি—গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে সিমলা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবরমেণ্ট এদেশ হইতে গম রপ্তানি সম্বন্ধে গত বৎসর মার্চ্চ মাসে যে কড়াকড়ি আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ তাঁহারা কতকটা শিথিল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। উল্লিখিত আইনের ফলে এদেশে গমের দর অনেকটা হ্রাস হইয়াছে, বিশেষতঃ বিলাতে ভারতীয় গমের টান আর তেমন নাই। কাজেই গত বৎসরাবধি গবরমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্টগণের মারফতে বিদেশে গম চালানের যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আপাততঃ রদ হইবে, অর্থাৎ এখন হইতে যে কেহ 'গমকমিশনার'গণের ছাড় পত্র লইয়া বিদেশে গম চালান দিতে পারিবেন। তবে রপ্তানি গমের পরিমাণ এখনও গবরমেণ্ট বাঁধিয়া দিবেন এবং তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন যে, ঐ আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন কোম্পানি যত গম বিদেশে রপ্তানি করিতেন, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিতেছেন কি না। বিগত ১লা মে হইতে এই নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হইবার কথা। ইহার ফলে যদি গমের দর পুনরায় চড়ে অথবা এদেশ হইতে গমের রপ্তানি আবার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গবরমেণ্ট গত বর্ষের ন্যায় গমের রপ্তানি যে কোন সময়ে রদ করিতে পারিবেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, এই নূতন ব্যবস্থার ফলে এদেশ হইতে গমের রপ্তানি বাড়িবে বুঝিয়া বোম্বাইয়ের দেশীয় মহাজনেরা গমের দর হন্দর প্রতি তিন আনা চড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ সাহেব ব্যবসাদারেরা বলিতেছেন, আজকাল জাহাজের ভাড়া, বীমা খরচ প্রভৃতি এত বাড়িয়াছে যে অধুনা এদেশ হইতে মাল পাঠাইয়া কিছুই লাভ বাচিবে না। কাজেই মহাজনেরা যে আশায় গমের দর চড়াইয়াছেন তাহার সাফল্য সম্ভাবনা অতি অল্প।

কদলী বৃক্ষের তন্তু—মহীশূরের ডিরেক্টার-অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ মিঃ এলফ্রেড চাটার্টন এক কল আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহা দ্বারা সহজে কদলীবৃক্ষ হইতে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির করা যাইতে পারে। এক একটি কলের জন্য ৫।৬ টাকার অধিক খরচ পড়ে না।—হিতবাদী।

কৃষক।

সূচীপত্র।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল। } ২য় সংখ্যা।

তুলসী-গাছ (OCIMUM BASILICUM)

———:*:———

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

হিন্দুগণের প্রত্যেক বাটীতেই দুই একটী করিয়া তুলসীগাছ আছে। কারণ তাহাদের দেবকার্য্য, ইষ্টকর্ম্ম, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি প্রায় প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপেই তুলসী পাতার ব্যবহার প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহারা কখনও কখনও মিষ্টান্নাদির সহিতও তুলসী পত্র ও মঞ্জরী মিশ্রিত করেন। গয়ার প্যাঁড়া ও বরফি প্রভৃতিতে উক্ত দুই জিনিষ দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ মিষ্টান্নাদি সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিবার জন্যই উহার ব্যবহার প্রথা প্রচলন হইয়াছে। আরও মিষ্টদ্রব্যের সহিত পত্র ও মঞ্জরী প্রভৃতি ভক্ষণ করিলেও শারিরীক উপকার সাধিত হয়। তুলসী কাষ্ঠও বিশেষ উপকারী। তুলসীর মালা গলায় ধারণ করিলে এবং তুলসীপত্র ও মঞ্জরী রুমালে অথবা গাত্র বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিলে শারিরীক ইষ্টলাভ হয়,—এজন্য হিন্দুগণের গৃহে তুলসীর এত আদর।

তুলসী নানাজাতীয় আছে। জাতিভেদে উহাদের নাম ও গুণ ক্রিয়াদি স্বতন্ত্ররূপ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদাভিধানে পঞ্চবিধ তুলসীর নামোল্লেখ আছে। যথা; ক্ষুদ্র পত্র তুলসী, রক্তবর্ণ তুলসী, শ্বেত তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী ও বাবুই তুলসী। তদ্ব্যতীত আরও নানাজাতি আছে। তন্মধ্যে একটী বন তুলসী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে তুলসীর গুণ ও ক্রিয়া এই যে, ইহা কফজ কাশ, নাশারোগ, নেত্র রোগ, বাত ব্যাধি প্রভৃতি বহুরোগ নাশক। তুলসীর পত্র ও মঞ্জরী ঔষধে অথবা ঔষধের অনুপানে ব্যবহার হইয়া থাকে।

ডাক্তারী-মতে তুলসীপত্রের রস শুষ্ক শাখা প্রশাখাদি, গাছের সকল অংশই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা কফ নিঃসারক, মূত্র কারক, ম্যালেরিয়া নাশক, সর্দ্দি, শ্বাস, কাশ, সবিরাম অবিরাম স্বল্প-বিরাম জ্বর, পার্শ্ববেদনা, কর্ণশূল, দক্র, কুষ্ঠ, শ্বিত্তজ ব্যাধি প্রভৃতি রোগে তুলসীপত্রের রসাদি বিশেষ উপকারী। মতান্তরে উহা উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্মকারক, পাচক। তুলসীর পত্র ও মঞ্জরী প্রভৃতি পাচক বলিয়াই কেহ কেহ ইহা চিবাইয়া খায়। অনেক হিন্দু বিধবা পানের পরিবর্ত্তে ইহা খাইয়া থাকেন। ইহা আমাতিসার, প্রমেহ, কফ, বেদনা, জীর্ণজ্বর ও বমন প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন কর্ণশূল, রক্তমূত্র, বাতাতিসার রোগে বাবুই তুলসী উপকারী, বাবুই তুলসীর বীজ চিনির সরবতে ভিজাইয়া পান করিলে প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক হয়। শুক্রমেহ রোগে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কৃষ্ণ তুলসীর গুণ প্রায় শ্বেত তুলসীর অনুরূপ। রাম তুলসী শিত স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, আমবাতে প্রযোজ্য।

সিন্ধুদেশ ও পারস্য তুলসীর জন্মভূমি। ভরেতের সর্ব্বত্র তুলসী গাছ দৃষ্ট হয়। পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যত্নসহকারে তুলসী রোপণ ও পালন করা হয়। পাঞ্জাবের পাহাড়তলিতে তুলসী বৃক্ষের বন আছে।

তুলসীকে চলিত ভাষায় বৃক্ষ বলা হইলেও ইহা বৃক্ষ নহে, ইহা গুল্মবিশেষ। গাছগুলি ৬।৮ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না, ইহা বহুশাখা বিশিষ্ট ও ঝাড়াল হয়।

তুলসীর বীজ হইতে গন্ধসার বা আতর প্রস্তুত হইতে পারে। চোলাই করিয়া গাছের শাখা প্রশাখা হইতে তৈল নিষ্কাষণ করা যাইতে পারে। এই তৈলের রঙ ঈষৎ হরিদ্রাভ। তৈলাধারে কিছুকাল থাকিলেই তৈল কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া দানা বাঁধিয়া যায়। গন্ধ ও প্রকৃতি অনেকটা তার্পিন কর্পূরের মত।

সমুদয় গাছটারই বেশ সদ্গন্ধ আছে, শুষ্কাবস্থায় এইগন্ধ আরও তীব্র হয়। গাছের নবপল্লব পত্রাদির আস্বাদ ঈষৎ ঝাল কিন্তু বিস্বাদ নহে। তুলসী বীজের কোন গন্ধ নাই কিন্তু ইহা তৈলাক্ত এবং চর্ব্বণকালে একটু কটুস্বাদ অনুভূত হয়। বীজ জলে সিক্ত করিলে ফুলিয়া উঠে এবং জেলিমত নরম ছড়হড়ে ভাব ধারণ করে। ফোঁড়া ব্রণাদিতে ইহার ঠাণ্ডা পুল্‌টিস্ পরম হিতকারী। সরবতে ভিজাইয়া খাইলে ধাতু ঠাণ্ডা হয়। ইহা পুষ্টিকর খাদ্য ও আমাসায়, মূত্রকৃচ্ছ রোগে মহৌষধ। কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে সরবতের সহিত ইহার বীজ ধারাবাহিক কিছুকাল ব্যবহার করিলে নিরাময় হয়। বিস্ফোটক ও নালীঘায়ে ইহার বীজ চুর্ণের পুল্‌টিস্ ব্যবহার করিলে সাতিশয় উপকার পাওয়া যায়। বীজ সরবতের সহিত ব্যবহারে জ্বর উপশম হয়। কাণের ব্যথা ফুলা ও বধিরত্ব ইহার পাতার রস প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

তুলসী শিকড় বাটিয়া খাওয়াইলে শিশুগণের উদরপীড়া প্রশমিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ বিশেষতঃ মুসলমানগণ ইহার বীজ জলে সিক্ত করিয়া সেই জল ঠাণ্ডাই পানীয়

হিসাবে ব্যবহার করেন। জলে ভিজাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ শর্করা সংযোগ করিলে ইহা সুখাদ্যে পরিণত হয় এবং ইহা বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য।

একজাতীয় তুলসী আছে (Ocimum Canum),—ইহা বাঙলা, বিহার, মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ ও সিংহল সর্ব্বত্র স্বভাবতঃই জন্মে। বিহারে ইহাকে ভরভরি তুলসী বলে। চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন যে জ্বরাবস্থায় হাত পা শীতল হইয়া আসিলে ইহার পাতা বাটিয়া নখে ও আঙুলে লাগাইলে আশু উপকার হয়। এইরূপ পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে খোস্, চুলকনা বা দদ্রু প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

রাম তুলসী (Ocimum Grastissimum)-তুলসীর মধ্যে ইহার পাতার সাতিশয় তীব্রগন্ধ। ইহার পাতার রস মেহরোগে ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। বাঙলায়, চট্টগ্রামে, নেপালে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার পাতার রস খাইতে দিলে ও মাখাইলে পারদ দোষজনিত বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহার বীজ ভিজাইয়া প্রলেপ দিলে শীর-বেদনা ও বাত জনিত বেদনা কমিয়া যায়। কৃষ্ণ তুলসী (Ocimum Sanctum)—The Sacred Basil—দেবকার্য্যে ইহার ব্যবহার বলিয়া ইহার আদর অত্যধিক। অন্যান্য তুলসীর ন্যায় ইহার শাখা পল্লব, পত্র, শিকড়ের ভেষজগুণ আছে। ইহার পাতার রসে বিশেষ গুণ এই যে তাহাতে মধু সংযোগ করিয়া ব্যবহারে শিশুগণের সর্দ্দি, কাশি, ঘুঁগরী উপশম হয়। এই তুলসী পত্রে নারায়ণের পূজা হয়। ইহা অতি পবিত্র, পরম হিতকর বলিয়া নারায়ণ পূজায় ইহার বিহিত হইয়াছে। তুলসী গাছ মাত্রেরই হাওয়া শোধন করিবার ক্ষমতা আছে এই কারণে গৃহস্থের অঙ্গিনাতে তুলসী চিরকাল আছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে পবিত্র তুলসী গাছে "ঝারা" দেওয়ার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে ঝারা দেওয়া হয়। বৎসরের অন্যান্য মাসেও ঝারা দেওয়ার রীতি আছে বটে, কিন্তু বৈশাখ মাসে দেওয়াই প্রশস্ত। "বৈশাখ মাসে তুলসীগাছে রাজা দেন ঝারা। শত শত তুলসী মালা কাটেন উমা তারা"॥ বৈশাখ মাসে ঝারা দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত,—বৈশাখ মাস ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়, এই সময় ঋতুর ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের সহিত ঝারা দেওয়ার নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জন্যই বৈশাখ মাসে ঝারা দ্বারা জল সিঞ্চন করিয়া তুলসী গাছের পুষ্টি সাধন করা হয়। বৈশাখ মাসে তুলসীগাছে ঝারা দেওয়া এবং তুলসী মালা বিতরণ করা বৈষ্ণবগণের পক্ষে অতিশয় পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। রোগ নাশক গুণ আছে বলিয়াই, এত কাষ্ঠ থাকিতেও একমাত্র তুলসী কাষ্ঠের মালাই বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিগণ পবিত্র বোধে গলদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। তুলসী পাতার রস ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী এবং বাটীতে রোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দূর হয়। অতি পুরাকাল হইতেই এদেশের বৈদ্য, হেকিম, হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমান ফকির এবং টোটকা চিকিৎসকগণ

নানারোগে ঔষধ ও অনুপানরূপে তুলসী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মাল বৈষ্ণবগণ ইহার রস দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যাধির চিকিৎসা করেন। তাঁহারা ক্ষতস্থানে পাতা ও শিকড় বাটিয়া দেন। রোগীকে পাতার রস পান করান। তাঁহাদের মতে যেস্থানে এই বৃক্ষ থাকে তথায় সর্পভয় কম হয়।

তুলসীগাছ প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিয়া থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানেও ইহা বেশ জন্মায়, বীজ ও কটিং দ্বারা চারা উৎপাদন করা হয়। তুলসী চাষে বিশেষ কোনরূপ যত্নের আবশ্যক হয় না। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। প্রত্যেক দুই হাত অন্তর এক একটী গাছ রোপণ করিলে এক বিঘায় ন্যূনাধিক ১৬০০ গাছ রোপিত হয় ইহার পত্র, বীজ, মঞ্জরী, কাষ্ঠ শুষ্কাবস্থায়ও সুগন্ধ বা গুণের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং বিদেশে তৎসমুদয় রপ্তানী করিতে পারিলেও বিশেষ লাভের আশা করা যাইতে পারে। মঞ্জরী ও পাতা হইতে একপ্রকার এসেন্স প্রস্তুত হয়, ইহার গন্ধ অতিশয় মনোরম। অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই এসেন্সের ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই জন্য তুলসীর চাষ বিশেষ লাভ জনক হইয়া উঠিতেছে। ইদানীং আমেরিকা ও ইউরোপের নানাস্থানেই ইহার চাষ আরব্ধ হইয়াছে। মিষ্ঠ তুলসী নামে একপ্রকার বিদেশী তুলসী আছে, তাহার পত্রের রসে অথবা উক্ত এসেন্সে ইউরোপ ও আমেরিকায় সুরুয়া ও বেনাল ইত্যাদি সুগন্ধ করিবার প্রথা ক্রমশঃই প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা উক্ত উভয় মহাদেশেই একরূপ মশলার মধ্যে পরিগণিত হয়।

এক্ষণে তুলসীর জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিষ্ণু পুরাণে আছে; "জলন্ধর নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি বাসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হয়, শরণাপন্ন ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল রণে প্রবৃত্ত হইলেন, ঐ রাক্ষসের বিন্দা নাম্নী এক পতিব্রতা পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিন্দা পতির প্রাণ রক্ষার্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যার ফলে কোনরূপেই জলন্ধরের বিনাশ হয় না দেখিয়া দেবতাগণও আশঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন, বিষ্ণু জলন্ধরের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিন্দার তপোভঙ্গ করিবামাত্রেই জলন্ধর শিবের হাস্তে নিধন হইল, পতির নিধন বার্ত্তা শ্রবনে শোকার্ত্ত হৃদয়ে বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে বিষ্ণু সভয়ে বৃন্দাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তুমি জলন্ধরের সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বথ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। পতিব্রতা বিন্দার পবিত্র দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইলে সেই চিতাভস্মেই বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদে উক্ত চারীটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। বিন্দার দেহভস্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তুলসীকে বিন্দাজী নামেও অভিহিত করা

হয়। আর ব্রহ্ম পুরাণে লিখিত আছে, তুলসী রাধিকার সঙ্গী ; রাধিকার শাপে ইনি ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শঙ্খচূড় নামে দৈত্যের পত্নী হইয়াছিলেন। এই জন্মে ইহার নাম তুলসী হয়। শঙ্খচূড়ের এইরূপ বর ছিল যে তৎ-পত্নীর সতীত্ব নষ্ট না হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না। এই জন্য শঙ্খচূড় বিনাশার্থে কৃষ্ণ শঙ্খচূড়রূপে তুলসীকে সম্ভোগ করেন, তৎফলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হয়। পতির মৃত্যুর-পর তুলসীও কৃষ্ণপদে পতিতা হইয়া দেহত্যাগ করিলে, তাহার শরীরে গণ্ডকী শিলা অর্থাৎ শালগ্রাম এবং কেশে তুলসী বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইল।

বিন্দার দেহ ভস্মে অথবা তুলসীর কেশে যেরূপেই হউক তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তির সহিত বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তুলসী হিন্দু মাত্রেরই পূজার্হ, বৈষ্ণবগণ তুলসী ভক্ত, তাহাদের নিকট ইহা দেববৎ পূজনীয়। তুলসীর পূজা, সেবা, দীপ দান, মালা ধারণ, হস্তে লইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ, নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। তদভিন্ন ঝারা দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই তুলসীর পূজা সেবাদি নিত্য নৈমিত্তিক করিয়া থাকেন। আত্মার সদগতি বিধানের জন্য মৃতদেহের সহিত তুলসীগাছ দেওয়ার প্রথা এদেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে।

উদ্ভিদরাজ্যে অতিকায় ফল ফুল

আজকালকার উদ্যানপালকগণ, অতিবৃহৎ ফুল ফল উৎপাদনার্থে অতীব আগ্রহান্বিত। ফল শস্য প্রদর্শনীতে এইরূপ অতিকায় ফল শস্য প্রদর্শন করিতে পারিলে খোসনাম হয় ও পারিতোষিক মিলে এই কারণেই তাঁহাদের আগ্রহ এত অধিক। অধিকন্তু একটা কোন অত্যাশ্চর্য্য ফলশস্য উৎপাদন করিতে পারিলে নিজেরও সন্তোষ বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতদ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। একঝাড় আক্, একটা মানকচু, দুই চারিটা ওল নানাপ্রকার কৃত্রিম সারসংযোগে ও সুনিপুণ কারাকিতে বড় করিয়া তোলা গেল কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইল? দুই একটা লাউ, কুমড়া, তরমুজ, শশা অতি বৃহদাকার হইল, বুদ্ধি খরচ করিয়া পাঁচরকম পরীক্ষা দ্বারা এমন কৌশল অবলম্বন করা হইল যাহাতে এমন ব্যাপার গুলি সম্ভব হয় ও সহজ সাধ্য হইয়া আসিল। কিন্তু ইহাতে সুনাম ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন লাভ নাই। খরচের অনুপাতে তাহার মূল্য দিতে হইলে সাধারণের পক্ষে তাহা অসম্ভব হয়। ক্ষেতের সব তরমুজ, সব কুমড়াগুলিকে এত বড় করা অসম্ভব এবং সম্ভব হইলেও তাহার মজুরি

পুষায় না। ক্ষেতের বা বাগানের শস্য বৃদ্ধি অর্থে আমাদের বুঝা উচিত যে, যে ক্ষেতে ৫০ মণ আলু উৎপন্ন হইত তাহাতে ৮০ মণ আলু ফলিতে লাগিল, যে ক্ষেতে ৫ টন ইক্ষু ফলিত সেইখানে এখন ৮ টন ইক্ষু উপপন্ন হইতে লাগিল, যে ক্ষেতে ৬ টন কুমড়া হইত, বৃদ্ধি হইয়া ১০ টন হইল, এইরূপ হইলে তবে ক্ষেতের শস্য বৃদ্ধি বলা যায়—ইহাতে চাষীর লাভ, দেশেরও লাভ। নতুবা মোটা বাঁশের মত সমস্ত ক্ষেতের মাঝে একঝাড় আক লইয়া কাহার কোন্ উপকার হইবে? ক্ষেতের সব ইক্ষুগুলি এই রকম মাত্রায় বাড়িলে, তাহাতে রসের মাত্র অধিক হইলে, সেই রসের আবার চিনির মাত্রা বেশী হইলে তবে বস্তুতঃ লাভের হইল বলা যায়। একটা ফুল, একটা কুমড়া, এক ঝাড় আককে বাড়াইয়া তোলাতে চাষির নিপুণতা প্রকাশ পায় সত্য ইহা তাহার অধ্যবসায়েরও নিদর্শন এবং যাহা একটাতে সম্ভব তাহা সকলগুলিতে, সব ক্ষেতে, সমুদয় বাগানের ফলে সম্ভব না হইবে কেন ইহা বিচারের বিষয়ীভূত। যে চাষী বা উদ্যানপালক তাহা করেন বা করিতে চেষ্টা করেন তাঁহার কার্য্য প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলতে হইলে মিতব্যয়িতার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরিমিত খরচ করিয়া সুবৃহৎ ফল ফুল উৎপাদন দ্বারা লোকের বিস্ময়োৎপাদন করাকেও অমিতব্যয়িতা বলা যায়। মেলায় বা প্রদর্শনীতেও পারিতোষিক বা প্রশংসা পত্র বিতরণ প্রায়ই এক-দেশ-দর্শিতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। চারিটা অতি বৃহৎ বেগুণ প্রদর্শন করিয়া একজন পারিতোষিক পাইল, অপর একজন তদপেক্ষা ছোট অথচ এক সমান ২ ঝাঁকা বেগুণ দেখাইয়া একটি পয়সা বা প্রশংসাবাচক একটা কথাও শুনিতে পাইল না!

যে গাছে ২০টা বেগুণ ফলিতে পারে তাহাতে ২টী মাত্র মুকুল রাখিয়া বাকিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে দুইটি বড় বেগুণ উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু এই দুইটা বেগুণের ওজন ২০টা বেগুণের ওজন অপেক্ষা নিশ্চয় কম। সুতরাং ২০টার স্থলে বহু আয়াসে ২টা বেগুণ ফলাইয়া কি লাভ হইবে? লাভ যে একবারে নাই তাহা নহে। আর্থিক হিসাবে বর্ত্তমানে কোন লাভের আশা না থাকিলেও, বীজ সঞ্চয়ের জন্য বড় ফল উৎপাদন করায় ভবিষ্যতে লাভ আছে। ক্ষেতের মধ্যে তেজস্কর গাছটি বাছিয়া লইয়া তাহার মূল শাখাতে ২ বা ৩টা ফল উৎপাদন করিলে ফলগুলি স্বভাবতই বড় হইবে। ফল বড় করিতে হইলে পটাস প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া গাছটিকে বিশেষ তদ্বিরে রাখিতে হয়। এরপ্রকার গাছের সুপক্ক ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে তাহা হইতে যে চারা হইবে তাহার ফল সাধারণতঃ বড় হইবে। এইরূপে কোন একজাতীয় ফলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব। অতএব এস্থলে খরচের আতিশয্যে কুণ্ঠিত না হইয়া বীজের জন্য বৃহৎ ফলই উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা এক্ষণে কুমড়া লইয়া পরীক্ষার কথা বলিব ও দেখাইব যে কি উপায়ে একটা কুমড়াকে অতিবৃহৎ আকারের করা যায়।

কোন ক্ষেতে উচ্চ মাদয় ভাল সার মাটি সংযোগ করিয়া কয়েকটা কুমড়া গাছ জন্মান গেল, গাছটিতে ফুলধরিতে আরম্ভ হইলে মূল ডগায় ফলোৎপাদন কারী একটা ফুল রাখিয়া বাকি মুকুলগুলি এমন কি কতকগুলি প্রশাখা ও কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া দেওয়া

গেল। ফলটা যখন মানুষের হাতের মুঠার মত বড় হইল, তখন কুমড়ার লতার দুইপাশে দুইটা মাটির টবে চিনির জল রাখিয়া নরম সূতার পলিতা পাকাইয়া একমুখ চিনির জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিতে হয়, অন্য মুখ কুমড়ার বোঁটার উপর ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে কুমড়া পলিতার দ্বারা ক্রমশঃ জল টানিয়া লইবে ও বড় হইতে থাকিবে এবং এক সপ্তাহ মধ্যে উহা অতিকায় হইয়া উঠিবে।
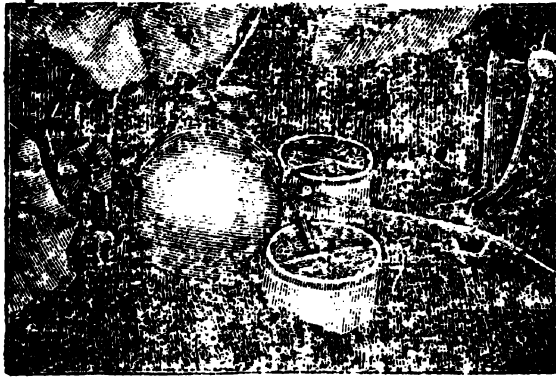
১ম সপ্তাহে কুমড়া সামান্য মাত্রায় বাড়িয়াছে।
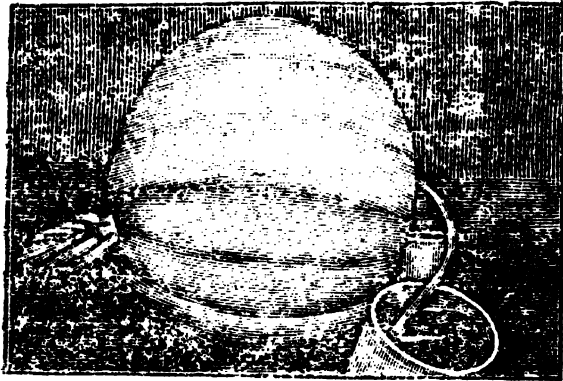
২য় সপ্তাহে কুমড়াটির বাড় অত্যাশ্চর্য্য দাড়াইয়াছে।

চিনির রস সহজেই করিয়া লওয়া যায়। গরম জলে ক্রমশঃ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ ঘন রস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। জল, আগুণের তাপ হইতে নামাইয়া তবে তাহাতে চিনি সংযোগ করিতে হয়। জ্বালে চিনির রস চাপান থাকিলে রস চিট হইয়া যাইবে। চিট রস সুতার পলিতা বাহিয়া লতা শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যেরূপ রস এখানে ব্যবহার যোগ্য তাহাকে চিনির রস না বলিয়া চিনির জল বলাই ভাল। শীতল অপেক্ষা গরম জলে চিনি শিঘ্র দ্রব হয়। চিনির জলে সর্ব্বদাই গামলা পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রকারে লাউ কুমড়া তরমুজ শসা অতিবড় করা যায়। ফলগুলি এইরূপে বৃদ্ধি করিবার সীমা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা যায় না। বীজের জন্য ফল বড় করিতে হইলে কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাই ভাল।

বঙ্গদেশীয় গরু ও মহিষ

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু M. R. A. C. লিখিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বঙ্গদেশে আপাততঃ যে পরিমাণ গরু ও মহিষ আছে তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট কি না তাহা এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৪৪৫৮১১২৫ ও মোট গবাদির সংখ্যা ২৫৩৫৫৮৩৮। সুতরাং লোক অপেক্ষা পশুর সংখ্যা অনেক কম। আবার যদি কেবল গাভীর সংখ্যা হিসাব করা যায় এবং প্রত্যেক গাভী বৎসরে ৭ মাস প্রত্যহ ১ সের হিসাবে দুধ দেয় বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বৎসরে লোকপ্রতি কত দুধ সরবরাহ হইতে পারে তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। তালিকার ৫নং স্তম্ভে উক্ত প্রকার অঙ্কাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলাতেই দুধের প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাখরগঞ্জ ও হাবড়া জেলাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ২৭টি জেলার মধ্যে আঠারটি জেলায় লোকপ্রতি দুধের পরিমাণ অর্দ্ধমণ হইতে এক মণ। বৎসরের হিসাবে এই পরিমাণ দুগ্ধ যে কিছুই নয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন এবং পরোক্ষতঃ ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে দুধের অভাব অত্যধিক। ইহাই বোধ হয় স্বাস্থ্যহানি ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রসারের অন্যতম কারণ। বাঙ্গালীর নিত্য আহার্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে পুষ্টিকর উপাদান দুগ্ধ ও মৎস্য। দুগ্ধের অবস্থাত এস্থলে প্রদর্শিত হইল, মৎস্যের অবস্থা ইহাপেক্ষা আরও শোচনীয়। সুতরাং রোগাক্রমণ সহ্য করিবার শক্তি আর কোথা হইতে থাকিবে? বড় বড় নগরসমূহে দুধ সরবরাহের বিষয় আমরা এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। কারণ উহা গ্রাম্য দুধ সরবরাহ হইতে স্বতন্ত্র ধরণের প্রশ্ন এবং উহার ব্যবস্থার জন্য যেরূপ ভাবে গোশালা প্রভৃতি স্থাপন করা চলে পল্লীগ্রামের জন্য সেরূপ চলে না। এতদ্ভিন্ন মূল্যের বিষয়েও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। কিন্তু একটি পন্থা অবলম্বন করিলে সহরে কিম্বা গ্রামে উভয় স্থলেই সুফল দর্শিতে পারে তাহা যৌথ কারবার হিসাবে দুধ সরবরাহ। ইহাতে যদি গোয়ালাদের সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও উত্তম। ঢাকায় এই হিসাবে একটি কারবার স্থাপিত হইয়াছে এবং বিবরণীতে প্রকাশ যে উহা মন্দ চলিতেছে না।

গোপালনের আর একটি প্রতিবন্ধক এই যে দেশে উৎকৃষ্ট গরুর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। গাভী, বলদ অথবা ষণ্ড সকলই যাহা সহজে পাওয়া যায় সেগুলি নিকৃষ্ট প্রকৃতির এবং সর্ব্বস্থলেই সুলক্ষণযুক্ত গরুর অভাব। কিন্তু মূল্য হিসাবে দেখিতে গেলে কুত্রাপি মূল্য বিশেষ সুলভ বলিয়া বোধ হয় না। তালিকার দ্বিতীয় স্তম্ভে মূল্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে বীরভূম ও নোয়াখালি জেলায় মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা

মুরাঙ্গিয়া ষণ্ড

মুরাঙ্গিয়া গাভী

চট্টগ্রামী ষণ্ড
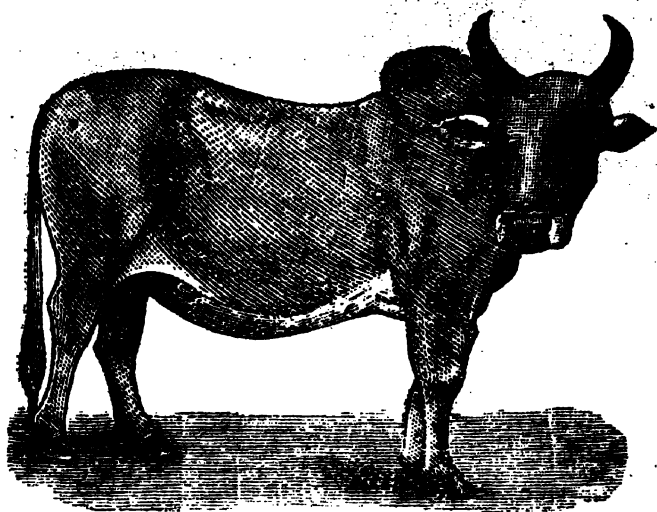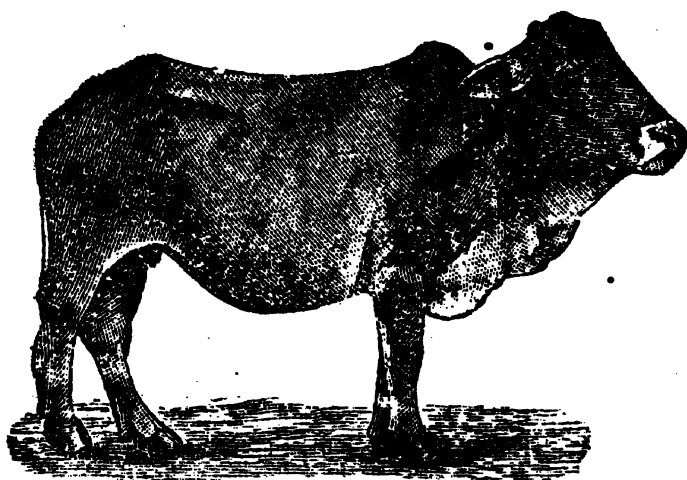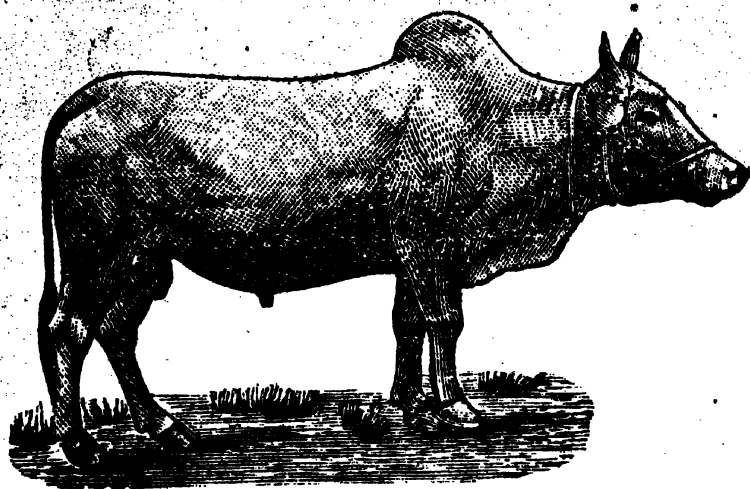
উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চ, বেড়ের মাপ ৬০ ইঞ্চ, দৈর্ঘ্য ৪৮ ইঞ্চ।
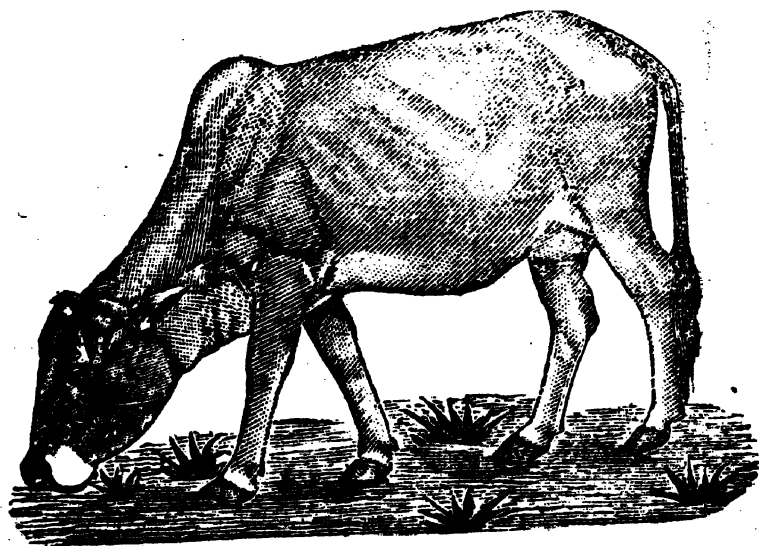
চট্টগ্রামী গাভী

উচ্চতা ৩৯ ইঞ্চ, বেড় ৫১ ইঞ্চ, দৈর্ঘ্য ৪২ ইঞ্চি।
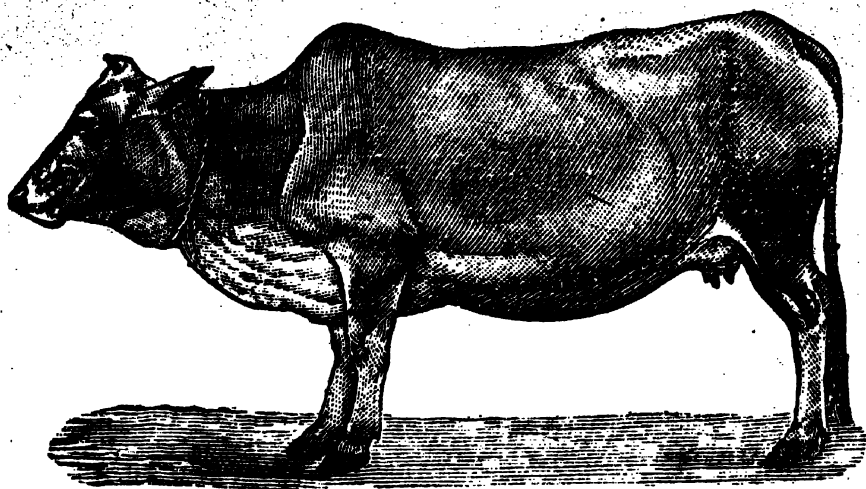
দেশী গাভী—ছোট আকারের

ঢাকাতে এই গাভী খরিদ হয়। ১২৫ দিনে ১৯৫৷৷৹ সের দুগ্ধ দিয়াছে এবং অনুমান হয় প্রায় ২০০ সের দুধ বৎসকে পান করাইয়াছে। ছাতির উপর দিয়া বর্ত্তুলাকার বেড় ৫০ ইঞ্চ। পুচ্ছদেশ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের মাপ ৫৯ ইঞ্চ, উচ্চতা ৩৮ ইঞ্চ।
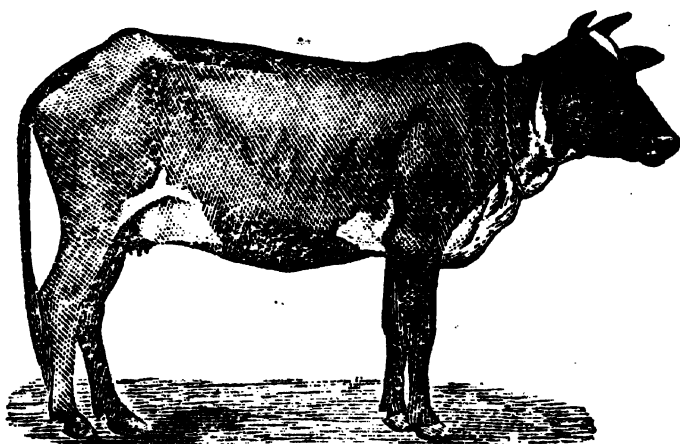
দেশী গাভী—রঙপুরে খরিদ

১৫৬ দিনে ৩২৬ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে। বৎসকেও ১০০ সেরের কম দুধ দেয় নাই। ছাতির উপর দিয়া বেড়ের মাপ ৫৫ ইঞ্চ। পুচ্ছদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫০ ইঞ্চ, উচ্চতা ৩৫ ইঞ্চ।

মেদিনীপুর ষণ্ড

উচ্চতা ৪৯ ইঞ্চ, বেড় ৭১ ইঞ্চ, সম্মুখের পায়ের বেড় ১৩ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ৫[illegible] ইঞ্চ, কপাল ৭ ইঞ্চ চওড়া।
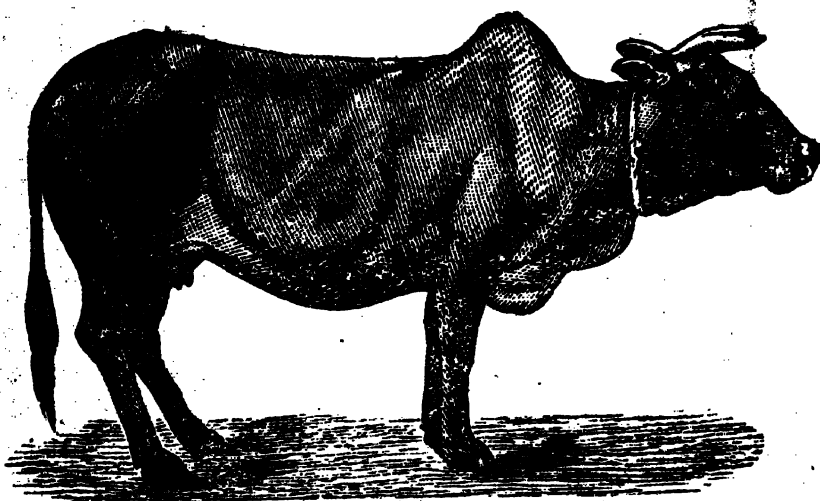
মেদিনীপুর গাভী

উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি, বেড় ৬১ ইঞ্চ, সম্মুখের পায়ের বেড় ১০ ইঞ্চি, লম্বা ৪৫ ইঞ্চি পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চ লম্বা, কপাল ৫ ইঞ্চ।

কম এবং ঢাকা, পাবনা ও হাবড়া জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা এস্থলে কেবলঃ মাত্র স্থানীয় গাভীর মূল্য প্রদর্শণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান হইতেও এতদ্দেশে গবাদি আমদানি হয়; তন্মধ্যে সোণপুরের হরিহর ছত্রের মেলাই সর্ব্বপ্রধান, তৎপরে নেপালের মোরং নামক স্থান। উড়িষ্যা অঞ্চল হইতে মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে অল্প বিস্তর গরু আমদানি হয়। গরুর হাট অথবা মেলা রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলাতেই প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। কিন্তু এ সকল স্থানে বলদই অধিক পরিমাণে আসে, গাভীর সংখ্যা নিতান্ত কম। যাহারা গাভী ক্রয় করে তাহারা প্রায় ছত্রের মেলা অথবা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নিজেরাই ক্রয় করিয়া আনে। স্থানীয় মেলাসমূহে সুলক্ষণযুক্ত গরু সামান্যই দৃষ্ট হয়।

বিবরণীর ১০নং পরিশিষ্টে বিভিন্ন জেলার গবাদির দেহের মাপ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য যেগুলি মাপ গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে সেগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানের উৎকৃষ্টতর নমুনা। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে বিশেষ মাপ ইত্যাদির উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য বঙ্গ দেশের প্রধান প্রধান স্থানীয় জাতিসমূহের চিত্র প্রদান করিলাম। এই সমুদয় চিত্রে সিরি, নেপালী, ঢাকা, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও মোরঙ্গ জেলার ষণ্ড ও গাভীর আকৃতি ও অবয়ব উত্তমরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। বর্ণশঙ্কর সমূহের চিত্র প্রদর্শিত হইল না, কারণ এ পর্য্যন্ত স্থায়ী গুণ ও লক্ষণ সম্পন্ন বর্ণশঙ্কর প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না এবং অনেকস্থলেই শঙ্করের জনক জননীর কুলের ইতিহাসের অভাব।

বিবরণীর শেষাংশে ব্লাকউড সাহেব তাঁহার মন্তব্যসমূহ একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্য তিনি প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের অনুমোদন করেন— (১) অধিক দুগ্ধশালী গাভী ও উৎকৃষ্টতর বলীবর্দ্দ ও ষণ্ড প্রজননের জন্য সরকারী অথবা বেসরকারী লোকের চেষ্টায় গোশালা স্থাপন এবং (২) বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থানীয় রুগ্ন ষণ্ডসমূহকে বন্দ করিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট ষণ্ডদ্বারা উন্নত শ্রেণীর গো প্রজনন। এই দুইটির মধ্যে কোনটিই অবশ্য নূতন কথা নহে, কিন্তু দেশব্যাপী উন্নতি সংঘটন করিতে হইলে সেইরূপভাবে বহু বিস্তৃত চেষ্টাও আবশ্যক। সেইরূপ চেষ্টা ও সেইরূপভাবে স্থানে স্থানে গোশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এক গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কে করিতে পারে। গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ প্রভৃতি দ্বারা কতক কার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও প্রতিবন্ধক আছে। শুধু উৎকৃষ্ট ষণ্ড সরবরাহ সম্বন্ধে ব্ল্যাকউড সাহেব বলিয়াছেন যে "It is a duty which it is suitable for union committees to take up, as well as Local and District Boards. If these bodies however are to be in a position to take up such a question, it will be necessery either to provide them with money or empower them to raise the necessery money

by taxation." এই কর্ত্তব্য সাধন স্থানীয় অথবা জেলাবোর্ড সমূহের এবং ইউনিয়ন কমিটি সমূহের উপযুক্ত কার্য্য বটে। কিন্তু ইহাদিগকে যদি এই কার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে উঁহাদের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দেওয়া আবশ্যক কিম্বা যাহাতে উঁহারা কর আদায় দ্বারা উক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক। এই উক্তি শুধু দুগ্ধ সরবরাহ ব্যাপারে কেন গোজাতির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক সকল বিষয়েই প্রযুজ্য। প্রথমতঃ দেশের লোক অজ্ঞ, তাহার পর নিঃস্ব। প্রথমতঃ উন্নত প্রণালীতে গোশালা স্থাপন, গোজনন পশুখাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইতে হইবে যে এই সমুদয় অত্যাবশ্যকীয় এবং পরিণামে লাভজনক। তাহার পর দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। দেশের শিক্ষিত মণ্ডলীর সাহায্যও একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ে একের বোঝা অন্যজনের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। গোজাতির উন্নতিসাধন উভয়েরই কর্ত্তব্য। সময় ও সামর্থ অনুসারে উভয়েই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল।

ভারতীয় কৃষির উন্নতি

ভারতের কৃষিকার্য্য একদিন চাষীদিগের হস্তে ন্যস্তছিল এবং চাষার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। আমরা এক্ষণে চাষী অর্থে চাষ ব্যবসায়ীগণকে,—পুরাকালের বৈশ্যগণকে—লক্ষ্য করিতেছি। সেকালে গুণকর্ম্মানুসারে শ্রেণী বিভাগ ছিল বটে কিন্তু উচ্চ নীচ বলিয়া এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। কালে সেই শ্রেণী বিভাগ লয় পাইয়াছে, এখন বাণিজ্য ব্যবসায়ে, কৃষিকর্ম্মে পশু পালনে, দেব সেবায়, অধ্যয়ন, অধ্যাপন কার্য্যে সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকলেই দেখিল বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস—চাষ অপেক্ষা বাণিজ্য ভাল সুতরাং যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ চাষা তাহারাই চাষে লাগিয়া থাকিল এবং কালের প্রভাবে ভারতের কৃষি হেয় হইতে হেয়তর অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু এখন ভারতের সমুদয় বানিজ্য নষ্ট প্রায়, তাই আবার লোকের চাষের দিকে নজর পড়িয়াছে। চাষ না হইলেই বা বাণিজ্য টীকে কিসে! এখন বিজ্ঞানের যুগ আসিয়াছে, যে কোন কর্ম্ম কৌশলে করিতে হইবে, বুদ্ধিপূর্ব্বক করিতে হইবে, বিজ্ঞান তাহার পথ দেখাইতেছে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এতদিন চাষের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট কৃষিতত্ত্বালোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন। পুষায় কৃষিতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে এবং চাষীগণকে কৃষিকর্ম্মের বিজ্ঞান সম্মত কৌশল গুলি শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু উদ্ভিদতত্ব, কীট ও ছত্রকতত্ত্ব, জীবাণুতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন তত্ত্বের মৌলিক গবেষণার পূর্ব্বে ভারতীয় চাষীর জন্য সুবীজ সঞ্চয়ের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। ভারতে কুত্রাপি বীজ উৎপাদনের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই বা কোন স্বাধীন বীজ ব্যবসায়ী নাই। বীজ, ক্ষেত্র ও কাল এই তিনটির উপরে চাষের ফলাফল নির্ভর করে। উত্তম বীজ, উর্ব্বর ক্ষেত্র অনুকুল কাল না পাইলে সুচাষ হইবে না। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে

নিযুক্ত। বিজ্ঞান ঊষর ভূমিকে উর্ব্বর করিতে প্রবৃত্ত, বন্ধ বেগুণ শশিষা, কদলী হইতে হইতে মানুষের ব্যবহার উপযোগী ফলশস্য উৎপাদনে দৃঢ়প্রযত্ন; রৌদ্রাতপ, বৃষ্টি, বায়ুকে প্রতিকূল অবস্থা হইতে অনুকূল অবস্থায় আনিতে কৃত সঙ্কল্প। বিজ্ঞান অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষের হাতে পড়িয়া বিঘ্ন, বিপদ, বিদ্রুপ উপেক্ষা করিয়া গল্প ও অলৌকিক কাহিনীগুলিকে সত্যে পরিণত করিতেছে। যে মানুষ ইহা করে তাহার সঙ্কল্প কখন চির-স্থির নহে, কালের খর স্রোতের সহিত সেও চঞ্চল গতিতে চলিয়াছে। কাল তাহার হাত এড়াইতে পারে না, কাল তাহাদ্বারা প্রতিহত হইয়া ক্রমাগত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। ভারতের বাণিজ্য এককালে বিশ্ববিখ্যাত ছিল, ভারতের কৃষি এককালে উন্নত ছিল, এখনই বা তাহার এ দুর্দ্দশা কেন! কালের সহিত সংগ্রামের লোক নাই—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ যাহার কথায় উঠিবে, বসিবে এমন লোক ভারতে ছিল এখন তাহার অভাব হইয়াছে—যাহার মৃত্যুভয় নাই, যাহার শঙ্কা নাই, যাহার লজ্জা নাই ঘৃণা নাই, যাহার লক্ষ্য অনন্ত আকাশের সীমাও অতিক্রম করিয়াছে ভারতে এমন একজন লোকের অভাব হইয়াছে—Wanted a man for India.

গভর্ণমেণ্ট আর যাহাই করুন এখন যে ভরতের চাষের কথা ভাবিতেছেন এবং চাষের প্রধান কথাটি যে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে ইহা অতীব সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ভারত গর্ণমেণ্টের কৃষি উপদেষ্টা (Agricultural adviser) মিঃ ম্যাক্‌কেনা সর্ব্বাগ্রে সুবীজ সঞ্চয়ের কথা বলিতেছেন। নূতন নিয়মে নূতন পদ্ধতিতে চাষ করিয়া সুবীজ সংগ্রহ করিতে বালা হইতেছে, শঙ্কর বীজ উৎপাদন করিতে বলা হইতেছে, এবং ক্রমাগত নির্ব্বাচন দ্বারা নানাজাতীয় ফল শস্য বীজের উন্নতি সাধনে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। এইগুলিই সু পরামর্শ।

বিশাল ভারতে বীজ সরবরাহ ছোট খাট ব্যাপার নহে,—নানাস্থানে সুবীজ ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে যদি ভারতের ন্যায় বিশাল ভূভাগে বিভিন্ন স্থানে এবং হিম, শৈত্য, আর্দ্র প্রদেশে যথোপযুক্ত স্থানে যেখানে যাহা হওয়া সম্ভব নির্ব্বাচন করিয়া বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত ক্ষেত্র স্থাপিত হইত তাহা হইলে আমাদের আশা সম্পূর্ণ হইত। আমরা সুবীজ সংগ্রহার্থ, বীজ ক্ষেত্রে স্থাপন করিবার জন্য সাধারণকে বারম্বার আহ্বান করিতেছি।

অতি অল্পকালের চেষ্টাতেই তুলা বীজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে গম, ধান, পাট, নীলের সু-বীজ উৎপাদনের চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। যে পাটের আঁশ পরিমাণে অধিক হয়, তথচ শক্ত ও টান সহ, যে পাটে—এই দুই গুণ আছে এমন একজাতি পাট উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। শঙ্কর বীজ উৎপন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে এবং পৃথকভাবে চাষ করিয়া বীজ বৃদ্ধির আয়োজন হইতেছে। স্বনামখ্যাত হাওয়ার্ড দম্পতি নীলের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অচিরে এমন

নীল উৎপন্ন করিতে পারিবেন যাহার পাতা অধিক হইবে এবং যাহাতে উৎপন্ন নীলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। তাঁহাদের আশা ফলবতী হইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। পুষাক্ষেত্রের গমের বীজের দেশ বিদেশে পরীক্ষা হইতেছে এবং বীজের পরিমাণ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহা দ্বারা ৫,০০০,০০০ একর জমিতে আবাদ হইতে পারিবে।

কয়েক দিবস হইল কলা বিদ্যা সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন "সার ডব্লু এজারলি; তিনি বলেন যে, গ্রেটব্রিটন ও আয়ারলণ্ডে যতখানি জায়গা ভারতের এতখানি জায়গায় ধান চাষ হয়। পৃথিবীর মধ্যে চীন সম্রাজ্যে অধিক ধান উৎপন্ন হয়। ধান্য উৎপাদনে চীন প্রথম, ভারত দ্বিতীয়। কিন্তু একর প্রতি ফলনের হার স্পেন ও ইটালিতে অধিক। স্পেনের ধান্য চাষ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমরা এ কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অন্য দেশের তুলনায় ভারতের ধানের ফলন অধিক বটে কিন্তু উহা যদি স্পেন ও ইটালীর মত করিয়া তুলিতে পারা যায় তবে ভারতের কত কোটি টাকা আয় বাড়িয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পরিমাণ যতটা ভারতে তদপেক্ষা অধিক ভূমিতে গমের আবাদ হয়। গম এখানে ফলেও মন্দ নহে। রুসিয়া ও যুক্তরাজ্য ব্যতীত এমন ফলন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গমের ফলন এতদপেক্ষা আরও বৃদ্ধি করা কোনমতেই অসম্ভব নহে। যুক্তরাজ্যে তুলার ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ভারতে তাদৃশ না হইলেও যুক্তরাজ্যের পরই ভারতের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। আখের আবাদ ভারতে কম নহে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভারতে মোটে এক একরে ১টন মাত্র ভূরা চিনি উৎপন্ন হয়, জাভা মরিসসে সে স্থানে একরে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৪ টনের কম নহে। সভাপতি অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, যদি ভারতের গমের ফলন ইংলণ্ডের মত, ইক্ষুর ফলন জাভা মরিসসের মত দাঁড় করান যায় তাহা হইলে ভারতীয় প্রজার অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে স্বচ্ছল হওয়া সম্ভব হইবে না কি?

এক গুণের যেস্থানে দ্বি অথবা চারিগুণ ফসল উৎপাদন করা যেমন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে তেমনি ইহা আবার প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু ভারতীয় নিঃস্ব প্রজাবৃন্দ এত অর্থ কোথা হইতে জুঠাইবে? এখানেও তাহাদের হতাশ হৃদয়ে আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দিয়াছে। চারিদিকে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ও চাষীগণের অর্থ সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিতেছে। বহুসংখ্যক কৃষক ইতিমধ্যেই উহার মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও অনেকে এই দলভুক্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়। ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তির সহজেই কর্ত্তব্যজ্ঞান লোপ পায়। এই সকল লোক উৎশৃঙ্খল হইয়া সমাজ ও সাম্রাজ্যের শান্তি নষ্ট করে। দেশে সম্যক শান্তিস্থাপন করিতে হইলে প্রজার অন্ন সংস্থান রাজার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।

পুষা ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধান

পুষাক্ষেত্রের পরীক্ষার কতিপয় ফল আমরা এস্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি—

ভুমিকর্ষণ—জমির উপরিভাগ বারংবার চষিলে জমিতে আগাছা কুগাছা জন্মিতে পারে না। সময় মত জমি চষিয়া তাহাতে মৈ দিয়া মাটি চাপিয়া রাখিলে জমি সরস থাকে এবং জমির উত্তাপের সমতা রক্ষা হয়। কোন না কোন শস্য উৎপাদন দ্বার উত্তাপের সমতা রক্ষা করাও যাইতে পারে, কেননা লতা গুল্ম দ্বারা জমিটি আচ্ছাদিত থাকিলে জমির উত্তাপের তারতম্য খুব কমই হয়। চাষ কারকিৎ করিলে জমির মাটিতে হাওয়া প্রবেশ করে এবং মৃত্তিকার তেজ বর্দ্ধিত হয় সত্য কিন্তু তদ্বারা উদ্ভিদের শিকড় বৃদ্ধির কতদুর সহায়তা হয় তাহা রসায়ন তত্ত্ববিদ্ মিঃ লেদার তদ্‌প্রচারিত পুস্তিকায় বিশেষভাবে কোন মিমাংসায় পৌঁছিতে পারেন নাই।

ইক্ষু কাটিবার সময়—অনেকের ধারণা যে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত হইতে ইক্ষু উঠাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য কারণ তাহা না হইলে ইক্ষুদণ্ডে রসের পরিমাণ কমিয়া যায় ও রসের বিকৃতি ঘটে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, এই ধারণা ভুল। চৈত্র মাস (March) সমস্ত ক্ষেতে ইক্ষু থাকিতে দিলেও কোন ক্ষতি হয় না বরং ইহাতে গুড় চিনির কারখানাওয়ালাদের সুবিধা হয়, তাঁহারা আরও অধিক দিবস ব্যাপিয়া তাঁহাদের কারখানার কার্য্য চালাইতে পারেন।

পুষাতে বীজের জন্য গম—পুষায় বীজ-গম উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। পুষা নং ১২, পুষা নং ৪ গমের দেশ বিদেশে চাষ হইতেছে এবং সুফল প্রদান করিতেছে। আর্জেণ্টাইন, ইজিপ্ট ও সুদানে ইহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এরূপ আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে পুষা, গ্রীষ্ম মণ্ডলের চাষের উপযোগী উৎকৃষ্ট বীজ-গম উৎপাদনের ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কীট ও ছত্রক তত্ত্ব—পুষাতে কীট ও ছত্রক তত্ত্ব আলোচনা বিশেষরূপে হইতেছে। ধানের উফ্রা সম্বন্ধে আমরা কৃষকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকারের উপায় এখনও স্থির হয় নাই। নিম্ন ব্রহ্মে রবারের কালসুতলী রোগ (Blck Thread disease) ও শাল গাছের রোগ প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে। বিগতবর্ষে তুলা গুটির পোকা, আকের সুড়ঙ্গকারী পোকা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রচারিত হইয়াছে।

জীবাণুতত্ত্ব—(Agricultural Bactereology) জলা জমি গাছ গাছড়া পচিয়া এক প্রকার অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অম্লত্বহেতু উক্ত জমিতে নাইট্রেট উৎপন্ন হইতে পায় না। উদ্ভিজ্জ পদার্থ, পশুশালার মলমূত্র আবর্জ্জনাদি জীবাণু-ক্রিয়া

(Microsopic organism) দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে বিকৃত হইয়া সারত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনকে নাইট্রিফিকেসন বা যবক্ষার প্রাপ্তি বলে। ব্যাকটিরিয়া নামক জীবাণু, জৈবিক পদার্থকে নাইট্রেটে পরিণত করে। জলা জমিতে সময় সময় নাইট্রেটের অভাবহেতু বীজ অঙ্কুরিত হয় না এই কারণে জলাজমির অম্লত্ব ঘুচাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ধানের পাতাকাটা মাহো (Rice leaf hopper) পোকা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। চাষীদের পুরাতন পদ্ধতি ক্ষেতে আলো জ্বালিয়া রাখা এখন কাজে লাগিতেছে। কীট তত্ত্ববিদগণও এই উপদেশ দিতেছেন।

ছাগল, ভেড়ার গায়ের পোকা নিবারণ জন্য তাহাদের চূণ ও গন্ধক জল দ্বারা ধৌত করিয়া অবশেষে ভিনিগার জলের পিচকারী দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ঘাষে বিঘ্ন—জমিতে ঘাষ থাকিলে মৃত্তিকাতে নাইট্রেট সঞ্চিত হইতে দেয় না, অতএব চাষের জমিতে ঘাষ থাকিলে সত্ত্ব নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমড়া—(Hogplum) ইহার শাস্ত্রীয় নাম Sapondias Mangifera। আম, আমড়া একজাতীয় উদ্ভিদ না হইলেও কার্য্যতঃ গুণে সমান, তবে আমের জন্ম উচ্চবংশে, আমড়া নীচ কুলোদ্ভব এই প্রভেদ। আমের গতিবিধি রাজসভায়, আমড়ার দরিদ্র বাঙলী গৃহস্থের বাসভবনে; কদাচিৎ সখ হইলে বড় লোকে আমড়ার খোঁজ করে মাত্র। আমড়ার আমের ন্যায় পাকা কাঁচা উভয় সময় অম্ল রাঁধিয়া খাওয়া যায়। আমড়া আমের ন্যায় মূল্যবান না হইলেও কচি আমড়া দরে বিক্রয় হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে আমড়া পাকে সেই সময় আমের আমদানী কমে এবং স্বভাবতই আমড়ার আদর বাড়ে। বাঙলাদেশে এই গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও ৩।৪ বৎসরে ফলবান হয়, ইহার জন্য বিশেষ তদ্বির করিতে হয় না, ইহা বনে জঙ্গলে স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখা যায়। একটু পাইট করিলে বোধ হয় ফলের উন্নতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙলাদেশে আমগাছ সব বৎসর ফলে না কিন্তু আমড়া কোন বৎসর ফাঁক যায় না, এবং এই প্রকার অনায়সলব্ধ বৃক্ষ হইতে বৎসরে ২৲ কিম্বা ৩৲ টাকা মুনফা সহজেই হয়। গাছে ফল ধরিলে, ফল ব্যাপারি আসিয়া গাছ জমা লয় সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণের ভারও উদ্যান স্বামীকে লইতে হয় না। বিলাতী আমড়া—(Spondias Dulcis) ঐ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছের পাতার ফলের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আমের সহিত বিলাতী আমড়ার সাদৃশ্য কমই দেখা যায়। বিলাতী আমড়া বাঙলাদেশে খুব ফলে কিন্তু ইহা একটু তদ্বির সাপেক্ষ। বাঙলার মাটিতে ৪।৫ বৎসরে ফলবান হয়। ফল দরে বিক্রয় হয়। য়ুরোপীয়গণের ইহা প্রিয়, বঙ্গবাসীগণও সাদরে গ্রহণ করেন। ইহাতে অম্লত্ব নাই বলিলেই হয়। ইহার চাটনি ও অম্ল হয়, কিন্তু দেশী আমড়ার মত এত সুন্দর ও উপাদেয় হয় না। দেশী আমড়ার বউলও অন্নে ব্যবহার হয়। দেশী পাকা আমড়া

পিতল কাঁশার বর্তনাদি পরিষ্কার জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। দেশী আমড়া গৃহস্থ পোষা ফল, বিলাতী আমড়া একটু সৌখীন। সৌখীন যুগে সুতরাং ইহার আদর একটু অধিক। বিলাতী আমড়া গাছ হইতে সহজেই ৪।৫ টাকা লাভ হয়। বিলাতী আমড়ার গাছ অধিকদিন স্থায়ী হয় না। ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই পোকা লাগিয়া মরিয়া যায়। দেশী আমড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বাগানের ধাঁরে ভিতে ২০ কিম্বা ২৫টা দেশী বা বিলাতী আমড়ার গাছ থাকিলে বাগানের একটা মালির মাহিনার আনুকুল্য হইতে পারে।

পত্রাদি

মৌমাছি পালন—

মিঃ আর রায়, কমলা নিলয়, রসোড়া (মুর্শিদাবাদ)

১। প্রশ্ন—মিঃ সি, সি, ঘোষ লিখিত মৌমাছি পালন সম্বন্ধীয় পুস্তকের সমালোচনা পাঠে আনন্দিত হইলাম। ঐ পুস্তকখানি কোথায় পাওয়া যাইবে ও মুল্য কত কিছু প্রকাশ নাই। এবিষয়ে সংবাদ দিবেন।

২। প্রশ্ন—এতদঞ্চলে বাগান ও কাজে কাজেই ফুলের বিশেষ অভাব। আমার যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে ফুলের গাছ আছে তাহা হইতে সম্বৎসর মধু সংগ্রহ হইতে পারে না। এই জন্য লিখি মধু আহরণ যোগ্য (Bee feeding) ফুল সমূহের একটি তালিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বছরকীর (annual) পরিবর্তে স্থায়ী (preunial) বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অধিক অনুমান করি।

৩য় প্রশ্ন—পশ্চিমাঞ্চলে কিরূপ ভাবে মৌমাছি পালন হইবে বা সম্ভবপর হইবে এই সন্দেহ খণ্ডন করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

উত্তর ১—পুস্তকখানি পুসার Agricultural adviser অফিসে পাওয়া যাইবে। দাম ১ শিলিং ৪ পেন্স; একটাকা কিম্বা ১।০ সিকা মুল্য। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন অফিসেও এই পুস্তক পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে তাঁহারাও পাঠাইতে পারেন।

উত্তর ২—আপনার ফুলের গাছ নাই বলিয়াছেন—মৌমাছি পালনের জন্য এত অধিক মধু প্রসবকারী ফুলের আবশ্যক যে, সে রকম ফুল গাছের সমাবেশ অনেকের নাই। ২২ অউন্স মধু সংগ্রহ করিতে হইলে মৌমাছিকে দুই হাজার কিম্বা ততোধিক ফুলে বেড়াইতে

হইবে। আবার ফুল বিশেষের মধু অধিক বা কম আছে। বছরকি (annual) বা স্থায়ী গাছ হউক, অধিক মাত্রায় জন্মান চাই। শীত কালে মৌমাছিগণ, সীম, মটর, শরিষার ফুল হইতে অনায়াসে মধু সংগ্রহ করিতে পারে এবং এই সকল ক্ষেত্র হইতে শস্য ও মধু উভয় সংগ্রহ হইতে পারে। শীতকালে কমলালেবু হয়, কমলার প্রশস্থ বাগান থাকিলে মৌমাছি পালনের সহায়তা হয়। গ্রীষ্মকালে বাঙলাদেশে বাতাবী প্রভৃতি লেবু, আম আমড়া প্রভৃতি মুকুলিত হয়, এই সময় এইজন্য মৌমাছির মধু সংগ্রহের অভাব থাকে না। বর্ষাকালে ভাঁটি (Buddleia asiatica), রোডোডেণ্ড্রান, লেডী অব দি নাইট (Duboisa Speciosa), সেফালিকা (Nyctanthes Arbortristis), বক (Agati Coccinea, A. Alba) প্রভৃতি ফুল ফুটিলে আর ফুলের অভাব থাকে না। গ্রীষ্মকালে এতঞ্চলে মল্লিকা, মালতি, টগর, কামিনী, বকুল, জুঁই, জাতি জেসমিন, প্রভৃতি ফুল ফুটে। কিন্তু এই সকল গাছ ২।৪ টা থাকিলে চলিবে না। রাশি রাশি ফুল ফুটা চাই সুতরাং যে কোন গাছ হাজার হাজার রোপণ করিতে হইবে। ডুরয়সা যাহাকে লেডি অফ্ দি নাইট বলা হয়, যাহাকে মালীরা ভুলক্রমে হোসেনা হেনা বলে, উহার বেড়া ধারে ধারে লাগাইলে সুন্দর বেড়া হয় এবং মৌমাছির জন্য ফুলের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়। এই গাছে গ্রীষ্মে ও বর্ষায় দুইবার ফুল হয়। আমাদের দেশে গবাদি খাদ্য ঘাষ খড় প্রভৃতি প্রচুর জন্মে এই জন্য গবাদির খাদ্যের জন্য আর সতন্ত্র কোন শস্যের চাষ করিতে হয় না। যেখানে অভাব সেখানে লুসার্ণ (আমরুলের মত ঘাষ), ক্লোভার, আলফালফা প্রভৃতি ঘাষের চাষ করা হয়। ইহাতে গরুর খাদ্য সংগ্রহ হয় এবং মধুসঞ্চয়ও হয়। যে জমি হইতে ২০ মণ ঘাষ সংগ্রহ হইবে, সেই জমি হইতে অন্ততঃ আধমণ মধু সঞ্চয় হইতে পারে।

উত্তর ৩—পশ্চিমাঞ্চল হউক বা বঙ্গদেশ হউক মৌমাছিগণের ঝাঁক বাঁধিবার একটা সময় আছে। সমতল ভুখণ্ডে মৌমাছিগণ বসন্তকালে ঝাঁক বাঁধে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে গ্রীষ্মের আরম্ভে বৈশাখ মাসে একবার এবং বর্ষশেষে আশ্বিন মাসে একবার ঝাঁক বাঁধে। বসন্তকাল পড়িলেই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমতল ভূমিতে তাহারা নামিয়া আসিয়া চাক বাঁধিবার চেষ্টা করে। এই সময় সুবিধামত স্থান পাইলেই সেই স্থানে আসিয়া বসে। এই সময় কৃত্রিম মধুচক্র কাষ্ঠের ফ্রেমে আঁটিয়া বড়গাছে বা দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া দিতে হয়। স্থান রোদপিঠে হইবে অথচ মধ্যাহ্নে ছায়া পড়িবে, এইরূপ স্থানই উহারা পছন্দ করে। মাঝে মাঝে চাকগুলি দেখিতে হয় যে মৌমাছি আসিয়া বসিল কিনা। নিকটবর্ত্তী স্থানে খাদ্য না পাইলে মৌমাছি থাকিবে না সুতরাং তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্যান্য খবর Beekeeping পুস্তকে পাইবেন।

চাষের জমি—

শ্রীগোপাল দাস বসু, বুজরুকদীঘি, বর্দ্ধমান।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আমার ১৯শে মার্চ্চ তারিখের পত্রের উত্তর চৈত্র সংখ্যা "কৃষকের" ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। পত্রোত্তর পাঠে হৃদয়ে বড় আশার সঞ্চার হইল। শ্রীভগবান আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই এ দীনের প্রার্থনা। এক্ষণে আপনাকে আর একটি বিষয়ে বিরক্ত করিতেছি।

হাজারিবাগ জেলার কোন্ স্থানে চাষ বাস করা সুবিধা, সেখানে কেহ বঙ্গবাসী গেছেন কি না, এবং কোনও ব্যক্তি আপনার জানিত আছে কি না যাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া এবং স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জমি জমার বন্দোবস্ত করিতে পারি, এরূপ কেহ ব্যক্তি যদি আপনার জানিত থাকে, তবে তাঁহার নাম ও ঠিকানা দয়া করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

ময়ুরভঞ্জ সম্বন্ধেও উপরোক্ত সংবাদগুলি দয়া করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহা হইলে পত্র দ্বারায় পূর্ব্বে সকল ঠিক করিয়া নিজে গিয়া স্থানাদি দেখিয়া একস্থানে চাষের বন্দোবস্ত করিব জানিবেন। আশা করি দয়া করিয়া পত্রোত্তর দানে চিরবাধিত করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের ঠিকানাটিও লিখিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, আশা করি তাঁহার ঠিকানাও দিবেন। তিনি এসব স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাইতে পারিব।

উত্তর—আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। হাজারিবাগে কিম্বা ময়ুরভঞ্জে যাইয়া এসম্বন্ধে খোজ করিলেই ভাল হয়। হাজারিবাগ বা ময়ুরভঞ্জে অনেক বাঙ্গালী আছেন। ময়ুরভঞ্জে বাঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং রবারের আবাদ করিয়াছেন। তাহাকে পত্র লিখিতে পারেন।

তাঁহার ঠিকানা—Mr D. N. Mukerjee, Asssistant Director Department of agriculture, Bengal, calcutta.

হাজিরীবাগে—Mr N. N. Mittra Dy. Magistrate, Hazaribag. এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এখন কোথায় আছেন. আমাদের জানা নাই।

সূত্র—

কুমার নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজবাটী রামগোপালপুর, মৈমনসিংহ।

ইনি সূত্র সম্বন্ধে অনেক ভারতীয় উদ্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন—তিনি আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি মালদহ প্রদর্শনী ও টাঙ্গাইল প্রদর্শনীতে সূত্র

প্রদর্শণ করিয়া যথাক্রমে ১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসাযোগ্য। অর্থের অপব্যয় না করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টায় সেই ধন নিয়োগ করিলে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হয়। তাঁহার সূত্র সম্বন্ধে পরীক্ষা যাহাতে সুপদ্ধতি সম্পন্ন হয়, তাঁহার পরীক্ষা ফল সাধারণে প্রচার হয় তদ্বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

নিম্নলিখিত উদ্ভিদের পরীক্ষা করা হইয়াছে—

1. স্থলপদ্ম—Hibiscus Mutabilis.
2. বন ঢেঁড়স্—Hibiscus ficulneus.
   ঢেঁড়স—Hibiscus esculentus.
3. মুর্গা—Agave Sisalana.
   Do. Vivipara.
4. মুর্ব্বা বা মুর্গা—Sanseviera Zeylanica.
   S. Cylindrica.
5. বেড়েলা—Sida.
6. আনারস—Ananas Sativus.
7. কেতকী—Pandanus Odoratissimus.
8. কলাগাছ—Musa Paradisiaca.
9. ঝাঁপীঝোরা
10. বন নল—Phragmites Karka.
11. বন কার্পাস—Wild Cotton, Tree Cotton.
12. নোনা আতা—Anona Reticulata.
    Squamosa.
13. ঘোরা চক্র
14. এরাচ্
15. জবা—Hibiscus rosa sinensis.
16. তুলাগাছ—Silk Cotton tree, Bombax malabaricum.
17. মেস্তা পাঠ—Hibiscus cannabinus.

কৃষি কলেজ—

শ্রীকৃষ্ণকমল চট্টোপাধ্যায় c/o রায় সাহেব এল, চট্টোপাধ্যায়, চাঁদপুর পোঃ, হুগলী।

প্রশ্ন—আপনাদের 'কৃষক' পত্রে জানিলাম সাবরে কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে কৃষি কলেজ কোথাও আছে কিনা? যদি না থাকে অগত্যা সাবরে যাইতে ইচ্ছা করি তথায় একজন ছাত্রের থাকিতে ও খাইতে কত খরচ বাড়িবে এবং যাতায়াতের খরচ কত?

উত্তর—প্রেসিডেন্সি বিভাগে কোন কৃষি কলেজ নাই। সাবর যাতায়াতের খরচ খুব অধিক না হইলেও ১০৲ হইতে ১২৲ টাকার কম নহে। সেখানে থাকিতে কত খরচ বা অন্য কোন বিশেষ খবরের জন্য আপনি সাবর কলেজের প্রিন্সিপালকে পত্র লিখুন।

বেগুণের তুলসী মারা রোগ—

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক বাগাটি হাই স্কুল।

প্রশ্ন—বেগুণ গাছের বেশ বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ডগাগুলি আতড়াইয়া শুষ্ক প্রায় হইয়া যাইতেছে। ইহাকে চাষীরা তুলসী মারা রোগ বলে ইহার প্রতিকার কি?

উত্তর—এক প্রকার ছোট কীড়া বেগুণের ডগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডগার অন্তসার খাইয়া ফেলে এবং ডগা শুকাইয়া যায়। এই পোকা লাগার সূত্রপাত হইলেই ডগাগুলি কিছু নীচে হইতে কাটিয়া জমা করিয়া পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এইরূপে ব্যবস্থা করিলে এই পোকার বৃদ্ধি হইতে পার না। "ফসলের পোকা" দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

বেল গাছ ছাঁটিবার সময়—

মিঃ জি, মুখার্জ্জী, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

প্রশ্ন—বেল যুঁই গাছের বর্ষাকালে অতিশয় বৃদ্ধি হয়, বেলের ফুল বর্ষাকালে ক্রমশঃ কমিয়া আসে কিন্তু যুঁই বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে। কোন সময় বেল যুঁই গাছ ছাঁটা কর্ত্তব্য?

উত্তর—বর্ষাশেষে বেল যুঁই গাছ ছাঁটা বিধি। যতদিন গাছে ফল কিম্বা ফুল থাকে ততদিন গাছ ছাঁটা চলে না এবং উচিতও নহে। ভাদ্র মাসে বেলের ফুল থাকে না ভাদ্রমাসে বেল ছাঁটিতে পারা যায়—আশ্বিনমাসেও ছাঁটা যায়। যুঁই ফুলেরও ঐ নিয়ম।

ধান্যের ফসলে বিঘ্ন ও তাহার প্রতিকার—

শ্রীআহম্মদ হোসেন; গুলুচিয়া, পোঃ সাস্ত, মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন—ধান্যের জমিতে শেওলা হইলে তাহার প্রতিকার কি?

উত্তর—চূণ ছড়াইয়া দিলে শেওলা মরিয়া যায়। ধান গাছের ভিতর অধিক চূণ ছড়ান চলে না কেননা তাহা হইলে চূণের তেজে ধান গাছ মরিয়া যাইবে। যখন ক্ষেতে ধান গাছ না থাকিবে সেই সময় ক্ষেতে চূণ ছড়াইয়া বারম্বার চষিলে প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে।

প্রশ্ন—ধান গাছের পাতা শীষ কাটা পোকায় কাটে, তাহার প্রতিকার কি?

উত্তর—ধেনো ফড়িঙে ধানের পাতা ও শীষ কাটে। ঘণ খোপ জাল বা পাতলা কাপড় জালের মত দুই দিক ধরিয়া ধান ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে ফড়িঙ জালে পড়ে। এই ফড়িঙগুলি আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে ধান ক্ষেত্রে মাটির নীচে গর্ত্তে ডিম পাড়ে। উচ্চ জমি হইলে এবং জমিতে ঐ সময় জল না থাকলে ডিম পাড়ার সুবিধা হয়। আমনের ক্ষেতে জল থাকে বলিয়া মাটির নীচে ডিম পাড়ার সুবিধা হয় না। পতঙ্গগণ গাছে ডিম পাড়ে অধিকাংশ ডিম ঝড়ে বাতাসে জলে পড়িয়া পচিয়া যায়। এই জন্য নিম্ন জমি অপেক্ষা উচ্চ জমির ধানে অধিক ফড়িঙের উৎপাত হয়। "ফসলের পোকা" পুস্তক দেখুন।

প্রশ্ন—ধানে খৈল—ধান ক্ষেতে খৈল কখন্ দেওয়া কর্ত্তব্য, কোন মাসে?

উত্তর—ধান ক্ষেতে খৈলের সার দিতে হইলে ধান রোপণের ৮।১০ দিন পূর্ব্বে খৈল দিয়া দুই তিনবার চাষ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ ও সারসংগ্রহ

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষের প্রসার—গর্ভর্ণমেণ্ট কৃষিবিবরণীতে প্রকাশ যে, গত বৎসরর ফরিদপুর জেলায় আলুর ফলন এত সন্তোষজনক হইয়াছিল যে এই জেলায় আলুর চাষের অনুপযুক্ত এরূপ ধারণা কৃষকদিগের মন হইতে একেবারে দূর হইয়াছে। এ বৎসর গোপালগঞ্জ ও সদর সবডিভিসনের নানা স্থান হইতে কৃষকগণ চাষের জন্য এ বিভাগ হইতে ২২৫/ মণ আলু মূল্য দিয়া কিনিয়া চাষ করিয়াছিল। আগামী সনের চাষের জন্য অনেক কৃষক এখন হইতেই বীজের অনুসন্ধান লইতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে আলুর আবাদ যে পরিমাণে বাড়িয়াছে ও কৃষকগণের ইহার উপর এত আগ্রহ হইয়াছে যে, মনে হয় আলু এই জেলায় রবি ফসলের মধ্যে নিকট ভবিষ্যতে প্রধান স্থান অধিকার করিবে।

ফরিপুর সদরে ১৪৬ জন কৃষক অলুর আবাদ করে তন্মধ্যে ১৩ জন কৃষক লাভবান হইতে পারে নাই, বাকী ১৩৩ জন সমস্ত খরচ বাদে বিঘাপ্রতি গড়ে ৪১৲ টাকার উপর আলু পাইয়াছে, গোপালগঞ্জ সবডিভিসনে ৩৭ জন কৃষক আলুর আবাদ করে তাহার মধ্যে ৫ জন লাভবান হইতে পারে নাই, অবশিষ্ট ৩২ জন সমস্ত খরচ বাদে গড়ে এক বিঘা জমি হইতে ৬১৲ টাকার উপর পাইয়াছে, গোয়ালন্দ সবডিভিসনে একজন কৃষক মাত্র আলুর আবাদ করিয়াছিল, সে সমস্ত খরচ বাদে তাহার জমি হইতে বিঘা হিসাবে ৪৮৲ টাকা পাইয়াছে।

ময়মনসিংহ—এই জেলার আলুর চাষ যৎসামান্য; তারপর বীজের আলুর উপর দৃষ্টি না রাখায় আলুর আয়তন ক্রমেই ছোট হইতেছে, বিঘাপ্রতি ফলনও এত কম হয় যে কৃষকগণ আলুর চাষ আর একটা লাভজনক ব্যবসা বলিয়া ধরে না। গত ৩ বৎসর যাবৎ কৃষিবিভাগ হইতে এখানকার আলুর চাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। দার্জ্জিলিং ও নাইনিতাল পাহাড় হইতে ভাল বীজ আনাইয়া প্রজাদিগকে সরবরাহ করা হইতেছে এবং কৃষি প্রদর্শকদ্বারা চাষের প্রণালী দেখান হইতেছে।

কৃষকগণ ১৯১৪ সনে ৩১৫/ মণ আলু চাষের জন্য লয়, গড়ে বিঘাপ্রতি খুব কম ৩০/ এবং খুব উচ্চ ১২৫/ মণ আলু পাইয়াছে। এইরূপ আশাতীত ফলে কৃষকগণ যেরূপ আলুর বীজ আনিতেছে তাহাতে মনে হয় এ বৎসর এ জেলায় আলুর চাষ অনেক বাড়িবে। যাহারা এইরূপে সরকার হইতে ভাল বীজ লইয়া আলুর চাষ করিয়াছে এবং এই প্রকারে দেশে আলুর চাষের উন্নতির জন্য সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য গত ৩১শে মার্চ্চ কৃষিবিভাগ হইতে এই জেলায় একটী আলু প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। ১২৫ জন আলুর তারতম্য অনুসারে পুরস্কৃত হইয়াছিল।

জেলার জমীদার ও ভদ্রলেকগণ প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াও কৃষকগণকে উৎসাহিত করিয়া কৃষি-বিভাগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গত বৎসর ১৩৪ জন কৃষক ৬১ বিঘা ৫৩ কাঠা জমিতে আলুর চাষ করিয়াছিল এবং সমস্ত খরচ বাদে গড়ে বিঘাপ্রতি ১০৭৲ পাইয়াছে।

এ জেলায় আবাদী জমির ২০ ভাগের এক ভাগ আলুর আবাদের উপযুক্ত, কৃষিবিভাগ জেলার কৃষকগণকে ভাল বীজ সরবরাহ করিয়া উৎসাহিত করিলে এই জেলা এক সময় আলুর জন্য বিখ্যাত হইবে।

রাজসাহীতে—প্রজাদের মধ্যে পাহাড়িয়া আলুর চাষের প্রবর্ত্তন বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। বগুড়া রাজসাহী, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ীতে দার্জ্জিলিং আলুর বিছনের বিশেষ আদর দেখা যায়। দেশী আলু এই সব স্থানে গড়ে বিঘাপ্রতি ২৫।৩০ মণের বেশী হয় না, কিন্তু দার্জ্জিলিং আলু ৭০।৮০।১০০ মণ পর্য্যন্ত হয়। দেশী আলু অপেক্ষা এখানে দার্জ্জিলিং আলু বেশী দিনও থাকে। গত বৎসর ২০০৴ মণ বিছন লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। বগুড়া জেলায় উক্ত আলুর প্রচলন অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইতেছে। আলুর চাষে গোবর ও বেড়ীর খোল বিশেষ ফল প্রদান করে। গত বৎসর কোন স্থানেই আলুর মড়ক দেখা যায় নাই। তৎপূর্ব্ব বৎসর দুই এক স্থানে উক্ত পীড়া দেখা গিয়াছিল। গত বৎসর উক্ত মড়ক দেখা না দিলেও উহার ভাবি আক্রমণ নিবারণার্থে তৎপূর্ব্ব বৎসরের আক্রান্ত গ্রামসমূহে বোরডো মিকশ্চার ব্যবহার করা গিয়াছিল এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বনও করা হইয়াছিল, এতদঞ্চলে আলুর চোরা পোকা প্রায়ই দেখা যায় এবং উহা হস্তদ্বারা রাত্রে বাছিয়া ফেলাই উহার দমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

রঙ্গপুর—দেশী আলু অপেক্ষা এখানে দার্জ্জিলিং ও ইটালিয়ান আলুর ফলন অধিক হয় কিন্তু দার্জ্জিলিঙ আলু শিঘ্র নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এখানকার চাষীরা দেশী আলুই পচ্ছন্দ করে। কৃষিবিভাগ দেশী আলু বীজের উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন।

ঢাকাতে—১৯১৪-১৫ সালে চাষীরা ৮০০ মণ আলু বীজ লইয়াছিল। ফল ভাল হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বর্ষের জন্য চাষীরা সহস্র সহস্র মণ বীজ আলুর জন্য আবেদন করিতেছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা আলু চাষের প্রাধান কেন্দ্র—এই দুই জেলায় আলুর জমির পরিমাণ দশহাজার বিঘার কম নহে। কিন্তু এই বিভাগে অন্যান্য জেলার চাষীরা আলু চাষ জানিত না। ভারতীয় কৃষিসমিতির চেষ্টায় ২৪ পরগণায় ও নদীয়া জেলায় নানাস্থানে আলু চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষিসমিতি—২৪পরগণা ও নদীয়া জেলায় ৬৫ জন চাষীকে বীজ সরবরাহ

করিয়াছেন। দেশী, দার্জ্জিলিং পাটনা বীজ আলু ৮৪২ মণ এখান হইতে সরবারাহ হইয়াছে।

পাঁকমাটি—ভারতীয় কৃষিসমিতির গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রে প্রতি বৎসরই বেগুণ, পাট ও আশুধানের ক্ষেতে পুষ্করণীর পাঁকমাটি কিম্বা পগারের পলিমাটি সাররূপে ব্যবহার করা হয়। তাঁহারা দেখিয়াছেন বারুইপুর ও সেণারপুর থানার অধিবাসী চাষীগণ প্রতিবৎসরই তাহাদের ক্ষেত্রে পগারের মাটি তুলিয়া ছড়াইয়া থাকে। ইহাতে ফল খুব ভালই হয়। গোবিপুর ক্ষেতে তিন বৎসর যাবত লক্ষ্য করিয়া দেখাতে বেশ বুঝা গেল যে এই মাটির সারবত্তা বেশ আছে। আমন ধানের ক্ষেতে মাটি ছড়ান চলে না। আমনের ক্ষেতে স্থানীয় চাষীরা গোময় সার ব্যবহার করে। সবজী কিম্বা আউস ধান ও পাটের ক্ষেতে তাহারা সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি ৩০০ ঝুড়ি মাটি বা গোময় ছড়াইয়া থাকে। এক ঝুড়ি মাটির ওজন ১ মণের অধিক হইবে কিন্তু এক ঝুড়ি গোময় ৩০ সেরের বেশী হইবে না। কৃষি বিভাগও সম্প্রতি পাঁকমাটির গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন—পুকুর বা মরা নদী হইতে মাটি কাটিয়া শুখাইয়া লইলে উত্তম সারের কাজ করে। এই বৎসর যশোহর ও নদীয়া জেলার কয়েকটী স্থানে ইহা ব্যবহার করা হইয়াছে। ফলাফল আগামী বৎসর বলিতে পারা যাইবে। তবে বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষকেরা অনেক স্থানে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তুঁতের চাষে ইহার খুব ব্যবহার। ইহা বিনা খরচে অথবা অতি অল্প খরচে জমিতে দেওয়া যাইতে পারে। কৃষকেরা যদি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা জমিতে ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাদের জমিতে সার দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ জলাশয়গুলির উন্নতি হইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

মান্দ্রাজে কাঁচের কারখানা—মান্দ্রাজে একটি কাচের কারখানা ছিল। অচল হইয়া কারবারটি বন্ধ করিবার জন্য পরিচালকগণ আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট ঐ কারখানা ক্রয় করিয়াছেন। আগামী অগষ্ট মাস হইতে কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা। সরকারী শ্রমশিল্পবিভাগের শ্রীযুক্ত নারায়ণমূর্ত্তি পরিক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—এই কারখানায় সোডাওয়াটারের বোতল প্রস্তুত হইতে পারিবে। গবর্মেণ্ট ব্যবসায়ের হিসাবে কারখানা চালাইবেন। অ্যালুমিনিয়ম ও ক্রোম চামড়ার কারখানা চালাইয়া মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট সফল হইয়াছিলেন। এখন এই দুই শ্রমশিল্প মান্দ্রাজে চলিয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্টও প্রজাকে হাতে কলমে শিখাইয়া সরকারী কারখানা বন্ধ করিয়াছেন। বাঙলায় কিন্তু আজপর্য্যন্ত কোন উল্লেখ যোগ্য কারখানা স্থাপিত হইল না। যেমন বাঙ্গালা, যেমন বাঙালী, গবর্মেণ্টও কি

তাহার অনুরূপ হইবেন? কাহারও কল্পনা কি কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে না? সোয়ান সাহেবের আশ্বাস বাণী কি আকাশে মিশিয়া গেল!

দার্জ্জিলিঙে উদ্ভিদ তত্ত্বানুসন্ধানাগার—আচার্য্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের উদ্ভিদ লইয়াই উদ্ভিদের অনুভূতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তার বসুর অনুসরণে এই বিষয়ের পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু উষ্ণকটিবন্ধের তরুলতার শীতপ্রধান দেশে পরীক্ষা সম্ভব নহে। এই জন্য তাঁহারা ডাক্তার বসুকে পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী তরুলতার পরীক্ষা করিতে বলেন। হিমালয়ে সেইরূপ উদ্ভিদের অভাব নাই।—আমাদের সদাশয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও শিক্ষাসচিবের অনুরোধ ভারতসচিব দার্জ্জিলিঙে এইরূপ একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তদনুসারে ডাক্তার বসু "গ্লেন ইডেন রিসার্চ্চ ষ্টেশন" নাম দিয়া একটি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটী পরীক্ষা সফল হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনান্দিত হইয়াছি। এই পরীক্ষাগারে উষ্ণ কটিবন্ধের উদ্ভিদকে বারো মাস এব ভাবে রাখিবারও চেষ্টা হইতেছে।

ঝিঙা বা ধুঁধুলের জালি—বঙলাদেশের লোকের নিকট ঝিঙা বা ধুধুলের বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। পশ্চিম প্রদেশে এমন কি বিহারে ঝিঙা, ধুঁধুল অন্য নামে খ্যাত। ইহার জালি স্পঞ্জের মত হয় বলিয়া এবং স্পঞ্জের মত কাজ করে বলিয়া ইহার ইংরাজী নাম Sponge gourd উদ্ভিদ শাস্ত্রে ধুধুল Luffa Ægyptiaca. Mill. এবং ঝিঙা Luffa acutangula. Roxb. এই আখ্যা পাইয়াছে। য়ুরোপের লোকে ইহাকে খাদ্যের জন্য খাতির করুক বা না করুক ইহার জালির বড় আদর করে। পাকা ধুঁধুল বা ঝিঙার উপরের ছাল এবং ভিতরের বীজ ফেলিয়া দিলে মধ্যে স্পঞ্জের ন্যায় জাল পাওয়া যায়।

জাপানি ধুঁধুল বঙ্গদেশীয় ধুঁধুল অপেক্ষা অনেক বড় ও মোটা হয় এই জন্য য়ুরোপের বাজারে ইহার অধিক আদর। বাঙলায় জাপানি ধুঁধুলের চাষ করিবার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছিলেন, ফল তাদৃশ সুবিধাজনক হয় নাই। যত্ন সহকারে চাষ করিলে বাঙলার ঝিঙা ধুঁধুলের আকার বৃহৎ হওয়া এবং জাপানি ধুঁধুলের চাষ প্রবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে।

ধুঁধুল তন্তুও মোজা বয়ন কার্য্যে ব্যবহার হয়। জাপান হইতে ধুঁধুলজালও ধুঁধুল তন্তু য়ুরোপের বাজারে আমদানি হয়। ধুঁধুল তন্তু সম্বন্ধে অনেক খবর Director of the Comerecial Intelligene (Calcutta) হইতে লিখিয়া পাঠাইবেন।

আমের ফসল—বর্ত্তমানবর্ষে আমের মুকুল অপর্য্যাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি ও তারপর নানাস্থানে শিলাবৃষ্টি হওয়াতে কোথাও কোথাও আম ভাল নাই। বোম্বাই অঞ্চলে দশভাগের এক ভাগ আম্র জন্মিয়াছে। মাদ্রাজেও প্রচুর আম্র হয়জন্মে নাই। বেহার হইতে কলিকাতায় প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে কিন্তু এবার বেহারের আম শিলাপাতে নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশেত আম ভাল হয় নাই।

কচুরির কথা—বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গে 'ওয়াটার হিয়সিন্থ' নামে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্ খাল-বিল তড়াগাদিতে অজস্র জন্মিয়া নৌকা ও ষ্টীমারের যাতায়াত পথ রুদ্ধ করিতেছে। দেশীয় ভাষায় এই গাছগুলিকে 'কচুরি' বলে। এই গাছ ইতিপূর্ব্বে মার্কিণ রাজ্যের অন্তর্গত ফ্লোরিডা প্রদেশে, অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যে ও ইণ্ডো-চায়না অঞ্চলে বহুবিস্তৃত হইয়া সেখানকার বাণিজ্য ব্যাপারে বিষম বাধা জন্মাইয়াছিল। পাছে বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দশা ঘটে, এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়াছেন। কিরূপে এই গাছগুলিকে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বাঙ্গালার কৃষি বিভাগের কর্ত্তারা অধুনা নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা রাসায়নিক বিশ্লেষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই কচুরি গাছের পত্র-পল্লব হইতে 'পটাশ' বা ক্ষার জাতীয় সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। এ বৎসর ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে এই গাছ ক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করিয়া দেখা হইবে। এদিকে কিন্তু অনেকের ধারণা, কৃষিবিভাগের পরীক্ষা লাভজনক বিবেচিত হইলেও কৃষকেরা সহজে কর্ত্তৃপক্ষের মতানুবর্ত্তী হইবে না। তাহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কাজে লাগাইতে অনেক দিন লাগিবে। ইতিমধ্যে ঐ গাছের বহর দিন দিন যেরূপ অতিমাত্র বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে কিছুদিন পরে হয় ত উহার বৃদ্ধি দমন সাধ্যাতীত হইয়া পড়িবে। এখন উপায় কি?

মরিশসে আখ—পত্রান্তরে প্রকাশ,—গতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর মরিশস দ্বীপে আখের ফলন শতকরা বাইশ ভাগ কম হইয়াছে; প্রকাশ,—গত বৎসরের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসের অনাবৃষ্টিই ইহার কারণ। তথাপি গত বৎসর মরিশসে মোটের উপর ২ লক্ষ ১৫ হাজার টন আখের চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল;—ইহার অধিকাংশই ইউনাইটেড কিংডমে প্রেরিত হইতেছে; সুতরাং মরিশসের চিনি ভারতে আসিবার সম্ভাবনা এবার খুবই অল্প; বিশেষ,—এদেশে বৈদেশিক চিনির উপর প্রবর্ত্তিত নূতন শুল্ক স্থাপনের ফলে আমদানীর পরিমাণ আরও অল্প হইবারই সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে এক্ষণে এদেশে অধিকতর চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা ত বিশেষ আবশ্যক। —এক টন সাতাশ মণের কিছু উপরে। বঙ্গবাসী।

তালের আঁাটি—আমাদের দেশে প্রচুর তাল জন্মে। তাহার আঁাটি সকলেই ফেলিয়া দেয়। জর্ম্মণেরা পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২,৮৩,০০০ টন তালের

আঁঠি স্বদেশে লইয়া যাইত, আঁঠি হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা সাবান, বাতি মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এবং তাহার খৈল গবাদির পুষ্টিকর আহার সামগ্রী রূপে ব্যবহৃত হইত। এই আঁঠি আনিবার জন্য কয়েক খানা জাহাজ আফিকা হইতে জর্ম্মণী যাতায়াত করিত। যুদ্ধারম্ভের পর জর্ম্মণেরা আর আফ্রিকা হইতে তালের আঁঠি লইয়া যাইতে পারে না। ইংরেজেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবাসী কি তালের আঁঠি তৈল করিবার চেষ্টা করিবেন না?

বাগানের মাসিক কার্য্য

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতী বেগুন পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জল্দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বান্ধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যূঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যূঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন— ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, পিচ নানা প্রকার লেবুর গাছের

গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা—শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আষাঢ় ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। | আষাঢ়, ১৩২৩ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

ভূমির উর্ব্বরতা এবং উহার বৃদ্ধি

প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

ভূমির সহিত গাছের সম্বন্ধ নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ সাধ্য নহে। এজন্যে ভূমির উর্ব্বরতার কোনও বাঁধাবাঁধি বাখ্যা দেওয়া যায় না। কোনও ভূমিতে বনজ ও উদ্যানজ ফুলের গাছ প্রভৃতি বেশ জন্মিলেও ধান্যাদির পক্ষে অহিতকর হইলে আমরা উহাকে অনুর্ব্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সাধারণতঃ যে ভূমিতে মনুষ্যের সাধারণ ভোজ্য দ্রব্য উত্তমরূপে জন্মিতে পারে আমরা তাহাকেই উর্ব্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বৃক্ষাদির জন্য ছয়টী উপকরণ আবশ্যক, (১) জল (২) বায়ু (৩) শীতাতপ (৪) খাদ্য (৫) শিকড় বিস্তারের স্থান (৬) অহিতকর পদার্থের অবর্ত্তমানতা। এক্ষণে এইগুলির গাছের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিরুপণ করা যাউক।

জল-সরবরাহ—ভূমি, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভ হইতে জল পাইয়া থাকে। এই জল বাষ্পাকারে এবং নিষ্কাশন দ্বারা অনেক পরিমাণ বিদূরিত হইয়া থাকে। এজন্য ভূমিতে জলের পরিমাণ অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল ভূমির পক্ষে আবশ্যকীয় হইলেও জল চলাচলের ব্যবস্থা আরও অধিক আবশ্যকীয়। বায়ু এবং শীতাতপের উপরও ভূমিস্থ জলের পরিমাণ নির্ভর করে। ইংলণ্ডে ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প বৃষ্টিপাত হইলেও ভূমি বেশ আর্দ্র থাকে। কিন্তু আগষ্ট মাসে বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইলেও ভূমি সেই পরিমাণ সরস থাকে না। ভূপৃষ্ঠের উপরও ভূমির দোষ গুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভূমির অবস্থান এবং নিম্নস্তরের মাটীর গুণাগুণ সেই স্থানের উর্ব্বরতা নির্ণয় করিতে হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অপ্রতুল জল সংস্থান ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষের জন্য, অথবা অল্প বৃষ্টিপাতের জন্যই হইয়া থাকে। ভূমিতে কর্দ্দমের অথবা খনিজ পদার্থের পরিমাণ অধিক হইলে জল জমিয়া থাকে, অধিকন্তু খড়ি অথবা বালুকার আধিক্য হইলে মৃত্তিকা সছিদ্র হয় এবং জল ভূভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই সকল স্থলে ভূমিকেই চাষের অনুপযুক্ত বলিয়া দোষারোপ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে উত্তম ভূমিতে ও পর্ব্বতের পাদদেশে অথবা ঢালু স্থানে হইলে পর্ব্বতের জল নামিয়া জমিয়া যায় ও জলাভূমিতে পরিণত হয়। ভূমির নিম্নস্তর প্রস্তরময় হইলে জলকষ্ট অনুভূত হয়। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে জলাভূমিতেও শস্যাদি প্রচুর পরিমাণ জন্মিতে পারে। ভূমির নিম্নস্তরে প্রস্তর বর্ত্তমান থাকিলে উহাকে ভাঙ্গিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু কঙ্করময় ভূমিকে উর্ব্বর করা আমাদের ক্ষমতার অসাধ্য।

কৃষক যদি জল-সরবরাহের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করে তাহা হইলে প্রথমে দেখা উচিত উহা ভূমির দোষে হইতেছে, কিম্বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে হইতেছে। ভূমিতে কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হইলে চূণ ছড়াইয়া অথবা জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলে সে দোষ দুরিভূত হইতে পারে; বালুর আধিক্য কর্দ্দম বা পলি প্রয়োগ করিয়া অথবা খনিজ সার দিয়া এবং শন ধঞ্চে প্রভৃতি সবুজ শস্যের (green crops) চাষ করিয়া সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। ভূমি কর্ষণেও ভূমির দোষ কাটিয়া যায়। উদ্ভিদ কর্ষিত ভূমিতে শিকড় চালাইতে পারে। অনেকখানি ভূমির উপর শিকড় চালাইতে পারিলে কম জল সরবরাহেও সুফল ফলিতে পারে। অর্থাৎ অধিক স্থান জুড়িয়া এক একটি গাছ থাকিলে কম জল সরবরাহে গাছগুলি যথেষ্ট রস-শোষণ করিতে পারে। ভূমিতে গাছের শিকড় প্রবেশ করাইবার কোনও অসুবিধা থাকিলে তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে। ভূমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে এবং নিম্নস্তরে সার প্রয়োগ করিতে হইবে। ভূমিতে অন্ন কারণে জল দাঁড়াইলে নালা কটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। ভূমির উপরের স্তরের মাটী গুঁড়া হইলে কৈশিকার্ষণ দ্বারা জল উবিয়া যাইবার পথ রোধ হয় এবং উপরের মাটি চূর্ণ হইলে নিম্নস্তরগুলি সূর্য্য কিরণ হইতে রক্ষা পায় এবং ভূমিও বেশ সরস থাকে। ভূমিতে পুনঃ পুনঃ নিড়ান দিলে ও মাটি হস্তদ্বারা গুঁড়াইয়া চালিয়া দিলে জল সংস্থানের স্বল্পতা তত অনুভূত হয় না ও তত মারাত্মক হয় না। এজন্য বিলাতের কৃষকগণের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে "Hoe is the best watering can." অর্থাৎ নিড়ানই জল সরবরাহের শ্রেষ্ঠ উপায়। যে সকল স্থানে অল্প বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টির পরই কৃষকেরা লাঙ্গল চালাইয়া কৃষিযোগ্য ভূমির উপরের কঠিন স্তরকে ভাঙ্গিয়া দেয় ও মৈ দ্বারা চাপিয়া দেয়। ইহাতে উপরের গুঁড়া মাটি আবরণের ন্যায় হইয়া নিম্নস্তরগুলিকে রস সংরক্ষণে সাহায্য করে।

বায়ু-চলাচল—ভূমিতে জল জমিয়া থাকায় যত অপকার হয় বায়ু চলাচলের মুক্ত পথ না থাকিলে তাহার অধিক অপকার হইয়া থাকে। গাছ শিকড় দ্বারা খাদ্য আহরণ করে। উদ্ভিদের খাদ্য অধিকাংশ সময় মৃত্তিকায় নিহিত থাকে, তবে কোন মৃত্তিকায় কম, কোন মৃত্তিকায় অধিক। খাদ্য বস্তু কম থাকিলে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু উদ্ভিদ সূক্ষ্মশিকড় দ্বারা রস ব্যতীত অন্য কিছুই টানিয়া লইতে পারে না। উদ্ভিদের খাদ্যগুলিকে সেই জন্য জল সংযোগে রস রূপে পরিণত করিতে হয়। খাদ্য বর্ত্তমান থাকিলেও জলাভাবে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। আবার বায়ুরও আবশ্যক; বায়ু জল, উত্তাপ একত্র মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল খাদ্য বস্তুকে উদ্ভিদের গ্রহণীয় অবস্থায় আনিয়া দেয়। এই জন্য কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকাভ্যন্তরে বায়ু ও উত্তাপের প্রবেশ পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হয়। উদ্ভিদ পত্র দ্বারাও বায়ুমণ্ডল হইতে অঙ্গার বাষ্প গ্রহণ করে।

এইহেতু যেমন জলের সংস্থান আবশ্যক তেমনি বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আবশ্যক। মাটীতে চূণ দিয়া অথবা নালা কাটিয়া, কর্ষণ এবং অপরাপর কৌশল দ্বারা যে কেবল ভূমিরই উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে; বায়ু সরবরাহেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে।

শীতাতপের পরিমাণ।—ভূমির সহিত তাপের পরিমাণ ভূমিস্থ জলের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ইহার সাধারণ তাপ এবং স্থানীয় তাপ প্রায়ই এক এবং বায়ুর উষ্ণতার সহিত ভূমির উষ্ণতায় অধিক পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ভূমির উপর অৰ্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত স্থান দিবাভাগে বায়ুর উষ্ণতার অপেক্ষাও শীতল হইয়া থাকে। ভূমির সামান্য নিম্নেও তাপের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণ বায়ুর যতটা উত্তাপ সেই স্থানের ভূমিরও ততটা উত্তাপ। ভূমির ছয় ইঞ্চি নিম্নে উত্তাপের পরিমাণ আরও অল্প। উত্তাপ, শুষ্ক ভূমির মধ্য দিয়া সহজে পরিচালিত হয় না এবং সূর্য্য কিরণের অধিক তেজ না হইলে নিম্নস্তরের ভূমিতে উত্তাপ পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু আদ্র ভূমিতে উহা অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতে পারে। স্থানান্তরে পরিচালিত হইলে উত্তাপের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্য কিরণে কেবল উপরের স্তর উত্তাপিত হয় কিন্তু আদ্র ভূমিতে সকল স্তরেই শীতাতপের পরিমাণ সমান। এপ্রিল মাসের বৃষ্টিতে নিম্নস্তরে জল প্রবেশ করে বলিয়া ঐ স্তরগুলি সহজ উত্তাপ পাইয়া থাকে; কারণ, আদ্র ভূমিতে উত্তাপ সহজে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে। শীতকালের বৃষ্টিতে নিম্নস্তরের সঞ্চিত উত্তাপ সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আপেক্ষিক উত্তাপের (Specific heat) তারতম্য একটী আবশ্যকীয় উপাদান। আর্দ্র ভূমিতে এক ডিগ্রি উত্তাপ বাড়াইতে শুষ্ক ভূমি অপেক্ষা পাঁচগুণ উত্তাপ আবাশ্যক। এজন্য পরিমিত উত্তাপ আর্দ্র অপেক্ষা শুষ্ক ভূমিকে অধিক উত্তাপিত করিতে পারে।

উপরিলিখিত নিয়ম ব্যতীত আর একটী কারণে ভূমি শীতল থাকে। জলকে বাষ্প

করিবার জন্য উত্তাপ আবশ্যক। এজন্য যখন ভূমি নীরস থাকে তখন বাষ্প উৎপাদিত হয় না সুতরাং ভূমি অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে।

ভূমিকে উষ্ণ করিবার জন্য নানা উপায়ের বিধান করা যাইতে পারে। ভূমিতে উত্তাপ কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে উহাকে উন্নত করিয়া দক্ষিণমুখী করিতে হইবে; অথচ উন্নত ভূমির অংশ পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিবে। সঞ্চিত উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভূমিতে ঝুল ছড়াইয়া দিতে হয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত জলকে নালা কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। ফুলের চাষ করিতে হইলে এই সকল বিধান অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তবে সাধারণ কৃষকের পক্ষ ইহার দুই একটী নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করিলেই যথেষ্ট। ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ এই সকল নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করিয়া অনেকে উপকার দর্শাইয়াছে।

খাদ্য সরবরাহ—গাছের আহার সাধারণতঃ ভূমিস্থিত জীবজ রসায়নিক ও খনিজ উপাদানের উপর নির্ভর করে। ভূমির মধ্যে অকেজো দ্রব্যেরই ভাগ অধিক। উহা গাছের কোনও উপকারে আইসে না। গাছের আহার তরল পদার্থ—রস এবং প্রতিক্রিয়াপ্রবণ (Reactionary) পদার্থের মধ্যে ইহা পাওয়া যায়। ভূমিতে চূণ (Calcium carbonate) বর্ত্তমান থাকিলে গাছের খাদ্য বস্তু আহারোপযোগী হইবার সুবিধা হয়। ইহার ঠিক কারণ আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

ক্ষেত্রে সার দিলে গাছের আহার বর্দ্ধিত হয়। যবক্ষারজান উদ্ভিদের একটি খাদ্য, ভূমিতে যবক্ষারজানের Nitrogen পরিমাণ—'সোডার যবক্ষার দ্রাবকীয় লবণ (Nitrate of soda Sulphate of amonia), * প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে অথবা শুঁটীধারী শস্যের চাষ করিলে মৃত্তিকার যবক্ষারজান বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। যবক্ষারজানের পরিমাণ কমিয়া গেলে ভূমির অনেক ক্ষতি হয়। এজন্য উপরোক্ত কোন না কোন একটা দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যবক্ষারজানের মাত্রা কমিয়া আসিতেছে, উহা আর কতদিন চলিবে ইহাই এক্ষণে একটা গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইদানীং, বায়ুস্থ যবক্ষারজান হইতে উহা প্রস্তুত করিবার জন্য পরীক্ষা হইতেছে এবং পরীক্ষা অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং এইরূপে যবক্ষারজান অভাবের ভয় অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে।

ভূমিতে হাড়, গুয়ানো † Slag (অগ্নিদগ্ধ ধাতুর পরিত্যক্ত মল) প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে ফস্ফরিকাম্লের (Phosphoric acid) পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। ফস্ফরিকাম্ল

---

* Amonia—এমোনিয়া এক তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট গ্যাস বিশেষ।

† গুয়ানো এক অত্যুৎকৃষ্ট সার। ইহা পক্ষীর মল। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্র ও নদী উপকূলে পাওয়া যায়।

ফস্ফেটে পরিণত, না হইলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলেই ভূমিতে ফস্ফেট এত অল্প থাকে যে উহাতে গাছের কোনও উপাকারই হয় না। এজন্য প্রায়ই ভূমিতে উহা প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু ইহার অল্পতা, যবক্ষারজানের অপ্রতুলতার মত তত মারাত্মক নহে। সর্ব্বত্রই ভূমির ফস্ফেট ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং এই ক্ষয় পূরণ করা আমাদের ক্ষমতার অসাধ্য। পৃথিবীর প্রস্ফুরস্ (Phospohorus) এক রতিও বাড়াইতে পারা যায় না অথচ প্রতি বৎসর ইহা সহস্র সহস্র মণ ভূমি হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি কোনও কালে প্রস্ফুরস্ পৃথিবী হইতে নিঃশেষিত হইয়া যায় তবে উহাও এক কঠিন সমস্যায় দাঁড়াইবে। কিন্তু অধিক ভয়ের কারণ নাই কারণ পৃথিবীস্থ ফস্ফেট সরবরাহ বহুদিন চলিবে। অধিকন্তু ক্ষেত্র হইতে যে ফস্ফেট ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা বাহিত হইয়া সাগরে নীত হইয়া থাকে। এজন্য ভূমিস্থ ফস্ফেট নিঃশেষিত হইয়া গেলে আমরা সমুদ্র হইতে কতক পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারিব।

ভূমিস্থ পোটাস্ সার (Potassium Chloride, Potassium Sulphate) সাধারণ কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও উত্তম চাষের পক্ষে অতিরিক্ত পোটাস্ সার অধিক পরিমাণে আবশ্যক। খড়িযুক্ত ভূমিতে অথবা সামান্য বালুকাময় ভূমিতে সামান্য গাছ জন্মাইতেও পোটাস্ সার নিতান্ত আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে পোটাস্ সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভ হইতে পোটাস্ সার কতক পরিমাণে তোলা যাইতে পারা যায়। মটর মসুর মুগ প্রভৃতি শুঁঠিধারী শস্য চাষে ইহা অতিব আনুকুল্য হয়। কাষ্ঠ কিম্বা গোময় ভস্ম, কাইনিট খনিজ পটাস হইতে পটাস সংগ্রহ করা যায়। চূণও পরোক্ষ ভাবে মৃত্তিকার সার। চূণ প্রয়োগে ভূমির আমোনিয়া ও পটাস বিযুক্ত হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়। চূণ প্রয়োগে আটাল মাটি নরম হয় এবং নরম বেলে মাটি অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়া চাষের উপযুক্ত হয়। চূণ প্রয়োগে ভূমিস্থ উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থের পচন ক্রিয়ার সহায়তা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, শস্য কাটিবার পর গাছের যে অংশটুকু পড়িয়া থাকে তাহা পচিয়া ক্রমে সারে পরিণত হয়। এই পচন কার্য্য ভূমিস্থ Calcium carbonate অর্থাৎ চূণের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় স্বভাবতই চূণ থাকে। চূণের অভাব হইলে পূরণ করিতে হয়।

গাছের সহিত ভূমির সকল সম্বন্ধ একপ্রকার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এখন দেখাইব যে, মাটিতে যে পরিমাণে জল থাকিলে গাছের সুবিধা হয়। ভূমিস্থ উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ জল সংযোগে পচিবার সহায়তা হয়, উহা পচিয়াই গাছের আহার রসরূপে পরিণত হয়।

গাছের আহারের সহিত জল-সরবরাহের সম্বন্ধ এই যে খাদ্যকে জলদ্বারা তরল করিলে তবে উহা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিতে পারে। গাছের শিকড়ের কঠিন পদার্থ

গ্রহণ করিবার শক্তি নাই। শিকড় কেবল তরল পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। উহারা অধিক তেজবান পদার্থ তরল ভাবেও গ্রহণ করিতে অক্ষম। ক্ষার পূর্ণ ভূমিতে গাছের অনিষ্ট হইতে পারে। জল ও চুণ সংযোগে উহার প্রতিকার হয়।

কেবল ইহাই নহে। ভূমিতে আহার উপযুক্ত দ্রব্য আছে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। গাছের শিকড় কতদূর পর্য্যন্ত ভূমি ভেদ করিতে সক্ষম তাহাও দেখিতে হইবে।

শিকড় বিস্তারের সুবিধা—শিকড় পূর্ণভাবে বিস্তার করিতে না পারিলে গাছ ভালরূপ জন্মিতে পারে না কারণ তাহা হইলে জল ও খাদ্য পাইতে গাছের অসুবিধা হয়। অল্প দিন হইল পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যদি একজাতীয় শিকড়ের সহিত ভিন্ন জাতীয় গাছের শিকড় জড়িত থাকে তাহা হইলে দুই গাছেরই অনিষ্ট হয়। বিলাতে Woborn নামক স্থানে Pickering সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একস্থানে ঘাস এবং ফল-গাছ একত্র জন্মাইতে দেওয়াতে ফলগাছের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শস্য-ক্ষেত্রে আগাছা জন্মাইতে দিলে শস্যের অনেক অপকার হইয়া থাকে।

অহিতকর পদার্থের প্রভাব—খাদ্য এবং জল সরবরাহের যতই সুবন্দোবস্ত থাকুক না কেন ভূমিতে অহিতকর পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে গাছের পূর্ণ বৃদ্ধি হয় না। ইংলণ্ডে এই সকল বিষয়ে তত লক্ষ্য করা হয় না কিন্তু যুক্ত-রাজ্যে ইহা লইয়া নানা যুক্তি তর্ক ও পরীক্ষাদি চলিতেছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারা যায়, যে আর্দ্র ভূমিতে গাছের পক্ষে অনিষ্টকর পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এই সকল পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প। কিছুকাল ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই সকল পদার্থকে অম্ল বা acid নামে খ্যাত করা হইতেছে। অতএব আমরাও পারিভাষিক নাম গ্রহণ করতঃ সেই সকল ভূমিকে অম্ল বা 'Sour' বলিব। এই অম্লতার যাহাই কারণ হউক না কেন ইহা পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করিলে এবং উত্তমরূপে চাষ করিয়া সে দোষ দূর করা যাইতে পারে। চুণ সংযোগেও অম্লাক্ত ভূমির দূষিত অবস্থা কাটিয়া যায়।

এরূপ অনেক স্থলে ঘটিয়াছে যে ভূমিতে লৌহ বা (manganese) * মাঙ্গানেসের পরিমাণের আধিক্য হওয়াতে ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলেও পয়ঃপ্রণালী এবং উত্তম চাষ দ্বারা সুফল ফলিয়াছে।

ক্ষার দ্রব্য পূর্ণ ভূমি তরল ক্ষারের মাত্রার অধিক্য হেতু অনুর্ব্বর হইয়া থাকে।

* ম্যানগানীস্—ইহা একপ্রকার ভঙ্গুর ধাতু বিশেষ। ইহার রং সীসার ন্যায় কাল এবং কাঠকয়লার মতন দেখিতে।

সোডাজনিত ক্ষারের (Sodium) মাত্রা অধিক হইলে (gypsum) প্রয়োগ করতঃ সে দোষ দূরিভূত করা যাইতে পারে।

উর্ব্বরতা বৃদ্ধির উপরোক্ত উপাদান সকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ আছে। জল-সরবরাহ, বায়ু-সরবরাহ এবং শীতাতপের পরিমাণ ইহারা পরস্পরের সহিত ঘন সম্বন্ধ এবং ইহার কোনটীর অসামনবস্ত হইলেও গাছ পূর্ণ আহার পায় না। মোটের উপর তিনটী উপাদান ও জল-সরবরাহ হইলে এবং মৃত্তিকায় চুণের নিঃস্বতা অনুভূত না হইলে বৃক্ষ, লতা গুল্মাদি সতেজে বাড়িতে থাকে এবং শিঘ্রই ফলবান হয়।

শসা

শসাকে উদ্ভিদ্-জগতে শসাকীজাতি (Cucurbilacese) কহে।

লাউ কুমড়া এই জাতির অন্তর্ভূক্ত।

লাউ, কুমড়া, শসা, জাতীয় উদ্ভিদকে দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়— এক শ্রেণীর শসা কুমড়া লাউ পালাতে বা বাঁশের কঞ্চির মাচাতে তুলিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালেই এই উপায়ে তাহাদের চাষ করিতে হয়। বর্ষাকালে লাউ, কুমড়া বা শসা মাটিতে ফলিতে পারে না, ফল ফুল ভিজা মাটির উপর অধিক দিন থাকিলেই পচিয়া যায়। রসা মাটির উপর গাছও জোর করে না। এই শ্রেণীর শসা পালায় জন্মায় বলিয়া উহাকে পালা শসা বলে। অন্য শ্রেণী ভুঁই শসা ভুঁয়ে হয় গাছ জমিতে লতাইয়া যায়। জমিতে লতাইবার সময় মাঝে মাঝে গাঁইট হইতে শিকড় ছাড়িয়া নিজের দেহের আয়তন ও তেজ বাড়াইয়া লয়। এই কারণে তাহাদের স্বাভাবতঃ ফল বেশী হয় গাছটি আয়তনে কিছু বাড়িলেই প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে ফুল ফুটিতে থাকে এবং ফল উৎপন্ন হইয়া জমির উপর শায়িত অবস্থায় বাড়িতে থাকে।

শসা গাছে পুরুষ অথবা স্ত্রী দুই প্রকার ফুল উৎপন্ন হয়। স্ত্রী পুষ্পগুলিই ফলবতী হইয়া থাকে, পুং পুষ্পের কার্য্য কেবল পরাগ নিষেক দ্বারা স্ত্রী পুষ্পের গর্ভাধান করা। পুং স্ত্রী দুই প্রকার ফুলই এক গাছেই ফুটিয়া থাকে কিন্তু তথাপি পুং পুষ্প স্ব-ইচ্ছায় আসিয়া স্ত্রী পুষ্পে সঙ্গত হইতে পারে না। অধিকাংশ সময় বায়ু, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা আদি কীটদ্বারা পরাগ নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কখন কখন পরাগ নিষেক কার্য্য সম্পূর্ণ না হইয়া আংশিক সম্পাদিত হয় বলিয়া ফল উৎকৃষ্ট বা পুষ্ট হয় না কখন বা ফল কচি অবস্থায় শুকাইয়া কিংবা পচিয়া নষ্ট হয়। মানুষে চেষ্টা করিয়া ইহার প্রতিবিধান

করিতে পারে। প্রস্ফুটিত পুং পুষ্প তুলিয়া লইয়া স্ত্রী পুষ্পে পরাগ নিষেক করিতে পারিলে ফলের উন্নতি বিধান হয় ও ফল ঝরা বা পচা নিবারিত হয়। অধিকন্তু মানুষ মনে করিলে দেশী ছাঁচি কুমড়ার সহিত শসার কিম্বা বিভিন্ন প্রকার শসার বর্ণ সঙ্কর (Genus Hybride) এবং ভেদ সঙ্কর (Varity Hybride) করিয়া বিভিন্ন আকৃতি ও গুণ বিশিষ্ট রকম ওয়ারি শসার সৃষ্টি করিতে পারে।

শসা চাষের কাল—পালা শসা বর্ষাকালে হয়। ভুঁই শসার বৎসরে তিন বার আবাদ হয়। ভাদ্দুরে শসা—বীজ বপনের সময় আষাঢ়ের শেষ, শ্রাবণের প্রথম, ফল হইবে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ; কার্ত্তিকী শসা—বীজ বপনের সময় কার্ত্তিক মাস, ফলিবে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ; চৈতে শসা—বীজ বপনের সময় চৈত্রের শেষ বৈশাখের প্রথম, ফলিবে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ।

পালা শসা অনেক রকমের আছে তাহার মধ্যে আমরা দেশী ও এমেরিকান দুই রকম শসার চিত্র ও বিবরণ দিলাম।

শাদা ডোরা পালা শসা—এই শসা গোবিন্দপুরক্ষেত্রে ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়াছিল। যেমনি লম্বা হয় তদনুরূপ মোটা হয়। এমন শসা বাজারে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ খুব তেজে বর্দ্ধিত হয়, পাতা চওড়া হয়, সবুজ এবং মনে হয় যে এই গাছ বিশেষ তাত বাত সহিষ্ণু। ইহার ফলন অধিক প্রত্যেক গাঁইটে ফুল ধরে এবং প্রত্যেক ফুলে ফল ধরে একটা ফুলও ব্যর্থ যায় না। ফলগুলি কচি অবস্থায়ও সুস্বাদু। তিন ইঞ্চ বড় হইলেই খাওয়া চলে। দেড় মাসের মধ্যে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। পাকিয়া পাঁড় হইতে আরও ১০।১৫ দিন সময় অতিবাহিত হয়। গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে এই শসার বীজ বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। পাকা শসাকে চলিত ভাষায় পাঁড়শসা বলে। পাঁড়শসা হইতে বীজ বাহির করিয়া লইয়া ছাড়াইয়া কুটিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। বীজগুলি ভবিষ্যত চাষের জন্য রক্ষা করা হয়।

এমারগু শসা—ইহা এমেরিকা হইতে আনিত। এ গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে এক্ষণে ইহার বীজ তৈয়ারি হইতেছে। শসাগুলি ৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। রঙ গাঢ় সবুজ বর্ণ। তুলিবার এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত রঙ ঠিক থাকে সুতরাং দুরদেশের বাজারে বিক্রয়ার্থে পাঠাইবার পক্ষে সুবিধা হয়। ফলের গায়ে অন্যান্য শসার ন্যায় ডিম ডিম কাঁটা থাকে না। ইহার গায়ের ডোরাগুলির বর্ণ পাটল। ইহাও পালা শসার জাতি। গাছ শিঘ্র বাড়িয়া উঠে। পাতা নরম ও লাউ পাতার মত মসৃণ ও ভেলভেটী (Velvety)। ইহাতে বীজ খুব অল্প জন্মায় এই জন্য ইহার বীজ খুব দামী। ২০।২৫টা শসা বীজের ১ প্যাকের দাম ।০ আনা।

ভুঁই শসা অধিকাংশ লম্বাকৃতি, ছয়, আট বা দশ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কোনটি সরল সোজা কোনটি বা ইষৎ বক্রাকৃতি, প্রায় গোলাকৃতি এক রকম ভুঁইশসা আছে, ইহা কাঁচা ও কচি অবস্থায় ফলের মত খাওয়া চলে না ইহাকে পাকাইয়া পাঁড়" করিয়া রাখিয়া খাইতে হয়।

শাদা ডোরা পালা শসা

পালা অপেক্ষা ভুঁই শসার ফলন অধিক এবং ভুঁই শসা চাষে লাভও অধিক হইয়া থাকে। পালা শসার জন্য মাচা বাঁধিতেই অনেক খরচ হয়। চাষী মাত্রেই ভুঁই শসার চাষ করিবার জন্য অধিক সমুৎসুক। যদৃচ্ছাক্রমে বীজ রক্ষা করা হয় বলিয়া প্রায়ই

আশানুরূপ লাভ হয় না। অপক্ক শসার বীজ হইতে ফসল ভাল হয় না। ক্ষেতের মধ্যে বাছা সুপুষ্ট পাড়শসা হইতে বীজ বাহির করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া লইতে হয়। যে গুলি জলে ডুবিয়া যাইবে সেই বীজই পুষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে ভাল ভুঁইশসা বীজও উৎপন্ন হইতেছে। চাষীরা ভাল বীজের মর্ম্ম ক্রমশঃ বুঝিতেছে। তাহারা ১ একসের বীজ ১৬৲ টাকা দাম দিয়া কিনিতেছে। এক বিঘা জমিতে শসা চাষ করিতে প্রায় আধসের বীজের আবশ্যক হয়। বীজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বপণ করিতে হয়। গাছ জন্মিলে সতেজ গাছগুলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। এই কারণে ঠিক প্রয়োজন অপেক্ষা কিছু অধিক বীজ বপণের আবশ্যক। একটা নিস্তেজ গাছ বহুযত্ন-সত্বেও যে ফল প্রসব করিবে সতেজ গাছ অল্প যত্নে তদপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক ফলদায়ী হইবে।

এমারেণ্ড শসা।

গোবিন্দপুর ক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্ষেত্রের চাষীরা অন্য সার না দিয়া বিঘা প্রতি ১ মণ শরিষার খৈল ব্যবহার করিয়া খুব ভাল শসা ফলাইতে পারিয়াছে আমরা দেখিয়াছি। তাহারা শসা চাসের সময় অন্য সার না দিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী চাষের ক্ষেতে রীতিমত মাটি ছড়ান ছিল বলিয়া পটাস, ফস্ফরিক অম্ল ও চূণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বাকী সারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শসার ব্যঞ্জন—কচি শসা লেবুর রস লবণ ও কিঞ্চিৎ শর্করা সংযোগে চাটনি অথবা ভিনিগার সংযোগে শসার সস্, এবং পাকা শসার ব্যঞ্জন অতি উপাদেয় খাদ্য। দেবসেবা কিম্বা মানুষের আহার্য্য ফলের মধ্যে শসা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আখ শসা কলা নৈবিদ্যের প্রধান অঙ্গ। শসা কলা বারমাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে ইতর ভদ্র সকলেই শসা খাইতে পাইলে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

শসার জমি ও শসার সার—দোঁয়াস জমিতে শসা চাষ করিয়া তাহাতে শুষ্ক আঁটাল মাটির সার দিতে পারিলে শসার চূড়ান্ত ফলন হইবে। শসার জমিতে জল বশিবে না, একটিও আগাছা কুগাছা থাকিবে না, ক্ষেতে গাছ ঘন হইবে না, এক একটা মাদায় দুইটির অধিক গাছ থাকিবে না এবং মাদাগুলি ৬ ফিট ব্যবধানের কম হইবে না তবে শসা ভাল ফলিবে। অনেক চাষী ক্ষেত চষিয়া হাতে ছড়াইয়া শসা বীজ বপন করে। ইহাতে অনেক বীজ নষ্ট হয় কারণ গাছ ঘন হইলে তুলিয়া ফেলিতেই হইবে। কোদাল দ্বারা মাটি চালিয়া মাদা বাঁধিয়া দিবার সময় গাছ লাইন বদ্ধ না হইয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকায় অসুবিধা হয় সারি বদ্ধ বীজ বপণ করাই কর্ত্তব্য। শসা ক্ষেতে বিঘা প্রতি ৩০০ শত ঝুড়ি পাঁকমাটি ছড়ান আবশ্যক। পাঁকমাটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাস ও ফস্ফরিক অম্ল থাকে। শসা ক্ষেতে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ১২ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৩২ পাউণ্ড পটাস, ৩২ পাউণ্ড ফস্ফরিকাম্ল প্রয়োগ বিধি। নাইট্রোজেনের জন্য আধমণ শরিষার খৈল, ফস্ফরিকাম্লের জন্য ১ মণ বোন সুপার ও পটাসের জন্য অন্তত ২০ ঝুড়ি ছাই প্রদান করিলে শসা ক্ষেত্রে সারের মাত্রা সম্পূর্ণ হইবে ও শসাও পূর্ণ মাত্রায় ফলিবে। এক বিঘাতে ৪০০ শত শসার মাদা ধরিবে এবং তাহা হইতে ৬০০ শতের অধিক গাছ ক্ষেত ছাইয়া ফেলিবে এবং সব গাছ পূর্ণ মাত্রায় ফলিলে ১০০ মণ ওজনের শসা উৎপন্ন হইতে পারে, ন্যূনকল্পে ফলন ৫০ মণের কম হইতে দেওয়া উচিত নহে কারণ তাহা হইলে খরচ ও পরিশ্রম পুষাইবে না। শসার যত্ন পাইট ও খরচ অধিক। ভুঁইশসা ক্ষেত তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয় এবং ক্ষেতের মাঝে টঙ বাঁধিয়া তাহাতে রাত্রযাপন করিয়া শসা ক্ষেত চৌকি দিতে হয় নতুবা শিয়াল, সাজারু, বরাহ শসা ক্ষেতে পড়িয়া বিস্তর তছরূপ করিবে। জাল দেওয়া সত্বেও শিয়াল গর্ত্ত কাটিয়া ও সুড়ঙ্গ কাটিয়া ক্ষেতে প্রবেশ করে। সাজারু সুড়ঙ্গ কাটাছাড়ায় উপায় নাই, বরাহ বেড়াভাঙ্গিয়া আসে।

পালাশসা শেয়াল খরগস্ প্রভৃতি জন্তুতে খাইতে পারে না কিন্তু ভুঁই শসা তারের জাল দিয়া না ঘিরিলে বা ক্ষেতের মাঝে বাসা বাঁধিয়া রক্ষা না করিলে জন্তু জানোয়ারে সব খাইয়া ফেলিবে। তারের জাল কিছু বৎসর বৎসর কিনিতে হয় না, এক বৎসর জাল কিনিলে ১০ বৎসর সেই জালে চালান যায়। জাল ভাড়াও পাওয়া যায়। তথাপি দেখা যায় যে বিঘা প্রতি ৩০৲ টাকা খরচের কম শসা চাস উঠে না। শসা চাষ এক সঙ্গে তিন বিঘা জমিতে করা বিধেয় কারণ তাহা হইলে খরচের অনুপাতে কিঞ্চিৎ কম হয়। এক বিঘা শসা ক্ষেত ঘিরিতে যে খরচ ৩ বিঘা ঘিরিতে খরচ দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু বেশী কিন্তু ৩ গুণ নহে। এক বিঘা ক্ষেত চৌকিদিবার যে খরচ ৩ বিঘা চৌকিদিবার

সেই খরচ। এইরূপে ক্ষেতে সার ছাড়ান, নিড়ান, জলসেচন, শসা তোলা প্রভৃতি খরচ কিছু কিছু বাঁচিয়া যায়।

শসা ক্ষেতে পোকা—শসা ক্ষেতে পোক লাগিলে মহা বিপদ। শসা ক্ষেতে লাল, কাল জোনাকী পোকার মত ছোট এবং উহা অপেক্ষা কিছু বড় কঠিন পক্ষ পোকার উৎপাত হয়। ইহারা গাছের পাতা খাইয়া ক্ষেত উৎসন্ন করে।

প্রতিকার—পোকা ধরা ও মরা, রাত্রে ক্ষেতের মাঝে মাঝে আলো জ্বালাইয়া রাখিলে আলোর সন্নিহিত গাছের উপর অধিকমাত্রায় পোকা আসিয়া জমে তখন এক সঙ্গে অনেক পোকা মারার সুবিধা হয়। ভারতীয় কৃষি সমিতি এক প্রকার Insect killer (কীট নিবারক আরক) বিক্রয় করেন তাহা প্রয়োগে উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে। ইহা পোকার এক প্রকার গায়ের বিষ। ইহাতে কঠিন পতঙ্গ সহজে না মরিলেও ডাঁটা পাতায় এই আরোকের গন্ধ হইলে পোকারা ক্ষেত ছাড়িয়া পালায়।

শসা, লাউ, কুমড়া চাষের জন্য "সব্জী চাষ" নামক পুস্তক খানির সাহায্য পাইতে পারেন এবং পোকার প্রতিকার "ফসলের পোকায়" পাইবেন।

——:*:——

কৃত্রিম রেশম

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কৃত্রিম রেশম যে স্থানে বাছাই হয়।

কাশীতে সুলভ মূল্যে এক প্রকার রেশমের কাপড় ও চাদর বিক্রীত হয়। ইহাকে "কাশীসিল্ক" বলে। ইহা প্রকৃত কি, সে বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারে নাই। একজন আমাকে বলিয়াছিল যে, ইহা রিয়া গাছের আঁশ। রিয়া গাছের আঁশ রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল বটে, কিন্তু কাশী-সিল্ক তাহা নহে।

এই রিয়া গাছ লইয়া ভারতবর্ষে অনেক কাণ্ড হইয়াছে। এ গাছের বাসস্থান দাক্ষিণ চীন। নিকটস্থ অন্যান্য স্থানেও ইহা জন্মে। সে স্থানের লোকে ভোঁতা ছুরি দিয়া উপরের ছাল চাঁছিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণের উজ্জ্বল পাট বাহির করে। এই পাট দেখিতে রেশমের ন্যায়, ইহার কাপড়ও রেশমি কাপড়ের ন্যায়। তবে অবশ্য প্রকৃত রেশমের ন্যায় তত সুন্দর নহে।

ভারতবর্ষে যাহাতে এই গাছের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, সে সম্বন্ধে গবরমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম কলিকাতার ও-পারে শিবপুরের উদ্ভিদ্ উদ্যানে ইহার চাষ হইয়াছিল। সেস্থানে গাছ সতেজে জন্মিয়াছিল। তাহার পর সাহারণপুরের উদ্যানে ইহা রোপিত হইয়াছিল। সেস্থানেও গাছ উত্তমরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অনেক জেলখানায় ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। চা-বাগানের সাহেবরাও ইহাকে লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গাছ সর্ব্বত্রই উত্তমরূপে জন্মিয়াছিল। কিন্তু গোল ঘটিল আঁশ বাহির করা সম্বন্ধে। চীন দেশে ছুরি দ্বারা উপরের ছাল চাঁছিয়া যে ভাবে লোকে ভিতরের আঁশ বাহির করে, ভারতবর্ষে তাহা করিতে পারা গেল না। অন্ততঃ খরচ এত অধিক পড়িল যে, তাহাতে পোষায় না। অবশেষে কলের দ্বারা যাহাতে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, গবরমেণ্ট সে বিষয়ে চেষ্টা করিলেন।

রিয়া গাছের ডাঁটা হইতে একমণ পাট যাহাতে পনের টাকা খরচে বাহির হইতে পারে, এরূপ কল যে উদ্ভাবিত করিতে পারিবে, তাহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে, গবরমেণ্ট এইরূপ ঘোষণা করিলেন। পুরস্কারের লোভে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার কল আসিয়াছিল। সাহারণপুরে সেই সমুদয় কলের পরীক্ষা হইয়াছিল। আমি সেই পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলাম। জব দ্বীপ হইতে আয়াটন নামক সাহেব অতি সুন্দর এক কল আনিয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় জল লইবার জন্য যে বোম্বা থাকে, কলটী বাহির হইতে দেখিতে সেইরূপ। যে গাছে আঁশ আছে, সেই গাছের শুষ্ক ডাঁটা তুমি কলের উপরে দাও। যন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ সে ডাঁটা ভিতরে চলিয়া যায়। তাহার পর অভ্যন্তরে যন্ত্রকৌশলে সেই ডাঁটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চাঁছিয়া ছুলিয়া কাষ্ঠ ভাগ পরিত্যক্ত হইয়া তাহা হইতে শুভ্র আঁশ কলের নিম্নে আসিয়া বাহির হয়। কলটি সুন্দর বটে, কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে গঠিত যে, পরীক্ষার সময় ইহা সর্ব্বদাই বিকল হইতে লাগিল। এত সূক্ষ্ম কল লইয়া এরূপ কাজ চলে না। ফল কথা, সে পরীক্ষায় কোন কল পুরস্কার লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইল না।

ইহার কয়েক বৎসর পরে আর একবার নানারূপ পাট বাহির করিবার কল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গবরমেণ্ট আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলিপুরের চিড়িয়াখানার নিকট এক বাষ্পীয় কল বসাইয়া তাহার বলে পরিচালিত করিয়া আমি ও আমার বন্ধু লিওটার্ড সাহেব অনেক যন্ত্র পরীক্ষা করিয়াছিলাম। অনেকগুলি যন্ত্র রচনার কৌশল অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু কাজে খরচ পোষায় না। আসাম শিবসাগর হইতে একজন ভদ্রলোক রিয়া গাছ সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। আক-মাড়া কলের ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের ভিতর দিয়া ডাঁটা বার বার দিয়া তিনি আঁশ বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই এক কথা—খরচ পোষায় না। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও যখন এদেশে রিয়া গাছ হইতে সুচারুরূপে পাট বাহির হইল না, তখন গবরমেণ্ট এ চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। আমার মতে

ভারতবর্ষের ভূমির গুণে এ স্থানে উৎপাদিত রিয়া গাছে অধিক শাঁস ও আটা জন্মে। সেই শাঁস ও আটা হইতে সহজে আঁশ পৃথক্ করিতে পারা যায় না। ফরাসি দেশে লোকে রাসায়নিক দ্রব্য গুণে শুষ্ক রিয়া গাছ হইতে রেশমের ন্যায় আঁশ বাহির করে। এই শুষ্ক রিয়া ডাঁটা তাহারা আফ্রিকা হইতে আমদানি করে। কিন্তু কি কি রাসায়নিক দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করে ও কি রূপে প্রয়োগ করে, তাহা আমরা জানি না। যাহারা আবিষ্কার করিয়া অর্থ লাভ করিতেছে, তাহারা অন্য লোককে বলিবে কেন ?

যাহা হউক, আমার বিবেচনায় কাশী সিল্ক রিয়া আঁশ নহে। ইহা কৃত্রিম রেশম। কাষ্ঠকে চূর্ণ করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিয়া লোকে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করে। কাষ্ঠ পিণ্ডহইতে অনেক কাগজও প্রস্তুত হয়। কাগজ প্রস্তুতর নিমিত্ত সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক কাষ্ঠপিণ্ড বিলাতে আমদানি হইত। যুদ্ধের জন্য সে আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে জন্য কাগজের বাজারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের নিমিত্ত অনেক দিন হইতে চেষ্টা হইতেছিল। উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণিশরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সমুদয় আবশ্যকীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়, সুলভ মূল্যে কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথম তাহাদিগকে বিয়োগ করিতে হয়। বিয়োগ করিয়া দেখিতে হয় কি কি রাসায়নিক মূল পদার্থ দিয়া তাহারা গঠিত। তাহার পর সেই সমুদয় রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে, তাহাদিগকে ঘরে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এই দেখ জল। জলকে বিচ্ছিন্ন করিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটী বায়বীয় পদার্থ বাহির হয়। সুতরাং সেই দুই পদার্থের সংযোগ হইলে জল হয়। জল প্রস্তুত করা সহজ বটে, কিন্তু উদ্ভিদ্ ও প্রাণিশরীরে উৎপন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা ঘোরতর কঠিন। যাহা হউক, রাসায়নিক বিদ্যার সহায়তায় এখন অনেকগুলি বস্তু লোকে উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাসায়নিক ভাবে উৎপাদিত ম্যাজিন্টা রঙ্গের উপদ্রবে আমাদের লাক্ষা কুসুম আর মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি রঙ্গের ব্যবসা মাটি হইয়া গিয়াছে। নীলের ব্যবসাও ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল।

লোকে প্রথম রাসায়নিক ভাবে যে রেশম প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা কাষ্ঠপিণ্ড হইতে নহে। অন্যান্য পদার্থের সংযোগে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল। সে কৃত্রিম রেশম স্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা প্রস্তুত করিতে খরচ অনেক পড়িয়াছিল। সে জন্য তুলা কাষ্ঠপিণ্ড প্রভৃতি বস্তু হইতে লোকে রেশম প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। চার্ডোনেট নামক এক ফরাসী সাহেব কাষ্ঠপিণ্ড হইতে প্রথম রেশম প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার এত খরচ পড়িয়াছিল যে, চারিবার তিনি দেউলে হইয়াছিলেন। কাষ্ঠ হইতে রেশম প্রস্তুত করিতে হইলে কাষ্ঠকে প্রথম ঘন আটারূপে পরিণত করিতে হয়। তাহার পর কাচ নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম নলির মুখ দিয়া ১২ হইতে কুড়ি খেই সেই আটা বাহির করিতে হয়। আর্দ্র অবস্থায় এই কয় খেই

একত্র পাকাইতে হয়। শুষ্ক হইলে ইহাই কৃত্রিম রেশমের সূতা হয়। ইহাকে চর্কাতে জড়াইয়া অন্যান্য সূতার ন্যায় বয়নকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

কৃত্রিম রেশমের কারখানা।

কাষ্ঠ-পিণ্ডকে আটার ন্যায় করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে রেশমের ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। ফরাসি চার্ডোমেট সাহেব সোরা ও গন্ধক দ্রাবকের সার ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে এই কার্য্যে কয়বার তিনি নিস্ব হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছেন। কাষ্ঠপিণ্ডকে আটা করিবার নিমিত্ত কোন কোন কারখানায় তামা ও নিষেদলের সার ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কারখানায় কষ্টিক সোডা ও কারবনেট বাইসলফাইড প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে কৃত্রিম রেশম বারুদের ন্যায় দাহ্য পদার্থ ছিল, অল্প মাত্র আগুনের সংস্রবে "দাউ" করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে সে দোষ দূর হইয়াছে। বিদেশ হইতে আনীত অনেক বালা ও চিরুণির এখনও সে দোষ আছে। সম্প্রতি আমি একখানা চিরুণি কিনিয়াছিলাম সামান্য একটু দিয়াসলাইয়ের নির্ব্বাণপ্রায় আগুনে সে দিন তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে পদার্থ দ্বারা এই সমুদয় বস্তু গঠিত হয়, তাহাকে গান্ কটন বলে। যুদ্ধের ইহা একটী প্রধান উপাদান।

ফরাশিদেশে বেসানকন, জর্ম্মণিদেশে ফ্রাঙ্কোফোর্ট এবং সুইজারলণ্ডদেশে জুরিচ নামক নগরে কৃত্রিম রেশমের বৃহৎ বৃহৎ কারখানা আছে। এই সমুদয় কারখানায় প্রতিদিন শত শত মণ কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হয়। অন্ততঃ বর্ত্তমান মহাসমরের পূর্ব্বে হইত। এখন কি হইতেছে, তাহা আমি জানি না।

বঙ্গবাসী।

"জবা পুষ্প"

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

জবা পুষ্পের গাছ যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের উদ্যানরাজী আলোকিত করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রভাত কালীন সেই নবরসচ্ছটাকে "জবা কুসুম সঙ্কাশ" বর্ণনায় সপ্রমাণিত হয়। তদনন্তর পূজার সময় "মায়ের পদে রাঙা জবা" পুষ্প অর্ঘ্য দান করিয়া কত ভক্ত কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই প্রাচীন জবা পুষ্পের আদর এখনও সমভাবে

বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণেও গৃহস্থের প্রাঙ্গনপার্শ্বে বা উদ্যানের কোণে রক্তপুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, জবা পুষ্প সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই ইহা জন্মিয়া থাকে। চীনদেশে ইহা বহুল পরিমাণে জন্মে, এবং তথায় ইহা শিল্প-কর্ম্মে যথেষ্টপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণতঃ লাল জবাফুল দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে শ্বেত, পীত ও নীলবর্ণের জবাফুলও আছে। ইহা বঙ্গদেশে জবা পুষ্প নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইলেও স্থান ভেদে ইহার নানা নাম আছে। হিন্দীতে ওড় ফুল ও দেবা, মহারাষ্ট্রে জাসবন্দ, গুজরাটে জালুন, ইংরাজীতে শুফ্লাওয়ার, ডাক্তারি নাম চায়না রোজ ইত্যাদি।

জবা পুষ্প নানাবিধ রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "জবা সংগ্রচ্ছনী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাৎজিৎ"। অর্থাৎ জবা পুষ্প ধারক, কেশের উপকারক, ও ত্রিসন্ধ্যা জবা কফ ও বায়ু নাশক। জবা ফুল অতি স্নিগ্ধকারী। ইহার পাপড়িগুলি কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিলে জ্বর কালীন তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ঐ জল সেবনে প্রস্রাবকালীন প্রদাহ দূরীভূত হয়। জবা পুষ্প জল সেবনে স্ত্রীলোকদিগের রক্ত প্রদর পীড়া প্রশমীত হইয়া থাকে। জবার এই সকল দ্রব্যগুণ জন্য ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত জবা ফুলের বা জবা গাছের দ্বারা যে সকল শিল্প-কর্ম্ম হইতে পারে তাহা প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদ্যক গ্রন্থে জবা পুষ্প কেশের উপকারক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই জবা পুষ্পের নামে যে তৈল বিশেষ দেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও সাধারণে অবগত আছেন। যদিও জবা পুষ্প হইতে প্রত্যক্ষভাবে তৈল বাহির করিবার রীতি প্রচলিত নাই, তথাপি উহা অন্য তৈলের সংযোগে কেশের মহোপকারী তৈল হয় বলিয়া, বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন টাটকা জবা ফুলের পাপড়ির রস এবং জলপাইয়ের তৈল সমভাগে লইয়া কোন মৃত্তিকা পাত্রে রক্ষা করিবে। পরে ঐ পাত্রটী অগ্নির উত্তাপে চড়াইলে যখন জলের ভাগ শুকাইয়া যাইবে, তখন নামাইয়া লইবে, এই তৈল মর্দ্দন করিলে চুল উঠা নিবারিত হয়, প্রচুর পরিমাণে কেশোদ্গম হয় এবং অকাল পকতা নিবারিত হয়।

চীন দেশীয় চর্ম্মকারগণ জবার পাপড়ির রঙ্গে জুতার চামড়ার কাল রং করে। ইংরেজগণও এই ফুলের পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করেন। ডাক্তার বির্ডি সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ জবাফুলের পাপড়ির রসে বুট ও সু জুতা পালিশ করা চলে। এজন্য ইংরাজীতে ইহাকে "শুফ্লাওয়ার" বলিয়া থাকে এদেশেও জবা পুষ্পের কষে জুতার রং কাল করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কি উপায়ে ঐ পালিশ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা ব্যবসায়ী ও রাসায়নীকদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

জবা ফুল কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে একপ্রকার বেগুণে রং বাহির হয়।

ইহার সহিত লেবুর রস বা অন্য কোন এসিড বা অম্ল প্রক্ষেপ করিলে ইহা পুনরায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণে পরিণত হয়। পূর্ব্বে হুগলী জেলার কাগজী বা কাগজ প্রস্তুতকারীগণ এই রঙের দ্বারা কাগজের লাল রং করিত। ভ্রু এবং কেশ কাল করিবার জন্য চীন দেশবাসীগণ জবা ফুলের দ্বারা এক প্রকার কলপ প্রস্তুত করে।

জবা গাছের ছাল হইতে যে আঁশ বাহির হয়, তাহাতে পাটের ন্যায় সূত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছালের ভিতরের দিকের আঁশ হইতে যে সুতা হয়, তাহা রেশমের ন্যায় মসৃণ ও চিকণ। জবা ফুলের পুরাতন শাখাগুলি কর্ত্তণ করিয়া ফেলিলে তাহা হইতে যে নূতন শাখা বাহির হয়, তাহা কাটিয়া লইয়া আঁটি বান্ধিয়া জলে পচাইলে বেশ আঁশ বাহির হয়। রক্ত জবা অপেক্ষা শ্বেত, নীল ও পীত বর্ণের জবা গাছের বেশ সরু সরু ও সরল শাখাগুলি উত্থিত হয়। তদ্বারা এই আঁশ অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে। লাল জবা ও আবার দুই জাতীয় হয়, (১) পঞ্চদল বিশিষ্ট, (২) বহুদল বিশিষ্ট। পঞ্চদল জবাই অধিকাংশ স্থানে দেখা যায় এবং ইহার পুষ্পই মায়ের পূজায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেক সৌখীনী বাগানে চারি বর্ণের জবা পুষ্পই দৃষ্ট হয়।

জমিদারী ব্যাঙ্ক

(পত্রান্তর হইতে সঙ্কলিত)

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র প্রচার করিয়াছেন,—

সবিনয় নিবেদন,

বাঙ্গালার সমবায়-ঋণদান-সমিতি সকলের সপ্তম প্রাদেশিক অধিবেশনে এ দেশে ভূম্যধিকারীদিগের ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। সমবায়-ঋণদান-সমিতিসমূহের দ্বারা য়ুরোপের নানা দেশে যেমন লোকের উপকার সংসাধিত হইয়াছে, এ দেশেও তেমনই উপকার হইতেছে। ইহাতে সদস্যদিগের ঋণভার লঘু হইতেছে; বিশেষ কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এইরূপ সমিতির সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছে। জার্ম্মাণীতে সমবায়-নীতি পরিচালিত Landshaften নামক ব্যাঙ্ক ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ঋণগ্রস্ত ভূম্যধিকারীগণের উপকার সাধনই এইরূপ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা পাইয়া ভূম্য-

ধিকারীরা ক্রমে ঋণ শোধ করিতে পারিবেন—আবার এই ব্যাঙ্কের ব্যবস্থায় তাঁহারা মিতব্যয়ী হইবেন।

এ দেশে জমীদারদিগের মধ্যে ঋণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং তাঁহাদের অনেকেরই ঋণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের মত অনুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। এ বিষয়ে স্থানীয় অবস্থা ও অভাব বুঝিয়া, স্থানভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে হইবে—ভূমির মূল্য ও জমীদারের ঋণের প্রকৃতি বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। এ বিষয়ের বিচার জন্য যে শাখাসমিতিনিয়োগ হইয়াছিল, তাহার মতে—

(১) ভূমি ব্যাঙ্কের সদস্যদিগের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবে।

(২) কাহাকেও সম্পত্তির নির্দ্ধারিত মূল্যের ২।৩ ভাগের অধিক টাকা ঋণ দেওয়া হইবে না।

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঋণে সম্পত্তি আবদ্ধ থাকিলে, সমিতির দত্ত টাকায় সে ঋণ শোধ করিয়া দিতে হইবে; অর্থাৎ সমিতি কোন সম্পত্তি দ্বিতীয় বন্ধক রাখিবেন না।

(৪) সম্পত্তির দলিল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে এবং এক বা একাধিক উকীল সম্মতি দিলে তবে টাকা দেওয়া যাইবে।

(৫) সুদের হার শতকরা ৫॥০ টাকা হইতে ৭॥০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে—তবে ৭॥০ টাকার অধিক হইবে না; কারণ, তাহা হইলে ঋণশোধ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

(৬) ছয় মাস অন্তর বা বৎসরান্তে সুদ শোধ করিয়া যাহাতে প্রয়োজন হইলে ৬০ বৎসরেও আসল ঋণ শোধ হইতে পারে, এমন ভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) যাহাতে বন্ধকের ব্যবস্থানুসারে সম্পত্তির আয় হইতে বৎসর বৎসর সুদ দিয়া আসলের কিছু কিছু শোধ হইতে পারে, এমন ভাবে জমীদারের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৮) সম্পত্তির অধিকারী ইচ্ছা করিলে যখনই কেন হউক না, টাকা শোধ করিতে পরিবেন এবং প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্কের সম্মতি লইয়া, আবদ্ধ সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

(৯) ব্যাঙ্কের ঋণদানের সুবিধার জন্য কলিকাতা বা অন্য কোন রাজধানীতে একটি মূল ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত করিয়া, তাহার শাখা বিস্তার করিতে হইবে।

বার্ষিক ১ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেই ভূম্যধিকারীর এই ব্যাঙ্কের সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে।

এই প্রস্তাবের বিচার জন্য যে শাখাসমতি গঠিত হয়, আমার আফিসে (৪ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে) তাহার অধিবেশন হইয়াছে। আমি সে সমিতির সম্পাদকরূপে এ বিষয়ে লোকের মত সংগ্রহের ভার পাইয়াছি। এ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আপনি ৮৫ গ্রে-ষ্ট্রীটে আমাকে আপনার মত জানাইলে বাধিত হইব।

যদি এ বিষয়ে আপনার আর কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হয়, আমাকে লিখিলে তাহা জানাইব।

নবীন জার্ম্মাণীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তথায় গত ৪০ বৎসরে সর্ব্বদিকে পরিবর্ত্তন হইলেও—কৃষিপ্রাণ দেশ শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিলেও তথায় ভূম্যধিকারী সম্পদায়ের চিরগত প্রভাব ও প্রতাপ লুপ্ত হয় নাই—merchant princeদিগের আবির্ভাব হইলেও তাঁহারা দেশের শাসনযন্ত্রে ভূম্যধিকারীদিগের স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সমাজে ভূম্যধিকারীগণের সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাহার কারণ এই যে, জার্ম্মাণীতে কৃষির অবনতি হয় নাই; কৃষি অবজ্ঞাত হয় নাই; আর ভূম্যধিকারী-সম্প্রদায় দারিদ্র্যের পীড়নে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়েন নাই। কৃষির স্থানে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের যে সামাজিক পরিবর্ত্তনের কারণ ঘটিয়াছিল, জার্ম্মাণীতেও তাহা ঘটিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণীতে সমবায়নীতিতে চালিত জমীদারী ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইয়া জমীদারগণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন।

এদেশে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী যেমন সমাজের মেদমজ্জা, ভূম্যধিকারীরা তেমনই সমাজের শক্তিকেন্দ্র। সমাজের চিরাগত প্রথানুসারে তাঁহারাই সমাজের চালক ও শাসক। সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকেরাও তাঁহাদিগের প্রভাবে অভ্যস্ত। অথচ আমাদের সামাজিক পরিবর্ত্তনে সেই সম্প্রদায়ের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। সে কথা স্যার হার্ব্বার্ট হোপ রিসলিও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সুসময়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকার মান বজায় রাখিতেই তাঁহাদের প্রাণান্ত হয়। আয় বাড়াইবার জন্যও ব্যয় প্রয়োজন—সেই অর্থের অভাবে আয় বাড়াইবার উপায় হয় না, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়াই যায়। ফলে ঋণ হয়, আর ক্রমে সুদের ভারে ঋণ বাড়িয়া যায়।

মফঃস্বলে অনেক স্থানের যে সব লোন কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছে, সে সকল হইতে ব্যবসাবাণিজ্যের কোনরূপ অর্থসাহায্য লাভ হয় না। কারণ, সে সব কোম্পানী ক্রেডিট অর্থাৎ পশার দেখিয়া টাকা ধার দেন না—ধার দেন সোণারূপা বা ভূমির উপর। কিন্তু সে সব ব্যবসা কেবল লাভের জন্য কল্পিত বলিয়া খাতকের স্বার্থরক্ষা করা হয় না। কাজেই সে সব কোম্পানী হইতে টাকা ধার করিলে অনেক স্থলে সম্পত্তি উদ্ধার করাই দুষ্কর হয়। সাধারণতঃ এই সব কোম্পানী সম্পত্তির আয়ের পণের গুণ মূল্য ধরিয়া তাহার অর্দ্ধেক টাকা ধার দেন। অর্থাৎ ১০ হাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি যদি স্থানীয় নিয়মে ২০ গুণ পণেও বিক্রীত হয়, তথাপি কোম্পানী তাহায় মূল্য ১৫ গুণে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরিয়া তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকা ধার দিবেন। সুদের নিয়ম, চক্রবৃদ্ধি হারে। প্রস্তাবিত সমবায় ব্যাঙ্কে সম্পত্তির মূল্য স্থানীয় নিয়মে দুই লক্ষ টাকা ধরিয়া ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়া চলিবে। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থায় ৭৫ হাজার টাকার অধিক টাকা প্রয়োজন হইলেই জমিদারকে অন্যত্র মাড়োয়ারীর

গদীতে বা মহাজনের বাড়ীতে হুণ্ডীতে বা "কস্য কর্জ্জপত্রমিদং" লিখিয়া কড়া সুদে টাকা ধার করিতে হইবে না। কেবল ইহাই নহে—ব্যাঙ্ক যে টাকা দিবেন, তাহার সুদ বাদ দিয়া মুনফার যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে অবস্থা বুঝিয়া ৫০ বা ৬০ বৎসরেও, আসল টাকা শোধের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা জমিদারের নিজ ব্যয় বাবদ লইবার পরামর্শ দিবেন—ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে ভূস্বামীর পক্ষে মিতব্যয়িতার শিক্ষা হইবে এবং ধীরে ধীরে তাঁহার সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে বাঙ্গালার বহু জমিদারের ঘর রক্ষা পাইবে—বহু প্রাচীন বংশের সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ হইবে—দেশের অসাধারণ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

যাঁহারা মনে করেন, সমবায়-ঋণদান-সমিতি কেবল দরিদ্রের হিতার্থ, তাহারা ভ্রান্ত। উচ্চতর স্তরে—সর্ব্বস্তরেই ইহাতে কল্যাণ সংসাধিত হয়। প্রস্তাবিত জমিদারী ব্যাঙ্কে সরকারের সহানুভূতি আছে। সরকার ব্যবস্থা করিলে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক হইতে নির্দ্দিষ্ট সুদে—ব্যাঙ্ক রেটের ১৲ বা ১॥০ দেড় কমে এইব্যাঙ্ক টাকা পাইয়া সেই টাকা খাটাইয়া লাভবানও হইতে পারিবেন।

শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বয়সে বৃদ্ধ হইলেও উৎসাহে যুবক। তিনি এখনও যে কাজে হাত দেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসীম উৎসাহবলে তাহা সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, তিনি এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক স্থাপনকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেশের উপকার করিবেন এবং এই ব্যাঙ্ক যাঁহাদিগের উপকারার্থ কল্পিত বাঙ্গালায় সেই বিপন্ন বা বিপদ-ভয়ভীত জমিদারসম্প্রদায় এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে মিত্র মহাশয়ে সাহায্য করিবেন।

মহীশূরে শিল্প-প্রচেষ্টা

কয়েক বৎসর হইতে মহীশূর রাজ সরকার স্বরাজ্যে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পুরাতন শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এ চেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে চন্দনতরুর অভাব নাই; এখানে বড় বড় চন্দনের বন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠ এই সকল বন হইতে সংগৃহীত হইয়া ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। জর্ম্মণীতেও বহু চন্দন-কাষ্ঠ এখান হইতে চালান হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অন্যান্য দ্রব্যের মত চন্দনের রপ্তানিও বন্ধ হইয়াছে। জর্ম্মণী হইতে যে প্রচুর চন্দন-তৈল ভারতে আমদানী হইত, তাহাও আর হইতেছে না। এদেশেও বিশুদ্ধ চন্দন-তৈলের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে; উহা এক প্রকার দুষ্প্রাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে। মহীশূর রাজসরকার সম্প্রতি চন্দন-তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এক কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে আর এক মাসের মধ্যে প্রতিমাসে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের চন্দন-তৈল তৈয়ারী হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিলে মহীশূর সরকার এই ব্যবসায়-পরিচালনের জন্য দেশের লোককে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। তখন রাজসাহায্যে ও প্রজার যৌথ-মূলধনে মহীশূরে একাধিক চন্দনতৈলের তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

মহীশূরে সাবানের কারখানা পূর্ব্বে ছিল না। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট সাবানের কারখানাও স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। মহীশূরের বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্দিরে (Indian Institute of Science) সাবান প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার সাবান বেশ ভাল; মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এ জন্য উৎসাহিত হইয়া সাবানের কারখানা স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আনায়ন করিতেছেন। এই সকল যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম আসিয়া পড়িলেই সাবানের কারখানা স্থাপিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর গবর্ণমেণ্ট তুলার কল, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিতেছেন। কাগজের প্রধান উপকরণ—পল্প, কাঁচা কাঠ হইতে চুয়াইয়া নির্য্যাস প্রস্তুত, বোতাম প্রভৃতি এবং এই জাতীয় অন্যান্য আবশ্যক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না, রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যসচিবেরা তৎসম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেছেন।

মোট কথা, মহীশূর গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যের শিল্পের উন্নতি জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ চেষ্টা নানা পথে সাফল্যলাভে অগ্রসর হইয়াছে। মহীশূরের জঙ্গলে

পেন্সিল-প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠের সন্ধান মিলিয়াছে। জাপানী পেন্সিলে যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, মহীশূরের কাষ্ঠ তাহা অপেক্ষা ভাল। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এই সুবিধা দেখিয়া পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টাও করিতেছেন।

ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য মালব প্রদেশ হইতে বহু কারিকর মহীশূরে আনীত হইয়াছে। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রথা ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রচুর পরিমাণে এই সকল দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশ হইতে জনৈক বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞকে লইয়া গিয়া রাজসরকার একটী বিস্কুটের কারখানাও স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বেশ ভাল বিস্কুট তৈয়ারী হইতেছে।

মহীশূরে হস্তচালিত তাঁতের যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল উন্নত প্রণালীর তাঁত রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র চলিতেছে। রাজসরকারের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার তাঁতীরা দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে।

জর্ম্মণীর রাসায়নিক কৃত্রিম রঙের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এবং এই জন্য দেশের রঞ্জন-শিল্পের প্রকৃত ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উদ্ভিজ্জ হইতে রঙ তৈয়ারীর যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

অন্ন-সমস্যা এখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। মহীশূর-রাজ শিল্পের পুনরুজ্জীবন দ্বারা এই জটিলতম সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। এ পক্ষে মহীশূরের রাজা ও প্রজা উভয়েরই সমান উদ্যোগ, সমান চেষ্টা। কোনও প্রজা এ পথে নূতন চেষ্টা করিলে মহীশূর-রাজসরকার তাহাকে যথেষ্ট সাহার্য্য করিতেছেন।

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট যে এই সকল কারখানা প্রভৃতি করিতেছেন, তাহাও প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য। এই সকল কারখানায় মহীশূরের শত শত শিক্ষিত যুবক কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে, তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের শিল্প ধ্বংসোন্মুখ, এখানে শিল্পের পুনরুত্থানের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট সাহার্য্য না করিলে এ প্রদেশের শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট কলকারখানা স্থাপন করিয়া হাতে কলমে যদি বাঙ্গালার মহাজনগণকে লাভ দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে এদেশের লোক প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ ও সারসংগ্রহ

খেজুর চিনি—বাঙ্গালা দেশে খেজুরের রস হইতে বহুল পরিমাণে চিনি তৈয়ারী করা হয়। কৃষিরসায়নবেত্তা খেজুরের রস হইতে চিনি তৈয়ারী সম্বন্ধে অনেক কাজ করিয়াছেন। এই ব্যবসা উন্নতিসাপেক্ষ এবং বেশ ভাল লাভজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আজকাল এ কাজ মোটেই ভালভাবে চলিতেছে না, উপযুক্ত প্রণালীতে চলিলে ১/ বিঘায় উৎপন্ন আখ হইতে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় ১/ বিঘায় খেজুর গাছের রস হইতে তাহার চেয়ে বেশী চিনি পাওয়া যায় এবং তৈয়ারী করার ব্যয়ও কম। মাটীর হাঁড়িতে রস সংগ্রহ করার চেয়ে ধাতুর হাঁড়িতে সংগ্রহ করা ভাল। মাটীর কড়াতে গুড় তৈয়ারী করার চেয়ে ধাতুর কড়াতে তৈয়ারী করা ভাল. কারণ মাটীর কড়া অপরিষ্কার এবং ইহাতে অনেক চিনি পুড়িয়া যায়। যদি সংগ্রহের জন্য মাটীর হাঁড়িই ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে উহার ভিতরটা চূণের জল দিয়া ধুইয়া দিলে ভাল হয়। মান্দ্রাজে উহা সব সময়েই করা হয় এবং তাহাতে রস বেশ মিষ্ট থাকে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ আমেরিকা হইতে রস জাল দিবার জন্য লোহার চুলা ও রস সংগ্রহ করিবার জন্য ধাতুর হাঁড়ি আনিতেছে।

রস সংগ্রহ করিবার জন্য বড় একটা ধাতুর পাত্র আনা হইতেছে যাহা গাড়িতে কিম্বা নৌকাতে করিয়া সর্ব্বত্র লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক রসওয়ালাকে জাল দিবার জায়গায় রস লইবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইবে না। যদি উক্ত যন্ত্র ফলপ্রদ হয় তাহা হইলে রসওয়ালারা একত্র হইয়া উহা আনাইতে পারেন। উহার দাম প্রায় ১২০০৲ টাকা।

মান্দ্রাজের যে সকল স্থানে খেজুরের রস হইতে চিনি তৈয়ারী হয়, কৃষিরসায়নবেত্তা সম্প্রতি সে সকল জায়গায় সেখানকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার লোকেরা রসকে অনেক ক্ষণ জাল দিয়া শক্ত (পাটালিরমত) গুড় তৈয়ারি করে। এই গুড় পাটের বস্তায় ভরিয়া ইউরোপীয় এজেণ্টদিগের নিকট বিক্রয় করা হয়। এজেণ্টগণ ইউরোপের চিনি পরিষ্কার করিবার বড় বড় কারখানায় ইহা পাঠাইয়া দেন।

আগামী শীতের সময় এখানে রস হইতে শক্ত গুড় তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা হইবে। হাঁড়িতে ভরিয়া ঝোলা গুড় গাড়িতে করিয়া দেওয়া বড় কঠিন, কারণ হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তদ্দরুণ অনেক গুড় নষ্ট হইতে পারে। শক্ত গুড় তৈয়ারী করিয়া ছালায় ভরিয়া স্থানান্তর করা অতি সহজ।

বাঙ্গালার মাটীতে চুণাভাব—কৃষিরসায়নবেত্তা বাঙ্গালা দেশের

বিভিন্ন জায়গা হইতে মাটীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জায়গায় মাটীতে চুণ নাই, মাটীতে চুণ না থাকিলে অধিকাংশ শস্য জন্মিতে পারে না। ঢাকায় মাটীতে চুণ দিয়া সরিষা, পাট, আখ প্রভৃতি ফসল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি মাটীতে চুণ না থাকে তাহা হইলে হাড়ের গুঁড়ার সার দিলে ফসল বাড়িবার খুব সম্ভাবনা। কোন্ জায়গার মাটীতে কোন্ শস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে এবং কোন্ সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য এই বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটী পরীক্ষা করিতেছেন।

নীলের অভাব—সমগ্র জগতের মধ্যে প্রতীচ্য দেশ অতিশয় অধিক নীল রঙ ব্যবহার করে। কাজেই সর্ব্ব সময়ে এই দেশে নীল সঞ্চিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সমগ্র জগতে বৎসরে প্রায় ৮,০০,০০,০০০ পাউণ্ড নীল ব্যয় হয়। এই সমস্ত নীলই কৃত্রিম অর্থাৎ রাসায়নিক। এই নীলের শতকরা ৯০ ভাগ জার্ম্মানিই উৎপাদন করিত। এই নিলের ৭০ ভাগ প্রতীচ্য দেশে ব্যবহার করে, তন্মধ্যে এক চীনদেশ শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার করে। চীনদেশে লোকে নীল রঙ সামান্য সামান্য কার্য্যেও ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সমস্ত দ্রব্য রঞ্জিত হয়, তাহার মূল্যও তত অধিক নহে, এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যেরূপই হউক না কেন, চীন প্রতি বৎসর অনেক নীল রঙ ব্যবহার করে। কাজেই চীনকে অনেক রঙ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। জার্ম্মানিতে নীলের অভাব হওয়ায় উদ্ভিজ্জ নীলের টান পড়িয়াছে এবং ভারতে নীলের আবাদ বাড়িতেছে।

ট্রেণে বরফ ঘর—ভারতের কয়েকটী রেল লাইনে ঠাণ্ডা কামরাযুক্ত ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা হইতেছে। ফলে দূরদেশ হইতে ফল মূল, কাঁচা তরকারি প্রভৃতি চালানের সুবিধা হইবে। ট্রেণের বন্ধ কামরায় বরফের স্তূপ রাখিয়া উহার উত্তাপ হ্রাস করা হয়। নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলে প্রাথমিক পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা সফল হইলে সম্ভবতঃ সকল রেলেই এই ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ ঘরে ফল, মূলাদি অধিককাল অবিকৃত থাকে। ইহাতে উদ্যানস্বামীগণের ব্যবসায়ার্থ ফল মূল কাঁচা তরকারি সমূহ বাজার হইতে দূরদেশে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে না।

আষাঢ়, ১৩২৩ সাল।

সরকারী শ্রমশিল্প সমিতি

বিগত কয়েক বৎসর হইতে সরকারী ও বেসরকারী অনেক ব্যক্তিই বলিয়া আসিতেছেন যে এতদ্দেশে শ্রম অথবা কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে। কেবল উপযুক্ত চেষ্টার অভাবেই কিছুই হইতেছে না। সৌভাগ্যের বিষয় যে গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে নজর পড়িয়াছে এবং সম্প্রতি শ্রম শিল্প বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্নাদি আলোচনা ও তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ স্যর টমাস হলণ্ড। এখনও সমিতির কার্য্য ঠিক আরম্ভ হয় নাই, তবে সমিতি কিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন তাহার পূর্ব্বাভাষ সভাপতি মহাশয়ের কতিপয় স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

নির্দ্ধারিত তথ্য ও অঙ্কাদি সাহায্যে ভারত যে নানা প্রকার শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা প্রতিপাদন করা অবশ্য সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে লাভবান হইতে পারা যায় সমিতি তৎসমুদয়ও নির্দ্ধারণ করিবেন। (১) সম্প্রতি যে মূলধন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা কার্য্যে নিযুক্ত করা; (২) একটি সুবৃহৎ জনসঙ্ঘ গঠন; (৩) আপাততঃ জ্ঞাত ক্ষেত্রজ উপাদানাদি পরীক্ষা ও বিশেষ বিশেষ শিল্পাদি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা; (৪) গবেষণালব্ধ ফল ও অন্যান্য দেশে অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাদি জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা; (৫) শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য মূলধন সরবরাহের ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা।

ইহার মধ্যেই স্যর টমাস হলাণ্ডের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অনেক বিষয়ে পরামর্শ হইয়াছে এবং যে সমুদয় বিষয় সমিতির নিকট উত্থাপিত হইতে পারে তাহারও পূর্ব্বালোচনা হইতেছে। আগামী অক্টোবর মাসে সমিতির অধিবেশন হইবে

এবং তাহার পরেই যত শীঘ্র সম্ভব সমিতি নানা প্রদেশে পর্য্যটন করিবেন। বলাবাহুল্য যে এইরূপ পর্য্যটনকালে বেসরকারী ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে, আপাততঃ দেশমধ্যে যে সমুদয় শিল্পের কলকারখানা আছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কারখানা পরিদর্শন হইবে এবং স্থানীয় শিল্প বিষয়ক সভা সমিতির সহিত পরামর্শও হইবে। যে সমুদয় প্রদেশে আপাততঃ Director of Industries নাই যেথানে বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। তাঁহারাই সমিতিকে স্থানীয় শিল্পবিষয়ক সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিবেন।

সমস্ত ভারতে এইরূপে পর্য্যটন করা যে কত সময় সাপেক্ষ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহার উপর সমিতির অভিপ্রায় যে প্রত্যেক প্রদেশে দুই হইতে তিন সপ্তাহমাত্র সময় ক্ষেপন করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া রাখিবেন। সমিতি কেবল আসিয়া দেখিয়া যাইবেন মাত্র। আমাদের দেশের অনেক শিল্পই কুটীর শিল্প মাত্র; এবং অতি কম সংখ্যক শিল্পই একত্র সমাবিষ্ট। তৎসমুদয় সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিশেষ তথ্য গ্রহণ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় আবশ্যক। সরকারী রিপোর্ট ও অঙ্কাদির উপর নির্ভর করিলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেগুলি যে সর্ব্ব স্থলে ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং কতিপয় বিশিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে স্বাধীন অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমরা আশা করি সমিতি এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

বর্ত্তমান সমিতি নিয়োগের ফলে ভারতে যে কয়েকটি সরকারী শ্রম বিভাগের সৃষ্টি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগের ও প্রাদেশিক ও ভারতীয় শাখা থাকিবে। ইহার মধ্যেই কয়েকটি প্রদেশে শিল্পবিষয়ক ডাইরেক্টর ও তাঁহার উপদেষ্টা অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল প্রদেশে হয় নাই, যে সমুদয় স্থলেও ঐ প্রকার ব্যবস্থার সূচনা হইতেছে। যে সমুদয় স্থানে কুটীর শিল্পের প্রাধান্য অধিক সেরূপস্থলে স্থানীয় অথবা প্রাদেশিক বিভাগের দ্বারা অধিকতর সুচারুরূপে কার্য্য হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু যে সমুদয় শিল্প কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নহে, এবং যাহাদের অনুষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধনও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা আবশ্যক তাহাদের জন্য একটি ভারতীয় শ্রমবিভাগ গঠিত হওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে এইরূপ কয়েকটি শিল্পের উল্লেখ করিতে পারা যায়; যথা—(১) রাসায়নিক, ক্ষেত্রজ, ধাতুজ, রঞ্জক ও ঔষধাদি সংক্রান্ত দ্রব্যাদি। (২) চর্ম্মজাত দ্রব্যাদি। (৩) কাচ। (৪) শর্করা ও সুরা। (৫) কাগজ এবং (৬) তৈল বীজ জাত দ্রব্যাদি। এই সমুদয় দ্রব্যাদি উৎপাদক কারখানা কয়েকটির বিশেষ সুবিধা হইলে যথা ইচ্ছা কারখানা স্থাপিত হইতে পারে এবং ইহাদের তত্ত্বাবধারণ ভারতীয় বিভাগের অধীন হইলে কোন আপত্য নাই।

শ্রম শিল্প সমিতির নিকট আরও কয়েকটি বিষয় উত্থাপিত হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত সমাধান হওয়াও বিশেষ বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান সময়ে শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য দুইটি সরকারী বিভাগে (Director of Statistics এবং Director General of commercial Intelligence) সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত দুইটি বিভাগ দ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় কিনা এবং যদি না হয় তাহা হইলে উহাদের কিরূপ সংস্কার আবশ্যক কিম্বা অন্য কোন নূতন বিভাগ আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ সংবাদ পত্র ও সাধারণ শিল্প বিষয়ক সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠায় কিরূপ ফল লাভ দর্শিতে পারে। এই দুইটি প্রধান বিষয় ব্যতীত সমিতি আরও কয়েকটি গৌণ বিষয় সমালোচনা করিবেন। সেগুলি এই (১) সরকারী বন বিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি বিভাগ হইতে প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকাদি দ্বারা সাধারণের কোন সুবিধা হইয়াছে কিনা; (২) কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিস্তার ও বিক্রয় কল্পে স্থানে স্থানে দেশমধ্যে ও বিদেশে প্রদর্শনী গৃহ ও স্থায়ী বিক্রয়ের দেকান স্থাপন বিষয়ের প্রয়েজনীয়তা; (৩) দেশজাত শিল্পাদির সাময়িক প্রদর্শনী উদ্বাটন; (৪) বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবসায় বিষয়ক প্রতিনিধি নিয়োগ এবং সমস্ত ভারতের জন্য ইংলণ্ড, বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে ও অন্যান্য রাজত্বে প্রতিনিধি নিয়োগ; (৫) শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরীক্ষার্থ সরকারী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগার স্থাপন ও তাহার সাহার্য্যে জিনিষের তারতম্য অনুসারে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা; (৬) ট্রেড মার্কা ও পেটেণ্ট আইনের সময়োচিত সংস্কার ও; (৭) শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা সমূহের জন্য জমি ক্রয়ের জন্য বর্ত্তমান আইন যথেষ্ট কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ভারতের ন্যায় দেশে, যেখানে শ্রমশিল্পের অত্যন্ত শৈশবাবস্থা, শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্যকীয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মতে গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন:—(১) সাহায্যার্থে অর্থদান অথবা ঋণ প্রদান (২) নব্যপ্রথা অনুসারে ক্রমিক অর্থদানে কলকারখানার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ডিভিডেণ্ড প্রদান (৪) নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারখানাজাত দ্রব্যাদি ক্রয় (৫) সুবিধা দরে জমি প্রদান (৬) রেলে মাশুল হ্রাস করিয়া ও অন্যান্য রূপে সুবিধা প্রদান (৭) নিম্নহারে শুল্ক গ্রহণ (৮) নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহা সফল হইলে তাহার পরিচালন ভার বেসরকারী ব্যক্তিগণের অথবা কোম্পানির হস্তে প্রদান ও (৯) কোন কল কারখানা সুচারুরূপে চালাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত সরকারী অভিজ্ঞগণের চাকুরী ঋণ প্রদান।

এই সমুদয়ের মধ্যে কোন প্রকারে সাহায্য প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর, আপাততঃ এই সমুদয়ের মধ্যে কোন প্রকার কোথাও সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে কিনা

এবং তাহাতে কিরূপ ফল ফলিয়াছে তাহাও সমিতি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গবর্ণমেণ্ট সাহার্য্য প্রদান করিলে কল কারখানা যে কতক পরিমানে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আসিবে তাহা স্থির নিশ্চয়। তবে সেরূপ কর্তৃত্ব কি মাত্রায় এবং কতদুর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত তাহাও একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কারণ সবই যদি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সমাপিত হয় তাহা হইলে লোকে নিজের চেষ্টায় কখনই কোন শিল্প অনুষ্ঠান অথবা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে না। এ বিষয়ে সাধারণের কতকটা স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক এবং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমরা এস্থলে স্থূলতঃ শ্রমশিল্প সমিতির উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাবিত কার্য্য প্রণালীর বিবরণ প্রদান করিলাম। সমিতির অধিবেশন হইলে অবশ্য আরও অনেক আলোচ্য বিষয় সমিতি ও সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। যথা সময়ে আমরা সে সমুদয়ের উল্লেখ করিব। এতদ্ভিন্ন বারান্তরে কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পাদির অভাব অভিযোগেও আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের রহিল।

পত্রাদি

উদ্যান চর্চ্চার বিষয়—

শ্রীশান্তিপদ সরকার পটুয়াখালি, ঢাকা।

প্রশ্ন—উদ্যান তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনারা মাঝে মাঝে "কৃষকে" আলোচনা করেন। উদ্যান সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয় কি এবং কোথায় তাহা শিক্ষা করা যায় ?

উত্তর—উদ্যান সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয়—নানাবিধ ফল ফুল উৎপাদন করিতে শিক্ষা করা, সাধারণভাবে উদ্যান রক্ষা ও পরিচর্য্যা করিতে শিখা, উদ্যান পরিদর্শক ও উদ্যান তত্ত্ব শিক্ষক হওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া উদ্যান রচনা করিতে শিক্ষা করা, ব্যবসায়ের জন্য ফল ফুল উৎপাদন করা, বৃক্ষলতাদির চারা কলম উৎপাদন ও তাহার ব্যবসা করা এবং উদ্যানজাত বীজের ব্যবসা করা।

সাবর ও পুষাতে যে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তথায় কীটতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্বেরই সমধিক আলোচনা হয়। উদ্যান তত্ত্বের বিষয়গুলির সম্পূর্ণ আলোচনা ভারতে কোথাও হয় না বা তাহা অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থা নাই।

গোলাপ এখন বসান চলে কি না ?—

মিঃ সি, এ, রিচমণ্ড হল মেদিনীপুর—

উত্তর—এখন গোলাপ বসাইতে কোন বাধা নাই, যদি জমি উচ্চ হয়। জলবসা জমিতে গোলাপ হইবে না। অতিরিক্ত বর্ষা হেতু গোড়ায় জল জমিয়া গাছ খারাপ হইবার ভয়ে আমরা বর্ষা প্রবল থাকিলে গোলাপ বসাইতে নিষেধ করি এবং বর্ষাঁন্তে গোলাপ লাগাইতে বলি। কিন্তু মেদিনীপুরের উচ্চ লাল মাটিতে যদি জল নিকাশের কোন ব্যাঘাত না থাকে এখনও গোলাপ বসাইতে পারা যায়।

আঁটির আম গাছ—

শ্রীপ্রমথনাথ বাগচি, পোঃ সুখপুকরিয়া, জেলা যশহর।

প্রশ্ন—প্রবাদে শুনিতে পাই। আমের আঁটি কৃষ্ণপক্ষে ফুটিলে সে চারার আম টক হয়। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকায় আলোচিত হইলে সাধারণে জ্ঞান পায়। এ প্রবাদটী বিজ্ঞান মূলক বা অমূলক। আর আঁটির চারাই গৃহস্থের করা কর্ত্তব্য। কলমের আম মাতৃ বৃক্ষের মত হয় বটে কিন্তু তেমন ফলে না আর বহুকাল স্থায়ীও নয়। আঁটির চারা রোপণ করিয়া কি উপায়ে মাতৃ বৃক্ষের ন্যায় হইতে পারে তাহার আলোচনা আপনার কাগজে হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। আমরা দেখি ভাল আমের চারা মাতৃ বৃক্ষের মত ফল না দিলেও অনেকটা সেই গুণ পায়। আমি কত ভাল আমের আঁটির চারা করিয়াছি ফল ছোট হইলেও মাতৃ বৃক্ষের ন্যায় অনেকটা হইয়াছে।

উত্তর—শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষে চারা ফুটিলে স্বাদের তারতম্য হয় কি না তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন মত প্রকাশ করা যায় না। গ্রহ ও তিথি অনুসারে জাতকের দোষ গুণের অল্পাধিক্য হয় জ্যোতির্ব্বিদেরা এই কথা বলেন। মনুষ্য ও প্রাণী জীবনে যাহা সম্ভবে তাহা উদ্ভিদ জীবনেও সম্ভব। শুক্লপক্ষে ধরণীতল অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ধারণ করে সুতরাং ঐ পক্ষে বৃক্ষ লতাদি জন্ম লইলে ভাল ফল আশা করা নিতান্ত অহেতুক নহে। আঁটির চারা হইতে মাতৃ বৃক্ষের অনুরূপ ফল লাভ করিতে হইলে বৃক্ষ লতাটিকে বা তাহাদের কতিপয় ডাল মুকুল উদ্গমের সমকালে পাতালা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে ঢাকিয়া রাখিলে মুকুলগুলিতে সঙ্কার্য্য সম্পাদিত হইতে পায় না এবং তাহা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হয় তদ্বারা মাতৃ বৃক্ষের অনুরূপ ফল উৎপাদিত হইবে।

প্রশ্ন—কাঁঠাল সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। মতৃ বৃক্ষের যেরূপ মোটা ডালের ফল হইতে বীজ লওয়া যায় রোপিত বৃক্ষ তত মোটা না হইলে গাছ ফল দেয় না এটা কি ঠিক ? এবার আমি একটী এমন সরু ডালের কাঁঠাল রোপণ করিলাম, বোধ হয় দুই বৎসরেই রোপিত বৃক্ষ সেইরূপ মোটা হইবে।

উত্তর—যে ডালে বেশ রৌদ পায়, এমন ডালের অগ্রভাগে সরু শাখায় যে কাঁঠাল জন্মে তাহার বীজে গাছ জন্মাইলে উহা শিঘ্র ফলবতী হইয়া থাকে। বৃক্ষ লতাদি শিঘ্র ফলবতী হওয়া অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। অনাবৃত স্থান, উত্তম মাটি, অনুকুল জল হাওয়া, পর্য্যাপ্ত ও উপযুক্ত পরিমাণ সার এবং উত্তম বীজ পাইলে তবে বৃক্ষ লতা আশু ফলবতী হইয়া থাকে। অন্যান্য উপাদানগুলি ঠিকমত পাইলে কাঁটাল সম্বন্ধে প্রবাদবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়।

প্রশ্ন—আতা, (যাহা ভাদ্র মাসে জন্মে) উহার আবাদ কেহ করে না। ফল অতি উত্তম। ঐ বৃক্ষ কিরূপে রোপণ করা হইলে ফলের উন্নতি হয় উপদেশ দিবেন। অযত্নে রোপিত ফলই কেমন উপাদেয়।

উত্তর—স্থানে স্থানে যত্ন করিয়া আতার আবাদ করা হয়। ২৪ পরগণায় অনেক জায়গায় আতার আবাদ আছে। ইহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। উত্তম ও সুপুষ্ট ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সবল চারা বাছিয়া রোপণ করিতে হইবে। ভাদ্র, আশ্বিন মাসে চারা রোপণ করিতে হয়। সদ্য বৎসারেই আষাড় শ্রাবণ মাসে ফল হইবে। আর এক বৎসর ঐ গাছ রাখা চলে কিন্তু ফল অন্তে ডাল অতি উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দিতে হইবে একটিও পুরাতন ডাল থাকিবে না। পুরাতন ডালের ফল ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে। দুই বৎসর পরে আবার নূতন স্থানে নূতন চারা রোপণ করিতে হইবে। এইরূপে আবাদ করিলে উৎকৃষ্ট ফল হয়; ফলও দামে বিক্রয় হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটি, বেগুণ, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি, ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা,) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্‌লা বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘণ ঘণ বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও

আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিনাংশ পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য রোপনের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

—সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

বাগানের বেড়া।—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। লোকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে তখন সকল চাষাই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্থ গো মহিষাদি চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায়ন্তর নাই। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরেণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যেষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

কৃষক।

সূচীপত্র।

শ্রাবণ ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

ধান ক্ষেতে সবুজ সার ও অন্য সার

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তিন রকম জমিতে ধান হয়—১ম দোঁয়াস বাগান জমি যেখানে আউস ভিন্ন আমন ধান হওয়া সম্ভব নহে ; ২য়। নিম্ন আটাল মাটিযুক্ত জমি এখানে বর্ষাকালে ধান চাষের সময় জল জমে, অন্য সময় শুখাইয়া যায়, ৩য়। কর্দ্দমাক্ত জলাজমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোন কালেই শুষ্ক হয় না। আমি ধান্যক্ষেত্রে বিশেষ সারের উল্লেখ করিয়াছি—এক্ষণে সাধারণ সার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতে ইচ্ছা করি।

আউস ধানের ক্ষেতে বিঘা প্রতি (১৪৪০০ বর্গফিট) ৩০০ ঝুড়ি শুষ্ক পাকমাটি ছড়াইয়া রাখিতে হয় এবং ধান বুনিয়া চারা বাহির হইলে নিড়াইয়া দিবার পর বা বিদা দিবার সময়—১০ সের হিসাবে সোরা ছড়াইতে পারিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

আমন ধানের ক্ষেতে শুষ্ক অবস্থায় চষিবার সময় গোময় সার বা হাড়ের গুড়া ছড়াইয়া রাখিতে হয় এবং ধান রোপণের ১৫ কিম্বা ২০ দিন পরে বিঘা প্রতি ১০ সের হিসাবে সোরা ছড়াইয়া ক্ষেত হস্তদ্বারা নিড়াইয়া উপরের কাদামাটি নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এইরূপ মাঝাকিতা জমিতে সবুজ সার প্রদান করায় সুবিধা পাওয়া যায়। অউসের ক্ষেতে সবুজ সার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না, কারণ যে সময় আউসের বীজ বপন করিবার কাল সেই সময়ই সবুজ সারের উপযোগী শণ, ধইঞ্চা বীজ বপনের সময়। সুতরাং সে সময় সবুজ সারের বীজ বুনিয়া গাছ জন্মিয়া চষিয়া তাহাতে আউস ধান উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। মাঝাকিতা আমনের জমিতে সবুজ সারের বীজ

বপন করিয়া তাহা এক দেড় ফুট উচ্চ হইলে চষিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু চুণ ছড়াইয়া জমিটিকে বিশেষ সারবান করিয়া তুলা যায় এবং তাহাতে বিশেষ সার প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক সস্তায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এবং ধানের ফলন বিশেষ সার প্রয়োগে যেমন দাঁড়ায় তদপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। চুণ প্রয়োগের কারণ—সবুজ সারের শাখা প্রশাখা শিঘ্র পচাইয়া উদ্ভিদের কার্য্যোপযোগী করা ও গাছ পাতা পচিবার সময় মৃত্তিকা যে অম্লাক্ততা প্রাপ্ত হয় তাহা নিবারণ করা।

ধান্যের ফলন

বিনা সারে। সবুজসার কিম্বা গোময় সার প্রয়োগে। সম্পূর্ণ সার প্রয়োগে।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ জলা জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করা যায় না এবং সবুজ সার প্রয়োগের বিশেষ আবশ্যকতাও দৃষ্ট হয় না কেননা এই সকল ক্ষেতে জলজ উদ্ভিদ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে। সেই গুলিকে জলে কাদায় চষিয়া ফেলিবার সময় কিছু চুণ ছড়াইলে সবুজ সার প্রয়োগের কার্য্য অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। এইসব ক্ষেত্র স্বভাবতই অম্লাক্ত হয় সুতরাং ইহাতে চুণ ছড়ান নিতান্তই প্রয়োজন। জলাজমিতে ধান্য রোপণ বা বপনের পর গাছগুলি কিঞ্চিত বড় হইলে জলের উপর গোময় ছড়াইয়া দিলে গাছগুলি সতেজে বাড়িতে থাকে এবং পর্য্যাপ্ত ফলন হয়।

জলাজমি ও মাঝকিতা জমিতে ধান্য রোপণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জলে কাদায় চাষ দিতে হয়; ইহাকে সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় পচান চাষ বলে। মাঝকিতা জমি শুষ্ক অবস্থায়ও চষিয়া রাখা যায়। গোময় ও হাড়ের গুঁড়া আদি সেই সময় ছড়াইয়া লাঙ্গল মই দ্বারা

জমির মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। সার ছড়াইয়া চাষ দিবার সময় খুব গভীর কর্ষণের আবশ্যকতা নাই। গভীর কর্ষণে সার, মাটির বহু নিম্নস্তরে পড়িয়া গেলে ধানের পক্ষে তাহা গ্রহণের উপযুক্ত হয় না। ধান, গুচ্ছ মূলক উদ্ভিদ। ইহার শিকড় গুচ্ছ জমির উপরে ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকে এবং মৃত্তিকার ৯ ইঞ্চ নিম্নে শিকড় চালাইতে ইহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

জলা জমির আইল বাধা যায় না, মাঝকিতা জমির আইল বাধা সম্ভব। আইল বাধা না থাকিলে এক জমির সার অন্য জমিতে বা অন্যত্র নীত হইয়া সারের সম্পূর্ণ উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দেয় না।

পর্ব্বত গাত্রেও ধানের চাষ করা যাইতে পারে। তথায় পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে আইল বাঁধিয়া ধান ক্ষেত রচনা করিতে হয়। এই সকল স্থানে পাঁক মাটি মিলে না। এই অঞ্চলে হাড়ের গুড়া শরিষার খৈল ও কাইনিট মিশ্রিত সার প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

ধান্যে সার ব্যবহারের প্রণালী ও সময়—সময় মত সার প্রয়োগ না করিলে এবং সার মাটির সহিত বীজ পবনের ও চারা রোপণের পূর্ব্বে উত্তমরূপে মিশ্রিত না হইলে সার প্রয়োগের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না—বস্তুতঃ দেখা যায় যে সার প্রয়োগের ভ্রম প্রমাদ হেতু অধিকাংশ সময় চাষীকে বর্থ মনোরথ হইতে হয়। কোথাও বীজের সহিত সার মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়ান হয়। কখন কখন ইহাতে বীজের জীবনীশক্তি কমিয়া যায় বা নষ্ট হয়। হাড়ের গুড়া গলিয়া উদ্ভিদের খাদ্য উপযোগী হওয়া সময় সাপেক্ষ সুতরাং ধানবীজ হাড়ের গুড়া সংযুক্ত করিয়া রোপণ করিলে সার প্রয়োগের ফল উক্ত ফসলে দৃষ্ট হয় না। সংক্ষেপে সার প্রয়োগ বিধি এইরূপ।—

১। বীজের সহিত সার সংযোগ করিয়া জমিতে না ছড়ানই কর্ত্তব্য।

২। বীজ বপনের যথাসম্ভব পূর্ব্বে চাষ কারিকিতের সময় জমিতে সার প্রদান করা বিধি।

৩। সার ছড়াইয়া জমিতে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। জমি জলে প্লাবিত হইয়া বা জমির উপর দিয়া পয়োনালা প্রবাহিত হইয়া সার যাহাতে ক্ষেত হইতে স্থানান্তরিত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ধান্যে গো, মহিষ, অশ্ব মল—গোময়াদি পশুমল তুল্য ভাল সার কদাচিত দৃষ্ট হয়। ইহাতে উদ্ভিদ খাদ্য সকলগুলিই আছে যথা—নাইট্রোজেন, ফস্ফরিকাম্ল, এবং পটাস। অধিকন্তু ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ পর্য্যপ্ত পরিমাণে থাকে বলিয়া ইহা জমির প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া জমিকে উদ্ভিদের অনুকূল করিয়া তুলে। চাষীরা এই গোময়ের আদর করে না তাহারা গোময় রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিয়া তাহার এমোনিয়া ভাগটি

উড়াইয়া দেয়। একটি গোরুর মল সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে বৎসরে উহা হইতে ১৭৬ পাউণ্ড নাইট্রেট্ অব সোডা পাওয়া যাইতে পারে।

বর্দ্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপী ধান চাষে গোময় সারের পরীক্ষা হইয়াছিল।

একর প্রতি সার	১২ সৎসরের গড় ফলন	বিগত বৎসরে গড় ফনন
গোময় ১০০ মণ	একর প্রতি	একর প্রতি
বিনাসারে	৩৫৫৬ পাউণ্ড	২৮৮৩ পাউণ্ড
গোময় ৫০ „	১৩৭৪ „	১৭৭৭ „
বিনাসারে „	৩৪৬১ „	১৭৪০ „
১০০ মণ গোময়	১৪৯২ „	১৬৯৬ „
প্রয়োগ বৃদ্ধি ফলন	১১৮২ „	১১০২ „
৫০ মণ „	১৯৬৯ „	১০৪৪ „

ধানে সবুজসার প্রয়োগের উপকারিতা—জমিতে শুঁটিধারি শস্য বীজ বপন করিয়া গাছ জন্মিলে তাহা জমিতে চযিয়া দেওয়ার নাম সবুজ সার প্রয়োগ বলে। ইহাতে জমির প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তিত হয়। কঠিন মৃত্তিকা নরম হইয়া, বেলে মৃত্তিকা, সারবান হইয়া শস্যেরউপযোগী হয়।

সবুজ সার প্রয়োগে জমির রসরক্ষার সহায়তা হয় সুতরাং অনাবৃষ্টিকালে শস্য রক্ষার একটু সুবিধা হয়। শুঁটিধারী শস্য মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে উদ্ভিদ্-খাদ্য উপরস্তরে টানিয়া আনে এবং এই প্রকারে উপরস্তরে যে নাইট্রেট্ সঞ্চিত হয় তাহা জলে সহজে ধৌত হইয়া যায় না। সবুজ সার দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ পচিয়া মৃত্তিকার হিউমিকাম্ল (Humic acids) সঞ্চিত হয়। এই অম্ল কঠিন খনিজ সার পদার্থগুলি গলাইয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করে। তখন এই গলিত সারগুলি উদ্ভিদ্ তাহার ক্ষুদ্র শিকড়াগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে।

উদ্ভিজ্জ সারের উপযুক্ত উদ্ভিদ—যে সকল শুটীধারী শস্য শীঘ্র জন্মান যায় সেইগুলিই উপযুক্ত যথা—সীম, মটর, শণ ধঞ্চে, পাট, বরবটী ইত্যাদি। এইগুলি ক্ষেতে জন্মাইয়া মাটিতে চষিয়া দেওয়ায় সবুজ সার প্রয়োগের সাধারণ বিধি।

অন্য প্রকারেও সবুজসার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সবুজ পত্র, শাখা প্রশাখাগ্রভাগ জমিতে গোময় সারের সহিত ছড়াইয়া চযিয়া দিলেও সবুজসার প্রয়োগের কার্য্য সংসাধিত হয়।

সবুজ সার প্রয়োগে আর একটা উপকার দৃষ্ট হয়। জমিতে শণ ধঞ্চে বুনিলে জমির ঘাষ ও আগাছ মরিয়া যায়।

ইহা কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে সবুজসার প্রয়োগে মৃত্তিকার নাইট্রোজেন ভাগ বাড়িয়া যায় এবং নাইট্রোজেন হেতু খৈল, সোরাসার, মাছের গুড়া প্রভৃতি খরিদ করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু ফস্ফারিকাম্ল ও পটাস প্রয়োগের জন্য সতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলে সম্পূর্ণ সার প্রয়োগ করা হইল না। সবুজ সারের সহিত ছাইমিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সার প্রযুক্ত হইলে চাষীকে আর কিছুতেই বিফল মনোরথ হইতে হয় না। বিঘাপ্রতি অন্ততঃ ২৫ ঝুড়ি উক্ত সার প্রযোজ্য।

বারান্তরে আমরা বিভিন্ন জেলার কতিপয় প্রধান ধান্য শস্যের বিষয় আলোচনা করিব।

মূলধন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেক্রেটারি ধাত্রিগ্রাম কৃষি-ব্যাঙ্ক লিখিত।

ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্।

আমরা পরের কাজ বেশ গুছাইয়া করিতে পারি, পরের কাজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না কিন্তু আপনার কাজে যে দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইতে হয়, যে অধ্যবসায়ের আবশ্যক হয়, যেরূপ সকল দিকে চক্ষু রাখিয়া চলিতে হয় আমাদের সেই অভ্যাসগুলি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা পর মুখাপেক্ষী হইয়া এই সদ্‌গুণগুলি হারাইতেছি। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজে না নামিলে আমাদের কি অভাব আমরা বুঝিতে পারি না। ঠেকিয়া না শিখিলে মানুষের চরিত্র গঠন হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রই আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র। কাজ করিতে করিতেই আমরা কাজে দড় ও দৃঢ় হই—এক কথায় কাজের লোক হই। পরের আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিলে এ সকল গুণ অর্জ্জনের অবসর কোথায়!

ত্যাগীর কথা স্বতন্ত্র। সংসারে থাকিতে হইলে অর্থের নিত্য প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দিন এখন আর নাই। আমাদের (বাঙ্গালীর) মধ্যে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ বা মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের অভাব না থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের অধিকাংশই এখন বৈশ্য ও শূদ্র।

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥　　গীতা ১৮।৪৪

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উল্লিখিত কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছি।

আমাদের বাহিক চাকচিক্য ভাল হইলেও বৈদেশিক বিলাস দ্রব্যে প্রলুব্ধ হওয়ায় সঞ্চয়ের অভ্যাস একবারে লোপ পাইয়াছে। ফলে দিন মজুরি করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। আত্ম নির্ভরশীল হইয়া শিল্প বাণিজ্যাদির যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই প্রথম আবশ্যক মূলধনের। ধন-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন অর্থ উপার্জন করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক :—

১। স্বভাবদত্ত সুবিধা

২। পরিশ্রম

৩। (Capital মূলধন অর্থাৎ যে ধন হইতে অন্য ধনের উৎপত্তি হয়।

প্রথম তুইটী অর্থাৎ স্বভাবদত্ত সুবিধা ও পরিশ্রম ইচ্ছা করিলে সকলেরই আয়ত্বাধীন কিন্তু মূলধন মিলাই কঠিন কথা। মূলধন সঞ্চয় সাপেক্ষ। আমাদের শাস্ত্রেও অর্থ সঞ্চয়ের নানা উপদেশ আছে যথা—

অর্থেনহি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্প চেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃসর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥
যস্যার্থস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাবাহু যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥ রামায়ণম্।
কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্··· ॥
অর্থাগমো নিত্যম্···জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥
ন বন্ধু মধ্যে ধন হীন জীবনম্···। হিতোপদেশঃ
দারিদ্র দোষঃ গুণরাশি···। ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি স্বভাবদত্ত বনজ পুষ্প সংগ্রহে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এবং সেই সংগৃহীত পুষ্প বিক্রয় দ্বারা (মূলধন ব্যতিরেকে) অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। তাঁহার আহারাদির ব্যয় বাদে ঐ উপার্জ্জিত অর্থের যে অংশ ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় তাহাই মূলধন সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সঞ্চয় ব্যতীত কেহ আত্ম নির্ভরশীল হইতে পার না।

শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক গৃহস্থকে আয়ের চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিতেছেন। সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক সংসারের কল্যাণে অসময়ে ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, অপরার্দ্ধ যোগ্য, দান, অতিথিসৎকার ও স্বদেশ সেবায় নিয়োজিত হইবে। এই প্রকার প্রণালী মত কৃষিংবা ব্যবসায় যাহাতে যে মূলধন নিয়োগ করা হইবে তাহা ৩ অংশে ভাগ করিয়া একাংশ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে, দ্বিতীয়াংশ সাময়িক অভাব পুরণের নিমিত্ত নিয়োজিত

থাকিবে এবং লভ্য মুনফা হইতে তাহা যথাসম্ভব পুরন করিয়া রাখিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত থাকিবে। অভাবনীয় কোন বিঘ্ন বিপদ হেতু অন্য কার্য্যে ক্ষতি থ্যাসারৎ হইলে তবে তাহা হইতে ঋণস্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে এবং সুবিধা পাইলেই সুদ সমেত সেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে। উচিত সময়ে আবশ্যক মত অর্থ না মিলিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খল হয়। মূলধনকে এ প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিলে কোন কাজেই নিস্ফল প্রয়াস হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায় জাপানে প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয় সংলগ্ন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং যাহাদের সঞ্চয় অধিক হয় তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় সে দেশের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে যখন জীবন সংগ্রামের দ্বার দেশে উপস্থিত হন তখন তাহাদিগকে আমাদের ন্যায় ভবিষ্যত অন্ধকারময় দেখিতে হয় না।

অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা সঞ্চয় করা কঠিনতর কার্য্য। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় নগদ টাকা হাত ছাড়া না করিলে তাহার যেন "হাত পা" হয় অর্থাৎ কোন দিক দিয়া যে খরচ হইয়া যায় তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। সেই জন্যই লোকে নিম্নলিখিত উপায়ে হাতের টাকা জোড়া করিয়া ফেলে।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী করা
২। তেজারতী বা ধার দেওয়া
৩। কোন মহাজনের (ব্যবসাদারের) নিকট জমা রাখা।
৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া
৫। ডাক ঘরে জমা দেওয়া
৬। জমি খরিদ

উল্লিখিত কার্য্যগুলির সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করিব।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী—সঞ্চয় উদ্দেশ্যে অলঙ্কার তৈয়ারী করার আমরা পক্ষপাতী নহি—কারণ (ক) স্বর্ণকারকে বাণি পান মরতা হিসাবে যেমন করিয়াই হউক শতকরা ২০৲ টাকা দিতেই হইবে। সুতরাং গড়ানয় সময়ই একশত টাকার দ্রব্য ৮০৲ টাকা হইয়া গেল। (খ) শিল্প বাণিজ্যের অভাবে আমাদের দিন দিন যে রূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে একমাত্র শোভা বর্দ্ধন ছাড়া আয়কর নহে এমন কোন কাজে অর্থ নিয়োগ করা অনুচিত। (গ) ইহাতে বিলাস বাসনা বর্দ্ধিত হয়। শতকরা ২০৲। ২৫৲ টাকা লোকশান দিয়া এরূপ আর্থিক অবনতি ক্রয় করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। ইত্যাদি।

২। তেজারতী বা টাকা ধার দেওয়া—এই কাজটীতে লাভ বা আয়স্বরূপ আছে কিন্তু সুদের লোভে টাকা ধার দিয়া অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িভূত হইতে হয়।

৩। কোন ব্যবসাদারের মারফত টাকা খাটাইলে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায় সত্য কিন্তু (যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক পল্লীগ্রাম বাসী ও কৃষক শ্রেণীস্থ) পল্লীগ্রামের লোকের সে সুবিধা অত্যন্ত অল্প কারণ সেরূপ নামজাদা, বড় ও বিশ্বাসী ব্যবসাদার সহর বাজারেই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া দুই এক টাকা করিয়া জমা দিয়া যাহাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে সেই সকল লোকের সহিত এইশ্রেণীর মহাজনেরা কারবার করিতে প্রস্তুত হন না।

৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া—এরূপ ব্যাঙ্ক সহরেই আছে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোকের উহাতে টাকা জমা দেওয়া সকল সময়ে সুবিধা হয় না। ইহা ব্যতীত তাঁহারা দুই এক টাকা লন না। সুদের লোভ "কোথাকার কে ঠিক নাই" এমন স্থানে আমাদের মত সঞ্চয় শিক্ষানবিশের টাকা রাখিতেও সাহস হয় না। সে দিন বর্ম্মা ব্যাঙ্ক, পিপলস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ফেল হওয়ায় কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

৫। ডাকঘরে টাকা জমা রাখা নিরাপদ সন্দেহ নাই কিন্তু সুদ নাম মাত্র। যে টাকা চাহিবা মাত্র (At call) পাওয়া যায় তাহা সঞ্চয় করা কঠিন বা অসম্ভব।

৬। জমি খরিদ নিরাপদ সত্য কিন্তু খাজানার হিসাবে সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকার বেশী আয় হয় না। দুই এক টাকায় জমি খরিদ হয় না সে কারণ প্রথমতঃ সঞ্চয় না করিলে একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব।

সঞ্চয়ের সদুপায়—১৯১২ সালের ২ আইন অনুসারে প্রতি পল্লীতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিয়া অন্ততঃ দুই এক টাকা করিয়াও তাহাতে সঞ্চয় করুন।

সুবিধা

১। এরূপ অধিক হারে সুদ কোন ব্যাঙ্কই (কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) দিতে পারে না।

২। আমানতকারীগণ ইহার কার্য্য পরিচালনা করায় ইহার শুভাশুভ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

৩। ব্যাঙ্ক সংগৃহীত অর্থ সাধারণ কুসীদজীবিগণ অপেক্ষা অল্প সুদে দাদন করিয়া গৃহশিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

৪। এইরূপ ব্যাঙ্ক (of unlimeted liability) স্থায়ী আমানত (fixed deposit) ভিন্ন অন্যরূপ আমানতের নিয়ম না থাকায় সঞ্চিত অর্থ সহসা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। ঋণ করিতে হইলে অধিক সুদ দিয়া কুসীদজীবির দ্বারস্থ হইতে হইবে না, এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লইবার চক্রবৃদ্ধি সুদ, ম্যাগার, ওয়াশীল ছাট প্রভৃতির ভয় নাই।

৬। এইরূপ ব্যাঙ্কের লাভের টাকা হইতে যে রিজার্ভ ফণ্ড খোলা হয় তদ্বারা গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

৭। গ্রাম্য বারওয়ারি প্রভৃতি নানা তহবিলের টাকা অনেক সময় অনেকে আত্মসাৎ করে। এইরূপ একটী ব্যাঙ্ক নিকট থাকিলে ঐ সকল তহবিলের টাকা উহাতে জমা রাখিয়া উহার তছরূপ-বন্ধ করিয়া অনেক সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

উপরোক্ত আইন অনুসারে স্থাপিত "ধাত্রীগ্রাম কৃষিব্যাঙ্ক কিরূপ কার্য্য করিতেছে বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মাকাল ফল

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

অন্তঃ-সার শূন্য মানবের পরিচয় দিতে হইলে কবিগণ পলাশ পুষ্প, সিমুল, ও মাকাল ফলের তুলনা দিয়া থাকেন, কিন্তু কল্পনার চক্ষে ইহারা যেমনই প্রতিভাত হউক না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে উপেক্ষানীয় নহে।

মাকাল লতা জাতীয় উদ্ভিদ্, ইহার বীজ যে কোন সময়ে রোপণ করিলে লতা জন্মিয়া থাকে, এই লতা অন্য বৃক্ষের আশ্রয়ে উচ্চে উঠিয়া থাকে এবং বহু বিস্তৃত হয়। কোন কোন উচ্চ অট্টালিকার ছাদের রেলিংয়ের উপরে ইহা শোভা বর্দ্ধনার্থে স্থান পাইয়া থাকে, বিবাহাদি আনন্দ উৎসবে ইহার সুপক্ক রক্তবর্ণ ফলগুলি দড়ি দ্বারা গাঁথিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আসর সাজান বা গেট প্রভৃতিতে ঝুলাইয়া দিলে দর্শকের অতীব চিত্তাকর্ষক হয়। এই লতা বৎসরের সকল ঋতুতেই ফল প্রদান করে। এক একটী লতা সযত্নে রক্ষিত হইলে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। এই জন্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে উহাকে "চির যুবতী" লতা বলে। ইহার ফল প্রথমে সবুজবর্ণ ও পাকিলে দেখিতে লাল এবং সুগোল। ফলের আকৃতি হিসাবে মাকাল দুই প্রকার—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। প্রথম শ্রেণীর লতায় যে ছোট ছোট লাল ফল হয়, তাহার ভিতরে দুর্গন্ধময় একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লতায় বড় বড় বেলের মত লাল বর্ণ ফল হয় ও উহার অবরণ কণ্টকময়। এই ফল সুপক্ক হইলে ভিতরের শাঁসও লাল বর্ণ ধারণ করে। উভয় ফলের ভিতরে বীজ থাকে। মাকাল ভারতের প্রায় সকল দেশের বন জঙ্গলে বা বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অযত্ন সম্ভূত, কে কেহ চেষ্টা বা যত্নপূর্ব্বক ইহার গাছ উৎপাদন করে না।

আমরা সাধারণতঃ ইহাকে মাকাল বলিয়া জানি, কিন্তু গ্রন্থ বিশেষে ইহা "রাখল শসা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত চলিত নাম ইন্দ্রবারুণী ও বৃহৎ ইন্দ্রবারুণী। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় ইহার আরও কয়েকটী পর্য্যায় আছে। ইহার হিন্দী নাম ইন্দ্রাবন্ ও বড়ী ইন্দ্রফলা। মহারাষ্ট্রে ইহাকে লঘু ইন্দ্রবন, কাং বেড়ল বলে। কর্ণাটে হামেকে, হিরিয়া হামেকে ; গুজরাটে ইন্দ্রর বাণীবু, আরবীতে হংজল, ল্যাটীন নাম সাইট্রলাস কলোসিন্ত, ইংরাজীতে কলোসিন্থ গোর্ড বলিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভিষক শাস্ত্রে এই উভয়বিধ ইন্দ্রবারুণী সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রবারুনিকা তিক্তা কটুঃশীতায় রেচনী।
গুল্ম পিত্তোদর শ্লেষ্ম ক্রিমি কুষ্ঠ জ্বরাপহঃ॥"

অর্থাৎ মাকাল ফল তিক্ত রস, কটু বিপাক, সারক, লঘু ও বিরেচক ; ইহা গুল্ম, পিত্ত, উদর, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর রোগে বিবিধভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ঔষধ হিসাবে মাকাল ফল ও লতা কবিরাজগণের বিশেষ আদরনীয়। কারণ ইহাদ্বারা নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। এইরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ইহার বিষ নাশক ক্ষমতা আছে বলিয়া সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির চিকিৎসায় এবং বিসূচিকা রোগগ্রস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার পাতা পাঁচনে ব্যবহৃত হয়, এবং শিকড় বিবিধ রোগে লাগিয়া থাকে। সুতরাং ঔষধের জন্যও যদি দুই একটী মাকাল লতা রোপণ করা যায়, তাহা হইলেও লাভ আছে। ইহার বীজ হইতে জ্বালানী তৈল উৎপাদনেরও কথা শুনা গিয়াছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই বীজ ঘানীতে পিষিয়া তৈল বাহির করে ও প্রদীপে জ্বালায়। সুতরাং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কারণ যখন এত সহজে এই ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন ইহার বীজ সংগ্রহে বিশেষ কোন বিঘ্ন নাই।

শর্করা উৎপাদনকারী উদ্ভিদ

শর্করা (চিনি)—নানাজাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয় ; আরবীও ফারসীতে চিনির নাম শক্কর, গ্রীকে সাকেরন, সংস্কৃতে শর্করা এবং ইংরাজী সুগার নাম শর্করারই অপভ্রংশ। সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষেই ইক্ষুচিনির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপরে চীন, পারসীক, আরব ও রোমানজাতিরা ইহার তথ্য অবগত হয়। কথিত আছে মহাবীর আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়-কালে গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিলে সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষদণ্ডের (ইক্ষুর) মধ্যে মধুর স্তায় মিষ্টরস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সম্রাট নিরোর রাজত্বের অনেক পূর্ব্বে

পাশ্চাত্য জাতীয়েরা চিনির ব্যবহার করিত, কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরাজেরা চিনির অধিক ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসই ইয়ুরোপের প্রধান চিনির বন্দর ছিল।

ইক্ষু, বিট, খর্জ্জুর, তাল, আরেঙ্গা ক্যারিওটা নারিকেল, মহুয়া, মেপল্ ভূট্টা, নীল, এবং নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে চিনি পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে উৎপন্নের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধুনা, ইক্ষু পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মিতেছে, তন্মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, জামেকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ডেমারারা, ফিজি, জাভা, প্রণালী উপনিবেশ, মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক ধনী কোম্পানী ব্যবসায় হিসাবে ইহার প্রচুর চাষ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর, গ্রীস, ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা, জাপান, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই তত্তৎ দেশীয় অধিবাসী-দিগের ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, অন্য কোন দেশে অধিক পরিমাণ রপ্তানী হয় না, কিন্তু ভারতবর্ষে আজকাল ইহার বিপরীত হইতেছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, নেদারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রীয়াতে প্রচুর পরিমাণ বিট চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ইক্ষু ব্যতীত খর্জ্জুর, তাল, নারিকেলবৃক্ষ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে খর্জ্জুর চিনির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; মহুয়া এবং নিম্ব হইতে চিনি বাহির হইলেও তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কেবলমাত্র মদ্য ও ঔষধের নিমিত্ত তাহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। এ দেশের খর্জ্জুরের ন্যায় সিংহলে ক্যারিওটা ইউরেন্স এবং আন্দামান ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আরেঙ্গা স্যাকারিফেরা নামক তালজাতীয় দুইপ্রকার এবং আমেরিকা ও জাপানে মেপল নামক উদ্ভিদ হইতেও চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় মেপল্ জন্মে, এ পর্য্যন্ত ইহাদের চিনি বাহির করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই; এই সকল উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, এজন্য ব্যবসায় হিসাবে ইহাদের চাষ লাভজনক নহে।

ইক্ষু, শর, খাগড়া ইত্যাদির ন্যায় জলাভূমির উদ্ভিদ; শতভাগ সরস ইক্ষুদণ্ড শুষ্ক করিলে ২৫ ভাগ দৃশ্যমান সৌত্রিক পদার্থ পাওয়া যায়, এজন্য ইহার চাষে জলই প্রধান আবশ্যকীয় বুঝিতে হইবে; ইক্ষুর সফল চাষ করিতে হইলে বৃহৎ জলাশয়, নদী বা বিল বা ইন্দারা প্রভৃতি সমীপে স্থান নির্ব্বাচন করা উচিৎ; জলাভাব ঘটিলে রোপণের দিবস হইতে ১৬ ভাগ জলের মধ্যে আবশ্যক মত জল প্রতি তিন মাস অন্তর সেচন করিতে পারিলে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। জলাভূমির গাছ হইলেও মানব মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী নানাদেশে ও নানা অবস্থায় চাষ করিয়া ইহার প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছে। কোথাও কোথাও বিশেষ উন্নত প্রণালীমতে কর্ষিত হইয়া ইহা এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে, যে তখন আর তাহাকে পূর্ব্বতনদিগের বংশধর বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখন তাহারা আর আদি স্থানে কোনরূপে জন্মিতে চাহে না, জন্মিলে সহসা

দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত হয়, এই কারণ বশতই বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই।

বহুপ্রকারের ইক্ষু দৃষ্ট হয়, যথাসম্ভব তাহাদের নাম ও পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১। কাজলা—শুষ্ক দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে, চাষে জলসেচনের আবশ্যক হয়। এই জাতীয় ইক্ষু বেগুনেরঙের, দৃঢ়ত্বক বটে কিন্তু শামসাড়া অপেক্ষা কিছু কোমল ও ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়; রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক; উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় উৎপন্ন হয়। নীলের সিটী, গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসারে ইহা ভাল জন্মে। নদীয়া, যশোহর, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি জিলায় বিস্তর কাজলা আখের চাষ হইয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ১৫।২০ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

২। কাজলী—রাজসাহী জিলায় এই ইক্ষু জন্মে, নাম কাজলীখাগড়া; বর্ণ লাল্চে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয়; দীর্ঘে ৪ হস্ত ও সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে সুন্দর বৰ্দ্ধিত হয়। রাজহাহী জিলার অনেক স্থানে বিনা সারেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে; বিঘাপ্রতি ১২।১৫মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহা কাজলারই প্রকার ভেদ; দক্ষিণ বিহার অঞ্চলেও উচ্চভূমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

৩। খড়ি—এই জাতীয় ইক্ষু বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিম উভয়ত্রই জন্মে ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প রোগপ্রবণ; বর্ণ সবুজের উপর সাদাটে, পাকিলে ফিকা হরিদ্রাবর্ণ, কঠিনপ্রাণ (Hardy). ঈষৎ স্থূলকায় ও শীঘ্র বৰ্দ্ধিত হয়, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া সহজে রোগ বা কীটাক্রান্ত হয় না, ৪।৫ বৎসরকাল সমভাবে ফলিয়া থাকে এবং উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। ইহার রসে মিষ্টতা অধিক, বিঘাপ্রতি ১৫।২০মণ উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। বৰ্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ও লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। ধলসুন্দর—কেহ কেহ ঢালসুন্দরও বলিয়া থাকেন; যশোহর, খুলনা, বরিশাল, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পবিস্তর চাষ হইয়া থাকে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়, শাদাটে বর্ণ সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে; ইহা হইতে উত্তম গুড় উৎপন্ন হয়।

৫। ইখড়ী—ফরিদপুর অঞ্চলে জন্মে; বর্ণ শ্বেতাভহরিৎ অত্যন্ত কঠিনত্বক; দুই হাত জলে ডুবিয়া থাকিলেও গাছ মরে না। বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ বালির দানার স্থায় শুষ্ক গুড় পাওয়া যায়।

৬। খাগী—পূর্ব্ববঙ্গে ইহা নিম্ন জলাভূমিতেই জন্মিয়া থাকে।

৭। কুলোড়—বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পূর্ব্বে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইত; সরস

ও অত্যন্ত নিম্নভূমিতেই ভাল জন্মে। বর্ণ মেটে খড়িরঙ, গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও সরুজাতীয় এবং ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রন্থিপূর্ণ। বিঘাপ্রতি ৮।১০ মণ উত্তম গুড় পাওয়া যায়।

৮। শামসাড়া—উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়, ফিকা হরিদ্রাবর্ণ, মোটাজাতি ও দৃঢ়ত্বক; ত্বকের কোন অংশ এক প্রান্ত হইতে টানিলে সমস্তটী গাঁটশুদ্ধ সহজেই উঠিয়া আসে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, পুঁড়ী ইক্ষুর ন্যায় ইহা হইতে প্রচুর রস পাওয়া যায়, রসে মিষ্টতা অধিক, উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় জন্মে। রেড়ীর খইল, গোময় ও গোমূত্র-সারে ইহার ফলন অধিক হয়; প্রথমে বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করিতে হইবে, পশ্চাৎ যেমন গাছ বাড়িতে থাকিবে ততই নিড়ানি করিয়া প্রত্যেক নিড়ানির সময়ে চূর্ণিত খইল গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিয়া আবশ্যকমত জলসেচন করিতে হইবে। কৃষকপত্রে ইতিপূর্ব্বে শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন—যে তিনি বিঘা প্রতি শামসাড়া ইক্ষুর পাকী ৬০মণ গুড় পাইয়াছেন; বস্তুত শামসাড়ার যদি এতাদৃশ অধিক ফলন হয়, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু, কারণ বৈদেশিক রসবহুল ইক্ষু হইতে গড়ে একারপ্রতি ৬ টনের উপর গুড় পাওয়া যায় না (একএকার প্রায় তিনি বিঘা জমী, একটন ২৭½)। এত পরিমাণ ফলন না হইক সাধারণতঃ সার দিয়া রীতিমত চাষ করিতে পারিলে শামসাড়ার বিঘাপ্রতি ৪০মণের উপর গুড় পাওয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক; আমাদের দেশে শামসাড়ার নিম্নে কাজলা ও খড়ি ইক্ষু পরিগণিত হয়।

৯। পুঁড়ী—শাস্ত্রে ইহার নাম পৌণ্ড্রক্ষু; বঙ্গদেশের মধ্যে সব্জী চাষে পুঁড়োদের ন্যায় কেহ উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, সম্ভবতঃ মালদহের পুঁড়ো (পৌণ্ড্রক) জাতিরাই ইহার উন্নতিসাধানকর্ত্তা এজন্য ইহার পুঁড়ী নাম হইয়াছে, অথবা পৌণ্ড্র দেশোৎপন্ন ইক্ষু এজন্য পৌণ্ড্রক্ষু নাম হইয়াছে। রঙ ফিকা হরিদ্রা, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, ত্বক অত্যন্ত কঠিন নহে, স্থূলকায় ও রসবহুল এবং প্রচুর সারযুক্ত সরস ভূভাগেই ভালরূপ জন্মে। বিঘাপ্রতি ২০মণেরও উপর গুড় পাওয়া যায়। সাহারানপুর অঞ্চলে, এই জাতীয় পুরী বা পুণ্ডানামক একপ্রকার ইক্ষু জন্মে, তাহা সাধারণতঃ ৮ হস্তেরও উপর দীর্ঘ হইয়া থাকে; ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। অনেকে এই জাতীয় ইক্ষুগুড় অপেক্ষা কাঁচা খাইবার নিমিত্ত মনোনীত করেন।

১০। পুরাকুহিয়া—আসামে সাদা ও লালচে বর্ণের এই নামের দুই প্রকার ইক্ষু জন্মে; ইহারা কোমলত্বক ও স্থূলকায়, কাঁচা খাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সরস দোঁয়াশ মাটীতে ভাল জন্মে ও একই ভূমিতে একাদিক্রমে ১০।১২ বৎসর জীবিত থাকে। এই জাতীয় ইক্ষু ১২ হস্তের উপর দীর্ঘ হয়, পাঁব ৬।৭ ইঞ্চি দীর্ঘ অত্যন্ত স্থূল, ব্যাস প্রায় ২½ ইঞ্চি।

১১। বোম্বাই—ইহা শামসাড়ারই মত, তবে কিছু স্থূলকায়, কোমলত্বক এবং কীট ও রোগাদি কর্ত্তৃক শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া পড়ে; দোয়াঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। এদেশে সাধারণতঃ কাঁচা খাইবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়।

১২। সাঁচিকুশর—কেহ কেহ সাচিবোম্বাইও বলিয়া থাকেন। ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর অল্পবিস্তর চাষ হয়। বর্ণ উজ্জল সোণালি, মধ্যমরূপ দৃঢ়ত্বক, মোটা জাতীয় ও অত্যন্ত রসপূর্ণ; গাছ ৩।৩½ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না; উচ্চ দোয়াঁশ ও মেটেল জমিতে সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। রসে মিষ্টতা অধিক ও অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় দানাদার গুড় উৎপন্ন হয়।

১৩। লাল ইক্ষু—আসামে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও কঠিনপ্রাণ; ইহাতে রসের পরিমাণ ও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। সকল জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা ইহা নিম্নভূমিতেই ভাল জন্মে।

১৪। কেতারি—বিহার হইতে সাঁওতালপরগণা পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই অল্পবিস্তর ইহার আবাদ হইয়া থাকে; গাছ ৩।৪ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না, বর্ণ ফিকা হরিদ্রাভ সবুজা, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক, কঠিনপ্রাণ ও অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা কিছু স্থূল; রস পরিমাণে অল্প জন্মিলেও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কলে ইহার রস স্বল্পায়াসেই গলিত হয়। উচ্চ এঁটেল দোয়াঁশ মৃত্তিকাতেই ভাল জন্মে; ইহার চাষে লাভ আছে।

১৫। খোলোই—অত্যন্ত স্থূলকায় এবং লালচে রঙ, রস প্রচুর কিন্তু মিষ্টের ভাগ অল্প; অত্যন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি পায়; নাগপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হয়।

১৬। পানসাহী—গাছ ৪।৫ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না, বর্ণ শাদাটে, সরুজাতীয় ও অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ, অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উচ্চভূমিতেই ভাল জন্মে; বিঘাপ্রতি ১৫।১৬মণ গুড় পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চাকীগুড়ের জন্য ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহার চাষে লাভ আছে। বাদসাহদিগের পানের নিমিত্ত ইহার চাষ হইত, এজন্য পানসাহী নাম হইয়াছে।

১৭। রেওা-গাছ ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ হয়, হরিদ্রাবর্ণ পাকিলে পাঁশুটে রঙ ও অপেক্ষাকৃত মোটাজাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে। বিহারের পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশসমূহে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সার গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার চাষ লাভজনক।

১৮। নাঙ্গা—ত্রিহুতের পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর চাষ হয়; গাছ ৪।৫ হস্ত উচ্চ হয়, মধ্যম কোমলত্বক ও মোটাজাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে এবং নিতান্ত নীরস ভূমিতেও সহজে মরে না কিন্তু সহজেই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু, রসে মিষ্টতা অধিক এবং সূক্ষ্ম অথচ দানাদার চিনি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়।

১৯। ভুর্লী—বিহার অঞ্চলে ইহার প্রচুর চায হয়; ইহা পূর্ব্বোক্ত রেগুা ও পানসাহীর মত, তবে আরও দীর্ঘে বর্দ্ধিত হয়, পত্রও কিছু বৃহত্তর ও কঠিনপ্রাণ; উচ্চ চিকণ মৃত্তিকাতে সুন্দর জন্মে এবং প্রচুর জলসেচনের আবশ্যক হয়; এতদুৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২০। লালগেণ্ডা—গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়, রক্তবর্ণ, কোমলত্বক ও স্থূলকায় কিন্তু তত দৃঢ়প্রাণ নহে; বেতিয়া, চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ইহার চাষ হইয়া থাকে, ইহা হইতে সুন্দর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে গুড় অপেক্ষা কাঁচা খাইবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

২১-২২। ধাউর ও মাতনা—এই দুই জাতীয় ইক্ষু সাজাহানপুর অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়; গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও কঠিনপ্রাণ; উচ্চ এঁটেল জমিতে ভাল জন্মে, প্রচুর জবসেচনের আবশ্যক হয়; বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহাদের রসে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২৩। দিকুচর—সাহাজানপুর অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে; গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়; স্থূলকায় ও কোমলত্বক এজন্য কীটাদি কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হয়; ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে।

২৪। সিবারি—গোরখপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়, এঁটেল নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে; গাছ ৫।৬হস্ত দীর্ঘ হয়, বর্ণ ফিকা সবুজাহলদে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয়; ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ রস পাওয়া যায় এবং উৎকৃষ্ট শুষ্ক গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

২৫। ধানী—উত্তরপশ্চিম ও সাজাহানপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে; গাছ দীর্ঘকায়, দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয়; এঁটেল অথচ নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক এবং উৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৬—২৭। হালকাভূ (Grass cane) এবং হলদে উখ (Straw cane)—বোম্বাই অঞ্চলে জন্মে, ইহারা দৃঢ়ত্বক, কঠিনপ্রাণ ও সরুজাতীয়; এঁটেল নিম্ন ভূমিতেই ভাল জন্মে; জলে প্লাবিত হইলেও গাছ মরে না; গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৮—২৯। রেস্তালি, পুটাপুটি—মান্দ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে এই দুই জাতীয় ইক্ষু জন্মে; উর্ব্বরা দোয়াঁশ ভূমিতে সুন্দর উৎপন্ন হয় ও গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

৩০। চীনা (China) বিদেশীয় ইক্ষুর মধ্যে ইহাই এদেশের জলবায়ু সহ্য হইয়া গিয়াছে; অত্যধিক বৃষ্টি বা শুকায় ইহার কোন হানি হয় না; যেখানে কোন জাতীয় ইক্ষু জন্মে না তথায় ইহা সুন্দর জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া কীট বা শৃগালাদি পশু কর্ত্তৃক ইহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। বিহারের নীলকরেরা এই জাতীয় ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হয়।

৩১। হেমজা—গোরখপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে, চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশে ইহা জন্মিতে পারে। বিঘাপ্রতি ২৫ মণের উপর গুড় পাওয়া যায়। ইহার চাষ তত বিস্তৃতিলাভ করে নাই।

৩২। কেল্লার—দেহলী—দিল্লী অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহা হইতে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি প্রস্তুত হয়।

৩৩। কোচীন—দাক্ষিণাত্যের কোচীন প্রদেশে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে; ইহা অত্যন্ত স্থূককায়, ৮৷১০ হস্ত দীর্ঘ ও অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, পাবের ব্যাস প্রায় ৮ ইঞ্চি। রসে মিষ্টতা অল্প, গুড় বা চিনির জন্য, ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে; কাঁচা খাইবারই উপযোগী, বিশেষত এরূপ বিপুলকায় ইক্ষু দর্শনীয় দ্রব্য বটে।

৩৪। বর্ম্মা—ইহা কোচীন ইক্ষুরই মত তবে অনেক সূক্ষ্মকায় কিন্তু দেশীয় সকল ইক্ষু অপেক্ষা স্থূল। সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। অত্যন্ত ভঙ্গুর এজন্য কলে পীড়নের সুবিধা হয় না, রসে মিষ্টতা অল্প সুতরাং গুড় বা চিনি অপেক্ষা কাঁচা খাইবারই উপযোগী।

৩৫।৩৬। বোরবোঁ (Bourbon) এবং ওটাহিটী (Otaheite)—জ্যামেকা, ওয়েষ্টইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; এ দেশে ইহারা ভাল জন্মে না। উপরোক্ত স্থান সমূহে অসংখ্য ইক্ষু-চিনির কারখানা আছে।

৩৭। মরিসস্ (Mauritius) প্রধানতঃ মরিসসদ্বীপেই এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে; কেহ কেহ ইহাকে বোরবোঁ জাতীয় বলিয়া থাকেন কিন্তু অনেকের মতে মালাবার-উপকুল প্রদেশ হইতেই প্রথমে মরিসস্ দ্বীপে নীত হয়, পশ্চাৎ তথায় অসম্ভব উন্নতিলাভ করিয়াছ। এই জাতীয় ইক্ষু বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল ও অত্যন্ত মিষ্টরসপূর্ণ। এদেশে ইহার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

৩৮।৩৯।৪০।৪১। ইয়োলো ভায়োলেট পার্পল ভায়োলেট ষ্ট্রাইপড্ রিবন এবং সিঙ্গাপুর নামক এই কয়েকজাতীয় ডোরাকাটা ইক্ষু জাভা, ফিজি, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়; ইহারা ভারতবর্ষজাত ইক্ষু বটে কিন্তু বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকালকার আমদানী জাভাচিনি ও ব্রাউনসুগার এই কয়েকজাতীয় ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাবরীনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মকায় ইক্ষু সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, সম্ভবতঃ চেষ্টা করিলে ইহাদের চাষ এদেশে সফল হইতে পারে।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিদেশীয় ইক্ষু আদৌ ভারতবর্ষজাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইলেও দেশান্তরে গিয়া ইহাদের আকৃতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত স্থূলকায়, কোমলত্বক, দীর্ঘাকার ও বহুল মিষ্টরসপূর্ণ, এজন্য প্রচুর পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে ইহারা শীঘ্রই কীট ও রোগাক্রান্ত হইয়া

পড়ে ; বহু চেষ্টাতেও ইহাদের চাষ সফল হয় নাই। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ সমূহেই ইহাদের চাষ হয়, কিন্তু এদেশে সমুদ্র হইতে বহুদূর অন্তবর্ত্তী ভূভাগেই ইহাদের চাষ হইয়াছে এজন্য জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাবশতঃ সম্ভবতঃ ইহাদের চাষ বিফল হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ইহাদের সফল চাষের আশা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাকুথা, রেঙ্গড়া, নিবার, কেবাহী, ধাবী প্রভৃতি নানা-জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে, এগুলি তত বিখ্যাত বা উৎপন্ন গুড় তত ভাল নহে। সমগ্র ভরতবর্ষজাত ইক্ষুর সংখ্যা একশতেরও উপর হইতে পারে কিন্তু সকলগুলিই যে পরস্পর বিভিন্নজাতি এরূপ নিশ্চই বলা যায় না। দেশভেদে এবং উৎকৃষ্ট কর্ষণপদ্ধতি অনুসারে পুষ্টিনিবন্ধন একই ইক্ষু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার একই ইক্ষু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ননামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু সাধারণতঃ রক্ত, রক্তাভ কৃষ্ণ, সুবর্ণ, পীত, হরিত, ডোরাকাটা, শ্বেতাভ পীত ও হরিতাভ পীত এই কয়েক বর্ণেরই দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞগণ গুণানুসারে ইক্ষুকে ছয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—(১) বুর্ব্বোঁ। (Bourbon), (২) মাডাগাসকার (Madagascar), (৩) লাল মরিসস্ (Red Mauritius), (৪) ওটাহেটি (Otaheite), (৫) পীতাভ বেগুণে জভা (yellow-violet java), (৬) সোলাঙ্গোল (Salangole)। মান্দ্রাজের সামলকোটা ইক্ষু-পরীক্ষার একটি প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। গভর্ণমেণ্ট এই লাল মরিসস্ ইক্ষু উৎপন্ন করাইয়া সাধারণে তাহার ফলাফল দেখাইতেছেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় লাল মরিসস্ ইক্ষু-চাষ করিলে ভারতে শর্করা উৎপাদন ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

শর্করা উৎপাদনকারী অপরাপর উদ্ভিদ পরিচয়।

বিট—Beta vulgaris—বিটে চিনির সম্বন্ধে বলা যায় যে ইক্ষুর নিম্নেই বিটচিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে; ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি ইয়ুরোপের উত্তরখণ্ডস্থ দেশসমূহে বিট স্বাভাবতঃ প্রচুর জন্মে। অধুনা ইহা যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, ইহার ব্যবহারও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্বল্পমূল্য বলিয়া ইহার আদরও অধিক। বিট হইতে চিনি বাহির হইতে পারে, পূর্ব্বে লোকের এরূপ ধারণাই ছিল না। ১৭৪৭খৃঃঅব্দে সিজিস্‌মণ্ড ম্যাগ্রাফ (Sigismund (Magraff) বিট হইতে সর্ব্বপ্রথম শর্করা বাহির করেন, কিন্তু তখনও ইহার প্রচলনের কোন চেষ্টাই হয় নাই; অনন্তর বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজের অনন্ত বিরোধ ফলে যখন জলে স্থলে ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র উভয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে উৎসন্ন ও লোপপ্রায় হইল এবং চিনির অভাব নিবন্ধন লোকের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল, তখন সম্রাটের সবিশেষ নির্বন্ধাতিশয়ে ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ পুরস্কারের

ঘোষণায় পণ্ডিতগণ বাহুল্যরূপে বিট হইতে চিনি নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু ১৮৩০ সালের পর হইতেই বিটচিনির ব্যবসায়ের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে। নতুবা ইহার অধিক উন্নতি হইত না কারণ তখন শতকরা উৎপন্নের পরিমাণ এত অল্প ছিল যে তাহাতে ব্যবসায় করিয়া লোকের খরচ পোষাইত না।

পূর্ব্বে বিট মানব ও পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বে মিষ্টতা অর্থাৎ শর্করার পরিমাণ অল্প ছিল। চিনি নিষ্কাশন প্রণালী আবিষ্কারকালে ১০০মণ বিট হইতে ১মণ চিনি পাওয়া যাইত, তজ্জন্য খরচা পোষাইত না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্ষণ ও সুমিষ্ট জাতীয় বীট বীজ নির্ব্বাচনপদ্ধতি উত্তরোত্তর অনুসৃত হওয়ায় বিগত ১৫০ বৎসরের মধ্যে বিট এরূপ উন্নত ও মিষ্টবহুল হইয়াছে, যে অধুনা ১০০মণ বিট হইতে ১৫।২০মণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকজাতীয় বিট দেখা যায়, যথা,—

১। সব্জীবিট, Garden or Culinary Beet—এই জাতীয় বিট অনেক প্রকার আছে; ইহারা অত্যন্ত কোমল, মিষ্ট ও আঁশবিহীন (coroless) এবং মানবখাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

২। চার্ডবিট, Seakale or Swisschard Beet—ইহাতে মিষ্টেরভাগ অত্যন্ত অল্প, আমাদের দেশীয় পুঁই বা পালম মত ইয়ুরোপে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদ।

৩। অতিকায় বিট, Beet Mangold Wurzel—প্রধানতঃ ইহা পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, ইয়ুরোপের দুঃস্থ লোকেও ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই গুলির আকার অতি বৃহৎ সাধারণতঃ ৪।৫ সের উপরও ওজনে হয়। পশুগণকে সদ্য ইহা খাইতে দেওয়া হয় না, ২।৩ মাস কাল কোন গৃহে আবদ্ধ বা ভূগর্ভে প্রোথিত রাখিলে তবে ইহা খাইবার উপযোগী হয়।

৪। শর্করাবিট, Sugar Beet—এই জাতীয় বিট হইতেই চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শর্করাবিটের বীজ পাওয়া যায় এবং শাদা জাতীয় শর্করাবিট চিনির নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও সুমিষ্ট।

৫। পালংশাক, Beta bengalensis—আমাদের দেশীয় পালমশাকও বিট-জাতীয় উদ্ভিদ। দেশীয় পালমের মূল যেগুলি কোমল হয় তাহা অত্যন্ত মিষ্ট, চেষ্টা করিলে এই পালম্ শাকের আমরা প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে পারি। যে সকল পালমের মূল অত্যন্ত স্থূল ও মিষ্ট পুনঃ পুনঃ কর্ষণযোগে তাহারই উন্নতি করা কর্ত্তব্য।

খর্জ্জুর—Phoenix sylvestris—উৎপন্নের পরিমাণ অনুসারে বিটচিনির নিম্নেই খর্জ্জুর পরিগণিত হইতে পারে; সমগ্র বঙ্গদেশের ব্যবহার্য্য চারিভাগের একভাগ পরিমাণ মিষ্ট আমরা খর্জ্জুর হইতে পাইয়া থাকি। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যায়, কিন্তু বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জন্মে। ভারতবর্ষের অন্যত্র বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মাদকদ্রব্য বোধে খর্জ্জুর রস ও গুড় অপবিত্র সুতরাং ত্যাজ্য; কিন্তু বঙ্গদেশে খর্জ্জুরগুড় ইক্ষু অপেক্ষাও সুস্বাদুবোধে ব্যবহার হইয়া থাকে। খর্জ্জুর হইতে অতি উৎকৃষ্ট দানাদার গুড়, চিনি, নলেন মাতগুড় ও পাটালি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; এই গুড় অধিক দিবস রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এজন্য আমাদের দেশে শীতকালেই পায়স পিষ্টকাদি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য খর্জ্জুর গুড় হইতেই প্রস্তুত হয়, বস্তুতঃ এ সকল দ্রব্য ইক্ষুগুড়ে প্রস্তুত দ্রব্য হইতেও অধিকতর সুস্বাদু। ভাতবর্ষের অন্যান্য স্থানে খর্জ্জুর হইতে গুড় অপেক্ষা তাড়ী প্রস্তুতের প্রথা দেখা যায়। শুষ্ক পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গে খর্জ্জুরের চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। ৫০টা খর্জ্জুরবৃক্ষ থাকিলে একটী প্রকাণ্ড গৃহস্থের বাৎসরিক গুড় কিনিতে হয় না, ৫০০ বা ১০০০ গাছ একটী সুন্দর আয়ের বিষয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর—Phoenix dactilifera—ইহা শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ নহে, পৃথিবীর উষ্ণকোটীবন্ধেই প্রচুর উৎপন্ন হয়; প্রথমে আরব ও মিশরদেশেই এই জাতীয় খর্জ্জুর দেখা যাইত, এখন পৃথিবীর প্রায় সকল উষ্ণদেশেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অধুনা আমেরিকার যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অল্প বিস্তর ইহার চাষের চেষ্টা চলিতেছে; এতদ্ব্যতীত বালুচিস্থান, পারস্য, এসিয়া মাইনর, মরক্কো, আলজিরিয়া, প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সরস শীতলস্থানে ইহার গাছ সতেজে বৃদ্ধি পাইলেও ফল বিশেষ মাংসল ও সুপক্ক হয় না; বাঙ্গালাদেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে যেরূপ ৮০।৯০ ডিগ্রি উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, তদপেক্ষা অল্প উত্তাপে পিণ্ডখর্জ্জুর মাংসল, মিষ্ট ও সুপক্ক হয় না। দেশ অতিশয় উষ্ণ অথচ ভূমি সরস, ঈষৎক্ষারযুক্ত ও বালিয়াঁশময় হইলে পিণ্ডখর্জ্জুর সুন্দর উৎপন্ন হয়; দোয়াঁশ ও এঁটেল মৃত্তিকাতেও ইহা জন্মিতে পারে; নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস ভূমিতে ইহা আদৌ জন্মে না; বৃক্ষমূল হইতে ৭।৮ হস্তের মধ্যে জলসঞ্চার না থাকিলে ক্রমাগত জলসেচন করিয়া গাছ বাঁচাইবার চেষ্টা করা বৃথা। জঙ্গল ও মরুদেশস্থ নদীতীরবর্ত্তী সিকতাময় ভূমিতে ইহার চাষে সাফল্য লাভের আশা করা যাইতে পারে। অধুনা ভারতবর্ষের সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষের চেষ্টা চলিতেছে, তন্মধ্যে সিন্ধু ও পঞ্জাবেই ইহার চাষ কতক সফল হইয়াছে। বঙ্গদেশে সখের হিসাবে কাহারও কাহারও উদ্যানে এই জাতীয় দুইচারিটা গাছ দেখা যায়; সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের অজল

দামোদর ময়ূরাক্ষী এবং তাহারও পশ্চিমে শোননদীর উপকূলবর্ত্তী ভূমিতে ইহার চাষ হইতে পারে।

কারিওটা ইউরেন্স ... Caryota urens.

আরেঙ্গা স্যাকারিফেরা ... Arenga saccharifera.

সিংহল, আন্দামান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, প্রণালী উপনিবেশ প্রভৃতি দেশে তালজাতীয় এই দুইপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে। অস্মদেশীয় তাল, নারিকেল, খর্জ্জুরাদির ন্যায় ইহাদিগের রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে; এদেশে ইহারা সুন্দর জন্মিতে পারে; দেখিতে অতি সুদৃশ্য বলিয়া এই দুই জাতীয় বৃক্ষ সখের হিসাবে রোপিত হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্রমাসে পাতাসারযুক্ত টবে বীজবপন ও আবশ্যকমত জলসেচন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়; চারা কিছু বড় হইলে অন্য টবে উঠাইয়া দুই এক বৎসরকাল যত্ন করিবার পর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে নিরূপিত ভূমিতে ১০।১২ হস্ত অন্তর রোপণ করিলে বাঁচিয়া যাইবে ও বাড়িতে থাকিবে। ১০।১২ বৎসরের ন্যূনে ইহারা গুড় প্রস্তুতের উপযোগী হয় না।

———:*:———

শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল।

গভীর কর্ষণে লাভালাভ

জমি গভীর কর্ষণে লাভ অনেক। লাঙ্গল দ্বারা জমি ইচ্ছামত গভীর করিয়া চষা যায় না। এই জন্য ধান কলাই শরিষা প্রভৃতি গুচ্ছমূল শস্য চাষে জমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত হইতে পারে কিন্তু আলু, মূলা, ওল, কচু, শালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি খন্দ উৎপাদন করিতে হইলে লাঙ্গল দ্বারা জমি না চষিয়া কোদাল দ্বারা কোপান আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ভারতীয় লাঙ্গল দ্বারা জমি মোটে ৩ হইতে ৫ ইঞ্চ পর্যন্ত গভীর কর্ষিত হয়। বাঙ্গলা দেশে কোদাল দ্বারা ১ কোপে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চ মাটি কোপান যায় এবং দুই কোপের হিসাবে কোপাইলে ১৮ ইঞ্চ পর্যন্ত জমি কোপান যাইতে পারে। সমুদয় ফলের গাছই গভীর মাটি খুড়িয়া আল্‌গা মাটির উপর বসান বর্ত্তব্য নতুবা গাছের কোমল শিকড় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্নের নরমস্তরে পৌছিতে পারে না। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফলের গাছ সারবান মৃত্তিকা পাইলে মাটির ২০ ফিট নিম্নদেশ পর্য্যন্ত শিকড় চালায়। নারিকেল, শুপারি খেঁজুর প্রভৃতি তাল জাতীয় বৃক্ষাদির শিকড় মাটির ৮।১০ ফিট নিম্নদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া ফলের বাগানের সারা বাগানটা ১০ বা ২০ ফিট্ গভীর করিয়া খুড়িয়া আল্‌গা করিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই। কিছু দূর পর্যান্ত মাটি আল্‌গা পাইলেই বৃক্ষ, লতাদি তাহাদের নিজেদের কার্য্য নিজেরাই করিয়া লয়। নরম শিকড়ওয়ালা গাছের কার্য্যে মানুষকে কিছু অধিকতর সাহায্য করিতে হয়। মানুষ যদি কলা পেঁপের বাগান করে তবে তাহার জমির ২ ফিট আন্দাজ কোপাইয়া তৈয়ারি করিয়া লইলে ভাল হয়। গোলাপ, জুঁই, মল্লিকার ক্ষেত করিতে হইলেও লোকে লাঙ্গলের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু লাউ, কুমড়া, শসা অথবা ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লঙ্কা চাষের সময় লোকে কোদালের সাহায্যে চাষ করে না বা করিলেও চলে না।

বড় বড় আগাছা, কুগাছা তুলিতে হইলে কোদালের সাহায্য আবশ্যক কিন্তু ঘাস মারিতে লাঙ্গলই যথেষ্ট। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনতি গভীর চাষে সব ঘাস মরে না। ৯ হইতে ১২ ইঞ্চ মাটি কর্ষিত না হইলে কোন কোন ঘাস মারা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে একবার লাঙ্গলে চষিলে কোন কাজই হয় না, ২।৩ বার চষিলে তবে কাজ হয়। একবার কোদালে কোপাইয়া তারপর লাঙ্গল দিয়া চষিলে জমির পাইট আরও ভাল হয়। কোদালে ঘাসের চাপড়াগুলি উল্‌টাইয়া গেলে তাহা রৌদ্রে, হাওয়ায় বেশ আল্‌গা হইয়া যায়। ইহার উপর লাঙ্গল চালাইলে মাটি সর্ব্বতোভাবে চাষের উপযুক্ত হয়। এই প্রণালীতে চাষ করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ, চাষীরা এত খরচের ব্যাপারে অগ্রসর হইতে পারে না। অপারগের পক্ষে সতন্ত্র কথা কিন্তু এরূপ গভীর চাষে লাভ যথেষ্ট।

মান্দ্রাজে জমির গভীর কর্ষণের জন্য ক্রোবার নামক এক প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার হয়। তাহাতে মাটি ১০ হইতে ১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত খোদিত হয়। বাঙলা দেশে সেই লাঙ্গল চালান যায় কি না দেখা কর্ত্তব্য। মাটির অবস্থা বুঝিয়া ভারতে নানাস্থানে বিভিন্ন রকমের লাঙ্গল ব্যবহার হইতে দেখা যায়। মিরাট অঞ্চলে এক প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার হয়, তাহার অবয়বের অধিকাংশস্থল লৌহ মণ্ডিত। লাঙ্গলখানি ওজনে প্রায় ৩॥০ মণ ভারি এবং লাঙ্গল টানিতে ৩ জোড়া বলদ যুতিতে হয়। বাঙ্গালার লাঙ্গল অপেক্ষা বিহারের লাঙ্গল ভারি এবং মিরাটের লাঙ্গলের মত বৃহৎ ব্যাপার না হইলেও বাঙলার লাঙ্গল অপেক্ষা দৃঢ় ও গুরুভার। বিহারের কঠিন মাটিতে এই প্রকার লাঙ্গল না হইলে চলে না কিন্তু বঙলার সরস নরম মাটির জন্য বাঙলার লাঙ্গলই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

আবার বাঙলার মধ্যে রঙপুর অঞ্চলে প্রচলিত লাঙ্গল বালকের খেলার জিনিষ বলিলে বলিতে পারা যায়; তাহাতে জমির চাষ নাম মাত্র হয়, উপরিস্তরের মাটি ২।২॥০ ইঞ্চ মাত্র আঁচড়াইয়া যায়। ইহাতে যে কর্ষণ কার্য্য কি প্রকারে সম্পূর্ণ হয় তাহা আমাদের ধারণায় আসে না এবং মনে হয় এতদঞ্চলের চাষীরা আলস্য বশতঃ চাষাবাদের কোন উন্নতির কথা ভাবে না, তাহারা চিরাগত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চাষে লাগিয়া আছে মাত্র। বিহার, ছোট নাগপুরের চাষীদের কিন্তু চাষে দৃঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। তাহারা জমির গভীর কর্ষণের জন্য সমুৎসুক, তাহারা একই আঁচড়ের উপর দিয়া পর পর দুইখানি লাঙ্গল চালাইয়া এক চাষেই দেশী লাঙ্গলে জমি ৯ ইঞ্চ পর্য্যন্ত গভীর কর্ষণ করে।

জমি গভীর কর্ষণে অধিকাংশস্থলে উপকার আছে ইহা চাষীরা যে না বুঝে তাহা নহে। হলকর্ষণ অপেক্ষা জমি কোদাল কোপান করিতে পারিলে যে আরও উপকার হয় তাহা তাহাদের বুঝাইবার আবশ্যক নাই কিন্তু তাহারা দরিদ্র এই কারণে তাহাদের খরচ বহুল কৃষি প্রথায় আগ্রহ আসে না। ধনীর টাকা চাষীর পরিশ্রমের সহিত যোগ হইলে তবে আমরা চাষের সম্পূর্ণ উন্নতির আশা করিতে পারি নতুবা চাষের উন্নতি বৃথা

স্বপ্ন মাত্র। গভীর কর্ষণে কি লাভ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়,—বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শিকড় আল্‌গা মাটী পাইলে অধিক স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন স্থান হইতে তাহারা আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় এবং অধিক আহার পাইলে বৃক্ষ লতা স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলদানে উন্মুখ হয়। আর একটী বিশেষ লাভ এই যে মাটী নিম্নে কতকদূর পর্য্যন্ত আল্‌গা ও গুড়া হইয়া থাকিলে জমিতে অধিক রস সঞ্চিত হয়। মাটি যত গুঁড়া হইয়া স্পঞ্জের মত হইবে ততই তাহাতে রস সঞ্চিত হইবার সুবিধা হয়। কঠিন দৃঢ় সম্বন্ধ মাটিতে রস সঞ্চার হইতে পারে না। জমির উপর জল দাঁড়াইয়া থাকিবে না, জমির নিম্নস্তরে এমন পয় প্রণালী থাকিবে যে নিচে জল দাঁড়াইয়া মাটি কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইবে না অথচ কৈশিকাকর্ষণ ও বায়ু মণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া জমিটি সরস থাকিবে, দৃশ্যতঃ মাটিতে জলের চিহ্ন দেখা যাইবে না অথচ মৃত্তিকা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলে সরস অনুভব হইবে, জমির এই অবস্থাই চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকুল। গভীর কর্ষণ দ্বারা জমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জমির মাটি গভীর কর্ষণ করিয়া সেই মাটি মৈ দ্বারা উত্তমরূপে চাপিয়া রাখিতে পারিলে জমিতে সহজেই রস রক্ষা করা যায়। জলজ শস্য হৈমন্তিক ধান্যাদির সময় জমি জলে কাদায় চষিতে হয় বটে কিন্তু শুষ্ক অবস্থাই জমির চাষ কারকিতের প্রকৃষ্ট সময় এবং বর্ষাপেক্ষা শীতে গ্রীষ্মে জমি চষিয়া তৈয়ারি করিবার সুবিধা হয়।

গভীর কর্ষণে উপকার সত্য কিন্তু সর্ব্বদা একনিয়মে কার্য্য করা চলে না, জমি নিম্নস্তরে বালি বা কাঁকর থাকিলে গভীর কর্ষণ দ্বারা বালি কাঁকর উপরস্তরে উঠান ঠিক নহে। জমির আগাছা কুগাছা মারিবার জন্য গভীর কর্ষণ আবশ্যক কিন্তু এই কার্য্য বীজ বপনের কিছুকাল পূর্ব্বে সারিয়া মাটি চাপিয়া রাখিতে হয়। আউস ধান, পাট প্রভৃতির বীজ বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে জমি ৩ ইঞ্চ কর্ষণ যথেষ্ট, তাহার অধিক খোদিত হইলে ক্ষতি হয়। রবিশস্য চাষের সময় জমির গভীর কর্ষণ ক্ষতিকারক। এই সময় গভীর চাষে জমির রস উবিয়া যাইয়া জমিকে নিরস করিয়া ফেলে। কখন কখন দেখা যায় যে ২' বা ৩' ইঞ্চ মাটি আঁচড়াইবার মত চষা ঠিক নহে বটে কিন্তু ৫।৬ ইঞ্চ গভীর চষা হইলেই যথেষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে কানপুর গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ৯।৫।৩ ইঞ্চি গভীর চষিয়া গম উৎপন্ন করা হইয়াছিল এবং বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ৫ ইঞ্চ চষিলেই গমের জমি তৈয়ারি হইতে পারে। অনাবৃষ্টির কালে গভীর চাষ বরং ভাল কিন্তু জমির শুষ্কাবস্থায় যে নিয়ম খাটে সরস জমি চাষে সে নিয়ম অবলম্বন করিলে চলে না।

আমরা বলিয়াছি যে লাঙ্গলের চাষ অপেক্ষা কোদালির চাষ ভাল কিন্তু সব খন্দে কোদালির চাষ চলে না বা খরচও পোষায় না। আলু কিম্বা আখ চাষে কিম্বা ফলের বাগানে কোদাল চালানতে লাভ আছে কিন্তু ব্যয়াধিক্য তাহার একমাত্র অন্তরায়।

সেইজন্য পাখাওয়ালা মাটি উল্‌টান লাঙ্গল বিশেষ কাজের বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কোদাল অপেক্ষা অনেক কম খরচে গভীর চাষ হয়। যেখানে জমির ঘাস বা আগাছা মরিতে হইবে, যে জমিতে ভারতীয় সাধারণ লাঙ্গল চালাইবার পূর্ব্বে কোদাল দ্বারা না কোপাইলে চলে না সেই জমিতে পাখাওয়ালা লাঙ্গল চালান খুব সুবিধাজনক কিন্তু আবাদী জমিতে, যে জমিতে বৎসর বৎসর শস্য উৎপাদন হইতেছে তাহাতে পাখা উল্‌টান লাঙ্গল চালাইলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। উপরের মাটি বার বার-চাষ দ্বারা বেশ গুঁড়া ও নরম হইয়া থাকে কিন্তু নিম্নস্তরের মাটি অপেক্ষাকৃত শক্ত। নিম্নস্তরের সেই মাটি উপরে উঠিলে সেই মাটিতে কিছুকাল চাষ হয় না। সেই মাটি রৌদ্র, বাতাস পাইয়া যতদিন না সারিয়া যায় ও ভগ্নপ্রবণ হয় ততদিন সে মাটি চাষীরা ভালমতে কাজে লাগাইতে পারে না। ধান, কলাই, মটর, মুগ প্রভৃতি শস্যের জমিতে উপর হইতে ৬।৮ ইঞ্চ নিম্ন পর্য্যন্ত সার সঞ্চিত থাকে সুতরাং গভীর কর্ষণ দ্বারা উপরের মাটি নিম্নস্তরে চলিয়া গেলে ফসলের খাদ্যাভাব ঘটে। গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রে একখণ্ড ধান জমিতে মোটা ধান চাষের উপযুক্ত জল সঞ্চয়ের জন্য উহা হইতে উপরস্তরের ৯" ইঞ্চ মাটি কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। তারপর যথোপযুক্ত চাষ কারকিং করিয়াও ধান রোপণ করাতে যৎসামান্য ধান হইয়াছিল।

বৃষ্টির পর জমিতে 'যো' হইলে তবে তাহাতে চাষ দিতে হয়। জমিতে সঞ্চিত জল ৫।৬ ইঞ্চ নিম্ন পর্য্যন্ত টানিয়া গেলেই দেশী লাঙ্গল চালাইয়া জমির পাইট করিয়া লওয়া যায়। এই সময় নিম্নস্তর হয় ত ভিজা থাকে সুতরাং এইকালে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত খননের চেষ্টা করায় অনিষ্ট আছে। চর জমির চাষে গভীর কর্ষণ আদৌ চলে না কারণ তাহার উপরের কয়েক ইঞ্চ মাত্র মাটি পলি পড়িয়া সারবান ও সরস হইয়া থাকে তাহার নীচের মাটি উপরে তুলিলেই তাহা চাষের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে কাজ করা সকল সময় চলে না, হাতে হাতিয়ারে কাজ করিয়া জমির অবস্থা ভালরূপে বুঝিতে হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।

গৃহ-শিল্প

যে বিষয়েই হউক দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজে করিতে না পারিলেই বিফল মনোরথ হইতে হয়। কোনটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির সরল এবং সহজ উপায় তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে কেবল ঘুরিয়া মরিতে হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই যে বর্ত্তমান সময়ের সূচনা হইতেই আমরা শিল্প শিল্প করিয়া এত বাক্যব্যয় করিতেছি কিন্তু কাহাকেও নামাইতে পারিয়াছি কি? শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের উপায় সম্বন্ধে আমাদের এখন যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাতে "নয় মণ তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না"। যতদিন ইহা চাই, উহা চাই বলিয়া বসিয়া থাকিবে ততদিন যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে।

এ দেশে শিল্প একেবারেই ছিল না এমন ত নয়। পূর্ব্বেও লোকে কাপড় পরিত, পূর্ব্বেও লোকে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেশেই প্রস্তুত করিত। সে সকল শিল্প লুপ্ত হইলেও অন্ততঃ তাহাদের সংস্কার গুলি ত আর দেশ হইতে একেবারে ধুইয়া পুঁছিয়া যায় নাই। আবার সেই সকল শিল্পের প্রবর্ত্তন অসম্ভব এবং বাতুলের চেষ্টা বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে কি লাভ হইবে? পুরাতন কি একেবারেই পরিহার্য্য? সেইরূপ পুরাতন পদ্ধতি আবার চোক কান বুজিয়া চালাইতে পারিলে কখনও কখনও বিশেষ উপকারও দর্শিতে পারে।

বড় বড় কলকারখানা যখন করা যাইবে তখন তাহার কথা। এখন ত দেখিতেছি এ দেশের মাটীতে কলকারখানা বড় টিকিতেছে না। সুতরাং কেবল কলকারখানার আশায় বসিয়া বসিয়া থাকিলে নুন আনিতে পান্তা ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। দেশের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর বসিয়া থাকা চলে না। এই দুর্দ্দশার সময়, দরিদ্রের অন্ন সংস্থান জন্য, নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির অভাব মোচন জন্য ক্ষুদ্র শিল্প, বা গৃহ শিল্প (Cottage industry) প্রচলিত হওয়া একান্ত দরকার।

শিল্পের কথা উঠিলেই, প্রথমে বয়ন শিল্পের কথা মনে পড়ে। আচ্ছা এই বিষয়ে সে কালের চরকা আমাদিগকে কতদূর সাহায্য করিতে পারে প্রথমে তাহার আলোচনা করা যাউক। চরকায় সূতা কাটা অভ্যাস করিতে তিন মাসের বেশী লাগিতে পারে না। তিন মাস অভ্যাস করিলে যে কোন স্ত্রীলোক ৪০ নম্বরের মত সূতা প্রস্তুত করিতে পারিবে। প্রত্যেক স্ত্রীলোক এক ঘণ্টায় অন্যূন এক ছটাক সূতা কাটিয়া তাঁতে ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে পারিবে। সরু মোটা সব রকমের সূতায় গড়ে প্রত্যেক ছটাকে পরিশ্রমিক খুব কম পক্ষে এক আনা।

চরকায় যে কোন সময় এমন কি রাত্রিতেও কাজ করা যাইতে পারে। গল্প করিতে করিতে, সন্তানকে মাই দিতে দিতেও মেয়েরা চরকা চালাইতে পারে। উপন্যাস যেমন

শিক্ষিতা রমণীদিগের কালহরণে সহায়তা করে চরকাও নিরক্ষরা স্ত্রীলোকের পক্ষে সেইরূপ বিশ্রামের সহচর হইতে পারিবে।

৮ আট বৎসরের মেয়েরাও কিছু দিন অভ্যাস করিলে চরকাতে মোটা সূতা অর্থাৎ কলের প্রস্তুত ২০ নম্বরের সুতার ন্যায় সূতা, যাহা খাতা শেলাই, পুঁথি পত্র বান্ধা, জাল প্রস্তুত, ঘুড়ি উড়ান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তেমন সূতা প্রস্তুত করিতে পারিবে। আবার বৃদ্ধারাও এ কার্য্যে অনুপযুক্ত নহেন।

একটী গ্রামে এক শত স্ত্রীলোককে তিন মাস সূতা কাটা অভ্যাস করাইতে তত্ত্বাবধায়কের বেতন মাসিক ২০৲ হিসাবে ৬০৲ টাকা পড়িবে। কিন্তু তিন মাস অন্তর প্রত্যেক মেয়ে মাসিক যদি একটী টাকাও পায় তবু সে গ্রামে মোটের উপর এক শত টাকা অতিরিক্ত আয় বাড়িল। ইহাতে কি গ্রামের অবস্থার উন্নতি হইবে না?

আমরা খুব কম লাভ দেখাইলাম। কিন্তু কার্য্যকালে প্রত্যেক মেয়ে চরকার অনুগ্রহে মাসিক অন্ততঃ ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ইহা কি অর্থাগমের একটী সহজ উপায় নয়?

একটী চরকার মূল্য খুব বেশী হইলে ২৲ টাকা। দুই টাকা পুঁজিতে অন্ততঃ দশ বৎসর কার্য্য চলিবে। প্রকাণ্ড কলের আশায় বসিয়া না থাকিয়া প্রত্যেক পরিবার যদি এইরূপে নামমাত্র ব্যয়ে এবং অল্পায়াসে দেশে বয়ন শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে সে কার্য্য এই মুহূর্ত্তেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে?

চরকার কাজ শিখাইতে বেশী দিন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। যাহারা কিছু কিছু কাজ জানে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলেই তাহারা সঙ্গিণী বা বাড়ীর অন্যান্য মেয়েকে শিখাইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের দরকারই নাই।

বেশী দিন অভ্যাস করিলে চরকায় এমন সরু সূতা প্রস্তুত হইতে পারে যাহা কলে বা মিলে কখনও প্রস্তুত হইতে পারে না। ঢাকার মসলিম কাপড়ের সূতাই তাহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং চিন্তাশীলতা ব্যতিরেকে শিল্প বানিজ্যেও উন্নতি করা যায় না; বড়ই দুঃখের কথা উক্ত দুই বিষয়েই আমরা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছি। যতদিন না আমরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিব, যতদিন না আমরা ক্ষুদ্র বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিব ততদিন আমাদের কোন কাজেই ফলদায়ক হইবে না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সেই সকল নিয়ম পদ্ধতি ঠিকরূপে জানিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়ম পদ্ধতিকে স্থিরতার সহিত দৃঢ়চিত্তে ধরিয়া থাকিতে হয় নতুবা অকৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী। দেশে অনেক বিষয়েরই আলোচনা হয়, কিন্তু বহু বিষয়েই নিরাশ হইতে হইয়াছে। তাই বলিয়া একেবারে কার্য্যানুষ্ঠান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য

কি? আছাড় না খাইয়া কেহ কি হাটিতে শিখে? যাহা হউক দেশে গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বারান্তরে আমরা তাহা করিব। এই স্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে—দশটী কাজের নাম করা অপেক্ষা একটী আরম্ভ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। তাই আমরা আবার চরকার উপর দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ইউরোপ হইতে আমদানী করা কল না হইলে কাজ চলিবে না এমন কি কথা আছে? ক্ষুদ্র অবজ্ঞাত জিনিসেও সময়ে মহৎ কার্য্য হয়।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।" বাঙ্গালী।

কমলালেবু (Orange)—বাঙলার নিম্ন প্রদেশ কমলার চাষ সম্ভব কি না ইহার মিমাংসা আমরা আজিও করিতে পারি নাই। চাষে বিঘ্ন অনেক এবং কীট ও পশু পক্ষীর হাত হইতে গাছ ও ফল রক্ষা করা কঠিন। কৃষি সম্পদে লিখিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিজ্ঞতা সাধারণের জ্ঞাতব্য। নারেঙ্গালেবু নামে এ দেশে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই নারঙ্গ বা নাগরঙ্গ। নাগ পর্ব্বত রঞ্জিত করিয়া থাকে বলিয়াই, নাগরঙ্গ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। নাগরঙ্গের বাঙ্গালা নাম কমলা। ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের কমলা জন্মে; কিন্তু আসামের খাসিয়া পাহাড়ে যে কমলা জন্মে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাই এদেশে শ্রীহট্টের কমলা নামে প্রসিদ্ধ। খাসিয়া পাহাড়ের কমলার খোসা পাতলা কোয়া রসপূর্ণ, গন্ধ মনোহর এবং স্বাদ সুমিষ্ট ও রসনার বিশেষ তৃপ্তিকর। দার্জ্জিলিং ও নাগপুরের কমলা অপেক্ষা, ইহার আকৃতিও অনেক বড়। শেষোক্ত উভয় স্থানের কমলার ছাল পুরু, রস অল্প এবং অস্বাদ অম্ল-মধুর। নাগপুরের সান্তারা জাতীয় লেবু বৎসরের মধ্যে একবার মাঘমাসে ও আর একবার আষাঢ় মাসে—এই দুইবার ফলে। কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের লেবুর তুলনায়, ইহা অতি নিকৃষ্ট।

বিশেষ যত্নের সহিত কমলাগাছ রোপণ করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারি নাই বাঙ্গলা দেশের অনেকের মুখেই এই কথা শুনা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই কমলা গাছ বেশ জন্মে এবং ফলপ্রসূও হয়; কিন্তু উহার স্বাদ মিষ্ট হয় না। মজুমদার মহাশয় বলেন যে "এদেশে কমলার চাষ করিয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সময় সময় দুই একটা গাছ বেশ সুশ্রী ও তেজাল হইয়া উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করে। এই সব গাছের ফলের আকৃতি বড় এবং স্বাদ অম্ল-মধুর হয় সত্য; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ফল দিয়াই, গাছগুলি মরিয়া যায়। কখনও ইহার অন্যথা হইতে দেখি নাই। আমার মতে, আমাদের দেশে কমলার চাষে হস্তক্ষেপ

না করাই কর্ত্তব্য। তবে সখের হিসাবে, ফলের বাগানে, দুই একটী গাছ রাখা যাইতে পারে।

কলাবাগানের মধ্যে, কলাগাছের সারিতে, কমলাচারা রোপণ করিতে পারিলে, সেই গাছ রৌদ্র ও ছায়াতে বেশ তেজাল হইয়া উঠে। গাছের শিকড় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে পর, কলাগাছের ঝোপ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। প্রখর রৌদ্রে চারা রোপণ করিলে, অনেক সময়ই তাহা মরিয়া যায়। সুতরাং, উক্ত উপায়েই চারাগাছ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কমলাগাছ ২।৩ বৎসরের বড় হইলে, তাহার ২।৪টী সতেজ ডাল ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্তই কাটিয়া ফেলিতে হয়। গাছের গোড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোনরূপ পাইট নাই। নানা প্রকার কীট, বানর, কাক ও তোতাপাখীতে কমলাগাছ ও কমলার বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। নানা উপায়ে বানর ও পাখীর উবদ্রব নিবারণ করা সহজসাধ্য নহে। কমলাগাছে এক প্রকার ছাতারোগ (Fungus disease) জন্মে; ইহাতেও গাছের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। আমি কমলারও চাষ করিয়াছি; আমার বাগানে কমলার গাছে ফলও ধরিতেছে; কিন্তু কিরূপভাবে গাছের পরিচর্য্যা করিলে সুফললাভের আশা করা যায়, তাহা আমি আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং কমলার চাষসম্বন্ধে বেশী কিছুই লিখিবার বা বলিবার নাই।"

উদ্যোগী উদ্যানপালগণকে আমরা চেষ্টায় বিরত হইতে বলি না কিন্তু সর্ব্বদা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিই।

পত্রাদি

সর্পাঘাতে তুলসী—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দত্ত, রামনগর, ২৪পরগণা।

মহাশয়,—

প্রসূন পত্রে দেখিলাম যে সর্পক্ষত মৃতপ্রায় ব্যক্তি তুলসী পাতার রস প্রয়োগে প্রাণ পাইয়াছে। সর্প দংশনের পর রোগী অবশ হইয়া পড়ে—যখন বিষ বৈদ্য আসিলেন তখন রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নাড়ী নাই, কেবল নাভীর নিকট অল্প একটু নড়িতেছে মাত্র। বৈদ্য নিজ হস্তে তুলসী পাতার অর্দ্ধপোয়া রস করিলেন, সেই পাতার রস করিয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন এবং মুখের মধ্যে কণ্ঠে ও নাভিকুণ্ডে যতটা ধরে, পূর্ণ করিয়া দিলেন। প্রাই অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগী নড়িয়া উঠিল এবং মুখের মধ্যে যে

তুলসীর রস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও একটু গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ হইল। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই রোগীকে বিশেষ যত্ন সহকারে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সকলের সম্মুখে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল। তখন তাহার অসহ্য গাত্রদাহ হইতেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য তুলসী পাতার রসের এরূপ অসাধারণ গুণ আছে কি না এবং অনেক প্রকারের তুলসী আছে ইহা কোন তুলসী ?

উত্তর—তুলসীর জরঘ্ন, কফঘ্ন প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। সাধারণতঃ এই সকল রোগে কৃষ্ণ তুলসী পাতার রসই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে বাবুই তুলসীর রস মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। তুলসীর ম্যালেরিয়া জ্বরের, কাশরোগের, প্রমেহ রোগের জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে ইহা বেশ বুঝা যায়। তুলসী পাতার রসে দাদ, চুলকণা, খোস প্রভৃতির কীটাণু নষ্ট হয় ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। তুলসী পাতার রসে বিষক্রিয়া নষ্ট হইলেও হইতে পারে। চিকিৎসকগণ দ্বারা ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। এইরূপ পরীক্ষা যাহাতে হয় তাহার জন্য আমরা চেষ্টায় রহিলাম।

দেওয়ালে আইভি লতা—(Ivy creeper)

শ্রীমনরঞ্জন কর—নৈহাটী, ই, বি, আর

প্রশ্ন—আমি আমার ঘরের দেওয়ালে আইভি লতা তুলিয়া দিয়াছি ইহাতে দেওয়াল বৃষ্টির জলে রসিয়া উঠিবে কি না ?

উত্তর—দেওয়াল রসিয়া উঠিবার কোন আশঙ্কা নাই। এই লতার এত ঘন পাতা হয় যে তাহাতে দেওয়ালে লেপিয়া থাকিবে এবং এক বিন্দু জলও দেওয়ালে লাগিবে না উপরন্তু সূর্য্যের উত্তাপ হইতে ঘরটী শীতল রাখিবে।

বীজ উৎপাদন ও বীজের ব্যবসা—

শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার পোঃ ছলিমমুন্সীর হাট, নোয়াখালী।

প্রশ্ন।—কি প্রকারে বীজের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। বিদেশীয় ভাল বীজ আপনারা সরবরাহ করিতে পারেন কি না ? আপনারা বিদেশী যে ব্যবসায়ীর বীজ আমদানী করেন তাহাদেরই বীজ ভাল বলিয়া জ্ঞাপন করেন। আমাদিগকে বীজ ব্যবসায়ের এজেন্ট করিতে পারেন কি না ?

উত্তর।—বীজ উৎপাদনের জন্য চাষ আবাদ স্বতন্ত্রভাবে করিতে হয়। ফসল বিক্রয়ের দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিলে সেই ক্ষেত হইতে পরবর্ত্তী চাষের জন্য ভাল বীজ উৎপন্ন হইবে না। ভাল বীজ উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা হইলে ক্ষেতের মধ্যে সতেজ গাছগুলিতে যে সকল

উৎকৃষ্ট ফল হইবে সেইগুলি বীজের জন্য পাকাইতে হইবে, সেই সকল গাছ হইতে নিকৃষ্ট ফল তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বাছাই ফল রাখিতে হয়। বীজের মধ্যেও সুপুষ্ট ও তেজস্কর বীজগুলি বাছিয়া লইতে হয়। তবে বীজের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। ইহা দুই এক বৎসরের কাজ নহে ক্রমাগত কিছুকাল ধরিয়া এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে তবে চেষ্টা সফল হয়। বীজ উৎপাদন একটি স্বতন্ত্র কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে অনন্যচিত্ত হইয়া লাগিয়া থাকিতে হইবে।

আমরা বিদেশী বীজ ব্যবসায়ী, সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু বীজ আনাইয়া পরীক্ষা করি এবং সেই সকল বীজ ব্যবসায়ী কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ করেন তাহাও খোঁজ রাখি। যাহার যে বীজ ভাল তাহাই বিজ্ঞাপিত হয়। সটন, ল্যাণ্ড্রেথ, কেলওয়ে, কার্টার, বিস্‌ট প্রভৃতি বীজ ব্যবসায়ীর সকলেরই নিজস্ব ফুল, ফল বা সব্জীর দুই চারিটা ভাল বীজ আছে। আমরা দেখিয়াছি ল্যাণ্ড্রেথের সব্জী বীজটা আমাদের দেশের জল হাওয়ায় অধিকতর উপযোগী। বীজের ব্যবসায়ের এজেণ্ট করিতে কোন আপত্য আমাদের নাই। কিন্তু আমরা সবিশেষ তদন্ত না লইয়া কাহাকেও এজেন্সি দিতে নিতান্ত নারাজ কারণ ইহাতে লাভ কম কিন্তু দায়ীত্ব অতি গুরুতর।

বিলাতি বেগুণ—

এখন অমরা তরকারিতে বা চাটনি প্রস্তুত করিয়া টমাটো খাইতে শিখিয়াছি। য়ুরোপীয়গণ টমাটো অতিবিস্তর ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণা টমাটো খাইলে চেহারা লাল হয়। এ ধারণা অমূলক নহে। রক্ত পাতলা হইলে রক্তে লৌহভাগ কমিয়া গেলে লোকের চেহারা ফ্যাঁকাসে হইয়া যায়। খাদ্যে লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই তখন একমাত্র উপায়, ডাক্তারেরা বলেন—

Tomato—As a food for supplying iron, it is far superior to many of the combination of iron so commonly used as a means of enriching the blood অর্থাৎ রক্তের সংশোধন মানসে লৌহের সংমিশ্রনে যত প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করি, টমেটো তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা আহার এবং ঔষধ—দুই। টমেটো বা বিলাতি বেগুণ এদেশেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

তামাক পাতার মাদকতা—

তামাকের পাতায়, ডাঁটায় একপ্রকার মাদকতা গুণ আছে। তাহা কোন তামাকে অল্প, কোন তামাকে অধিক। নাইকোটিন (Nicotine) এই মাদকত্বের কারণ। জমি জলখসা বা খারাপ হইলে এই মাদক গুণের বৃদ্ধি হয়।

যদি তামাকের পাতায় Nicotine থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জমির

যথেষ্ট দোষ আছে। এরূপ তামাক আদৌ আদৃত হয় না। তামাকে Nicotineএর মাত্রা যত কম থাকে আর সুগন্ধ যত বেশী থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বেশী Nicotine থাকিলে বুঝিতে হইবে যে হয় জমির জল চলাচলের দোষ আছে না হয় Nitrogenous সার অতি অধিক মাত্রায় হইয়াছে। আবার কোন তামাকের পাতায় চুরুট যদি সমভাবে পুড়িতে না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জমিতে ক্ষার অল্প আছে। যে জমিতে পটাসের অল্পতা ঘটিয়াছে সে জমিতে উৎকৃষ্ট তামাক কোন কারণেই আশা করা যায় না। কোন জমিতে আপনা হইতেই এই সকল গুণ থাকে সেখানে চাষের জন্য বিশেষ সারের আবশ্যকতা নাই কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত সার দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। গুল্মের উপর জমির প্রধানতঃ দুইটি প্রভাব :— প্রথমতঃ জমিতে সার অর্থাৎ রাসায়নিক লবণাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে কাজেই তাহা হইতে গাছ স্বীয় আবশ্যক মত আহার টানিয়া লইয়া নিজের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ জলের পরিমাণ, তাপ রক্ষণের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত করিয়া গাছের পুষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। তামাকের জমিতে যত অধিক মাত্রায় ক্ষার বা ছাই এবং এমোনিয়া থাকিবে ফসলও তত বেশী হইবে। পাতা পচা সার দিলে জমিতে দ্রবনীয় ক্ষার-বেশ অধিক মাত্রায় থাকে। এরূপ জমির তামাকে মাদক গুণ কম হয়।

বোম্বাই তুলার কল—

ইংলিশ তুলাজাত দ্রব্যের অপেক্ষাকৃত মূল্য অধিক এবং তাহা ভারতে পৌঁছিতে জাহাজ ভাড়া পড়ে বলিয়া বোম্বাই সুতার কল ওয়ালাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু সে সুবিধা তাহারা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারিল না। জাপান আসিয়া তুলাজাত দ্রব্যে ভাতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। দুই, চারি আনায় জাপান এমন সুন্দর রঙদার ও ডোরাকাটা গেঞ্জি সরবরাহ করিতেছে যে ভারতে তাহা-জন্মান অসম্ভব। জাপান এক্ষণে সুক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। আমাদের উচিৎ যতদূর সম্ভব ভারতের মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকা নতুবা অচিরে জাপানি দেশলাই, জাপানি সিমেণ্টের মত বস্ত্রও বাজারে অধিকার করিয়া বসিবে।

পাটের পরীক্ষা—

আঁশ তত্ত্ব-বিদ্ মিঃ ফিন্‌লো সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দেশী পাট (Corchorus olitorius) অপেক্ষা পূবে পাটের (Corchorus capsularis) চাষই অধিকতর লাভজনক এবং পাট চাষে পটাস সার ও সোডা বিশেষ উপযোগী। এতদিন জর্ম্মানি হইতে আনিত খনিজ পটাস প্রধান কাইনিট বাজার একচেটে করিয়া রাখিয়াছিল। ফিন্‌লো সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বন ঢেঁড়স প্রভৃতি বনজ উদ্ভিদে যথেষ্ট পটাস পাওয়া যায়। আমাদের চিরপরিচিত কলার খোলায়

ও বাসনায় পটাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং পটাসের জন্য আর বিশেষ ভাবনার কোন কারণ নাই। কিন্তু বাঙলার পাট পচান একটা বিষম সমস্যার ব্যাপার। ইহার জন্যই পাট চাষ দুরূহ বলিয়া মনে হয়। ফ্রান্সে মদিনার পাট পচান বৈদ্যুতিক প্রচার হইয়া থাকে, এখানে সে প্রথারি প্রচলন হইতে পারে কি না তিনি এখন ভাবিয়া দেখুন।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস

সব্জীবাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুণ চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সব্জী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলির কাটিয়া ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় এই সময় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে লোকে ফুলকপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতেছে। আশ্বিনমাসের শেষে কার্ত্তিকমাসের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩২৩ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

রাঁচির অবস্থা এবং উৎপন্নজাত পন্য

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, লিখিত।

রাঁচি অতি স্বাস্থ্যকর সুন্দর স্থান। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে, অতিদুর্গম জঙ্গলময় ছিল। তখন আসা যাওয়ার জন্য মানুষে টানা, পাল্‌কি গাড়ীর ন্যায় একপ্রকার "push push" গাড়ী ছিল। এখনও "push" "push" এর চলন আছে। কিছুদিন হইতে B. N. Railway খুলিয়াছে। ৪।৫ বৎসর হইতে এখানে নূতন বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী রাজধানী হইয়াছে। ইহার চারিদিকেই ধূম্রবর্ণের মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত রাঁচি রেল লাইনটী পুরুলিয়া হইতে বিস্তর পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া আসিয়াছে। ইহা যখন বাংলাদেশের সহিত একত্রিত ছিল, তখন হইতেই রাঁচিতে, ছোট নাগপুরের বিভাগীয় ও ডিভীসেনাল্ কমিশনর সাহেব এখানে অবস্থিতি করিতেছন। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Political জমিদারী ষ্টেট্ আছে। তন্মধ্যে রাঁচি ও শূয়ারগুঁজাই খুব বড় ষ্টেট্। সমুদ্রতীর হইতে রাঁচির (Sealebel) ২১০০—ফিট উচ্চ। "জনার" পাহাড়ের শিখর দেশই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর। এখানে এখনও অধিকদূর ব্যাপি জঙ্গল, পাহাড় থাকায়, বর্ষাকালে অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। বনাকর্ষণই বারিপাতের বৈজ্ঞানিক কারণ। এই নূতন সহরটী উত্তর দক্ষিণও পূর্ব্ব পশ্চিমে; ডুরুণ্ডা হইতে লালপুর হইয়া মোরবাদী পর্য্যন্ত ৭।৮ মাইল বিস্তীর্ণ। এখানকার আদিম অধিবাসী ওরাং মুণ্ডা, এবং কোল জাতিই অধিক। ইহারা অতি ধর্ম্মভিরু ও পরিশ্রমী এবং সরল। ছোট লাটের গ্রাম্মাবাশ, পালামেট নেতারহাট। উহার উচ্চতা ৩৬০০ ফিট্। এখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ অতি বিরল। কেবল এপ্রেল মে মাসেই একটু গরম বোধ হয়। শীতকাল ছাড়াও, অন্যান্য সময়, বেশ ঠাণ্ডা

শীতের সময় প্রাতে জলের উপর অল্প অল্প বরফ ভাষিতে দেখা যায়। এইখানে গবর্ণমেণ্টের পুলিষ ট্রেনীং হয়। রাঁচির মৃত্তিকা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, লৌহের অংশই অধিক। পাতকুয়ার জল অতিশয় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ও সুস্বাদু। চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূমি পতিত আছে। ছোট নাগপুর পাহাড় হইতে সুবর্ণরেখা নদীর উৎপত্তি হইয়া, দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়া ঘাটশীলা দিয়া, বৈতরণী, কাঁশাই, ও ব্রহ্মণী নদীর সহিত মিশিয়া উড়িষ্যার ভিতর দিয়া গঙ্গাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। রাঁচির ভিতর যে অংশ, তাহাকে "ডুরুণ্ডা" বলে। রাঁচিতে পেঁপে কুমড়া, রানারসীম্, বাঁধাকপি, ঢেঁড়শ ইত্যাদি নানাপ্রকার শাক সব্জী, খুব প্রচুর পরিমাণে ও বৃহদাকারের জন্মায়। একটী মিষ্ট কুমড়া ও বেম্বাই পেঁপের ওজন, যথাক্রমে ১০ সের হইতে ২৫ সের ও ১॥০ সের হইতে ৪ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। বোম্বাই ও নাইনিতাল আলুর ওজন (১টীর) ৩ ছটাক হইতে ২॥ আড়াই পোয়া পর্য্যন্ত দেখা যায় এখানে একটী নেপালী ও ধানী লঙ্কার গাছে, প্রতিবারে আধসের হইতে পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত, পরিপক্ক লঙ্কা তোলা হয়। এমন আর, অন্যত্র দেখি নাই। এখানে ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, লাউ, এই তিন জাতীয় তরকারি দেড় ও দুইহাত পর্য্যন্ত লম্বা এবং তদুপযুক্ত মোটা হয়। বর্ষাকালে এই সকল তরকারি, অন্যান্য অধিকাংশ স্থান অপেক্ষা বেশী সস্তা। এখানে ইলিশমাছ ২৲ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়। পোণামাছ ।/০ ।৵০ আনা সেরে পাওয়া যায়। এখানকার (Sea-level) যখন ২১০০ ফিট্ উচ্চ, তখন সাহারণপুরের ন্যায় এখানেও কাবুলী আঙ্গুর, ও আলুবোখেরা এবং ন্যাশ্পাতি ফলের ফসল ভালই জন্মাইতে পারে।

২। রাঁচির ৫।৬ ক্রোশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই চারিটি সাহেব, বেশ আসামী জংলি চায়ের আবাদ করিতেছেন। এখানকার চা'এর গুণও মন্দ নহে। কুলী মজুর সস্তা। বাঙ্গালীদের কেবল, চাকরী ছাড়া বোল নাই। এ সকল প্রবৃত্তি ও শিক্ষা, আর জীবনেও হইবে না।

৩। 'জনার' পাহাড় ও জঙ্গলে—অনেক বাণিজ্যপণ্য উদ্ভিদ্ পাওয়া যায়। যথা বিড়ী প্রস্তুতকারী—কেঁদ্ মিঠাইয়ের শত শত গাছ, লাক্ষা জন্মান কুসুম ফুলের বন। কাগজ প্রস্তুতকারী সাবাই ও মিক্ মিক্ ঘাস। লাঠি ও তীর তৈয়ারি জন্য নিরেট ও ছোট, ঝাড়ি বাঁশ। ইহা টাকায় ৩২ গাছি হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়, ইহা হইতেই কনেষ্টবলদের হাতের রেগুলেশন লাঠি প্রস্তুত হয়। আর কলিকাতায় যে সুন্দর সুন্দর গাঁইটওয়ালা রং করা বাঁশের লাঠি প্রতিগাছি ॥০ ॥৵০ আনা হিসাবে বিক্রয় হয় তাও এই বাঁশ হইতে প্রস্তুত। এই পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে মোটা মোটা লাইমষ্টোন রাশি রাশি পাওয়া যায়। ইহা পোড়াইয়া উৎকৃষ্ট কোমল চুণ প্রস্তুত হয়। এখানে এই চুণ বেশ সস্তা। সুবর্ণরেখা White sand নামে এক প্রকার খড়িমাটি পাওয়া যায় ইহা শীত ও গরমকালে, নদীগর্ভ হইতে খুড়িয়া আনিলেই চলে। ইহার দ্বারা

ঘর লেপন, চুণকাম করা এবং দাগকাটা, দাঁত মাজা ইত্যাদি সকল কাজই চলিতে পারে। কোল রমণীরা উহা খুড়িয়া আনিয়া চূর্ণ করতঃ চালিয়া ১০।১২ সের ওজনের টুক্রী, তিন আনা হইতে চারি আনা হিসাবে, সহরে বিক্রয় করিয়া যায়। এই কোমল চূর্ণের সহিত, পরিমাণ মত তিসী তৈল মিসাইয়া, ছাইনবোর্ড অঙ্কিত করা চলে। শূয়ারগুঁজা নামক ষ্টেট হইতে, প্রত্যহ শত শত মণ শূয়াগুঁজা গাড়ি বোঝাই হইয়া, নানা দেশের, বিশেষতঃ কলিকাতায় তেলের কলের মহাজনদের আড়তে চালান যায়। এই রবিশস্য, এখানে প্রচুর পরিমাণে, বসন্তকালে উৎপন্ন হয়। ইহা সর্ষপ তৈলে ½ অংশ ভাঁজাল চলে। রাই বা শ্বেতী সরিষা এবং শূয়ারগুঁজার ঝাঁজ একই প্রকার।

৪। রাঁচিতে যদি কোন গরীব বাঙ্গালী জমিদারের নিকট হইতে ২।৩ বিঘা জমি জমা করিয়া লইয়া, একখানি কলা ও পেঁপের বাগান করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহার আর ভাতের কষ্ট আদৌ থাকে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কলা ও পেঁপে এত বড় মোটা ও পুষ্ট হইতে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রংপুরী কদলী ইহার নিকট আকার ও মিষ্টকর পরাস্ত স্বীকার করিবে। তবে গরমকালে (মার্চ্চের ১৫ই হইতে মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত) দুই তিন দিন অন্তর ক্ষেতে জল সেচন করিতে হয়। বাগানের মধ্যস্থলে একটী কূপ খনন করা উচিত।

৫। এ দেশে স্বভাবজাত রাস্তাঘাটের চারিদিকেই বন তুলসী গাছের ন্যায় কাল কাল পাতাবিশিষ্ট একপ্রকার ঝাড়জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে স্থানীয় মুণ্ডা ও কোল ভাষায় "পুটুষ" বলে। উহা অত্যন্ত ম্যালেরিয়া নাশক এবং তিক্তাস্বাদযুক্ত। এই গাছের একটী ঝাড়ে ভিন্ন ভিন্ন ডালে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের লাল, কাল, সাদা, জর্দ্দা, সবুজ এবং অতি নয়ন রঞ্জক রঙ্গীন। ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া থাকে। আর ফুলগুলি অধিক দিন পর্য্যন্ত ফুটন্ত ভাবেই স্থায়ী হয়। ঐ গাছের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন ঘন কাঁটা আছে। তজ্জন্য এদেশীয় লোকে এই "পুটুষের" ডাল কাটিয়া বাগানের বেড়া দিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাল কাটিয়া পুতিলেই, মেহেদী গাছের ন্যায় খুব ঘন সন্নিবিষ্ট বেড়ায় পরিণত হইয়া উঠিয়া নয়ন রঞ্জন মনোহারী ফুল ফুটিয়া, দর্শকের মনাকর্ষণ পূর্ব্বক ম্যালেরিয়া নাশ করে। ভগবান যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের কোথায় কি ভাবে কাহাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বাঙ্গালায় ধান ও পাট

চাষীজমির পরিমাণ তুলনা—১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দ। বাঙ্গালায় ২৯, ৬৩৯, ৬০০ একার জমিতে নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে, ধানের জমির পরিমাণ ২০, ৬৪৯, ৯০০ একার। সুতরাং শতকরা হিসাবে, বাঙ্গালার সমগ্র চাষীজমির প্রায় ৭০ ভাগভূমিতে ধান এবং প্রায় ১০ ভাগ ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়া থাকে।

পাটের আবাদী জমি—বিগত ১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার কোন কোন জিলায় কি পরিমাণ ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে, সরকারী বিবরণীতে (Agricultural Statistics of Bengal) তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। (এক একার = ৩১/৪ বা কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা)।

ঢাকা-বিভাগ—ঢাকা—২৯৩১০০; ময়মনসিংহ—৫৮৭৬০০; বাখরগঞ্জ—৬২০০ এবং ফরিদপুর—২৪১১০০ একার।

রাজসাহী-বিভাগ—দিনাজপুর—৯২৬০০; জলপাইগুড়ি—৬১৫০০; মালদহ—৪০০০; বগুড়া—৮৫০০০; পাবনা—১৫৬০০; রাজসাহী—১১১৪০০ এবং দার্জ্জিলিং—৩৫০০ একার।

চট্টগ্রাম-বিভাগ—চট্টগ্রাম—২০০; ত্রিপুরা—২৯৬৩০০ এবং নোয়াখালী—৬৯৫০০ একার।

প্রেসিডেন্সি-বিভাগ—চব্বিশ-পরগণা—৮৭৮০০; নদিয়া—৯৩৫০০; মুর্শিদাবাদ—৩৭৮০০; যশোহর—১২৫৩০০ এবং খুলনা—৩২০০০ একার।

বর্দ্ধমান-বিভাগ—বর্দ্ধমান—১২০০০; বীরভূম—০; বাঁকুড়া—০; মেদিনীপুর—১৫০০০; হুগলী—৪৩৯০০ এবং হাওড়া—২০৮০০ একার।

পাটের চাসে মোট জমির পরিমাণ ২৮৭১৬০০ একার বা ৮৬৮৯৬১৩ বিঘা।

বিগত ১৯১২—১৩ খৃঃ অব্দে, পাটের চাষে মোট জমির পরিমাণ ছিল—প্রায় ৯০ লক্ষ বিঘা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্যবৎসরে পাটের চাষে জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ইউরোপীয় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে (১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে) প্রেসিডেন্সী-বিভাগ ও বর্দ্ধমান-বিভাগে মোট ৪৬৮১০০ একারে পাটের চাষ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এই বৎসর ঢাকা-বিভাগের একমাত্র ময়মনসিংহ জিলাতেই ৫৮৮৬০০ একার জমিতে পাট জন্মিয়াছে। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী-বিভাগ এবং বর্দ্ধমান-বিভাগে মোট যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল, একমাত্র ময়মানসিংহ জিলাতেও তদপেক্ষা ১১৯৫০০

এবার অধিক জমিতে পাট জন্মিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ কিরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পাটে আয় ও উন্নতির উপায়

কৃষি-বিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথের নির্দ্দেশমতে, পাটে বাঙ্গালী কৃষকের বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৬ কোটী টাকা। তিনি প্রতিবিঘায় উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ধরিয়াছেন—৫।০ মণ এবং মণ হিসাবে পাটের মূল্য ধরিয়াছেন—৮৲ টাকা। ১৯১৩—১৪ খৃঃ অব্দে, সমগ্র বঙ্গে ৯০ লক্ষ বিঘায় পাট হইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্যবর্ষে পাটের চাষে ভূমির পরিমাণ ও তদনুযায়ী উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, পাটের চাষে আয়ের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং মিঃ স্মিথের নির্দ্দেশানুযায়ী বিঘাপ্রতি ৫।০ মণ পাট এবং উহার মূল্য গড়ে ৮৲ টাকা ধরিয়া হিসাব করিলেও, এক্ষণ পাটের চাষে আয় দাঁড়ায়—৩৪৭৫৮৫৬০০৲ টাকা। খরচ বাদে প্রতিবিঘায় কত নিট লাভ দাঁড়ায়, মিঃ স্মিথ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। ধান ও পাটের চাষে আয়-ব্যয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে, অর্থনীতির হিসাবে, কোন্ শস্তের চাষ কৃষকের পক্ষে অধিকতর লাভজনক, তাহা বুঝা যাইত। *

পাটের উন্নতি—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথ (Mr. E. Smith) বলিয়াছেন,—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাট চাষ করিলে, ইহার উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কৃষি-বিভাগের তত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী মি ফিন্‌লো (Mr. R. S. Einlow) পাটের চাষে কতিপয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার গবেষণা বা পরীক্ষার ফল এখনও কৃষক-সমাজের কাজে লাগে নাই। পাটের চাষে, এদেশের কৃষকেরা এখনও "যথাপূর্ব্বম্, তথাপরম্।" তথাপি, পাটের চাষে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রকৃতই সুফলপ্রসূ হইলে, সাধারণ কৃষকও তাহা ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিবে, আমাদের এ ভরসা আছে।

বীজের দোষেই প্রধানতঃ পাটের চাষে ক্রমাবনতি ঘটিতেছে; ইহা কৃষকদিগেরও অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তথাপি, সুবীজ সংগ্রহের প্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি আজিও আকৃষ্ট হয় নাই। কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে ইতিপূর্ব্বে আকৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার কোন কোন 'জুট ফার্ম্ম' (Jute Eirms) মফঃস্বলের কতিপয় স্থানের রায়তদিগের মধ্যে কৃষি বিভাগের পাটের বীজ পরীক্ষার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বীজে কৃষকেরা উৎকৃষ্ট পাট জন্মাইয়াছে। মিঃ ফিন্‌লো লিখিয়াছেন—

---

* "কৃষি-বিভগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী সকলের ১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দের বার্ষিক কার্য্যাবিবরণী" (Annual Reports of the Expert officers of the Department of Agricaltuse, Bengal)

"In last year's report the suggestion was made that the mufassal agencies of the Calcutta jute firms might be able to render great assistance to the Agricultural Department in testing and introducing improvements in the cultivation of jute io their respective districts. Messrs. Sinclair Murray & Co. have through Mr. Luke 'made a commencement in this directionat Naraingunge in the present season by growing a fine crop of jute from dpartmental seed as a demonsration." ইহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—

"গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, কলিকাতাস্থ ভিন্ন ভিন্ন 'জুট ফার্ম্মের' মফঃস্বল এজেন্সী সকল আপন আপন এলাকার মধ্যে পাটের চাষে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি পরীক্ষা ও প্রবর্ত্তন করিয়া, কৃষি-বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারে। মেসার্স সিনক্লেয়ার কোম্পানী মিঃ লিউকের মধ্যবর্ত্তিতায় নারায়ণগঞ্জে, বর্ত্তমান পাটের খন্দে (১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে), এই কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। পরীক্ষা উক্ত কোম্পানী এবার কৃষিবিভাগের বীজে ভাল পাট উৎপাদন করাইয়াছেন।"

মেসার্স সাটী এণ্ড ব্লাউন্ট (Messrs. Suttie and Blount) নারায়ণগঞ্জের বাহিরে মফঃস্বলের অন্তত্রও রায়তদিগকে সুবীজ পাইবার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

একমাত্র সুবীজ-নির্ব্বাচনেই পাটের চাষে সুফল লাভ হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে—যথা, সারব্যবহার, ফস্ফেট ব্যবহার দ্বারা পাটের ওজন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, এতদপেক্ষা অধিকতর সুফল লাভের আশাই করা যায়।

মিঃ ফিন্‌লোর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিতেছেন,—

(১) বাঙ্গালার অম্লাক্ত লাল মাটীতে সার-ব্যবহার (Manures for jute on the acid red soils in Bengal).

(২) ক্ষার প্রয়োগ (Application of Potash)

(৩) পাটে ফস্ফেট ব্যবহারের ফল-পরীক্ষা (Investigation of the effect of Phosphates on jute);

(৪) কৃষির উন্নতিতে সমবায়-সমিতির প্রভাব (Influence of Co-operative Credit in the develop-ment of agriculture)

(৫) বিভিন্ন পাট-নির্ব্বাচন (Selecton of jute varieties);

(৬) মফঃস্বল জুট ফার্ম্মের সাহায্যলাভ (Assistance from Mufassal agencies of jute firms);

(৭) বেল বাঁধা পাটে দাগ লাগা (Heart damage); এবং

(৮) জলজ উদ্ভিদ্ (Water weeds.) পরীক্ষা।

ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

ভারতে কৃষি-শিক্ষা

আজকাল দেশমধ্যে চারিদিকেই শিক্ষা শিক্ষা রব শুনা যাইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, ব্যবসায়শিক্ষা, নানাবিধ শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন পক্ষপাতীগণ বলিতেছেন যে শিক্ষায় ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়াই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষার মধ্যে কোনটি প্রথম ও প্রধাণ তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। ভারতের প্রায় ২৫২ কোটি লোকের মধ্যে ২০ কোটি কৃষিজীবি, অর্থাৎ প্রত্যেক ৫টি ব্যক্তির মধ্যে ৪টি ব্যক্তিকে জীবনধারণের জন্য কৃষির উপর নিভর করিতে হয়। সুতরাং কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবেনা যে কৃষির উন্নতির উপরেই সমস্ত দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু কৃষশিক্ষা আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইলেও কিরূপ উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সুচারুরূপে প্রদান করিতে পারা যায়, সেটি একটি গুরুতর সমস্যার বিষয়। আপাততঃ যে সমুদয় সরকারী কৃষিশিক্ষালয় আছে তৎসমুদয় দ্বারা যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না, তাহা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বড় বড় সরকারী কৃষি কর্ত্তারাও স্বয়ং একথা স্বীকার করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা ম্যাক্ কেনা সাহেব সে দিন বিলাতে সোসাইটি অব্ আর্টসের অধিবেশনে পঠিত বক্তৃতায় তাঁহার প্রণীত "ভারতে কৃষি" (Agricultur in India) নামক পুস্তিকায় স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ভারতের কৃষি কলেজ সমূহ সরকারী কৃষি বিভাগ সমূহের জন্য কর্ম্মচারী প্রস্তুত ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ উপকার আসে নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্কুলগুলিতে কিছু সুফল ফলিয়াছে। নিম্নস্তরের কৃষিশিক্ষারত (অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুল সমূহে) কথাই নাই। প্রাথমিক কৃষি শিক্ষা এখনও সর্ব্বস্থানে আরম্ভই হয় নাই এবং যে সকল স্থানে হইয়াছে

সেখানেও ফল নিতান্তই আনুষঙ্গিক। এতৎ প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে প্রকাশিত প্রাথমিক কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা সাধারণের পাঠযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইহাতে প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমস্যা বিশদ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান কৃষিশিক্ষার বিষয় বলিতে হইলে লর্ড কুর্জ্জনের প্রতিনিধিত্ব কালে সিমলায় শিক্ষা সমিতির অধিবেশনের উল্লেখ করিতে হয়। এই সময় হইতে এতদ্দেশে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত। ইহারই তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৪ সালে প্রকৃত কৃষিশিক্ষাও উন্নতির প্রারম্ভ হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অধিকাংশ প্রদেশেই কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি পুষার কৃষি তত্ত্বানুসন্ধানাগার ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এইবার বৎসরে আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি ? দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে ভারতের পক্ষে উপযোগী কতগুলি কৃষিতত্ত্ব আবিষ্কৃত অথবা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কোন দেশে কোন ফসলের উৎকর্ষ সাধিত ও ফসলের হার বাড়িয়াছে; সাধারণের ও কৃষকমণ্ডলীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষি জ্ঞান কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে; এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে উদ্যম, শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের অনুপাতে ফলে অতি সামান্যই হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ অবস্থার কারণ কি এবং তাহার প্রতিকারই বা কি ? যাহাকে কৃষি শিক্ষা দিতে হইবে তাহার সাধারণ শিক্ষা কতক পরিমাণে থাকা আবশ্যক, যে উচ্চ কৃষি শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা তাহার সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত আরও উচ্চ হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু একদিকে আমাদিগের কৃষকমণ্ডলী প্রায় নিরক্ষর এবং অন্য দিকে কৃষি কলেজে যেরূপ উচ্চাঙ্গের কৃষি শিক্ষা প্রদান করা হয় তদুপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ছাত্রগণের নাই। সুতরাং উভয় স্থলেই কৃষি শিক্ষার কর্ত্তাগণের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে এতদ্ভিন্ন যে শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কৃষি-শিক্ষা লাভ করিলে কৃষির উন্নতির পথ সুগম হইবে, তাহারা কৃষি-শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। এদিকে সমৃদ্ধিশালী ভূম্যধিকারীগণের সন্তান-বর্গের কৃষি-শিক্ষার উপর আস্থা নাই, অন্যদিকে নিরক্ষর অথবা অল্প শিক্ষিত কৃষকেরা উপযুক্ত জ্ঞানাভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষির কোন মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছে না। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতের নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষি-শিক্ষা দিতে হইলে আগে তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষা দিতে হইবে কিম্বা সাধারণ শিক্ষার সহিতই কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু কৃষির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা এসমস্ত গবর্ণমেন্ট অথবা জনসাধারণ দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় নাই। সাধারণ শিক্ষার জন্য বাৎসরিক দশ কোটির উপর টাকা ব্যয় ও কৃষির জন্য অর্দ্ধ কোটি মাত্র ব্যয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃত সকল উন্নতির মূলেই অর্থব্যয়। গবর্ণমেন্ট কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উপর অর্থব্যয় করিতে পারেন না। অন্য দিকে প্রভূত অর্থব্যয় ব্যতীত কৃষির উন্নতির উপায়

নাই। এই সমস্যা সমালোচনা করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কৃষি উপদেষ্টা বার্নার্ড কভেণ্টি সাহেব মার্কিন রাজ্যে প্রচলিত একটি প্রথার ভারতে অনুষ্ঠানের অনুমোদন করিয়াছেন। প্রথাটি সকল মার্কিন প্রথার ন্যায় একটু নূতন ধরণের; কিন্তু তাহা হইলেও বিশেষ আলোচনা যোগ্য।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিন যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণাংশের অবস্থা প্রায় ভারতের ন্যায় শোচনীয় ছিল। এখানেও কৃষি-জীবির সংখ্যা লোক সংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু ফসলের ফলনের হার সামান্য। লোক প্রায়ই নিরর্থ এবং সমবেত চেষ্টার একান্ত অভাব। কর্ত্তাপক্ষগণ এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া অবশেষে উন্নতির জন্য যে প্রস্তাব করিলেন তাহার ফল মর্ম্ম এই যে—"শিক্ষাভাবে তোমাদের অবনতি হইতেছে; তোমরা তোমাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে অর্থাভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেছ না। আমরা সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগকেও ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। তোমরা নিরর্থ; ব্যয়-করিতে অক্ষম; আচ্ছা, আমরা তোমাদিগকে অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সহায়তা করিতেছি। তোমরা কৃতকার্য্য হইলে আরও অধিক সাহায্য পাইবে। আমাদিগের ক্ষমতা থাকিলেও আমরা সাক্ষাতভাবে তোমাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে শিক্ষা দেওয়া তোমাদের অপকার স্বরূপ বলিয়া গণ্য করি। তোমাদিগের শিক্ষাগার সমূহ তোমাদিগের নিজের চেষ্টাতেই স্থাপিত ও প্রতিপালিত হওয়া উচিত। এ সমুদয়ে তোমাদেরই আদর্শ সমাজ ও জীবনে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক"।

এইরূপ প্রস্তাবের পর General Education Board নামক বেসরকারী সমিতির সাহায্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষক মণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা স্কুল কলেজে পুস্তকগত শিক্ষা নহে। কৃষকের নিজের ক্ষেত্রে চাক্ষুষ শিক্ষা। বড় বড় অভিজ্ঞ সত্বরে নিযুক্ত হইল। ২।৩ বৎসরের মধ্যে অভিজ্ঞ মণ্ডলী কোন্ কোন্ কৃষিতত্ত্ব দেশ মধ্যে প্রচার বাঞ্ছনীয় ও লাভজনক তাহা স্থিরীকৃত করিয়া ফেলিলেন। সেই সমুদয় নির্দ্ধারিত তথ্য নানা স্থানে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রতিপাদিত হইতে আরম্ভ হইল। কৃষকগণ দেখিতে পাইল যে, যে সমুদয় ক্ষেত্র "সমবায় ক্ষেত্র শিক্ষা"র (Co-operative Farm Demonstration) সমিতির অধীনে আছে সেগুলিতে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র অপেক্ষা দুই তিনগুণ অধিক ফসল ফলিতেছে। তাহাদিগকে আর কিছুই বলিতে হইল না, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সমিতিতে যোগদান করিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণ সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ফলনের হার গড়ে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সমবেত চেষ্টার ফলে ও কর্ত্তৃপক্ষগণের আনুকুল্যে মার্কিন যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণাংশ বিগত দশ বৎসরের মধ্যে এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িয়াছে যে দেশ মধ্যে নানা স্থানেই উত্তম শিক্ষাগার, সুন্দর অট্টালিকা, সুরম্য বাগান বাগিচাদি দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের

নৈতিক পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে। আজকাল সমাজে, ব্যবসায়ে অথবা অন্যান্য কার্য্যে দারিদ্র প্রযুক্ত আর সেই বিশৃঙ্খলা নাই।

কভেণ্টি সাহেব এই চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়া বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণ সমবেত হইয়া এই পন্থা অনুসরণ করিলে ফল এইরূপই ফলিবে। তাহা অনেকটা সম্ভব বটে, কিন্তু ভারতের সহিত মার্কিণ রাজ্যের দক্ষিণাংশের কতকটা পার্থক্য আছে। কভেণ্টি সাহেবের মতেই যে সময় এই প্রকার উদ্যম আরম্ভ হয় তখন দক্ষিণাংশের অধিবাসীগণের গড়পড়তা বার্ষিক ব্যক্তিগত আয় ৪৫০৲; আর ভারতের অধিবাসীগণের বার্ষিক আয় কোন হিসাবেই ৩০৲ টাকার উর্দ্ধ হইতে পারে না। অন্যদিকে দক্ষিণাংশে যে সময় কৃষি শিক্ষা আরম্ভ হয় সে সময়ে উত্তরাংশে কৃষি বহুল পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। উত্তরাংশে নির্দ্ধারিত কৃষিতত্ব সংগ্রহ দ্বারা দক্ষিণাংশে কৃষি উন্নতি কার্য্যে যে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে ভারতে কৃষি-বিষয়ক গবেষণা ও অনুসন্ধান এখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থায়। প্রকৃত লাভজনক বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। যে সমুদয় লাভকর প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম ও তাহাদের উপকারিতা স্থলবিশেষে আবদ্ধ। এই সমুদয় গুরুতর প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কভেণ্টি সাহেবের প্রস্তাব যে একবারে অসাধ্য তাহা বোধ হয় না। অন্ততঃ এ সমস্ত যথেষ্ট পরিমাণ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

পত্রাদি

বঙ্গদেশীয় গো ও মহিষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—রাঁচি।

কৃষকের গোপালন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে লিখিতেছি যে, বঙ্গদেশীয় গো মহিষের অভাব ও অবনতির জন্য, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যে নিরীহ, গৃহপালিত গো মহিষ, ভারতের একমাত্র ভূমিকর্ষণ, দুগ্ধপ্রদান, ঘৃত উৎপাদন, বোঝা বহন, ইত্যাদি শতকরা ৯৯টা কাজে লাগে, আর যাহারা, দেড় বা দুই বৎসর অন্তর একটী মাত্র, সন্তান প্রসব করে, সেই গোধনকে অনায়াসে পাষণ্ড গোয়ালা, জীবঘাতক কসাইয়ের হস্তে বেচিয়া ফেলিতেছে! তাহার কেহই পূর্ব্বের ন্যায় রক্ষক নাই। তাহার কি আবার কস্মিন কালে বা কোন উপায়ে উন্নত হইবার আশা করা যাইতে

পারে ? আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এমন যে মহোপকারি গোধন, তাহাই রক্ষা করিতেন, সুতরাং গোবংশের প্রভূত পরিমাণে, বৃদ্ধি ও উন্নতি হইত। তখন এদেশে পশুঘাতক, মাংসাসী সম্প্রদায় ও কষাইয়ের আবির্ভাব হয় নাই। গোপকুলের মনে এবং গৃহস্থের অন্তরে, গোপালনটী পরমধর্ম্ম বলিয়া বোধ এবং পাপের ভয় ছিল। সুতরাং গোবংশের আপনা আপনিই বৃদ্ধি ও উন্নতি হইত। গোবংশের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্যই এদেশের মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে, ষাঁড় দাগাইয়া স্বাধীন ভাবে, বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রথা আছে। এখন ষাঁড় সহরের ময়লাটানার কার্য্যে নিযুক্ত যদি স্বয়ং রাজার এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও কৃপাকটাক্ষ থাকে বা হয়, তবে রাজশাসনের দ্বারা, আবার সেই পূর্ব্বভাবই বজায় হইতে পারে। যে দেশেই যাই, এবং যে দিকেই চাই, তথায় পূর্ব্বের ন্যায় গোধন রক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাই না। গোচারণের বিস্তীর্ণ মাঠ নাই। গোয়ালার পালন্দা বা বাথান্ দেখিতে পাই না তবে আর বৃথা গোধনের কথা, উল্লেখ করিয়া লেখক মিছামিছি অন্তরের ব্যথা টানিয়া আনেন কেন ? কালের স্রোতে যাহা ভাসিবার, তা ভাসিয়াই যাইবে। ভারতের কৃষিকার্য্য জমির অসমান অবস্থানুসারে কখনই বিলাতী কল বলের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। সে নিয়ম, এদেশে ঘটিছে না। তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ এতদিন তাহা করিতে ছাড়িতেন না। সুতরাং গোধন দ্বারাই এদেশের চাষ আবাদ ও ভূমিকর্ষণ প্রথাই প্রচলিত ছিল ও থাকিবে। অতএব, এমন যে মহোপকারী গোধন, তাহাকে নির্দ্দয়রূপে পালন ও সংহার করিলে কে আর আমাদিগকে, ঘোর বর্ষা বাদলে, হল কর্ষণ দ্বারা, অন্নদান, দুগ্ধ পান, বোঝা বহিয়া, জীবন রক্ষা করিবে ? পূর্ব্বে, প্রত্যেক গৃহস্থই, দুই একটী করিয়া গোধন পালন করিতেন এখন তাহা ঘৃণার বিষয় হইয়াছে! পূর্ব্বে যে, গাভী বা বলদের মূল্য ১০৲।১২৲ টাকা ছিল এখন তাহা ২৫৲।৩০৲ টাকা হইয়াছে। বাল্যকালে পশ্চিমে টাকায় ২০ সের দুগ্ধ ও ৴২৷৷০ সের ঘৃত ছিল ? আজ তাহার চিহ্ন নাই।

(শর্করা ও খর্জ্জুর) সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

১। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত শর্করা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লেখকের উক্তি সম্পূর্ণ নহে। যে কয়েকটী শর্করা জনিত উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া শাঁক ও চীনের আলুর রস হইতেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিনি পাওয়া যায়।

২। তালের রসের চিনি, খেজুর অপেক্ষাও বেশী হয়। উহার গুড়, চিনি, এবং মিচ্‌রী, বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ—খেজুরের ন্যায় তাল গাছের পাঁইট্ আদৌ করিতে হয় না এবং তালগাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। উহার জটার মুখ কাটিয়া রস সংগ্রহ করিতে হয়। এই রস, প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। পাঁওরুটী প্রস্তুতের ইহা একটা প্রধান

উপাদান। দেশী মদের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এই রস অতি সস্তা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাল বৃক্ষ ভাল জন্মায়। অধিকন্তু তালের কড়ি ও বরগা, শালের ন্যায় শক্ত ও স্থায়ী।

৩। রাঁচি ও পালমৌতে পীণ্ড খেজুরের চাষের চেষ্টা করিলে হইতে পারে কিন্তু আসল পাটনা, গয়া প্রভৃতি খাটি বিহারে হওয়া অসম্ভব। শিশু খেজুরের মূলের রসে অত্যন্ত কৃমী দমন ও নাশ করে।

৪। ২৪ পরগণা জেলায় গোবরডাঙ্গা, বালীর হাটের, হারিতপুর, মৃজাপুর, বাদুড়িল, টসবী, প্রভৃতি স্থানে এবং খুলনার সাতক্ষীরার অধীন নানাস্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত চিনির কারখানা ছিল। যশোহরের অন্তর্গত, কেশবপুর এবং মণিরামপুরে বিস্তর চিনির কারখানা ছিল। বৈদেশিক সস্তা দামের (বাউন্টি বিশিষ্ট) চিনির, অবাধ আমদানিতেই এদেশের চিনির ব্যবসায় এককালীন লোপ পাইয়াছে। যে প্রণালীতে বিদেশী চিনি প্রস্তুত হয়, দেশী চিনি সে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় না। সুতরাং খরচা না পোষানতে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। অগত্যা কারখানাগুলি সমূলে লোপ পাইয়াছে।

৫। বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অধিকাংশ স্থানে অযত্ন অবস্থায় বিস্তর খেজুরের বন দেখিতে পাওয়া যায়। গুড়ের দাম বেশী হওয়ায় খুলনা, ২৪ পরগণায়, এবং নদীয়ার শিউলী বা গাছিরা উক্তস্থানে, শীতকালে যাইয়া ঐ সকল খেজুর গাছ জমা করিয়া লইয়া, উৎকৃষ্ট সুগন্ধ পাটালী ও গুড় প্রস্তুত করিয়া কড়া দামে বিক্রয় করে। ২৪ পরগণায় টাকীতে শিউলীরা, সোডা দিয়া রস পরিষ্কার করতঃ যেরূপে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও শাদা পাটালী প্রস্তুত করে ; আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। উহাকে "নলেনের পাটালী বলে।" উহার প্রতি সের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ১৲ হইতে ।৵৹ আনা পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রিত হয়। ১০ সেরে ১ তোলা ওজনে সোডা দেয়। ইহার গুড় প্রতিমণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মণ দরে বিক্রিত হয়। আর উহার "মাৎ" হইতে তামাক মাখার, এবং মদ তৈয়ারির জন্য, নানা দেশে শত শত মণ চালান হয়। শর্করার কথা তো সতন্ত্র।

খেজুরের আবাদে কোন প্রকার মূল্যবান হাড়ের গুঁড়া বা খৈইল সারের প্রয়োজন হয় না। কেবল বৈশাখ মাসে, বৃষ্টিহইলে, খেজুর ক্ষেত্রে, দুই তিনবার লাঙ্গল দিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া বর্ষার জল খাওয়াইলেই যথেষ্ট হয়।

পুং জাতীয় খেজুর পুষ্পকে "চুমারী" বলে। ইহা অতি কোমল ধুলিবৎ রেণুবিশিষ্ট। অতি সুগন্ধ। অন্যান্য তাজা পুষ্পের এসেন্স তৈয়ারির ন্যায় খেজুর পুষ্প হইতেও যথেষ্ট এসেন্স প্রস্তুত হয়। উহাও বেশী দামে বিক্রয় হইতে পারে।

আষাঢ় মাসে, সুপক্ক খেজুরের বীজ, সংগ্রহ করতঃ অভিলম্বিত কর্ষিত ক্ষেত্রে,

ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া, বেঙ ৭ হাত অন্তর গাছ থাকে এই হিসাবে বপন করিলেই ভাল হইবে। কোন সারের প্রয়োজন নাই। পুরাতন পতিত মাঠান জমিতেই চারা ভাল হয়। বিশেষ যত্নের দরকার হয় না। এই গাছের গোড়ায় ২।৫ দিন পর্য্যন্ত জল জমিয়া থাকিলেও গাছের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। খেজুর ক্ষেত্রে, আউস ধান, কলাই, এবং অন্যান্য রবিখন্দ ও বার্ষিক তুলার চাষ ভাল হয়। তাহা হইতেও কৃষকের দ্বিগুণ লাভ হয়। চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহার রস পাওয়া যায়। ৭ দিন অন্তর জিরান্ দিতে হয় নতুবা রসে শর্করার অংশ বেশী হয় না। অধিক রসাল গাছে, "সুতুলী" করিয়া নাগরীতে করিয়া রস নামাইতে হয়। পৌষ মাসে গাছের মাথী শক্ত হইলে, "দোকাট্" দেওয়া উচিত। "দোকাটের" পর, তৃতীয় দিনে, আর কাটিতে হয় না। উহাকে, "ঝারা বা ওলা" বলে। তে-কাটের রসে, ভাল গুড় বা চিনি হয় না, মাৎ গুড় বা চিটে গুড় হয়।

অনভিজ্ঞ কলিকাতা অঞ্চলের শিউলী বা গাছীরা, তাড়ি করিবার জন্য গাছের জীবনের মায়াত্যাগ করিয়া, ৩ দিন অন্তর পচা নাগরীতে রস সংগ্রহ করিয়া, তাড়ি প্রস্তুত করে। পাঁওরুটী ও দেশী মদের জন্যও তাড়ি করে। তাড়িতে বেশ নেশা হয়।

——:*:——

সাময়িক কৃষি-সংবাদ ও সারসংগ্রহ

উদ্ভিদের জ্ঞান

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পূর্ব্বে অনেক প্রবন্ধে আমি উদ্ভিদের বিষয় লিখিয়াছি। অনেক সময়ে তাহাদের ব্যবহার দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, মনে হয়, যেন আমাদের মত তাহাদেরও জ্ঞান বুদ্ধি আছে। অনেক লতা বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে আশ্রয়-বস্তুকে জড়াইয়া উপরে উঠিতে থাকে। কোন কোন লতা ইহার বিপরীত ভাবে উপরে উত্থিত হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহাদের এ স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারি নাই। কিছুদূর উপরে উঠিয়া লতা আশ্রয়-বস্তু খুঁজিতে থাকে। যাহাদের শোঁ আছে, আশ্রয়-বস্তু পাইলেই তাহারা শোঁ দিয়া জড়াইয়া ধরে। উদ্ভিদেরা কি দেখিতে পায়? কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী,—শরীর অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। যে সমুদয় কোষ দ্বারা বৃক্ষের পত্র গঠিত, তাহাদের অনেক কোষ বক্রভাবে ধারণ করে। সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে আশে পাশের বস্তুসমূহ তাহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। জীবের শরীরে যে স্বচ্ছ স্থানে বস্তুসমূহের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই যন্ত্রকে চক্ষু বলে। আমার মতে জীবের প্রথম অবস্থায় ত্বক্ বা স্পর্শ শক্তি ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় ছিল না। তখন জীবের সর্ব্বশরীরে দর্শনশক্তি প্রভৃতি সামান্য ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে শরীরের ঊর্দ্ধদিকে এক কি দুই স্থান অধিক ভাবে সূর্য্যকিরণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। সেই স্থানের সহায়তায় জীব আলোক ও ছায়া ভালরূপে বুঝিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এই স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া চক্ষু যন্ত্রে পরিণত হইল। প্রথম অবস্থায় জীব সর্ব্বশরীর দ্বারা বায়ু-তরঙ্গের ভাব সামান্যরূপে বুঝিতে পারিত। ক্রমে এক কি দুই স্থান ঢাক ঢোলের চর্ম্মের আকার ধারণ করিল। যে বায়ু-তরঙ্গকে আমরা শব্দ বলি, তাহার আঘাত ইহা দ্বারা ভালরূপে অনুভূত হইতে লাগিল। এই দুই স্থান ক্রমে কর্ণ নামক যন্ত্রে পরিণত হইল।

অনেক উদ্ভিদ্ রাত্রিকালে পাতা মুড়িয়া নিদ্রা যায়। লজ্জাবতী উদ্ভিদকে স্পর্শ করিলেই তাহার পাতা কুঞ্চিত হয়। কোন কোন প্রাণীও এইরূপ করে। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামে কেন্নো নামক যে কীট মানুষের ঘরে দ্বারে বেড়ায়, তাহাকে স্পর্শ করিলেই সে কুণ্ডলী পাকাইয়া চক্রাকার ধারণ করে। কচ্ছপ আত্মরক্ষার নিমিত্ত খোলার ভিতর আপনার মুখ লুকায়িত করে। শজারুজাতীয় প্রাণীও আত্মরক্ষার নিমিত্ত গোলাকার ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্টক দ্বারা শত্রুকে ভীত করে। লজ্জাবতী গাছ ও কেন্নো কীট

বোধ হয় এইরূপ উদ্দেশ্যে আপনাদের শরীর কুঞ্চিত করে। কিন্তু ইহা দ্বারা কিরূপে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদ্‌গণও জীবন রক্ষা, সন্তান উৎপাদন ও বংশবিস্তার—এই তিন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবামাত্র উদ্ভিদ্ শিশু উপর দিকে বায়ু ও আলোক, নিম্নদিকে মৃত্তিকা নিহিত খাদ্য অনুসন্ধান করিতে থাকে। অঙ্কুরের মূল শিকড়ের নিম্নভাগ কঠিন চর্ম্মে আবৃত থাকে। ইহা দ্বারা শিকড় মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। যে দিকে ভাল খাদ্য আছে, শিকড় সেই দিকে গমন করে। যে দিকে ভাল খাদ্য নাই, সে দিকে গমন করে না। কোন্ দিকে ভাল খাবার আছে যেন দেখিতে পায়, অথবা যেন তাহার গন্ধ পায়। শিকড়ের নিম্নভাগ, যে স্থান কঠিন বল্কল দ্বারা আবৃত থাকে, উদ্ভিদ্ সে স্থান দিয়া ভূমি হইতে রস শোষণ করে না। সে ভাগ কেবল মৃত্তিকা ভেদ করিবার উপযোগী। মৃত্তিকার ভিতর মূলের নিম্ন দিক প্রবিষ্ট হইলে উপরিভাগ হইতে চুলের ন্যায় সরু সরু শিকড় বাহির হয়। ইহা দ্বারাই উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে রস শোষণ করে। বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদের শিকড় কঠিন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। জলের সহায়তায় মৃত্তিকা-নিহিত উদ্ভিদ্-খাদ্য দ্রবীভূত হইয়া তরল হইলে তবে শিকড় তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অঙ্কুরের মূল কিরূপে ভূমির ভিতর প্রবেশ করে তখন মাটি খুড়িয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তও উদ্ভিদ্ নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ্ আপনার ফুল উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে, ফুলে সুগন্ধ ও মধু উৎপাদন করে। সৌন্দর্য্য দেখাইয়া উদ্ভিদ্ কিরূপে মধুমক্ষিকা ও অন্যান্য কীট পতঙ্গদিগকে পথ প্রদর্শন করে, সুগন্ধ বিস্তার করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে আহ্বান করে, মজুরি স্বরূপ মধু দান করিয়া কিরূপে আপনার কার্য্য সাধন করিয়া লয়, এ সকল কথা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি। নিতান্ত শৈশব অবস্থায় উদ্ভিদ্-শিশু মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। সে জন্য অঙ্কুর যত দিন না একটু বড় হয়, ততদিনের নিমিত্ত তাহার মাতা বীজে খাদ্যের সংস্থান করিয়া রাখে। যে রূপ গো-বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তোমরা গাভীর দুগ্ধ অপহরণ কর, সেইরূপ ধান্যের শিশুকে ফুটন্ত জলে বধ করিয়া, চাউলে তাহার নিমিত্ত যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা তোমরা ভক্ষণ কর। শৈশব অবস্থায় আপনাদের শিশুর প্রতিপালনের নিমিত্ত ধান যব গম প্রভৃতির মাতা যে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, প্রধানতঃ তাহাকে শ্বেতসার বলে। প্রধানতঃ ইহাই চাউলের গুঁড়া আটা ময়দা রূপে মানুষ ভক্ষণ করে।

বৃক্ষতলে অনেক বীজ পড়িলে তাহাতে সন্তানের মঙ্গল হয় না। স্থানাভাবে সন্তান-দিগের প্রাণ নষ্ট হয়। সে জন্য প্রথমতঃ উদ্ভিদ্‌গণ অনেক বীজ উৎপাদন করে। কীট

পতঙ্গ মধুকরগণও এইরূপ করে। অভিপ্রায় এই যে, যত যায় যত থাকে। অন্যান্য জীবের আহার হইয়াও তাহারা জগতের কার্য্য সাধন করে। তা না হইলে একটী পুঁটী মাছের গর্ভে যত ডিম্ব হয় অথবা একটী বট গাছে যত বীজ হয়, সে সমুদয় যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সমুদয় পৃথিবী পুঁটি মাছে অথবা বট গাছে পূর্ণ হইয়া যাইত। গাছ অন্যান্য সকলের স্থান হইবে না, বৃক্ষ ছায়াতেও ইহারা ভালরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে না, এসজন্য আপনার বীজ দূরে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত উদ্ভিদ্‌গণ নানা উপায় অবলম্বন করে। আজকাল এই দেরাদুনে অনেক আম্র। সেদিন দেখিলাম যে, বাজারে আঁঠির আম এক পয়সায় কুড়িটা বিক্রীত হইতেছে। বোম্বাই আমও পয়সায় দুইটা করিয়া কিনিয়াছি। অনেক আম দেখিতে অতি সুন্দর—পীত ও লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। এই সমুদয় আম্র অন্যান্যের অম্লরস বিশিষ্ট সে জন্য ইহাদিগকে বাহিরে ভড়ং করিতে হইয়াছে। বোম্বায়ের আমের ভিতরে গুণ আছে। তুচ্ছ বাহির ভড়ং করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। কাঁচা অবস্থায় আম্রের বর্ণ সবুজ থাকে। পাতার ভিতর তখন তাহারা লুক্কায়িত থাকে। পাকিলে তাহারা সাজ সজ্জা করিয়া পাতার ভিতর হইতে মুখ বাহির করে। পক্ষীদিগকে যেন বলিতে থাকে,—"দেখ কেমন আমার রূপ। ভিতরেও সুমিষ্ট রস আছে। এস, আমাকে মুখে লইয়া দূরে গমন কর।" পক্ষী ও বাদুড় নানা ফলকে দূরে লইয়া যায়। তালের আঁঠি শৃগাল দ্বারা দূরে নীত হয়। বুঝিয়া দেখিতে গেলে, সকল বিষয়ের একটা না একটা কারণ আছে। এ গাছটীর পাতা কেন এরূপ, ও গাছটীর ফুল কেন ওরূপ, সে গাছটীর ফল কেন এরূপ, সকল বিষয়ের কারণ আছে। তবে আমরা সকল বিষয় জানি না—এই না। শিমুল গাছ সুগন্ধ বিস্তার করিয়া কীট পতঙ্গদিগকে আকুল করে না, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণে ফুলগুলিকে রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করে। বংশবিস্তারের নিমিত্ত ইহারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। বীজের সহিত ইহারা উড়োকল জুড়িয়া দিয়াছে। সেই উড়োকলের সহায়তায় বীজ দূরে উড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দিগের সেই উড়োকল লইয়া আমরা পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করি, গদি ও বালিশ পূর্ণ করি। কণ্টকময় জীবিত সেঁকুল বা সিঁহাকুল গাছের উত্তম বেড়া হয়। বাগানের চারি ধারে বীজ পুতিয়া অনেকবার আমি সেকুলের গাছ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। বনে বাদাড়ে নানাস্থানে সেঁকুলের গাছ জন্মে। কিন্তু আমি ইহার বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারি নাই। ইহার কারণ প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিলাম যে, পক্ষিগণ সেঁকুল ফল আহার করে। পক্ষী-উদরের উষ্ণতায় বীজ কোমল হয় সেই বীজ বাহির হইয়া সেঁকুলের গাছ হয়। কোন কোন বীজের ইহাই ধর্ম্ম। গোবরের সহিত অনেক বাবলা গাছের অঙ্কুর দেখিয়াছি। গরু বাবলা সুঁটি ভক্ষণ করে। উদরের উষ্ণতায় বীজ কিঞ্চিৎ কোমল হয়। তাহার পর গোবরের সহিত বাহির হইয়া বীজ অঙ্কুরিত হয় ও সেই গোবর বাবলা শিশুর শৈশব অবস্থার খাদ্য হয়।

ছোট ছোট বাবলা গাছের গায়ে অনেক কাঁটা থাকে। বড় হইলে তত কাঁটা থাকে না। কচি কচি বাবলা পল্লব গরু বাছুরের অতি মুখরোচক খাদ্য। সে জন্য বাল্যকালে বাবলা গাছ কাঁটায় সজ্জিত হইয়া গরুবাছুরের মুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। বড় হইলে আর আর আবশ্যক হয় না। অনেক গাছ আপনাদের শরীরে কটুরস তিক্তরস বিষময় রস সঞ্চিত করিয়া গরু বাছুরের মুখ হইতে পরিত্রাণ পায়। সেই রস সংগ্রহ করিয়া মানুষে ঔষধ প্রস্তুত করে। আমার বাড়ীর সম্মুখে এক্ষণে দোপ্পাটি গাছের বন হইয়াছে। নধর রসাল কোমল বাৎসরিক গাছ, কিন্তু গরুতে ইহা খায় না। ইহার শরীরে এরূপ কোন প্রকার বিষময় রস আছে, যাহা মানুষের কাজে লাগিতে পারে। অনেক দিন হইল, পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কোন কোন দেশে ইহা হইতে লোকে বালসাম নামক এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে কেহ তাহা করে না। দোপ্পাটি বাৎসরিক গাছ। যে সমুদয় উদ্ভিদে কয়েক মাসের মধ্যে ফুল ফল হইয়া মরিয়া যায়, তাহাদিগকে বাৎসরিক উদ্ভিদ্ বলে। ইহাদের অনেকের এক আশ্চর্য্য রীতি দেখিয়াছি। দোপ্পাটি গাছে এক্ষণে ফুল হইতেছে। কিছুদিন পরে ইহাতে ফল হইবে। ফল পাকিয়া ফাটিয়া যাইবে তাহার ভিতর হইতে বীজ এখন মাটিতে পড়িয়া থাকিবে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যতই কেন বৃষ্টি হউক না, তখন তাহারা অঙ্কুরিত হইবে না। তখন যেন তাহারা মনে করে যে, এ বৃষ্টি কিছু নহে। অল্প দিন পরে গ্রীষ্মকাল পড়িবে, তখন আর বৃষ্টি হইবে না, এখন অঙ্কুরিত হইব না। আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আসিলে তখন বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইবার ঠিক বর্ষা পড়িয়াছে, যেন ইহারা বুঝিতে পারে।

উদ্ভিদের যে জীবন আছে, তাহা সকলেই দেখিতে পায়। কিন্তু ইহারাও যে দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট এক প্রকার যোনি, তাহা সাহেবেরা স্বীকার করেন না। কিন্তু বঙ্গের গৌরব সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌গণও ক্লেশ ও মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে। সেই জন্য এদেশে উদ্ভিদ্‌ছেদন পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। সেই জন্য বৃক্ষ হইতে কোনরূপ উপকার লাভ করিলে প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহার শান্তির নিমিত্ত পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, যথা—

> "মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
> জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি॥"

যদি মনুষ্যও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, যথা,—

> "পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
> অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥"

আমের কচি ডালের মাজরা—এক প্রকার সাদা কীড়া আম গাছের বিশেষতঃ কলমের গাছের কচি ডালের ভিতর ছিদ্র করিয়া খায় এবং এইরূপে ডালগুলি মারিয়া ফেলে। এই পোকা ফাল্গুন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের ফলের বাগানের আম গাছের বিশেষ ক্ষতি করিতে দেখা গিয়াছে। অন্যত্রও এই পোকা লাগিতে দেখা যায়।

জীবন বৃত্তান্ত—স্ত্রী পোকা (পতঙ্গ) উহার শুঁড়দ্বারা কচি ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটী ডিম পাড়ে। একটী ডালে প্রায়ই একটী ডিম দেখিতে পাওয়া যায়। ডিমগুলি ঈষৎ হলুদ রঙের। ডিম ফুটিয়া ছোট পা শূন্য শাদা কীড়া বাহির হয়। কীড়াগুলি ছিদ্র করিয়া নীচের দিকে ঢুকিতে থাকে, সে জন্য ডালটী মরিয়া যায়। পূর্ণ বয়স্ক হইলে ডালের ভিতরেই পুত্তলি আকার ধারণ করে এবং অবশেষে পতঙ্গ বাহির হয়। পতঙ্গগুলি দেখিতে অনেকটা চাউলের কেরী পোকার ন্যায় কিন্তু বড় (প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা)। এই পোকাগুলিকে প্রায়ই কচি ডালের উপরে সঙ্গম করিতে বা ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ডিম ও কীড়াগুলিও আক্রান্ত ডালের ভিতরে পাওয়া যায়।

প্রতিকার—গাছের উপর ঔষধ ছিটাইয়া এই মাজরা পোকার কিছুই করিতে পারা যায় না কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়ে এই পোকা অনেক পরিমাণে দমন করা যাইতে পারে—

নূতন ডাল বাহির হইলেই তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিবে এবং এই মাজরার পতঙ্গ পাওয়া গেলে তাহা ধরিয়া মারিবে। ডিম ও কীড়া সহ আক্রান্ত ডালগুলিও নষ্ট করিবে। যদি প্রথম হইতেই ইহা করা যায় তবে আর পোকার বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং এইরূপে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমান যাইতে পারে।

ঢাকা ফার্ম, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, সহকারী কীটতত্ত্ববিদ।

উন্নত-প্রণালীতে রেশম কাটাই—পুসা কৃষি-কলেজের রেশম-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয়ের অভিজ্ঞতার ফল—বাঙ্গালা নিয়মে, কাঠের আগুনে ঘাইএর জল গরম করিয়া, তাহাতে গুটী সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে জল ও 'চরকি'র উপরিস্থিত রেশম অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং উন্নতি রেশম-কাটাই-প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই প্রণালীতে কার্য্য করিতে এবং রেশমের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(১) অগ্নির উত্তাপে জল গরম না করিয়া, লৌহনির্ম্মিত সচ্ছিদ্র নলের সাহায্যে, বয়লার (Boiler) হইতে বাষ্প আনাইয়া, আনীত বাষ্পে ঘাইএর জল গরম করিতে হয়। এইরূপ জলেই গুটী সিদ্ধ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে অন্ততঃপক্ষে

৫০টী ঘাই (Reeling Basin) থাকিবে। এতদপেক্ষা কম ঘাই থাকিলে, কেহই তাশানুরূপ লাভবান হইতে পারিবেন না।

(২) সিদ্ধ ও কাটাই করিবার পাত্র পৃথক রাখিতে হইবে। কাটাই করিবার সময় জলের উত্তাপ প্রায় ১৬০° হইতে ১৭০° ডিগ্রী থাকিলে, রেশমসূত্রের স্থিতিস্থাপকতা ও ভারসহনক্ষম শক্তি (strength) নষ্ট হয় না। সুতরাং প্রথমে একটী পাত্রে গুটীগুলি সিদ্ধ করিয়া লইয়া, তাহা হইতে অন্তিমসূত্র নির্গত করিতে এবং তৎপর সেগুলি অন্য আর একটী পাত্রে (ঘাইএ স্থানান্তরিত করিতে হইবে। ইহাতেও একটী লৌহের সচ্ছিদ্র নল বয়লারের সহিত সংলগ্ন থাকা চাই। বয়লার হইতে ঘাইএ ইচ্ছানুযায়ী বাষ্প আনায়ন বা বাষ্প-প্রবেশের পথ রুদ্ধ করণের জন্য নলে ছিদ্ররোধক গুঁজি tap থাকিবে। সুতরাং ঘাইএর জলের উত্তাপ যখন যত ডিগ্রী ইচ্ছা তত ডিগ্রীই করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, উক্ত উপায়ে, ঘাইএর জলের তাপ সমভাবেও রাখা যায়।

(৩) প্রতিবারে আবশ্যকানুরূপ অল্প পরিমাণ গুটী সিদ্ধ করিয়া, তাহাই কাটাই, করা উচিত। নচেৎ, গরম জল মধ্যে গুটীগুলি অনেকক্ষণ থাকিলে, সূত্রের স্থিতি-স্থাপকতা ও ভারসহনক্ষমশক্তি হ্রাস পায় এবং ইহার ওজনও কম হইয়া থাকে।

(৪) তহবিল বা চরকি হাতের সাহায্যে না ঘুরাইয়া, কলের সাহায্যে ঘুরাইতে হইবে। পাকদার হাতে ধরিয়া, সমান জোরে তহবিল ঘুরাইতে পারে না; ফলে, তহবিলের পাক কম-বেশী হইয়া পড়ে; ইহাতেও রেশমসূত্র নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কলের সাহায্যে তহবিল ঘুরাইতে পারিলে, সূত্রের পাক কম অথবা বেশী হইতে পারে না।

(৫) যে সকল রেশমসূত্রগুচ্ছ কাটান হইতেছে, ঐ গুলিতে সমানসংখ্যক গুটীর অন্তিমসূত্র থাকা চাই। পক্ষান্তরে, গুটীর উপরের অন্তিমসূত্র নীচের অন্তিমসূত্র অপেক্ষা একটু বেশী মোটা হয়; সুতরাং যে সূত্রগুচ্ছে গুটীর নীচের অংশের সূত্র পাক হইতেছে, তাহার সংখ্যা কিছু বেশী হওয়া প্রয়োজন।

(৬) বৃষ্টির জল, নদীর জল অথবা কুপের জল পরীক্ষা না করিয়া (ক্লার্ক সাহেবের প্রক্রিয়ানুযায়ী সহজেই জল পরিষ্কার করিতে পারা যায়,) তাহা ঘাইএ ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ, জলে লবণ বা ধাতবপদার্থ থাকিলেও রেশমসূত্র খারাপ হইয়া যায়।

(৭) ঘাইএর জল অপরিষ্কার হইলে, তাহা সময় সময় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। একই জলে দুই তিন বার গুটী সিদ্ধ করিলেই, ঘাইএর জল অপরিষ্কার হইয়া যায়। সুতরাং জল পরিবর্ত্তন করা বিধেয়।

(৮) রেশমগুটীগুলি কম-বেশী সিদ্ধ হইলেও, সূত্রের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। কম সিদ্ধ হইলে, সহজে কাটাই হয় না এবং শীঘ্র শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে, বেশী সিদ্ধ হইলেও, সূত্রের ভারসহনক্ষম-শক্তি হ্রাস পায় এবং সূত্রের ওজন কম হয়।

(৯) ইতালী দেশীয় কেনেল-সূত্র-কাটান-প্রণালীতেই রেশম-কাটাই করা বিধেয়।

ইহাতে সূত্রের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। জাপ্পন-প্রণালীতে (কেসোন-সূত্র-কাটান প্রণালী ও জাপ্পন-প্রণালী সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল) সূত্রকাটাই করিলে সূত্রের পরিমাণ খুব কম হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছু ভাল সূত্র পাওয়া যায়। জাপ্পন-প্রণালীতে সূত্র ভাল হইলেও, পরিমাণ কম হয় বলিয়া, এ উপায় অবলম্বনে বেশী লাভ দাঁড়ায় না।

(১০) সূত্রগুচ্ছ ছিঁড়িয়া গেলে, খুব ছোট করিয়া, গিঁট লাগাইতে হয়।

(১১) তহবিলের সূত্র অন্য একটি তহবিলে গুটাইয়া লইয়া (তহবিলে যে পরিমাণ সূত্র জড়ান যায়, সেই পরিমাণ সূত্র জড়ান হইলেই, তাহা অন্য তহবিলে তুলিয়া লইতে হয়,) তাহা ভালরূপে 'বন্দী-পাকাইয়া,' শুষ্কস্থানে, কাঠের বা টিনের বাক্সে, কাগজে জড়াইয়া রাখা উচিত।

(১২) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সূত্র এক সঙ্গে না রাখিয়া, পৃথকভাবেই রাখিতে হইবে। বিক্রয়ের সময়েও, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সূত্র পৃথকভাবেই বিক্রয় করা উচিত। কারণ, তাহা না হইলে, নিকৃষ্ট সূত্রের সহিত উৎকৃষ্ট সূত্রও একদরেই বিক্রয় করিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

(১৩) এদেশে নিকৃষ্ট রেশম ব্যবহার করিয়া, কেবল উৎকৃষ্ট রেশমই বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়। ইহাতে ভারতের রেশমের দর বাড়ে ও আদর বাড়িয়া যায়। এককালে, ইউরোপে ভারতীয় রেশমের খুব বেশী আদর ছিল; কিন্তু অধুনা, ভারতের রেশম ভাল হইলেও, তাহা কেহ ক্রয় করিতে চাহে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারতের কুত্রাপি রেশমের যাঁচাইঘর Conditioning House—যে পরীক্ষাগারে রেশম যাঁচাই করিয়া, প্রত্যেক চালানের রেশমের ভারসহনক্ষম-শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতার বিষয়, বিদেশী ক্রেতাকে জানান হয়, সেই রেশম-পরীক্ষাগারকেই যাঁচাইঘর বলে। রেশমতত্ত্ববিদ্‌ ব্যক্তি দ্বারাই যাঁচাইর কার্য্য সম্পাদিত হয়; সুতরাং বিদেশী ক্রেতা নিঃশঙ্কচিত্তেই, যথোচিত মূল্য দিয়া, রেশম ক্রয় করিতে পারে এরূপ একটী যাঁচাইঘর থাকিলে এবং বিদেশে কেবল উৎকৃষ্ট রেশম রপ্তানী করিতে পারিলে, ভারতীয় রেশমের দর বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বলা বাহুল্য, এরূপ পরীক্ষাগার বা যাঁচাই-ঘর একমাত্র সরকারী ব্যয়েই পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর।

(১৪) ইউরোপের বাজারে যেরূপ সূতার বেশী আদর, সেইরূপ সূতা প্রস্তুত করিয়াই, ইউরোপে চালান দিতে হইবে। ইউরোপের অনেক অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে, তিনিই রেশমসূত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় জানাইতে পারিবেন।

(১৫) রেশম-কাটাই কুঠিগুলি সমবায়-সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইলেই, রেশমের উৎকর্ষ-সাধন সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। কোয়া প্রস্তুতকারী বসনীরা সমবায়-সমিতির

পরিচালক বা সভ্য হইলে, অতি অল্প খরচেই কুঠির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। দশে মিলিয়া কাজ করিতে পারিলে, অর্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ সকল কার্য্যেই সুফললাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(১৬) দালালের নিকট রেশম বিক্রয় না করিয়া, যাহারা রেশম রপ্তানী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট রেশম বিক্রয় করাই বিধেয়।

ভারতে বস্ত্র শীল্প—১৯১৩-১৪ সালে ১,১৬,৩২,৯১৫৮৮ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পুর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে ১,২২,০৪,৪২,৫৪৫ গজ কাপড় হইয়াছিল। এতএব আলোচ্য বৎসর ৫,,৬১,৫০,৯৫৭ গজ কাপড় অর্থাৎ শতকরা ৫,৬ কম উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পুর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসরে রপ্তানীর হার কিছু বেশী। ১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত কত কাপড় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে তাহার পরিমাণ—

১৯০৮-০৯	...	...	৭,৭৯,৮৮,৯৬৪ গজ।
১৯০৯-১০	...	...	৯,১৮,৩৭,৫৫৮ গজ।
১৯১০-১১	...	...	৯,৯৭,৮৮,৩১৫ গজ।
১৯১১-১২	...	...	৮,১৪,২৯,৪১০ গজ।
১৯১২-১৩	...	...	৮,৬৫,১২,৮১২ গজ।
১৯১৩-১৪	...	...	৮,৯৩,৩৩,৭১৬ গজ।

গম রপ্তানী।—ভারতবর্ষ হইতে ১৯১১-১২ হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসর প্রতি বৎসর জুলাই মাসে কত গম বিদেশে চালান গিয়াছে তাহার তালিকা।

জুলাই	২৬৬,২০০	৩২৮,০০০	৩১৮,৫০০	১৫৯,৬০০	১৮৭,৫৭০

সীলেটে অন্নকষ্ট—'সুরমায়' কোন পত্রলেখক লিখিয়াছেন—"শ্রীহট্ট জিলায় অনাবৃষ্টির দরুণ সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আউষ ধান্য জ্বলিয়া গিয়াছে। প্রতি একারে দশ পনর সেরের অধিক ফসল পাওয়া যায় নাই। এই জিলার লোকের যে কি উপায় হইবে, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। বর্ত্তমানে বালীগঞ্জ থানার অধীন লক্ষীপুর পরগণায় শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এমন কি অধিকাংশ লোকে অতি কষ্টে চাউল সংগ্রহ করিয়া দিনান্তে এক সন্ধ্যা খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমানেই প্রায় চারিমাস কাল এইরূপ ভাবে চালাইতে হইবে, সুতরাং কি উপায়ে ঐ চারি মাস কাল অতিবাহিত করিবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। বিগত ১৯১৩। ১৫ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে

সাহায্য করিয়াছিলেন, এবারে তাঁহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন; আজ তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থী। শ্রমজীবীরা গোমহিষ অভাবে রীতিমত কৃষিকার্য্য করিতে পারে নাই। সুশিক্ষিত ভারতবাসীর সাহায্য ব্যতীত এতদঞ্চলের লোকের উপায় নাই। আশা করি, দয়াশীল ভদ্রমহোদয়গণ এই সকল অন্নক্লিষ্ট লোকের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।"

২৪ পরগণার অধিকাংশ স্থানে ও হুগলী জেলায় জলাভাবে হৈমন্তিক ধান চাষের বিঘ্ন হইতেছে। এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রকৃতপক্ষে দেখা না দিলেও সকলেরই অল্পবিস্তর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। চাউলের দর উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ৬ই ভাদ্র ১৩২৩।

মহীশূর রাজ্যের ব্যবসায়োদ্যোগ—মহীশূর দরবারের কয়জন কর্ম্মচারী ও কয়জন ব্যবসায়ীকে জাপানের শিল্প ব্যবসা দেখিয়া আসিবার জন্য জাপানে পাঠাইতেছেন। আজ কাল জাপানী পণ্য যেরূপে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে তাহাতে সকলেরই দৃষ্টি জাপানের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। কি উপায় অবলম্বন করিয়া জাপান অত্যল্পকালমধ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য—জাপানের সাধন-মন্ত্র জানিবার জন্য—সকলেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সরকার অধ্যাপক হ্যামিণ্টনকে পাঠাইয়াছিলেন—তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক। এ বিষয়ে মহীশূর দরবারের কার্য্য আরও প্রসংশনীয়—দরবার যে সব ব্যবসায়ীকে জাপানে পাঠাইতেছেন, তাঁহারা জাপানী ব্যবসার শক্তিকেন্দ্র যত সহজে আবিষ্কার করিতে ও স্বদেশে সেই শক্তি প্রযুক্ত করিতে পারিবেন, আর কেহই তত সহজে পারিবেন না। অধ্যাপক হ্যামিণ্টনের বিবরণ সত্বর প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। এদেশে শিল্প-ব্যবসা কমিশনের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কি সে বিবরণ প্রকাশিত হইবে না?

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক মাস

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্তের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসূরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্তের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—চারি হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটোলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

আলু ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস পাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উরকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আশ্বিন ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। { আশ্বিন, ১৩২৩ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

লৌহ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস লিখিত

বামা ও তাহার স্বামী নণ্ডুরামের নিবাস ছোটনাগপুর, লোহারডাগা জিলা, যাহাকে অনেকে রাচির জিলা বলিয়া জানেন। জাতিতে ইহারা অগরীয়া। অগরীয়ারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বলে—ছোটনাগপুর আমাদের আদিম নিবাস নহে; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আগ্রা অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছিলেন। গলায় আমাদের যজ্ঞোপবীত ছিল; জীবিকার জন্য কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে হইল বলিয়া আমরা ইহা এখন পরিত্যাগ করিয়াছি। আগরীয়ারা ক্ষত্রিয় হইলেও, ইহাদিগের আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য সজ্জাতি হিন্দুদিগের মত নয়। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ করিয়া ইহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে কিছুদিন পরে বড় বড় হাড়গুলি তুলিয়া লইয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া আসে। আগরীয়া ও আগুরি এই দুইটী নামে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, বামা ও নণ্ডুরামের নাম ধাম কুল-মর্য্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আলোচনার আবশ্যক নাই। ইহারা কি কাজ করিয়া দিনপাত করে, তাই লইয়াই আমাদের কথা। বামা ও নণ্ডুরাম ও তাহাদিগের দুইটী ছেলে প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করে, ও সেই লৌহ কর্ম্মকারদিগকে বিক্রয় করে। তাহাতেই অতি কষ্টে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়। সেই কাজ করে বলিয়া সকলে ইহাদিগকে লোহা-অগরীয়া বলিয়া থাকেন। লোহা হয়, তজ্জন্য রাচি জিলার নাম লোহারডাগা হইয়াছে কি না,

তাহা বলিতে পারি না। রাণিগঞ্জের দিকে যাহারা কখনও বেড়াইতে গিয়াছিলেন মাঠে ছোট বড় কত পাথর পড়িয়া আছে, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। এক একখানি পাথর দেখিতে ঠিক লোহার মত, হাতে তুলিয়া দেখিলে খুব ভারি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে লৌহ থাকে; সে কথা পরে বলিব। বামার দুইটী ছেলে এইরূপ পাথর কুড়াইয়া আনে ও সকলে মিলিয়া তাহা চূর্ণ করে। বামাদের একটী ভাঁটী আছে। সেই ভাঁটিটী অনেকটা, চুণ পোড়াইবার ভাঁটির মত দেখিতে। ইহা মৃত্তিকা দিয়া গঠিত, গোলাকার প্রায় তিন হস্ত উচ্চ। তলভাগে মেজে। মেজের আধ হাত উপরে ছাদ। ছাদ হইতে ভাঁটির চূড়া পর্য্যন্ত মাটি দিয়া বুজানো, কেবল মাঝখানে একটী সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের উপর-মুখে কিছু দিলেই মেজেতে গিয়া পড়ে।

নথুরাম প্রথমে মেজেটীতে কাঠের কয়লা ঠাসিয়া দেয়। তার পর উপর হইতে মুঠা মুঠা কয়লা দিয়া সুড়ঙ্গটীও কয়লায় পরিপূর্ণ করে। সুতরাং সুড়ঙ্গের কয়লা ও মেজের কয়লা এক হইয়া পড়ে। তার পর নিচেতে একটু আগুণ দিয়া জাঁতার তাও দিলেই সমুদয় কয়লা ধরিয়া উঠে। জাঁতার তাও কিছু উপর হইতে দেওয়া যায় না, নীচে হইতেই লোকে দিয়া থাকে। ভাঁটির তলভাগে যে মেজে, সেই মেজের এক ধারে একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রটীতে একটী মাটির নল লাগানো থাকে। মাটীর নলের সহিত জাঁতার বাঁশের চোঙ্গের যোগ। যদি মাঝখানে একটু মাটির নল না রাখা যায়, তাহা হইলে বাঁশের চোঙ্গটী যে পুড়িয়া যাইবে, আর জাঁতাটি যে নষ্ট হইয়া যাইবে। ভাঁটিতে বাতাস দিবার জন্য একজোড়া জাঁতার আবশ্যক। জাঁতাগুলি দেখিতে ঠিক জগঝম্পের মত, কাঠের খোল, ছাগলের ছালে ঢিলে-ঢিলে ছাওয়া। জাঁতার এক দিকে বাঁশের চোঙ্গ, যাহা দিয়া ভাঁটির ভিতর বাতাস যায়; অপর দিকে একটি ছিদ্র, যাহা দিয়া বাহির হইতে বায়ু আসিয়া জাঁতাকে পরিপূর্ণ করে। ভাঁটির দুইদিকে দুইটি কাঠের খুঁটি ঢেঁকি-কল ভাবে ভূমিতে সংলগ্ন আছে। তাহাদিগের মাথায় দড়ি বাঁধিয়া নীচে হইতে টানিলে নুভিয়া আসে, আবার নোল দিলেই আপনি-আপনি উপরে উঠিয়া পড়ে। এই দড়ির অপর দিকটা জাঁতার চর্ম্মে সহিত টানো টানো ভাবে বাঁধা। উপরে কাঠের টানে জাঁতার চর্ম্ম তাই সর্ব্বদা বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জাঁতার বাহির দিকে যে ছিদ্রটি আছে, তাহাকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বন্ধ করিয়া চর্ম্মের উপর চাপ দিলেই, খুঁটি নত হইয়া পড়ে, আর চর্ম্মের ভিতর যে বায়ুটুকু থাকে, তাহা কৌশ করিয়া বাঁশের চোঙ্গ দিয়া ভাঁটিতে প্রবেশ করে। বাহিরের ছিদ্রটী এই সময় খুলিয়া দাও, চর্ম্মের উপরে চাপটী ছাড়িয়া দাও, অমনি খুঁটির মাথাটী উপরে উঠিয়া পড়িবে, খুঁটিতে আর জাঁতাতে যে দড়ি বাঁধা আছে, তাহাতে টান ধরিবে, আর বাহির হইতে বায়ু আসিয়া চর্ম্মকে পরিপূর্ণ করিবে। আবার ফের চর্ম্মকে চাপিয়া ধর, ফের সেইরূপে বায়ু গিয়া ভাঁটিতে প্রবেশ করিবে। এখনকার লোকেরা পায়ের ভর দিয়া জাঁতাকে চাপিয়া

ধরে। জাঁতার উপর যেই একবার পা রাখে, অমনি ফোঁশ করিয়া ভাঁটিতে বাতাস যায়, পা তুলিয়া লইলেই জাঁতা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। অপর পায়ের দ্বারা বাহিরের ছিদ্রকে একবার বন্ধ, একবার মুক্ত রাখিতে হয়। পাশা পাশি দুইটী জাঁতা রাখিয়া লোকে কাজ করে। একবার এটীতে পা, একবার ওটীতে পা, এই করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটী জাঁতা হইতে অবিরত ভাঁটিতে বাতাস যাইতে থাকে। একেলা দুইটী জাঁতা চালাইতে গেলে ভালরূপ ভর পড়ে না, আর শীঘ্রই নণ্ডুরাম শ্রান্ত হইয়া যাইবে, তাই সে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়াছে। পশ্চাৎ হইতে বামা তাহার কোমর ধরিয়াছে, আর স্ত্রী-পুরুষে দুজনে মিলিয়া জাঁতা চালাইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই কয়লা ধরিয়া উঠে; ভাঁটির ভিতর কি মেজেতে কি সুড়ঙ্গে আগুণ গন্ গন্ করে। সুড়ঙ্গের কয়লা পুড়িয়া অধোগামী হইতে থাকে। অঙ্গার অধোগামী হইয়া সুড়ঙ্গের উপরিভাগ ক্রমে খালি হইয়া পড়ে। এখন সেই যে সকলে মিলিয়া তাহারা প্রস্তর চূর্ণ করিয়া রাখিয়াখিল, তাহার কিয়দংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয় ও তাহার উপর ফের কয়লা সাজাইয়া দিতে হয়। এক থাক পাথরের গুঁড়া এক থাক কয়লা দিয়া ক্রমাগত সুড়ঙ্গকে পরিপূর্ণ করিতে হয়। যেমন কয়লা পুড়িতে থাকে; পাথরের গুঁড়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই গলিতে থাকে, আর গলিয়া তলায় ভাঁটির মেজেতে গিয়া জমা হয়। এই দ্রবীভূত প্রস্তর চূর্ণের নিম্নভাগে গুরুভার লৌহ অবস্থিতি করে। লৌহ ভিন্ন প্রস্তরে আর যে কিছু পদার্থ থাকে, তাহা গলিয়া তরল ভাবে উপরে ভাসিতে থাকে। মাঝে মাঝে ভাঁটির গায়ে ছিদ্র করিয়া উপরিস্থিত এই ক্লেদ বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপে দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রস্তরচূর্ণ ও কয়লা যোগাইলে, ভাঁটিতে অনেক খানি লৌহ জমিয়া যায়। তখন শেষকালে একবার জাতায় ঘন ঘন ভর দিয়া অগ্নিকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিতে হয়। তার পর ভাঁটির মুখে মাটির নলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই পথ দিয়া লৌহ বাহির করিযা লইতে হয়। এই লৌহ সম্পূর্ণ তরলভাব ধারণ করে নাই, অর্দ্ধ দ্রবীভূত পিণ্ডাকারে ইহা ভাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধও নয়। প্রস্তর-নিহিত অপরাপর দ্রব্য (সাধারণ কথায় যাহাকে লৌহমল বলিয়া থাকে) ও কয়লার গুঁড়া এখনও ইহার সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাই বাহির করিয়াই রক্তবর্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাকে বলপূর্ব্বক পিটিতে হয়। তাহাতে অসার দ্রব্যসমূহ দূরে গিয়া পড়ে ও লৌহ ক্রমে নির্ম্মল হইয়া আসে। একবার পিটিলেই লৌহ সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হয় না। আরও দুই চারিবার হাপরে পোড়াইলে ও পিটিলে তবে ঠিক হয়। কোনও কোনও লৌহ-নিষ্কারকেরা লৌহকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া তবে লোহার ও কর্ম্মকারদিগকে বিক্রয় করে। আবার কেহ বা তাহা না করিযা অশুদ্ধ অবস্থাতেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। কর্ম্মকারেরা আরও পোড়াইয়া ও পিটিয়া আপনাদিগের কর্ম্মোপযোগী করিয়া লয়। ছয়

ঘণ্টা ধরিয়া পরিশ্রম করিলে ভাঁটি হইতে যে এক খণ্ড লৌহ বাহির হয়, তাহাকে "গিন্নি" বলে।

লৌহের উৎপত্তি বিষয়ে জঙ্গল-মহলে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে অতি প্রাচীন কালে লোহাসুর নামে একটা দুর্দ্দান্ত দৈত্য ছিল। ঘোরতর তপোবলে সে এরূপ বলশালী হইয়াছিল যে, স্বর্গের দেবতাগণ তাহার ভয়ে কম্পিত থাকিতেন, এমন কি ইন্দ্রকেও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। লোহাসুর স্বর্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শচীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। ইন্দ্রদেব পথের ভিখারী হইয়া কখনও মর্ত্তে, কখনও পাতালে, কখন মাঠে, কখনও ঘাটে। অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাজদেহ রাজভোগে গঠিত। এ সুকোমল দেহে এরূপ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ আর ক দিন সহ্য হইয়া থাকে? আর সহিতে না পারিয়া তিনি রুক্ষকেশে, মলিনবেশে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক কান্না-কাটনার পর দয়াময় মহাদেব তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। কিন্তু সদয় হইলে কি হইবে, ওদিকে নিজেই লোহাসুরকে বর দিয়া বসিয়া আছেন যে, বিষ্ণুর চক্রই হউক, ইন্দ্রের বজ্রই হউক, আর বরুণের পাশই হউক, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মনুষ্য মধ্যে যে কোন অস্ত্র প্রচলিত থাকুক, তাহা দিয়া লোহাসুরকে মারিলে তাহার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগিবে না। সুতরাং বড়ই শঙ্কটের কথা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেব একটী মনুষ্যের সৃজন করিলেন। তাহাকে কামারের সজ্জায় সজ্জিত করা হইল। কিন্তু কি স্বর্গে, কি মর্ত্তে, কি পাতালে, তখন কুত্রাপি একটীও কামার ছিল না, কামার কাহাকে বলে কেহই জানিত না। তা কামারের সজ্জা কোথা হইতে আসিবে, তাই সেই কৈলাস-শিখরবাসী ভক্তাধীন ভবানীপতি নিজের আসবাবই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জাঁতা হাতুড়ী প্রভৃতি কর্ম্মকারের আবশ্যকীয় যন্ত্র-সমূহ গড়াইয়া দিলেন। ডমরুটী ভাঙ্গিয়া হইল হাতুড়ী, মড়ারমাথার খুলিখানি একটু পিটিয়া-পাটিয়া হইল নেহাই (যাহার উপর স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারেরা কোন দ্রব্য রাখিয়া হাতুড়ীর ঘা মারিয়া থাকে), সাপটীকে বাঁকাইয়া হইল চিমটা। এইরূপ আয়োজন দেখিয়া শঙ্করবাহন ষাঁড়টীও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের প্রতি সকরুণ হইয়া তিনিও আপনার গায়ের একটু ছাল খুলিয়া দিলেন। তাহাতেই জাঁতা যোড়াটী প্রস্তুত হইল। মনুষ্যকে এইরূপে সুসজ্জিত করিয়া ভবানীপতি তাহাকে অদেশ করিলেন,—স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্র অতি ক্লেশ পাইতেছেন, ইন্দ্রের নিমিত্ত তুমি লোহাসুরের সহিত যাইয়া যুদ্ধ কর, সেই দুর্জ্জয় দানবপতিকে শীঘ্রই বধ কর। এইরূপে সুসজ্জিত ও আদিষ্ট হইয়া "যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি" ভৈরবরবে মনুষ্য যাইয়া লোহাসুরের নিকট উপস্থিত হইল। ভীষণ পর্ব্বতাকায় লোহাসুর এই কীটসদৃশ সামান্য মনুষ্যকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া

বাঙ্গলার-নাই বিস্মিত হইল। মনে মনে ভাবিল, তাই তো, এ যে সেই বাঙালায় রসময় কবি কলিকালে যাহা বলিবেন, আজ তাহাই দেখিতেছি। দানবেরা যে কতকটা দেবযোনি, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে না কি? তা না হইলে যুগ-যুগান্তর পরে রসময় বাবু কি বলিবেন, লোহাসুর কেমন করিয়া জানিল? রসময় কবি একবার একজন সমৃদ্ধিশালী তন্তুবায় জমিদারের বাটীতে কিছু বিদায় পাইবার প্রত্যাশায় গিয়াছিলেন। দক্ষিণাটা কিন্তু মনের মত হয় নাই। এ অবস্থায় কবিলোক চুপ করিয়া চলিয়া আসিবেন, সে কথা তো কখনই হইতে পারে না। গৃহস্বামী পারস্ত ভাষা পড়িতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটী কবিতা রচনা করিলেন, ও বাবুকে শুনাইয়া বলিলেন,—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি। মোগল গেলেন পাঠান গেলেন ফার্সী খাঁ আজ তাঁতি।"

এই কথা বলিয়াই প্রস্থান। লোহাসুর ভাবিল, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সকলেই রণে পরাজিত হইলেন, স-নন্দনকানন এই স্বর্গদেশে আমি বাহুবলে একাধিপত্য স্থাপন করিলাম, আজ কি না মর্কটের মত একটা মনুষ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায়! এই রহস্ত চিন্তা করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া মনুষ্যকে বলিল,—তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না, তোমার মত সামান্ত কীটকে আমি যখন এক গালে খাইয়া ফেলিতে পারি, তা আবার তোমার সহিত যুদ্ধ কি করিব? লোক আমাকে উপহাস করিবে, মা'র বাছা ঘরে ফিরিয়া যাও। মনুষ্য নিরুপায় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে দানবকে বলিল,—ভাল প্রকৃতই যদি তুমি এত বলশালী, সত্যই যদি তুমি অমর, তোমার অসাধ্য যদি কিছুই না থাকে, তবে আমি একটী কথা বলি, তাহা করিতে পার? তা যদি করিতে পার, তবে আমার মনে বিশ্বাস হয় যে, যথার্থই তুমি অজয় অমর, আর তাহা হইলে তোমার সহিত যুদ্ধ আর কি করিব, কাজে কাজেই ঘরে ফিরিয়া যাইব। দানব উত্তর দিল,— বল, আমি আবার করিতে না পারি কি? মনুষ্য বলিল—একটু রও, আমি এইখানে কাদা দিয়া একটী ভাঁটি গড়ি, সেই ভাঁটির গায়ে আমার এই জাতাটী বসাই, আর তাহার ভিতর কয়লা সাজাই, তুমি যদি সেই কয়লার উপর খানিক-ক্ষণের জন্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ দৈত্য বটে! দানব দৈত্য ভূত প্রেতেরা প্রায়ই বোকা হইয়া থাকে; তাহারা বড় ফের ফন্দি বুঝে না, গায়ের বলেই তাহারা জগৎকে সরা-খানা দেখে। মন্ত্রবল বুদ্ধিবল যে গায়ের বলের চেয়ে বড়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহার সাক্ষী আরব্য উপন্তাসের দৈত্যটা, যে মৎস্যবধী ধীবরের এক কথাতেই আবার হাঁড়ির ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিল। আর আমাদের দেশের রোজাদের ত কথাই নাই, বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা আজও ভূতটী ধরিয়া কুপার ভিতর

পুরিতেছেন ; কাল সে ভূতটী ধরিয়া কুপার ভিতর আগাইয়া রাখিতেছেন। তাঁদের কাজই হইল এই। দানব হাসিয়া বলিল—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি কি না উৎকট কাজ করিতে বলিবে। যত বড় খুশী ভাঁটি গড় ; বল তো আমি না হয় তোমার সহিত কাদর যোগাড় দিব, যত খুশী কয়লা চাপাও, কয়লায় আগুণ দিয়া যত খুশী জাঁতা বহ। একেলা না পার, তোমার যদি কেহ বামা সুন্দরী থাকে, তারেও না হয় ডাকিয়া আন। তোমার কোমর ধরিয়া সেও জাঁতা বহিবে। তার পর যতক্ষণ বল, ততক্ষণ আমি ভঁটির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। ভাঁটি গড়া হইল, কয়লা সাজান হইল, জাঁতা বসানো হইল। হাসিতে হাসিতে দানব গিয়া ভাঁটির ভিতর কয়লার উপর আসনপিড়ি হইয়া বসিল। মনুষ্য কয়লায় অগুণ দিয়া জাঁতায় তাও আরম্ভ করিয়া দিল। আগুণ ধরিয়া উঠিল, কয়লা রক্তবর্ণ হইয়া টক্‌টক্ করিতে লাগিল। অসুরের গা পুড়িল, দুঃসহ যাতনা হইল ; তবুও (দানব কি না ? গার্জুরি টুকু তো চাই !) যতই কেন কষ্ট হউক না, প্রকাশ করা কিন্তু হবে না। তাই লোহাসুর অটল অচল ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে তাহার শরীর লাল হইয়া উঠিল। শরীর গলিতে লাগিল, অবশেষে সমুদয় শরীরটী গলিয়া ভাঁটির বাহিরে গড়াইয়া আসিল। এই যে সব লেহা দেখিতে পাও, খাঁটি লেহাই বল আর লৌহময় প্রস্তরই বল, এসব সেই লোহাসুরের শরীর। কেবল লোহা নয়, পিত্তল কাঁসাও তাই। আর সেই যে মানুষটী, যিনি কৌশল করিয়া লোহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তিনিও বড় কেও কেটা নন। তিনি কর্ম্মকার প্রভৃতি কয়েটী ধাতুসম্পর্কীয় শিল্পকারদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ। লোহাসুরের দ্রবীভূত শরীর শীতল হইয়া যেই একটু জমিয়া আসিল, অমনি তিনি তাহা পিটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিটিয়া পিটিয়া যে কয় প্রকার ধাতু বাহির হইল, তাহা তিনি তাঁহার সন্তানবর্গকে বিভাগ করিয়া দিলেন, যথা—(১) লোহার কর্ম্মকারকে তিনি লৌহ দিলেন ; (২) পিত্তল কর্ম্মকারকে তিনি পিত্তল দিলেন ; (৩) কাঁসারিকে তিনি কাঁসা দিলেন ; (৪) স্বর্ণ-কামারকে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য দিলেন ; (৫) ঘট্রা কর্ম্মকারকে তিনি এরূপ লৌহ দিলেন যাহাতে অনায়াসে কাজলনাতা, লৌহফল ও পুত্তলিকা বিশেষতঃ লক্ষ্মীপূজার সময় যে পেচকের আবশ্যক হয়, তাহা গড়া যাইতে পারে ; (৬) চাঁদ কামারকে তিনি এরূপ পিত্তল দিলেন, যাহাতে সুচারু দর্পণ নির্ম্মিত হইতে পারে। (৭) ও (৮) ঢোক্রা ও তাম্রাকে তিনি তাম্র দিলেন। প্রবাদটী জঙ্গল মহলের, সুতরাং যে সকল ধাতুকারদিগের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম কিছু জঙ্গলী জঙ্গলী। ইহাদের মধ্যে অনেকের আচার ব্যবহারও তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে। কেহবা মুর্গী পোষে ও মুর্গী খায়, আবার কাহারও বা সেই উপাদেয় ভঁইসের মাংস পাইলেই পরম আনন্দ। আবার, ভাদ্র মাসে ঘোর-নিশীথে যখন এই কর্ম্মকার-কুমারীরা হেলিয়া দুলিয়া শ্রীশ্রীভাদু দেবতার স্তুতিসূচক মধুর গান করিতে থাকেন, তখন কার না

মন মোহিত হইয়া যায় ? পৃথিবীতে যদি এমনও কেউ কঠিনপ্রাণ পাষণ্ড থাকে যে, সেই কোকিলকণ্ঠী, কৰ্ম্মকারকুমারীদিগের অলকা-তিলকা-বিভূষিত সুধাংশুবিনিন্দিত মুখচন্দ্রিমা দেখিয়াও একবারে জ্ঞানহারা না হইয়া পড়ে, গানের ভাব বুঝিলে তাহার আর কিছু বাকী থাকে না। বুকে সকলে সাহস বাঁধুন, আমি সেই গানের দুইটী কথা এখানে ফেলি :—

কদম গাছে উঠ্‌লে ভাদু কাঁচা কদম ভেঙ্গোনা।
পাক্‌লে কদম সবাই খাবে কেউ কিছু তখন ব'ল্‌বে না ॥

অর্থাৎ কি না, হে ভাদু ! তুমি দুড় দুড় করিয়া কদম- গাছে উঠিলে দেখিতেছি ; কিন্তু কদম ফল এখনও পাকে নাই। কাঁচা কদম ফলগুলি ছিঁড়িয়া বৃথা নষ্ট করিও না। যখন কদম পাকিবে, তখন আমরাও খাইব, তুমিও খাইও ; যত ইচ্ছা পাড়িও, কেউ তখন তোমাকে মানা করিবে না। বলা বাহুল্য যে এখানকার লোকে পাকা কদম ফল খাইয়া থাকে।

এই গেল, জঙ্গল-মহলে লৌহ-উৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ। প্রবাদটী সত্য কি মিথ্যা সে বিচার করিবার আমার ক্ষমতা নাই। যদি সে শাস্ত্রজ্ঞানই থাকিবে, তাহা হইলে এই সামান্য নীরস প্রস্তাব লিখিতেই বা প্রবৃত্ত হইব কেন ? উপন্যাস রচনা করিতাম, না হয় তীব্র বাক্যে সাহেবদের গালি দিয়া প্রবন্ধ লিখিতাম ! আবাল-বৃদ্ধ দেশহিতৈষীরা মায় তাঁদের ছানা-পোণাটী পর্য্যন্ত, সাধু সাধু বলিয়া আমার জয়ধ্বনি করিতেন। হায় ! সে যশ আমার কপালে নাই। আমার যে গতিবিধি, দীন হীন ভিখারী ভারতবাসী-দিগের পর্ণকুটীরে ! আমি যে তাহাদিগের হাঁড়ি উট্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করি—"কেমন নন্দুরাম, কাল কতটুকু লোহা নামাইলে, কতকে বেচিলে ; দুই দিন ছেলে পিলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে তো ?" যাহার গতিবিধি পর্ণকুটীরে, অট্টালিকাবাসীরা তাহাকে ভাল বলিবেন কেন ? কুটীরবাসীরা কি খায়, কি পরে, যাহার অনুসন্ধান ; উচ্চ রাজতন্ত্রপরায়ণ জ্ঞানগম্ভীর মহোদয়েরা তাহাকে আদর করিবেন কেন ? লোহা প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যজাত লইয়া যাহার আলোচনা, আপনাদিগের সেই এম এ বিএ রূপ মণিময় মুকুটধারী পণ্ডিতেরা সে মূর্খের পানে ফিরিয়া চাহিবেন কেন ? সেজন্য আগেই বলিয়া দোষে খালাস হইয়াছি, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই যে বিচার করি, এমএ বিএ নই যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে করিতে উগ্রভাবাপন্ন প্রবন্ধ লিখি। তবে একথা বলিতে পারি, যে উৎপত্তি যেরূপেই হইয়া থাকুক, লৌহ একটী মূল বা রূঢ় পদার্থ যৌগিক পদার্থ নয়। যৌগিক পদার্থ, দুইটী বা ততোধিক মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে হইয়া থাকে। উত্তাপ দ্বারা হউক বা তাড়িতবল প্রয়োগে হউক বা অন্য কোন উপায়ে হউক, যৌগিক পদাথকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়, আবার সেই মূল পদার্থগুলিকে লইয়া, পুনরায় রাসায়নিক সংযোগে যেরূপ যৌগিক

পদার্থ ছিল, তাহা করিতে পারা যায়। তুঁতে একটা যৌগিক পদার্থ। তামা ও গন্ধক চূর্ণ একত্র মিশাইয়া তাপ দিলেই তুঁতে হয়। সুতরাং রাসায়নিক উপায় দ্বারা তুঁতেকে বিয়োগ করিয়া ইহা হইতে গন্ধকটুকু ও তামাটুকু পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু গন্ধককে বা তামাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। তাপই দিই অম্লিকরণই প্রয়োগ করি, যে কোন রাসায়নিক উপায় করি, গন্ধক গন্ধক রহিয়া যায়, তামা তামাই থাকিয়া যায়। ইহাদিগের ভিতর হইতে আর কোন পদার্থ বাহির করিতে পারি না। তাই, গন্ধক ও তামা মূল পদার্থ, তুঁতে যৌগিক পদার্থ। সেইরূপ লৌহ মূল পদার্থ, হীরাকস যৌগিক পদার্থ। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা মোটামুটি পাঁচটী মূল পদার্থ ধরিয়া গিয়াছিলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতে সমুদয় পৃথিবী গঠিত বলিয়া মোটামুটি স্থির করিয়াছিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহারা ক্ষিতির ভিতরেই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রকারেরা ক্ষিতিকে একটা স্বতন্ত্র ভূত বলিয়া গণনা করেন না, ইহাকে যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, বালুকার আকর, চুণের আকর প্রভৃতি নানামূল পদার্থের ক্ষিতি একটা সমষ্টি মাত্র! সেই সকল দ্রব্যের সহযোগে মৃত্তিকা হয়। তা ভিন্ন মৃত্তিকা কিছুই নয়, এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কেবল কথায় বলেন না, এক মুঠা মাটি দিলে তোমার সম্মুখে সেই মাটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিবেন, কি কি দ্রব্য মিশিয়া-ঘুষিয়া সেই মাটটুকু হইয়াছে। তাহাতে কতটুকু সোণা আছে, কতটুকু লোহা আছে, কতটুকু বালির আকর আছে, কতটুকু চুণের আকর আছে, সব কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিবেন। আবার সে হিসাব অব্যর্থ সন্ধান। যেমন দুই দুয়ে চারি হয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই, সেইরূপ ভাল করিয়া যদি হিসাব করিয়া দেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগের হিসাবে আর কোন সংশয় থাকে না। ইউরোপের লোকে দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এখন ইহাঁদের কথার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন। অনেক টাকা দিয়া ইহাঁদের মত সংগ্রহ করিয়া সেই মতানুযায়ী কার্য্য করেন। শুনিলাম,—সে দিন একজন কলিকাতার সাহেব ছোটনাগপুরে একটা পাহাড় কিনিবার কল্পনা করিয়া সেই পাহাড়ের এক মুঠা মাটি পরীক্ষার নিমিত্ত একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পাহাড়ে সোণা আছে কি না, আর কত মাটিতে কতটুকু সোণা পাওয়া যাইতে পারিবে, সেই কথা নিশ্চয়রূপে স্থির করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষককে এই মাটি লইয়া দুই দিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এই দুই দিন পরিশ্রমের মজুরি স্বরূপ তিনি ১৪০ টাকা লইয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, ভূমি-ক্রেতা সাহেব অবশ্যই সেই মত কার্য্য করিবেন। তাহা হইলে ঠকিবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভূমি পরীক্ষা করিয়া লন। আমি ঐ জমিটুকু কিনিবার বাসনা করি, তাহাতে আলুর চাষ করিয়া দু পয়সা পাইব কি না, মাটি পরীক্ষা করিয়া আমাকে

বলিয়া দিন। আমি ঐ ভূমি টুকুতে গমের চাষ করিয়াছিলাম, ফসল ভাল হয় নাই, জমিতে কি দ্রব্যের অনাটন আছে; আর তাহাতে কি দ্রব্য দিলেই বা সেই দোষ দূরীভূত হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। নানা ব্যবসায়ীরা আপনাদিগের ব্যবসার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এইরূপ নিত্য নিত্যই বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া থাকেন। যাঁহা হউক পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখনকার বিজ্ঞানবেত্তারা ক্ষিতিকে বহুমূল পদার্থে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। তেজ ও আকাশকে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু জল ও বায়ু যে মূল পদার্থ নয়, তাহা স্থির করিয়াছেন। জগতে যে কোন বস্তু আমরা দেখিতে পাই, মায় মুসুরিটী সরিষাটী পর্য্যন্ত, বিয়োগ ও সংযোগে কাহাতে কি পদার্থ আছে, সকলই স্থির করিয়াছেন। ইহাঁদের কথা আর কি বলিব, কোটী কোটী যোজন দূরে সূর্য্যমণ্ডলে, আবার তার চেয়ে কোটী কোটী যোজন দূরে নক্ষত্রমণ্ডলে, কোন্‌টীতে কি পদার্থ আছে, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। জগতের বস্তুসমূহের মধ্যে কেবল ৬৩টী দ্রব্যকে ইহাঁরা কোনও উপায়েই বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে অন্য পদার্থ বাহির করিতে পারেন না। তাই, এই ৬৩টী মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মূল বা রূঢ় পদার্থদিগের মধ্যে কতকগুলি ধাতু, কতকগুলি ধাতু নহে। এইরূপ প্রস্তাবে নানারূপ মূল ও যৌগিক পদার্থ লইয়া আমাদিগের কাজ পড়িবে। সকল সময়েও গল্প করিয়া বুঝাইতে পারিব না॥ কাজেই গুটিকত পদার্থের নাম ও গুণের কথা কিছু কিছু বলিতে হইতেছে। অনেক গুলিনের আবার বাঙ্গালা নাম নাই। কতকগুলির বাঙ্গালা নাম থাকিলেও ইংরাজি নাম করিলে বরং কিয়ৎপরিমাণে লোকে বুঝিবেন, কিন্তু বাঙ্গালা নাম করিলে একবারেই হয় তো কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন না। ৬৩টী মূল পদার্থের মধ্যে ৪৮টী ধাতু, আর ১৫টী ধাতু নহে। ৪৮টী ধাতুর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর নাম এখানে করিতেছি; যথা—(১) এলুমিনিয়ম্ ইহাকে সোজাসুজি ফটকিরির পাথর বলা যাইলেও যাইতে পারে। কারণ ইহার সহিত অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত হইয়া বাজারে যে ফটকিরি দেখিতে পাই সেই যৌগিক দ্রব্যটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) এণ্টিমনি ইহাকে সুরমার পাথর বলিতে পারি, কারণ ইহা হইতেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা চক্ষে যে সুরমা লাগান, তাহা প্রস্তুত হয়। (৩) বিস্মথ ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ এক প্রকার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। উদরে বেদনা হইলে ডাক্তারেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) ক্যালসিয়ম, ইহাকে চূর্ণের আকর বলিতে পারা যায়, কারণ ইহা হইতে যৌগিক পদার্থ চুণ উৎপন্ন হয়; খড়িমাটিও ইহার যৌগিক পদার্থ। (৫) কোবাল্ট, জয়পুর অঞ্চলে এই ধাতু পাওয়া যায়, সেখানে ইহাকে সৈতা বলে। (৬) ম্যাগনেসিয়ম, ইহা হইতে ম্যাগনেসিয়া নামক যৌগিক পদার্থটী উৎপন্ন হয়; তাহা সচরাচর চিকিৎসা প্রকরণে ব্যবহার হইয়া থাকে। (৭) ম্যাঙ্গানিস, এই ধাতুটী ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। কাচ প্রস্তুত করিতে

বিলাতে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। আধুনিক প্রণালীতে আকর হইতে লৌহ নিষ্কাষণ কার্য্যেও ইহার বিশেষ আবশ্যক। (৮) নিকেল, ইহা একটী নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। দস্তা তামা ও এই নিকেল একত্র গলাইয়া নকল রৌপ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাজারে ইহার নাম জার্ম্মন সিল্‌ভার। ঠিক রূপার মত বাজারে যে চামচা বিক্রয় হয়, তাহা এই নকল রৌপ্য হইতে প্রস্তুত। (৯) পটাসিয়ম, এক প্রকার ক্ষার। নানা প্রকারে নানা বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। (১০) সোডিয়ম, যাহা হইতে সোডা হয়। আপাততঃ এই দশটী ধাতুর নাম করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আর বেশী নাম করিতে গেলে সকলে আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন, মনেও করিয়া রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন কেবল দশটীর নাম করিয়াই সকলকে নিষ্কৃতি দিলাম, তখন পাঠকবর্গকে আমার নিকট ঋণী হওয়া উচিত। অর্থ দিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, তাঁহারা যদি এই দশটী ধাতব মূল পদার্থের নাম মনে করিয়া রাখেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। পুনরায় এই দশটীর নাম করিতেছি;—এলুমিনিয়ম বা ফটকিরির আকর; এণ্টিমনি বা সুরমার আকর, বিসমথ, ক্যালসিয়ম বা চুণ ও খড়ির আকর; কোবল্ট, ম্যাগনিসিয়ম, ম্যাঙ্গানিস, নিকেল, পটাসিয়ম, সোডিয়ম। এই দশটী ছাড়া সোণা, রূপা, তামা, সিসা, লোহা, পারা, টিন, দস্তা এ আটটি ধাতুর নাম তো সকলেই জানেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮টী ধাতুর মধ্যে দশটী আর আটটী ১৮টীর নাম জানা হইল। আশা করি, সকলে এই ১৮টীর নাম মনে করিয়া রাখিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ৬৩টী মূল বা রূঢ় পদার্থের মধ্যে ১৫টি ধাতু নহে। এই ১৫টীর মধ্যে দুইটী অধিক পাওয়া যায় না, কার্য্যেও বড় লাগে না। তাহাদের ছাড়িয়া বাকি ১৩টীর নাম করিতেছি। (১) আর্সেনিক, সঙ্খীয়া বা শেঁকো বিষ। ইহা কি তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (২) বোরণ, ইহা হইতে সোহাগা হয়। (৩) ব্রোমীণ, সমুদ্রের জল জাল দিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রোমাইড অফ্ পটাসিয়ম নামক মহৌষধ ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূল পদার্থ সমূহের মধ্যে কেবল দুইটী বস্তু তরলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এই ব্রোমীণ, দ্বিতীয়টী পারা। এতদ্ভিন্ন অপরাপর পদার্থ হয় কঠিন, না হয় বাষ্প। (৪) কার্ব্বণ বা অঙ্গার, ইহার কথা পরে বলিব। (৫) ক্লোরীণ ইহা এক প্রকার বাষ্প, এই বাষ্পও সোডা সহযোগে লবণ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ বাষ্পকে দেখিতে পাওরা যায় না। লবণকে রাসায়নিক উপায়ে বিয়োগ করিলে ইহাকে পাওয়া যায়। (৬) ফ্লুরিণ, ইহাও একপ্রকার বাষ্প, চুণের আকর প্রভৃতি পদার্থে মিশ্রিত হইয়া থাকে, সহজে বাহির করা যায় না। (৭) হাইড্রোজেন বা জলজান, ইহার কথা পরে বলিব। (৮) অয়োডীন, সমুদ্রের উদ্ভিজ্জ শরীরে, সোডা প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ঔষধাদিতে উহা ব্যবহৃত হয়। (৯) নাইট্রোজান যবক্ষার, ইহার কথা পরে বলিব। (১০) অক্সিজেন, অক্সিজেন

বা অম্লজান ইহার কথা পরে বলিব। (১১) ফস্ফরস, আমাদের শরীরের নানা অংশে এই দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। শরীরের নানা অংশ বিশেষতঃ অস্থি গঠনের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত আবশ্যক। অস্থি ভস্ম করিয়াই ইহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটু ঘসিলেই ইহা হইতে অগ্নি উৎপাদন হয়। ইহা দ্বারাই বিলাতী দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১২) সিলিকন বা বালুকার আকর। (১৩) গন্ধক অক্সিজেন্ নাইট্রোজন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বণ এই চারিটী মূল পদার্থের কেবল নাম উল্লেখমাত্র করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলি নাই। এই চারিটী পদার্থ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাণী মাত্রের ইহারাই জীবন, প্রাণী মাত্রের ইহারাই দেহ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় রাসায়নিক শাস্ত্রে অক্সিজেন 'অম্লজান' নামে অভিহিত হইয়াছে। কেননা, দ্রব্যসমূহের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া অম্লগুণ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। যত মূল পদার্থ আছে, তাহা-দিগের সর্ব্বাপেক্ষা অক্সিজেন পরিমাণে অধিক। খাঁটি অক্সিজেন একটী বাস্প। চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। চারিদিকে যে বায়ুর ভিতর আমরা বাস করি, তাহার তিন আনা অংশ অক্সিজেন। আর পৃথিবীতে যত মৃত্তিকা প্রস্তর ইত্যাদি কঠিন পদার্থ আছে, সে সমুদয়কে যদি একবারে ওজন করি তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক অক্সিজেন। আর জলের প্রায় ১৫ আনা ভাগ অক্সিজেন। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অক্সিজেন যখন একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদাথ নির্ম্মাণ করে, তখন ইহা কঠিন আকার ধারণ করে। আবার সেই যৌগিক পদার্থকে বিয়োগ করিলেই, ইহা স্বতন্ত্র হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বীয় বাস্পীয় আকারে ওরিণত হয়। মৎস্য যেরূপ জলের ভিতর থাকে, এই যে সেইরূপ বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি, সেই বায়ুর তিন আনা ভাগ অক্সিজেন, বাকী নাইট্রোজেন। বায়ুতে যে নাইট্রোজেন, তাহা অক্সিজেনের সহিত এক সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু দুইটীতে রাসায়নিক সংযোগ হইয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ-ভাবে নাই। পৃথিবীতে আবার অনেক স্থানে হাইড্রাজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ মিশ্রণ অন্য প্রকার, ইহা রাসায়নিক সংযোগ। এই সংযোগে একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই যৌগিক পদার্থের নাম জল, যাহা আমরা পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের আহারীয় শস্যাদি বর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়। হাই-ড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে জল হয় বলিয়া হাইড্রোজেন নাম জলজান। বায়ুতে থাকিয়া অক্সিজেন নানা দ্রব্যের সহিত সর্ব্বদাই মিশিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া নানারূপ বিভিন্ন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতেছে। যেখানে অক্সিজেন কোন দ্রব্যের সহিত মিশিয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে থাকে, তখন সেখানে উত্তাপ বাহির হয়। সেই উত্তাপ কখনও অধিক হয়, কখনও কম হয়। বাহিরে একখানি লোহা পড়িয়া থাকিলে তাহার সহিত

যখন আস্তে অল্পে অল্পে অক্সিজেন মিশিয়া একটী যৌগিক পাদার্থের সৃষ্টি করে, যাহাকে আমরা 'মরিচা' বলি,তখন এত অল্পমাত্র উত্তাপ বাহির হয় যে, আমরা একেবারেই অনুভব করিতে পারি না। আবার যখন কোন দ্রব্যের সহিত খুব শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে অক্সিজেন মিশে, তখন উত্তাপ এত অধিক হয় যে, তাহাতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। কাঠ ও কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্ব্বণ থাকে; বস্তুত বিশুদ্ধ কয়লাই কার্ব্বণ, তজ্জন্য কার্ব্বণের বাঙ্গলা নাম অঙ্গার। এই কার্ব্বণের সহিত যখন অক্সিজেন মিশিয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণকার্য্যের সময় কি হয় তাহা সকলেই জানেন। কাঠ ও কয়লাস্থিত কার্ব্বণে যে উত্তাপটুকু সঞ্চিত থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়ে, জলন্তশিখা হইয়া আগুন জ্বলিতে থাকে। কাঠ বা কয়লাস্থিত কার্ব্বণ ও বায়ুস্থিত অক্সিজেন এই দুইটী পদার্থ এইরূপে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হইয়া, একটী যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। সে যৌগিক পদার্থটী বাষ্প, তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, চক্ষে দেখিতে পাই না। কাঠ ও কয়লায় যা কিছু ধাতব পদার্থ আছে, তাহাই ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। কার্ব্বণ ও অক্সিজেন সংযোগে যে যৌগিক পদার্থটী উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, তাহাকে কার্ব্বণিক অম্ল বা কার্ব্বণিক য়্যাসিড গ্যাস বলে। এই বাষ্পটী ভয়ানক বিষ। যেখানে ইহা অধিক পরিমাণে আছে, সেখানে কোনও প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। নিশ্বাসের সহিত লইয়া মরিয়া যায়। কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্ব্বণ আছে, সুতরাং কয়লা জ্বালাইলে অধিক পরিমাণে কার্ব্বণিক অম্ল উৎপন্ন হয়। ঘরের বাহিরে, কিংবা যে ঘরে দ্বার জানালা খোলা আছে, এরূপ ঘরে কয়লা জ্বালাইলে, কার্ব্বণিক অম্ল উত্থিত হইয়া বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যায়, তাহাতে মনুষ্য-জীবনের কোন অপকার হয় না। কিন্তু ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া কয়লা কি গুল জ্বালাইলে, ঘরের অক্সিজেন লইয়া কার্ব্বণ, কার্ব্বণিক অম্ল উৎপাদন করে। সেই বাষ্প ঘরেই রহিয়া যায়, বাহিরে যাইতে পারে না। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়াও ঘরের বায়ুকে সংশোধিত করিতে পারে না। এ অবস্থায় অতীব দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অনেকেই না জানিয়া এই বাষ্প হইতে প্রাণ হারাইয়া থাকেন। শুইবার ঘর কিংবা আঁতুড় ঘর উত্তপ্ত রাখিবার জন্য দোষাদোষ না জানিয়া কেহ কেহ ঘরে কয়লা বা গুল জ্বালাইয়া, দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে যান। শীঘ্রই তাঁহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহকালে সে কালনিদ্রা আর ভঙ্গ হয় না। কখন মরিলাম তাহা টেরও পান না। এইরূপ দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। ফরাশী দেশে অনেকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই বিষে বিষাক্ত হইয়া একবার আমিও মরিতে মরিতে রহিয়া গিয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল। শীতকাল, গায়ের শীত-ত আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। তাই ভাবিলাম ঘরে গুলের আগুণ করিয়া শুই। কার্ব্বণিক অম্লের কথা জানিতাম। তাই

বাহিরে গুল ধরাইলাম; যখন খুব ধরিয়া গুলগুলি লাল টক্ টক্ করিতে লাগিল, তখন ঘরের ভিতর লইয়া আসিলাম, মনে করিলাম ইহাতে আর কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এরূপ করিয়াও ঘরের বায়ু বিলক্ষণ দূষিত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে অল্প হইয়াছিল, শরীরে অসুখ ছিল, তাহার জন্য একবারে নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি নাই। খানিক রাত্রিতে ভয়ানক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল, মাথা আর তুলিতে পারি না। উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেই অমনি ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাই। অতিকষ্টে দ্বার খুলিয়া দিলাম, জানালা খুলিয়া দিলাম। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়া ক্রমে ঘর হইতে কার্ব্বণিক অম্লকে দূরীভূত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে তবে আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইলাম। কয়েক বৎসর গত হইল সিমলার পাহাড়ে কার্ব্বণিক অম্লের দ্বারা একবারে চৌদ্দ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তখন আমি সিমলায় ছিলাম। শীতকাল, বরফ পড়িতেছে, গাছপালা পাহাড়-পর্ব্বত সমুদায়ই বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ভারত-সেনাপতি নেপিয়র সাহেব সেই সময়ে সিমলা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে অনেক কুলি ছিল; রাত্রিকালে কুলিরা শিবিরের ভিতর নিদ্রা যাইত। একটী তাঁবুতে চৌদ্দজন কুলি শুইত। বড় শীত; পাহাড়ী লোক হইলে কি হয়, গরিব মানুষ, অধিক কাপড় চোপড় তো নাই! শীতে তাহাদিগের কাজেকাজেই কষ্ট হইতেছিল। একদিন, দিনমানে তাহারা কোন জমিদারের নিকট হইতে দুই ঝুড়ি কয়লা পাইয়াছিল। রাত্রিকালে তাঁবুর মাঝখানে একটী গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে কিছু আগুণ দিয়া তাহার উপর দুই ঝুড়ি কয়লা একবারে ঢালিয়া দিয়াছিল। গর্ত্তের ভিতর কয়লা পুড়িতে লাগিল, চারিদিক ঘেরিয়া কুলিরা শুইল। তাঁবুর নিম্নভাগে যে এক আধটু ফাঁক ছিল, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া সে ফাঁকটুকুও বুজিয়া গেল। সকাল হইলে সকলে দেখিল, ১৩জন লোক একবারে মরিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁবুর দ্বারের নিকট যে লোকটী শুইয়া ছিল, তাহার ঈষৎমাত্র শ্বাস বহিতেছে। কয়লার খনি, জাহাজের খোল ও পুরাতন কূপেও কার্ব্বণিক অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতেও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এক বৎসরের অধিক হইল, বিলাত হইতে কলিকাতায় একখানি জাহাজ আসিতেছিল। তাহাতে এই বাষ্প দ্বারা সাত আট জন লোকের মৃত্যু হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল চুচুড়ার ষাঁড়েশ্বরতলায় একটী পুরাতন কূপে এইরূপে চারি পাঁচ জন লোকের মৃত্যু হয়। সেই কূপে প্রথম যে লোকটী নামিল, সে তলভাগে পৌছিতে না পৌছিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। উপরে যাহারা ছিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে কি হইয়াছে। নীচে যে লোকটী নামিয়াছে, তার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? দেখিবার জন্য আর একজন লোক নামিল। নীচে না পৌছিতে পৌছিতে সেও মূর্চ্ছিত হইল। এইরূপে একে একে, তার পর যে কয়জন নামিল, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইল। পুরাতন কূপ, যাহা অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহার হয় নাই,

কিংবা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নামিতে হইলে প্রথমে একটী প্রজ্বলিত দীপ বা উদীপ্ত বাতিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহার ভিতর ঝুলাইয়া দিতে হয়। যদি দীপ বা বাতিটী ভিতরে গিয়া জ্বলিতে থাকে তবে সে কূপে নামিতে কোন ভয় নাই। যদি বাতিটী ভিতরে গিয়াই টুপ করিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রাণ-প্রদীপও সেখানে টুপ করিয়া নিবিয়া যাইবে। বাতি তাহার ভিতর জ্বলিতে থাকিলে জানিবে যে, কার্ব্বণিক-অম্ল সেখানে হয় একবারেই নাই কিংবা যৎসামান্য ভাবে আছে। অক্‌সিজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। অক্‌সিজেন না থাকিলে দাহন-কার্য্য হয় না, অক্‌সিজেন কোনও একটী বস্তুর সহিত মিশিয়া অপর একটী যৌগিক পদার্থকে উৎপন্ন করার নামই পোড়া। উত্তাপ বাহির হওয়া সেই মিশ্রণ কার্য্যের লক্ষণ মাত্র। সুতরাং যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোন বস্তু দগ্ধ হইতে পারে না, সেখানে প্রদীপ জ্বলিতে পারে না, প্রাণাগ্নিও সেখানে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তাই অক্সিজেন প্রাণী মাত্রের জীবনস্বরূপ। এই যে আমাদের দেহ রাবণের চিতার ন্যায়, ইহা দিবা রাত্রি হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। আগুণ নিবিলেই মৃত্যু। আমাদের খাদ্য সামগ্রী সমুদয় নাইট্রোজেন, কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষরূপে এই চারিটী মূল পদার্থের সহযোগেই নির্ম্মিত। সুতরাং আহারের সঙ্গে সর্ব্বদাই শরীরে কার্ব্বণ প্রবেশ করিতেছে। কাঠ ও কয়লা রূপে এই কার্ব্বণ জীবনাগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিতেছে। যেমন আহারের সঙ্গে কার্ব্বণের যোগান চাই, তবে অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে, তেমনি অক্সিজেনের যোগান চাই, তবেই এই প্রাণ-হুতাশন জ্বলিবে। পান ভোজনের সহিত যে টুকু অক্সিজেন উদরস্থ হয় তাহাতে এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মৎস্য যেরূপ জলে থাকে, আমরাও বায়ুর ভিতর সেইরূপ ডুবিয়া আছি। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আছে। এই অক্সিজেন আমরা অহরহ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি। অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া কি করে? শরীরের ভিতর যে কার্ব্বণ আছে, তাহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন যখন কার্ব্বণের সহিত মিশিতে থাকে, তখন কি লক্ষণ উপস্থিত হয়? অগ্নি হয়, উত্তাপ হয়, তাহাই জীবনাগ্নি। এই মিশ্রণ-কার্য্যের লক্ষণ অগ্নি বটে, কার্ব্বণে যে উত্তাপ সঞ্চিত ছিল তাহা অক্সিজেনের সহিত মিশিবার সময় বাহির হইয়া পড়ে বটে ; কিন্তু কার্ব্বণ ও অক্সিজেনে মিশিয়া ফল কি হইল, কি নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই বস্তুর সহযোগে উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ানক বিষময় কার্ব্বণিক য়্যাসিড গ্যাস। এই বিষময় বাষ্পটী শরীরে থাকিয়া পাছে রক্তকে দূষিত করে, তাই প্রশ্বাসের সহিত আমরা ইহাকে বাহির করিয়া দিই। সুতরাং একঘরে অনেক লোক শয়ন করিলে সকলে মিলিয়া অক্সিজেন টুকু টানিয়া লন, কার্ব্বণিক-অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া ঘরটী তাহাতেই পরিপূর্ণ করেন। কাজেই ঘরে কয়লা জ্বালাইয়া শয়ন করাও যা, আর এক ঘরে অনেক লোক শোয়াও তা। • ইহাতে পীড়া হইবার কেন সম্ভাবনা

তাহা বুঝিলেন তো? আচ্ছা, এই যে অসংখ্য জীবজন্তু, অসংখ্য মনুষ্য কাল-কালান্তর হইতে অহোরাত্রি অবিরত প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বণিক-অম্ল বাহির করিয়া দিতেছে; সে কার্ব্বণিক-অম্ল কোথায় যায়? পৃথিবী কেন তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় না? তা যদি যাইত, তাহা হইলে এই ধরাধামে আজ একটী প্রাণীও জীবিত থাকিত না। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল শুন। আমরা যেমন নিশ্বাসে অক্সিজেন লই, প্রশ্বাসে কার্ব্বণিক-অম্ল ত্যাগ করি। গাছেরা তাহার ঠিক বিপরীত করে, তাহারা নিশ্বাসে কার্ব্বণিক-অম্ল লয়, প্রশ্বাসে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছেদের তো নাক নাই, তবে কি করিয়া তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের পাতার নিম্নদেশে অনেক ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারাই এই কার্য্য সমাধা হয়। সুতরাং আমরা যে কার্ব্বণিক-অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি, যাহা বায়ুতে মিশিয়া যায়, গাছেরা তাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে। মনে আছেত,—কার্ব্বণিক-অম্ল একটী যৌগিক পদার্থ, মূল পদার্থ নয়, ইহা কার্ব্বণ ও অক্সিজেনের সহযোগে হইয়াছে। গাছেরা এই বাষ্পকে নিশ্বাসের সহিত লইয়া সূর্য্যালোকের সহায়তায় কার্ব্বণকে একদিকে আর অক্সিজেনকে একদিকে পৃথক করিয়া ফেলে। কার্ব্বণ টুকু লইয়া ছাল কাঠ করিয়া আপনাদের দেহ পরিবর্দ্ধন করে, আর অক্সিজেন টুকু ছাড়িয়া দেয়। একদিকে জীব জন্তু অপরদিকে উদ্ভিজ্জ এই দুই দলে ক্রমাগত এইরূপে কার্ব্বণ ও অক্সিজেনের বিনিময় চলিতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জ শরীর হইতে অন্ধকারে অক্সিজেন বাহির হয় না। অন্ধকারে কার্ব্বণিক অম্ল বাহির হয়। সুতরাং রাত্রিকালে শুইবার ঘরে অধিক ফল ফুল পাতা রাখা ভাল নয়। বিলাতে দুই একজন কমলালেবু ব্যবসায়ীর এইরূপে মৃত্যু হইতে শুনিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে অগ্নি জ্বালিতে পারে না। আবার যদি খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বর হু হু করিয়া সেই দ্রব্যটী পুড়িয়া যায়। খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য পোড়াইলে বড়ই উত্তাপ হয়। যে দ্রব্য বাহিরের বায়ুতে সহজে পোড়াইতে পারা যায় না, খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর সে দ্রব্য অনায়াসেই পুড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভিতর থাকিলে, খাঁটি অক্সিজেনের নিশ্বাস লইলে, পাছে আমাদের এই প্রাণাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া সত্বর আমরা পুড়িয়া মরি তাই যে বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি তাহা শুধু অক্সিজেন নয়। অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন নামক বাষ্প আমাদিগেরই এই বায়ুতে বিস্তর রহিয়াছে। এই নাইট্রোজেন একটী মূল পদার্থ, ইহা হইতে সোরা, নিষাদল প্রভৃতি বস্তু সমূহ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইহার নাম যবক্ষারজান।

এতক্ষণ ধরিয়া বড়ই নীরস বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু কি করি, আজ কালের দিন যে কোনও ব্যবসার কথা বলিতে যাইব, তাহাতেই এই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বণ প্রভৃতি পদার্থের বিযোগ, সংযোগ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ব্যবহার।

একে তো জ্ঞান উপার্জ্জন করাই কঠিন; তাতে আবার সেই জ্ঞান পার্থিব পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া কিরূপে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে। ইংরাজেরা ছাই মুঠাটা ধরিয়া কিরূপে সোণা মুঠাটা করেন, তাহা বলিতে হইবে। কাজেই এভাবে প্রস্তাব আগাগোড়া খোসগল্পের মত হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষেই সাহেবেরা ছাই মুঠাট ধরিয়া সোণা মুঠাটা করিয়া থাকেন। যেখানে বামা ও নণ্ডুরাম *পাথর হইতে লোহা বাহির করে, সেখান হইতে কেবল মাটি কাটিয়া কলিকাতায় আনিতে যা খরচ পড়ে, বিলাত হইতে ইংরাজেরা লোহা আনিয়া আমাদিগকে সেই দামে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাতে আর বামার ঘরে অন্ন থাকিবে কি? বামার ছেলে পিলে কেন না পেটের জ্বালায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে? কিন্তু দোষ কার? বামার দোষ নয়, নণ্ডুরামেরও দোষ নয়, অন্ন বিহনে অস্থি-পঞ্জর-সার ছেলে দুইটীরও দোষ নয়। আহা! ইহারা কি জানে! দোষ আমার, ও আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণবর্গের। সেই না আমারা, যাহারা নানা শাস্ত্র রচনা করিয়া জগতকে এক দিন শিক্ষা দিয়াছিলাম? বড় কথা দূরে থাকুক্। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি অতি সামান্য কয়টী অঙ্ক রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আজ জগৎ চলিতেছে, আজও জগতের লোক সেই অঙ্কসন্নিবেশ প্রণালীর চাতুর্য্য দেখিয়া চমকিত হইতেছে। বীজগণিত প্রভৃতি উচ্চ শাস্ত্রের কথায় আর কাজ কি? কিন্ত আজ আমাদের পানে একবার চাহিয়া দেখ! জগতের শিক্ষাদাতা, জগতের পুজ্য না হইয়া, আমরা সেদিন হইলাম "কাফের" আবার আজ হইয়াছি "নিগার।" কেন বল দেখি? একটী বিশেষ কারণ এই—আমরা ক্ষিত্যপতেজা-মরুদ্ব্যোম বলিয়া বসিয়া রহিলাম। কালে "ক" অক্ষর এদেশে অথাদ্য মধ্যে পরিগনিত হইল, পূর্ব্বার্জ্জিত ধন একে একে সকলই গালে দিলাম, হায়! আমাদের যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সকলই লোপ হইল। কিন্তু অন্যান্য জাতিরা এই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানা অপূর্ব্ব শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, নানা অপূর্ব্ব পদার্থের রচনা করিলেন, নানা অদ্ভুত বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অবিষ্কার করিলেন, আর এই বিশ্বসংসার-নিহিত ভীষণ আসুরিক বল সমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তাই, আজ তুরস্ক আরব্য, পারস্য, গান্ধার, ভারত শ্যাম, চীন মহাচীন, সমস্ত পৃথিবী, এই যশঃপ্রদায়িনী, বলপ্রদায়িনী, বিদ্যার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। এই মহাবিদ্যা তোমারও নন আমারও নন। গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি তুমি কার? না, যখন যার কাছে থাকি, তখন তার! যাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে এই মহাবিদ্যা বিরাজ করিতেছেন, আজ তিনিই বিপুল বলশালী, তাঁরই ঘর ধনধান্যে উচ্ছলিত, ধরাধামের তিনিই অধীশ্বর, আর তাঁর নিকট ব্রাহ্মণ বল, শূদ্র বল, সকলেই গলবস্ত্র। মনের কালী যায়, চক্ষের জল মুছিয়া হাসি,—যদি এই মহাবিদ্যাকে আনিয়া সতীহারা শিবসদৃশ উদাসীন ছন্নছাড়া পিতৃভূমি জন্মভূমিকে ফিরিয়া দিতে পারি। সকলে এস, ভাই, সেই মহাবিদ্যার অন্বেষণ করি; যেখানে পাই তাঁকে সেইখান থেকে ধরিয়া আনি।

লৌহের বিষয় এখনও কিছু বলা হয় নাই। সূচনা হইয়া রহিল। বাকি পরে লিখিব।

মটর (PISUM)

ইহা শুঁটীধারী শস্য পর্য্যায়ভুক্ত (Leguminosæ)। দুই রকম মটর আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই (১) দেশী মটর বা ক্ষেত্রজাত মটর (Pisum arvense); (২) উদ্যানজাত মটর (Pisum sativum)।

দেশী মটর উদ্যানজাত মটর অপেক্ষা ছোট হয়। ইহার চাষ কিন্তু বহুবিস্তৃত সভাবজাত বন্য অবস্থায় ইহা কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। দেশী মটরের দানা ছোট, গোল অপেক্ষাকৃত শক্ত, রঙ সবুজাভ, গাত্র মার্ব্বেলের মত মসৃণ। সাধারণ লোকে এই মটরের দালই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। উদ্যানজ মটরের মত ইহার দাউল খুব সুসিদ্ধ হয় না এবং এই কারণে সভাবতঃ দুষ্পাচ্য ; ক্ষেত্রজ ও উদ্যানজ মটরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে কিন্তু বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

ইহার দাউল মানুষের খাদ্য, ইহার খোসা ভুসী ও শুষ্ক গাছ গবাদির খাদ্য।

জমি ৬।৮ বার চষিয়া সার দিয়া মটর বুনিতে হয়। নদী চরের পলি পড়া জমিতে সার দিবার আবশ্যকতা নাই। কখন কখন মটর ও সরিষা একত্র বোনা হয়। বর্ষার শেষে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মটর বুনিবার সময়। চাষীরা প্রায়ই বিঘা প্রতি ।।০ আধ মণ বীজ বপন করে। ভাল বীজ হইলে দশ বার সের বীজই পর্য্যাপ্ত হয়। মটর ক্ষেত্র নিড়াইবার বা উহাতে জল সেচনের আবশ্যকতা নাই। জলবসা সেঁতসেঁতে ক্ষেতে মটর হয় না। মটর বপনের পর বার বার মেঘ বৃষ্টি হইলে ফসল খারাপ হয় ও ফসলে পোকা ধরে। বিঘা প্রতি ৪ মণ মটর প্রায়ই ফলিতে দেখা যায়। শুঁটী পুষ্ট হইলে গাছসমেত সমস্ত শস্য গৃহজাত করিতে হয়। অবশেষে মাড়িয়া ঝাড়িয়া মটর কড়াইগুলি পৃথক করা হইলে ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া গোলাজাত করা হয়। মটরের রঙ প্রথমত বেশ সবুজাভ থাকে কিন্তু অধিক রৌদ্রে ক্রমশঃ রঙ খারাপ হয়। সমশিতল জায়গায় অল্প উত্তাপে শুকাইতে পারিলে রঙ ঠিক থাকে। ক্ষেত্রজ দেশী মটরের এত তদ্বির পোষায় না। উদ্যানজ মটরের জন্য এরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক।

বড় মটর (P. sativum)—বাঙ্গালাদেশে ইতিপূর্ব্বে কাবুলী মটর, পাহাড়ী মটর ও ওলন্দাজ মটর এই তিন জাতীয় উদ্যানজ মটর দেখা যাইত। এক্ষণে বহু প্রকারের বড় মটরের চাষ হইতেছে। দেশী মটরের শুঁটী কাঁচা তুলিয়া তরকারীর সহিত খায় বটে কিন্তু উহা বড় মটরের মত সুস্বাদু নহে বা নরম নহে সেইজন্য যেখানে বড় মটর পাওয়া যায় সেখানে ছোট মটরের শুঁটী কেহ খায় না। শুঁটীগুলি খোসা সমেত আস্ত বা বীজ ছড়াইয়া লোকে কাঁচা বা তরকারী রাঁধিয়া খায়। বীজের উপর যে খোসা থাকে উহা বীজ যত পাকিয়া উঠে ততই শক্ত হয়। কচি অবস্থায় নরম থাকে। শক্ত খোসা

দুষ্পাচ্য ও অধিক খাইলে উদরামর জন্মায়। যে কোন অবস্থায় খোসা ছাড়াইয়া দাউল ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে মটরে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায়।

	জল	আলবুমেনয়েড্‌স	শ্বেতসার বা শর্করা	তৈল	আঁশ	ছাই
মটর খোসাসমেত	১১.৮	২৮.২	৫৫.০	১.৫	১.০	২.৫
„ খোসা শূন্য	১২.৫	২৩.৬	৫৪.৩	১.৩	৫.৭	২.৪

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মটরে মানুষের শরীর পোষণোপযোগী অনেক জিনিষ আছে এবং মটর গাছ শুষ্ক এবং কাঁচা অবস্থায় গবাদিকে বিচালীর মত করিয়া কাটিয়া খাওয়ান যায়। মটর শুঁটীর খোসা, কলাইয়ের ভুসী গবাদির পুষ্টিকর ও প্রিয় খাদ্য। ধানের নিম্নেই খাদ্য হিসাবে মটর মসুর প্রভৃতি কলাই চাষ বিশেষ লাভজনক।

উন্নত দেশী মটর।

উদ্যানজাত মটর দুই রকম—শাদা ও সবুজ রঙের। আমাদের দেশের শাদা মটর

যাহা এখন ক্ষেতে চাষ হয় এবং পাটনা, গয়া, পঞ্জাবে যাহার চাষ সমধিক তাহা কোন না কোন উদ্যানজাত মটরের জাতি বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলন দেশী মটর অপেক্ষা অধিক এবং ইহার দাউল দেশী সবুজ মটর অপেক্ষা সুস্বাদু। উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে দেশী মটর হইতেই উদ্যানজ মটরের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশী মটর উন্নত হইয়া অনেক বিলাতী উন্নতজাতীয় উদ্যানজ মটরের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্যানজ দেশী মটর তাহার সাক্ষীস্থল।

উচ্চ দোঁয়াস জমিতে অন্যান্য সারের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ছাই চুণ সংযোগ করিয়া বড় মটরের চাষ করিলে ফলন খুব বাড়িয়া যায় এবং মটর সুস্বাদু হয়। উদ্যানজ মটরকে আবার তাহাদের গুণানুসারে কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

এক শ্রেণীর মটর পালায় উঠে—তাহারা প্রায়ই ৪ হইতে ৬ ফিট লম্বা হয়। আর শ্রেণীর মটর তাহাতে পালা দিতে হয় না। গাছ ১ ফিট ১॥০ ফিটের বড় হয় না। উদ্যানজ মটর আবার জলদী নাবী ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

দেশী মটরের মত ইহা সমুদয় ক্ষেতে হাতে ছড়াইয়া বীজ না বুনিয়া নালা কাটিয়া ইহার বীজ বপন করাই শ্রেয়ঃ; ইহাতে বীজের মিতব্যয় হয় এবং মটরের পাইট করিবার বা মটর তুলিবার বা পালা মটরে পালা ধরাইবার সুবিধা হয়। উদ্যানজ মটরে মাঝে জল সিঞ্চনের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়।

মটরে সার—মটর প্রভৃতি কলাই চাষে বিঘা প্রতি পটাস ১৫ হইতে ২০ পাউণ্ড; ফস্‌ফরিক অম্ল ১৫ হইতে ২০ পাউণ্ড; এবং নাইট্রোজেন কিয়ৎ পরিমাণ আবশ্যক হয়।

নাইট্রোজেনের জন্য কিছু গোময়সার, পটাসের জন্য গোময় ভস্ম এবং ফস্‌ফরিক অম্লের জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১ মণ হাড়ের গুঁড়া, ১০০ ঝুড়ী ছাই, ৩০ ঝুড়ী গোময় প্রদান করিলে সম্পূর্ণসার দেওয়া হইল বলিয়া মনে করা যায়। এক ঝুড়ী ছাইয়ের ওজন একমণ হওয়া চাই এবং সেইরূপ ঝুড়ীর ১ ঝুড়ী গোময় প্রায় ১॥০ মণ হইবে। হাড়ের গুঁড়া পূর্ব্ববর্ত্তী ধান বা পাটের ক্ষেতে কিছু অধিক পরিমাণে দিয়া রাখিলে মটর চাষের সময় আর হাড়ের গুঁড়া প্রদান করিতে হয় না। পূর্ব্ব প্রদত্ত হাড়ের গুঁড়ার সারাংশ সব ব্যয়িত না হইয়া মটরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

উদ্যানজ বড় বিলাতী মটর যাহা বাঙলাদেশে সাধারণতঃ চাষ করিতে দেখা যায়—

জলদী জাতী—Earliest of all—গোল দানা শুঁটী ছাড়া ছাড়া লম্বা ২ ইঞ্চ, গাছ উচ্চ ১০ ইঞ্চ। ফলন অধিক।

লিট্‌ল জেম Little Gem—সবুজ তোবড়ান শুঁটী, জোড়া জোড়া ফলে, চওড়া, বীজ খুব ঘেঁস ঘেঁস্। গাছ উচ্চ ১ ফিট ১॥ ফিট; ফলন অধিক।

রিঙ লিডার (Ring leader) বীজ গোল, মসৃণ, রঙ শাদা, শুঁটী ছাড়া ছাড়া ও সোজা, ফলন অপেক্ষাকৃত অধিক।

ফিল বাস্‌কেট (Fill basket) দানা গোল, রঙ সবুজ। শুঁটী জোড়া, গাছ লম্বা ৩ ফিট, অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হয়।

ষ্ট্রাটাজেম (Stratagen)— তোবড়ান দানা। ৬ ফিট লম্বা গাছ। শুঁটী বড়, ৯ হইতে ১১ দানা হয়। দানাও বড়।

বিলাতী টেলিগ্রাফ মটর

টেলিগ্রাফ (Telegraph)—তোবড়ান দানা। শুঁটী ছাড়া ছাড়া চওড়া, অনেক শুঁটী ধরে। গাছ বেশ সোজা ও দৃঢ় হয়। লম্বা ৬ ফিট।

টেলিফোঁ (Telephone)—তোবড়ান দানা রঙ সবুজ। গাছ ৫।৬ ফিট উচ্চ।

চাম্পিয়ান অফ ইংলণ্ড (Champion of England) তোবড়ান সবুজ দানা শুঁটি জোড়া জোড়া লম্বা ঈষৎ বক্র। এক একটা শুঁটীতে ৬ হইতে ৯ দানা থাকে। গাছ ৫।৬ ফিট লম্বা হয়। ফলন অত্যন্ত অধিক।

ভিচেস্ পারফেকসন্ (Vitch's Perfection)—তোবড়ান দানা শুঁটী বড় ৭।৮ টা দানা থাকে। গাছ ৩ ফিট উচ্চ।

নাবী জাতীয়—কুইন (Queen) তোবড়ান শাদা দানা, জোড়া শুঁটী ও সোজা। দানা নরম, শুঁটীতে ৬।৮ টা দানা থাকে। গাছ ৬ ফিট লম্বা, সোজা অনেক শাখা হয়।

জায়াণ্ট ম্যারো (Giant marrow)—সবুজ তোবড়ান দানা, শুঁটীতে অনেক দানা হয়। শুঁটী ৭ ইঞ্চ লম্বা গাছ ৫।৬ ফিট উচ্চ। ফলন খুব অধিক।

ম্যাক্লিনস্ বেষ্ট অফ অল (Maclean's Best of all) তোবড়ান সবুজ দানা শুঁটী চওড়া, ৩ ইঞ্চি লম্বা। গাছ ৩ ফিট উচ্চ ফলন অধিক।

নি প্লস্ অলট্রা (Ne Plus Ultra) তোবড়ান শাদা দানা শুঁটী ঈষৎ বক্র প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা। গাছ ৬।৭ ফিট উচ্চ, ফলন অধিক।

এমিরিকান ওয়াণ্ডার গাছ ১ ফিট ১॥ ফিট উচ্চ, ফলন অতিশয় অধিক, খেতে জন্মাইবার উপযুক্ত, খাইতে অতি সুস্বাদু।

ব্লুইম্পিরিয়াল ইহা টেলিফো মটরেরই অনুরূপ—

মারোফ্যাট (Marrowfat) ইহার দানা শাদা। গাছ ৬।৭ ফিট লম্বা হয়, দানা বড়। পাটনা মটর বোধ হয় ইহা হইতে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ ছোট মটরে পরিনত হইয়াছে। অথবা শাদা দেশী মটর হইতে এই মটরের সৃষ্টি হইয়াছে। কাবুলী মটর এই মটরের অনুরূপ গুণ বিশিষ্ট।

সুগার পি (Sugar peas) অন্যান্য মটর অপেক্ষা ইহার পত্র গুলি খোসা সমেত খাইতে সুমিষ্ট। গাছ ২ ফিট ২॥ ফিট উচ্চ হয়। পালা না ধরাইলেও চলে। কোন কোন জাতীয় সুগার পীর গাছ ৪।৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

ওলণ্ডা (Dwarf Dutch) ইহা এক্ষনে এদেশের মটর হইয়া গিয়াছে। খোসা সমেত শুঁটী খাইতে সুমিষ্ট। গাছ লম্বা ২ ফিট ২॥ ফিট ক্ষেতে জন্মে, পালার আবশ্যক নাই।

আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

বাঙ্গালায় আবার আশ্বিনে ঝড়

৫ই আশ্বিন ১৩২৩ সাল ইংরাজী ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ বৃহস্পতিবার ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ইহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে ঝড়ের সুচনা বুঝা যাইতে ছিল, এলো মেলো বাতাস বহিতে ছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতে ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল হইতে জোর জোর দমকা বাতাস এবং মধ্যে মধ্যে ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৪টা না বাজিতে বাজিতে বৃষ্টিও বাড়িতে থাকে। সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টির বেগ কিছু মন্দীভূত হয় বটে কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। রাত্রে ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হয়। ঝড়ের গতি সমুদ্র উপকুল হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে থাকে রাত্রে কিন্তু গতি ফিরিয়া দক্ষিণ-দিক হইতে প্রকাশিত হইয়া ছিল। ঝড়ের বেগ কলিকাতা এবং কলিকাতার আশে পাশে জেলা ২৪ পরগণার অনেক খানি জায়গা অনুভূত হইয়া ছিল। মেদনীপুরেও ঝড় ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল তথায় অনেকের বাড়ি ভুমিসাৎ হইয়াছে। খুলনায় ঐ দিনে বিষম ঝড়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে ঝড়ের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ঝড়ের বেগেও পদ্মার প্রবাহ বাড়িয়াছিল এবং অনেক জায়গায় ভাঙ্গন বাড়িয়া গিয়াছিল। ঝড়ের গতি ক্রমশঃ বিহার অঞ্চলে প্রধাবিত না হইলে বাঙলার বিশেষতঃ পূর্ব্বে বঙ্গের আরও সমূহ ক্ষতি হইত।

বাঙলায় খুব জোর বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি এবং নদীর জল বাড়িয়া বন্যা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এবার এই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বান দেখা দেয় নাই ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান ঝড়ে চাষের ক্ষতি—অনেক রোয়া ও বোনা ধানের গাছ বাতাসের জোরে ও জলের আলোড়নে ডগা কাটিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ নিম্ন জমির

ধান ক্ষেতে জল চাপ হইয়া গাছ হাজিয়া গিয়াছে। উচ্চ ধরণের জমিগুলিতে ধানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সব্জীর বাগানের ক্ষতি কিন্তু অত্যধিক হইয়াছে। ভূঁইশসার লতা জলে বাতাসে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষেত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পালাশসা, সিম, ঝিঙ্গার সাতিশয় লোকসান হইয়াছে। পটল জলে হাজিয়া গিয়াছে বেগুণ গাছগুলি ঝড়নাড়া হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

ঝড়ে ফলে বাগানের ক্ষতি সমূহ—আম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি গাছগুলির ডাল ভাঙ্গিয়া উৎপাটিত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে কলা ও পেঁপে গাছ সমভূম হইয়াছে সদ্য বৎসরের নূতন বাঁশগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। তেঁতুল আমড়া আর একটীও গাছে নাই। কাঁদি সমেত নারিকেল ছিড়িয়া পড়িয়াছে গাছ উপড়াইয়া ও ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়াছে।

বিভিন্ন গাছের উপর ঝড়ের প্রভাব—পেয়ারা গাছ মাত্রেই ঝড়ে হেলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার ডাল কমই ভাঙ্গিয়াছে। লিচুগাছ, কাঁঠালগাছের ডাল পালা ছিন্ন হইয়া গাছগুলি নেড়া বোঁচা হইয়া গিয়াছে, কাঁঠালের বড় বড় ডালও ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু কাঁঠাল বা লিচু খুব কমই উপড়াইয়া পড়িয়াছে। ঝড়ে তালের গাছের কিছু ক্ষতি হয় নাই কিন্তু নারিকেল গাছ অনেক ভাঙ্গিয়াছে ও উৎপাটিত হইয়াছে, খেজুরের ক্ষতি নারিকেল অপেক্ষা কম। ঝড়ে আম লিচুর ডাল ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল গাছ কম উৎপাটিত হইয়াছে। অশ্বথ গাছ পড়িয়া গিয়াছে কেন না তাহার ভাসা শিকড়, কিন্তু ঝড়, বটের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই, উপড়ান ত দূরের কথা। শিশু, শিরিশ, কৃষ্ণ চুড়া, বর্ষণ বৃক্ষ পড়িাছে অতি বিস্তর। শিশু বৃক্ষের শিকড়গুলি পাতাল ভেদী বটে কিন্তু তাহার যেন মাটি ধরিয়া রাখিবায় ক্ষমতা নাই।

বর্ত্তমান ঝড়ে শস্য হানি হইয়াছে বটে কিন্তু প্রাণ হানি কমই হইয়াছে, ১২৭১ সালের আশ্বিনে ঝড়ের তুলনায় কিছুই নহে। সেটি প্রকৃত সাইক্লোন হইয়াছিল। অমরা সাই-ক্লোন অর্থে যাহা বুঝি বর্ত্তমান ঝড় তাহা নহে। ৭১ সালের ঝড় বাঙলার কতকাংশ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। ঝড়ের বেগে সমুদ্র হইতে হুগলী স্রোতাভিমুখে প্রচণ্ড জোরে জল প্রধাবিত হইয়াছিল, এবং নদীর দুই কুল ভাসাইয়া দুই দিকে ৮।১০ মাইল বিস্তৃত হইয়া জল স্রোত চলিয়াছিল এবং ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তি বহুদুর বিস্তৃত ভূমি ভাগে বহুলোকের কম চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছিল, মানুষ, গরু, ছাগল কাক চিল প্রভৃতি পক্ষি যে কত মরিয়াছিল তাহার তখন সংখ্যা করা যায় নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ লোক মরিয়াছিল এবং কিছুদিনের মধ্যে অতি প্লাবনজনিত জ্বর, উদরাময়াদি রোগে প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এতদঞ্চলের শতকরা ৮০ জন লোককে ঐ ভীষণ ঝড়ে ও বন্যায় প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল বর্ত্তমান ঝড় তাদৃশ

প্রবল না হইলেও কিন্তু অধিকক্ষণ যাবত স্থায়ী হওয়ায় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সেবারের সে ঝড়ের পর মড়ক ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এবারের ক্ষতি তাদৃশ ভয়ানক নহে বটে কিন্তু সমুদয় খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য এক্ষণে এত অধিক হইয়াছে যে তাহাকে দুর্ভিক্ষ সময়োচিত মূল্য বলা যাইতে পারে, তাহার উপর এখন কড়া ক্রান্তি দাম পড়িলে মানুষের তাহা অসহনীয় হইবে। এক্ষণে ২৪পরগণা, নদীয়া, খুলনা, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাবড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ আছে।

পুরাতন বীজে শস্যোৎপাদন—অনেক পুরাতন বীজের জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ফলোৎপাদন ত দূরের কথা ঐ সমুদয় বীজ অধিকাংশই অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু আমরা আজ কয়েক বৎসর পরীক্ষা করিতেছি যে পুরাতন মুলা বীজ ও পুরাতন তরমুজ খরমুজ ফুটী কাঁকুড়ের বীজে ফসল ভাল হয়। নূতন মুলা বীজে মুলা বড় না হইয়া পাতার খুব বৃদ্ধি হয়। ফুটী কাকুড়েরও তাই, লতাগাছ খুব বাড়িয়া যায় ফল তাদৃশ অধিক হয় না। ইহাদের পুরাতন বীজ হইতে উত্তম ফসল হইতেছে। বীজ দুই বৎসর বা তিন বৎসর রাখ, সযত্নে রাখিতে হইবে জলো হাওয়া লাগিয়া তাহাদের জীবনী শক্তি নষ্ট না হয় বা ভিতরের নিহিত অঙ্কুরটি নষ্ট হইয়া না যায়। শসা বীজের এরূপ পরীক্ষা আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। আমরা অন্য অন্য বীজেরও ক্রমশঃ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি।

বঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি।—অন্যান্য বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণতঃ বঙ্গদেশের জেলাসমূহে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এই বৎসর ময়মনসিংহ ও বগুরা ভিন্ন সকলজেলায়ই তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ বারিবর্ষণ হইয়াছে। সাধারণ পরিমাণ অপেক্ষা ২৪ পরগণায় ২.৫৬, কলিকাতায় ৭.৫৫, নদিয়ায় ২.৪৪, মুর্শিদাবাদে ১.০৫, যশোহরে ৩.১৩, খুলনায় ১.৮৪, বর্দ্ধমানে ৫.৪৮, বীরভূমে ১.১৪, বাঁকুড়ায় ৩.২৯, মেদিনীপুরে ২.৫৫, হুগলীতে ২.২৩, হাওড়ায় ২.৭৭, রাজসাহীতে ৫.৯২, দিনাজপুরে .৪৮, জলপাইগুড়িতে .৮০, দারজিলিংএ ১০.৩১, রঙ্গপুরে ১০.৯১, পাবনায় ২.৬৪, মালদহে ৮.৩৮ ঢাকায় ৩.৩৬, ফরিদপুরে ১.৩৭, বাকরগঞ্জে ১.৩৪, চট্টগ্রামে ১.২৭, ত্রিপুরায় ৪.৯৫, নোয়াখালিতে ৫.৮০, পার্ব্বতচট্টগ্রামে ৪.৪১ এবং কোচবিহারে ৭.৭৬ ইঞ্চি অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

অতিবৃষ্টি হেতু ২৪শ পরগণা ও যশোহরের ভাদই ধান্যের ভীষণ অনিষ্ট হইয়াছে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে যে ভীষণ ঝটিকা হইয়াছিল তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের জেলা সমূহে এবং বাকরগঞ্জে স্থানে স্থানে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। ৫টি জেলা হইতে পশুপীড়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যশোহর ও ত্রিপুরায় খড়ের অভাব ঘটিয়াছে।

পত্রাদি

প্রায় সহস্র বিঘা কৃষি কার্য্যোপযোগী জমির উদ্ধার সাধন—

শ্রীওয়াজেদ মল্লিক। পাঁচতোপী, সবডিবিশান কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জেলা মুর্শিদাবাদ কান্দী সবডিবিশানের এলাকাধীন ফতে সিংহ নামক পরগণাটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান। উক্ত পরগণার অন্তর্গত বহুতর গ্রামে উত্তরাঢ়ী জমিদার কায়স্থ, ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন। জমিদার এবং ব্যবসা শ্রেণী লোক অপেক্ষা অধিকাংশ লোক কৃষি জিবী, তাহাই আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই পরগণায় মৌরাক্ষী নামক নদী প্রবাহিতা। এই নদীর স্বভাব এই যে, অন্য সময়ে কিছুমাত্র জল থাকেনা বালুকা ধূ ধূ করে কিন্তু বর্ষা সময়ে তাহাতে বন্যা আসিলে সেই নদী প্রবলাকার ধারণ করে। বন্যাও বেশী দিন থাকে না কিন্তু সেই স্বল্প কাল মধ্যে তাহার প্রবল স্রোতে তত্তীরস্থ উর্ব্বরা জমিগুলি বালুকাময় করিয়া ফেলে। পরস্পরের আবাদি জমি কেহ চিহ্নিত করিয়া লইতে পারে না। এই ফতে সিংহ পরগণার জমি স্বাভাবতঃ উর্ব্বরা ধান্য প্রধান ফসল, তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার রবিথন্দ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এক্ষণে পূর্ব্বাঞ্চলের কৃষি-জিবীগণ পাট উৎপন্ন পূর্ব্বক প্রভৃতি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে কিন্তু এই পরগণায় আদৌ পাটের চাষ হয় না বটে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখানকার কৃষক মাত্রেই রেশম উৎপাদন করে। কেহ তুঁতের চাষ পূর্ব্বক তাহা রেশম উৎপাদন কারীকে বিক্রয় করে কেহ গুটী পোকা পালন করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এ প্রদেশের কৃষকগণ পূর্ব্বে কৃচিৎ কেহ ধান্য বিক্রয় করিত কেবল তুঁত এবং রেশম ছাড়া রাজা মহাজনদিগের দেনা মিটাইত কিন্তু কয়েক বৎসর রেশমের ব্যবসা মন্দীভূত হওয়ায় কৃষকদিগের একমাত্র ধান্য এবং গুড়ের উপর সমস্ত খরচ নির্ভর করিতেছে কিন্তু মৌরাক্ষী নদীর কৃপায় তাহারা আশানুরূপ ফল পাইতেছে না। কান্দী সবডিবিশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণ পাঁচতোপী নামক গণ্ডগ্রামের ঠিক দক্ষিণে উক্ত নদী প্রবাহিতা। কিছু দিবস হইতে তাহার একটী শাখা উত্তর দিকে প্রবাহিত হইতে ছিল কাল প্রভাবে তাহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া তত্তীরস্থ প্রায় ২৫।৩০ খানি গ্রামের প্রজাদিগের কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে চক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করার উপায় নাই। বর্ষাকালে প্রবল বন্যার স্রোতে ঐ সকল গ্রামের এলাকার জমিগুলির উপর বালি ফেলিয়া উর্ব্বরা হীন করিয়াছে উপরন্তু বন্যার স্রোতে ঐ সকল গ্রামের প্রজাবর্গের আবাস গৃহ সমূলে উৎপাটিত করিয়া একবারে আশ্রয় হীন করিতেছে। কয়েক বৎসর হইল আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয় পূর্ব্বক উক্ত নদীর মুখে একটী বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রজাদের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল প্রজাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ বন্যার প্রবলস্রোতে সেই বাঁধ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কিছুমাত্র চিহ্ন রাখে নাই তদবধি বন্যা

ঐ সকল গ্রামের প্রজাগণ প্রভৃতি ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিতেছে বহু অর্থ সাধ্য বলিয়া কেহ উক্ত বাঁধ নির্ম্মানে সাহস করেন নাই। বিভিন্ন জমিদারের এলকায় ঐ সকল ক্ষতি-গ্রস্থ মৌজা অবস্থিত। তাঁহারাও উক্ত বাঁধ পুনর্নির্ম্মানে উদাসীন ছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, যখন গবর্ণমেণ্ট এতদিক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক উক্ত বাঁধটী রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন নাই তখন সেই শাখা নদীটী প্রকৃত নদীতে পরিণত অবশ্যম্ভাবী বিবেচনায় এপর্য্যন্তও কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সহসী হয়েন নাই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ পাঁচতোপী গ্রামের অন্যতম প্রবীণ, স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় গত চৈত্র মাহায় নিঃস্বার্থ ভাবে উক্ত নদীর বাঁধটী পুনর্নির্ম্মানে বদ্ধ পরিকর হয়েন তদবধি তিনি ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ দ্বারা একটী সমিতি গঠন করতঃ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সেই সকল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক দিগের নিকট হইতে তাহাদের অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক এই সুমহৎ কার্য্যটী সমাধা করিয়া দিয়াছেন। এই বাঁধটী পুনঃ প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। অবশ্য উক্ত সদাশয় পর হিতৈষী প্রজারক্ষক জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় একরূপ ভিক্ষোপজিবী হইয়া চাঁন্দা সংগ্রহ এবং স্বয়ং পরিদর্শন পূর্ব্বক উক্ত বাঁধটী প্রস্তুত সমাধা করিয়া দিয়াছেন। নতুবা কনট্রাকটরদিগের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে দ্বিগুণ খরচ পড়িত। গত বৎসর এপ্রদেশে সময় মত সুবৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকদিগের বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এই বাঁধটী বাঁধান উপলক্ষে প্রায় দুই মাস যাবৎ দৈনিক ৩।৪ শত মজুরের অন্নসংস্থানের উপায় হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় জমিদার মহাশয় বহু কষ্টে চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত বাঁধটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন তন্মধ্যে যে সকল দুস্থ প্রজাগণ প্রতিশ্রুত মত চান্দা দিতে অসমর্থ হইয়াছেন উক্ত সদাশয় প্রজাহিতৈষী জমিদার মহাশয় নিজ হইতে প্রায় আড়াই শত টাকা প্রদান পূর্ব্বক আরব্ধ কার্য্যটী সমাধা করিয়া দিয়া প্রায় এক হাজার বিঘা আবাদি জমি কৃষি-কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়া বহু সহস্র প্রজাকে অনন্ত বিপদ হইতে রক্ষা সাধন করিয়া দেওয়ায় আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম। অন্যান্য জমিদার দিগের তুলনায় শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের জমিদারীর ক্ষতি সামান্য। কিন্তু তিনি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আমাদের যে এই মহদুপকার সাধন করিয়া দিলেন তাহা ভুলিবার নহে। এক্ষণ বর্ষা সমাগত এপর্য্যন্ত উক্ত মৌরাক্ষী নদীতে ৩।৪টী প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ উক্ত বাঁধেরকোন ক্ষতি হয় নাই। বরং যে সকল জমিতে বালুকার স্তুপ হইয়াছিল উক্ত বাঁধের সন্নিকট জমির এযাবৎ তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইত না উক্ত নদীর স্রোত বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত সেই সকল বালুকাময় জমির উপর ২।২॥ হাত পরিমিত পলি পড়িয়া যাওয়ায় প্রজাগণ তাহাতে কলাই বুনিয়াছে অপর্য্যাপ্ত ঐ ফসল পাওয়া যাইবে। বর্ষাকাল পর্য্যন্ত উক্ত বাঁধ রক্ষা জন্য উক্ত জমিদার মহাশয়

মাসিক ১০৲ দশ টাকা বেতনে দুইজন রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই রক্ষক দুইজনের থাকিবার জন্য বাঁধের দুইপার্শ্বে দুইখানি কুঁড়ে ঘর করিয়া দিয়াছেন। উক্ত জমিদার মহাশয়ের এই নিঃস্বার্থ প্রজা হিতৈষীতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি এই বাঁধটী বাঁধানর ফলে উক্ত ২৫।৩০ খানি মৌজার প্রজাবর্গ কতদূর উপকৃত তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে প্রকাশ করা সধ্যে নহে। যদি বৎসর বৎসর সুবৃষ্টি হয় তাহা হইলে প্রজাগণ সেই সকল জমিতে অবাধে ধান্য, রবিশস্য প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করিয়া এত দিবস যে ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিতেছিল তাহার কথঞ্চিৎ পুরণ করিতে পারিবেন। আমরা কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমাদের এই সৌভাগ্যের সূত্রপাত সংবাদ অপনার সুবিখ্যাত কৃষক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আমাদের মত অবস্থাপন্ন প্রজার জমিদারগণের তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে বিবেচনায় অত্র সংবাদটী পাঠাইলাম অধুগ্রহ ও কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার উক্ত পত্রিকায় স্থান দান কলিলে চিরবাধিত হইব নিবেদনেতি।

উদ্ভিদ্ জীবনের উন্নতি—

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দোপাধ্যায় নৈহাটী ই, বি, আর,

প্রশ্ন—ফল ফুল বীজের স্থায়ী উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? উদ্ভিদ কি সকল সময়েই মাতৃ বৃক্ষের অনুরূপ ফল প্রসব করে?

উত্তর—প্রাণী জীবনের ন্যায় উদ্ভিদ জীবনেও দেখা যায় যে চাষ ও পরিচর্য্যা দ্বারা উহাদের পিতা মাতার উন্নতি করিতে পারিলে বংশন্নতি হইয়া থাকে। অকিঞ্চিৎকর বনজ কুসুম হইতে কত নয়ন মনোহর ফুলের উৎপত্তি হইয়াছে, নিকৃষ্ট বনজ ফল হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাচন ও তদ্বির দ্বারা কত কত স্বাদু ও রসাল ফলের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ভিদের বংশগত গুনানুসরণই (Heredity) ইহার মূল কারণ। উদ্ভিদের এই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বহুতর অত্যাশ্চর্য্য ফুল ফলের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। সামান্য শরিষা গাছ হইতে চাষের পরিপাট্যে ও উৎকর্ষে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপির সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ভিদের এই ধর্ম্মের সন্ধান না পাইলে কেহ ফল, শস্য বা সব্জীর এতাদৃশ উন্নতি বিধান করিতে পারিত না। কিন্তু আবার এই গুণেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ক্রমোন্নতি হইতে হইতে সহসা অবনতির নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতে দেখা যায়! অতি বিশুদ্ধ বাছাই বীজে ভাল ও বড় বাধাকপি না হইয়া হঠাৎ ক্ষেত ময় শরিষা গাছের মত এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে, উহা আকৃতি প্রকৃতিতে না কপি না শরিষা এরূপ গাছ জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতিকে 'ধরিয়া বাধিয়া আমরা অনেক কাজে লাগাই কিন্তু সময় সময় প্রকৃতির খেয়াল অনিবার্য্য।

গর্ত্তে মুলজ খন্দ রক্ষা—

শ্রীহরিচরণ দাস। বশিরহাট, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—আমাদের দেশে অসময়ের জন্য কাটালের বীজ রক্ষা করিবার একটা প্রথা আছে। মাটিতে গর্ত্ত খুড়িয়া কাঁটাল বীজ পুতিয়া রাখা হয়। মাটি ভালমতে চাপিয়া রাখিলে অধিক দিন এই ভাবে থাকিলে নষ্ট হয় না। এই প্রকারে শালগম, বিট, গাজর, মূলা এমন কি আলু রক্ষা করা যায় কি না ?

উত্তর—যে কোন মূলজ খন্দ এই ভাবে রক্ষা করা যায়। গর্ত্তটি যত ইচ্ছা লম্বা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু চওড়া বা গভীর ১।১॥ হাতের অধিক না হওয়াই ভাল। দ্রব্যের পরিমাণানুসারে গর্ত্তটি ইচ্ছামত লম্বা হইবে। কিন্তু গর্ত্তের মাঝে ৮।১০ ফিট অন্তর এক একটি দেওয়াল রাখিয়া দেওয়া মন্দ নহে কারণ কোন কারণে একটা কক্ষের বীজ পচিতে আরম্ভ হইলে অন্যগুলি রাক্ষা হইতে পারে। আপনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন। এই সকল সব্জী গুদামে ফাঁকা জায়গায় ঢালা থাকিলে পোকা লাগিয়া ও অন্য কারণে অনেক নষ্ট হয় গর্ত্তে রক্ষিত হইলে লোকসানের মাত্রা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। গর্ত্তের মুখোমুখি বা কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া সব্জীগুলি সজ্জিত করিয়া তাহার উপর উঁচু করিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। গর্ত্তটি বেশ উচ্চ শুষ্ক জায়গায় হওয়া উচিত। ভিজা মাটিতে সব্জী রাখিলে সহজেই পচিতে আরম্ভ হইবে। গর্ত্ত রসা হইলে, গর্ত্ত মধ্যে রস ও উত্তাপ পাইয়া আলু বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে।

সহজ প্রাপ্য সার—

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ। আহারবেলমী, বর্দ্ধমান।

প্রশ্ন—বহুপ্রকার সারের বিষয় আপনার কৃষক পত্রিকায় আলোচনা দেখিতে পাই। অনেক দামী সারেরও উল্লেখ আছে। সব্জী চাষের উপযুক্ত সহজে প্রাপ্য অল্প দামের কোন একটা সারের বিষয় যদি বলিয়া দিতে পারেন তবে বড়ই উপকার হয়।

উত্তর—সবজীর পক্ষে গোময় সার অপেক্ষা আর অল্পদামী, সহজ প্রায় ভাল সার নাই। ইহার সহিত গোয়াল পরিস্কার করিবার সময় যে খড় কুটা, ধুলা, ছাই বাহির হইবে তাহাও মিশ্রিত থাকিবে। গরুর গোয়ালে সর্ব্বদাই ছাই ও ধুলা ছড়াইয়া গোয়ালটি শুষ্ক রাখিতে হয় ইহাতে মুত্র সঞ্চিত হয়। এই সমুদয় আবর্জ্জনা মিশ্রিত গোময় সার এক বৎসরকাল গর্ত্তে ফেলিয়া পচাইয়া ব্যবহার করিবেন। ইহাতে উদ্ভিদের খাদ্য নাইট্রোজেন, পটাস, সল্ফেট সব রকমই থাকে কিন্তু গোময় আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবে লোকে গোময় পুড়াইয়া নষ্ট করিতেছে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ ও সারসংগ্রহ।

নারিকেল ছোব্ড়ার গুঁড়ায় কার্পেট—নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া আর নগণ্য নহে। এই নারিকেল ছোবড়াকে চাপ দিয়া জমাইয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া এক প্রকার কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ঘরের মেজে ও সিঁড়ির উপর পাতিয়া দিবার উপযুক্ত। ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, ইহার উপর চলিলে আরাম অনুভব হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সার হিসাবেও ইহা মূল্যবান। রুগ্ন বৃক্ষ, লতায়ও এই সার দিলে অবিলম্বে বৃক্ষলতাকে সতেজ করিয়া দেয়। ইহার উপর বীজ বপন করিলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সতেজ চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য কৃষিক্ষেত্র সমূহে এক প্রকার শৈবাল ব্যবহৃত হইত, তাহাতে অম্লাক্ত পদার্থ থাকায় অনেক স্থলে চারা মরিয়া যাইত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া পরীক্ষা করিয়া অতি সুন্দর ফল হইতেছে। যে সকল গাছের গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মরিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সেই সকল বৃক্ষের মূলদেশে নারিকেল ছোবড়ার গুড়া দিলে জল টানিয়া লইয়া বৃক্ষকে সজীব করিয়া দেয়। নারিকেল ছোবড়াতে গুঁড়ার বাহুল্য হেতু ইহা বৃক্ষ লতাদির গুল কলম বাঁধিবার জন্য ব্যবহার হয়। গুলট সর্ব্বদা সরস থাকিলে তবে ক্ষতস্থান হইতে শিকড় উদ্গত হয়। নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়ার রস রক্ষা করিবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া এই কার্য্যে নারিকেল ছোবড়ার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে নারিকেল ছোবড়ার পরিবর্ত্তে বিচালি, চট্ ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কাজ তত ভাল হয় না। এই সকল কারণে এই সকল পরিত্যক্ত গুঁড়া এখন বিদেশেও রপ্তানী হইতেছে। ১ টন এইরূপ ছোবড়ার গুড়ার মূল্য ২৫ শিলিং পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে টাকায় দুইসের পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। এক টন প্রায় ২৭৷৷০ মণ।

"Field" সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "The pity of it is this that cocoanut fibre refuse has become so expensive as to be out side of the limit of the garden bill," অর্থাৎ দুঃখের বিষয় যে, এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া এত মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যয় বাহুল্য হেতু বাগানের বা কৃষি কার্য্যে ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

কিন্তু পরিতাপ, গুড়া এত মূল্যবান হইলেও এদেশে কেহ এ তথ্য অবগতই নহে, এই পরিত্যক্ত গুড়া যে আবার অর্থকরী হইতে পারে, এ ধারণাই নাই। কতবার দেখাইয়াছি যে, এদেশের অনায়াসলব্ধ অনেক দ্রব্য বিলাত ও অন্যান্য দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশ প্রকৃতই রত্নপ্রসূ, কিন্তু অধুনা অকাল কুষ্মাণ্ডের দল বাড়িতেছে—সকলেই অন্ধ, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পায় না। এ রোগের ঔষধ নাই। ছেলে হইতে বুড়োকে পর্য্যন্ত ফুটবল, বায়োপ, থিয়েটারের, ক্লবের খবর জিজ্ঞাসা কর দেখি, সব বলিতে পারিবে, কিন্তু ভাতের খবর জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কোন সংবাদই রাখে না। ধিক্ এই অনুকরণপ্রিয় জাতিকে!

কাছাড়ের অবস্থা।—শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার চন্দ্র লিখিয়াছেন;—১৯১৩ এবং ১৯১৫ সালে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্লাবন হইয়াছিল। সংপ্রতি ১৯১৬ সালে তৃতীয়বারের ভীষণ প্লাবনে শ্রীহট্ট ও কাছাড়বাসীরা বিপন্ন হইয়াছে। শিলচরে টিলার উপরিস্থ ৬টি ছয় বাড়ী ব্যতীত অপর বাড়ী ঘর ও রাস্তা জলের তলে ছিল। রাজ পথের উপরদিয়া বড় বড় নৌকা চলাফিরা করিত। সৌভাগ্যক্রমে এই জেলার সর্ব্বত্রই টিলা ও ছোট ছোট পাহাড় ছিল বলিয়া লোকর প্রাণ বাঁচিয়াছে। কিন্তু প্রবলস্রোতে লোকের ঘরের চাল, জিনিষপত্র গরু বাছুর ভাসিয়া গিয়াছে। স্রোতের জলে হস্তী এবং দুই ব্যাঘ্রের মৃতদেহও ভাসিতে দেখা গিয়াছে। সমতল অঞ্চলে শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। করিমগঞ্জ এবং উত্তর শ্রীহট্টেরও সেই অবস্থা। লোকের দুর্গতি এমন হইয়াছে যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য

অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান ।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহাহইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিকদিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁস জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্থ।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভাবিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্রক্স, পিটুনিয়া ষ্টাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই

মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনায় সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটীতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়! সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা যথেষ্ট,. ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

কার্ত্তিক ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

বিষয়	পত্রাঙ্ক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

খর্জ্জুর

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার ভাকিল হাইকোর্ট লিখিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

খর্জ্জুর কৃষি-ব্যবসায়ী প্রাতে রস সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুব্জপৃষ্ঠ এক প্রকার পাত্রে করিয়া জ্বাল দেয়। রস জ্বাল দিতে এক প্রকার উনান প্রস্তুত করে। তাহার একটী মুখ, ইহা দিয়া কাষ্ঠাদি দিতে হয় এবং মৃত্তিকা পাত্র বদলাইবার উপযোগী ৩।৪।৫ বা ততোধিক চোখ থাকে। রসের পরিমাণ অনুসারে চোখের সংখ্যা স্থিরীকৃত হয়। এই উনানকে বাইন বলে। সম্পন্ন কৃষকের কেহ কেহ ১৫।১৬ চোখের বাইন চালাইয়া থাকে। রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে কত সময় লাগে তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কারণ এখানে উত্তাপ নিয়মিত নহে। রস যথা সম্ভব গাঢ় হইয়া গুড় রূপে পরিণত হইতে পাঁচটী অবস্থা অতিক্রম করে। প্রথম অবস্থা গাদ কটা বা ময়লা উঠান। দ্বিতীয় মাকড়সা ফুট। তৃতীয় অবস্থা সরবে ফুট। চতুর্থ অবস্থা বাগা ফুট। পঞ্চম অবস্থা গুড়ে ফুট।

পাটালি প্রস্তুত—গুড় ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উনান হইতে নাবাইয়া ফেলা হয়। গুড়ের দানা বাঁধাইবার জন্য কৃষকেরা একটী উপায় করে। সাধারণতঃ গুড় প্রস্তুত করিবার মৃৎপাত্রে (খুলী বা গাম্‌লা) যে পরিমাণ রস ধরে তাহা অপেক্ষা কম গুড় ঢালিয়া লইয়া একটা তাড়ু দ্বারা কিছু গুড় জালার গায়ে তুলিয়া ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া ঘসিতে থাকে। ঘসিতে ঘসিতে গুড় যখন সাদা চিনির মত হইয়া জালার গা হইতে ঝরিয়া পাত্রমধ্যস্থ গুড়ে পড়ে তখনই চূর্ণীকৃত গুড়ের সহিত পাত্রস্থ সমুদয় গুড় মিশাইয়া ফেলে। এই ক্রিয়াকে বীজ মারা কহে এখন অন্য গুড় প্রস্তুত হইলে একটু একটু বীজগুড় প্রত্যেক জালায় ঢালিয়া দেয়। এখন নাড়িয়া নাড়িয়া বীজ মিশাইয়া গুড় নাগরি

ভরিয়া রাখে। অবশিষ্ট বীজগুড় পাথরে বা কলার খোলায় ঢালিয়া দেয়। শীতল হইলেই ইহা পাটালী রূপে পরিণত হয়।

রস জ্বালাইয়া গুড় করিবারও একটা কৌশল দেখা যায়। কেহ কেহ ভাল দানাদার গুড় করিতে পারে না। কেহ কেহ এবিষয় সুপরিপক্ক। বীজ মারিবার সময়ে বুঝাযায় যে গুড় কি প্রকার হইবে। আরামের প্রথমে যে গুড় বা পাটালী হয় তাহার এমন এক প্রকার সদ্‌গন্ধ হয় যে সহজেই তাহা রসনালুব্ধ করে। এই প্রকার গুড় উচ্চমূল্যে বিক্রিত হয়। খাইতে খর্জ্জুরগুড় ইক্ষুগুড় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। প্রথম আরামের গুড় সকলেই আদর করে। প্রথম আরামের যে গুড় মধুর মত পাতলা করিয়া রাখা হয় তাহাকে নলেন গুড় বলে ইহা সর্ব্বত্র আদৃত, ইহার গন্ধও চমৎকার।

চিনি প্রস্তুত প্রণালী—গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা স্বতন্ত্র ব্যবসায়; সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ কৃষকে ঐ কার্য্য করিতে পারে না। কৃষকের নিকট গুড় খরিদ করিয়া তবে চিনির কুঠিওয়ালারা চিনি করে। এজন্য চিনির কুঠিওয়ালারা কৃষকদিগকে পূর্ব্ব হইতে দাদন দিয়া থাকে। কৃষক চিরকালই মহাজনের দায়স্থ। এই কুঠিওয়ালারা এক সময়ে চিনির ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ করিত। তখন তাহারা ব্যবসায়ের উন্নতির হিসাবে কিছুই চেষ্টা করে নাই। তাহারা অর্থাহারণ করিয়াছে কিন্তু অর্থের যাহা মূল তাহার প্রতি দৃষ্টি করে নাই।

তাই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার আরম্ভেই সংগ্রামত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, এই কুঠিওয়ালারা প্রায়ই অশিক্ষিত সুতরাং যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে।

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের উপকরণ, একটী বড় ঝাড় ইহাকে পোত বলে। ইহাতে প্রায় ২।০ মণ গুড় ধরে; একটী বাখারীর (বাঁশের ফালি) ত্রিভুজ এবং একটী মাটির বড় গামলা, আর পাটা শেওলা ইহা এক প্রকার জলজ শৈবাল। পাটার গুণ এই যে ইহা বহু দিন রস সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। বর্ণহীন করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে বলিয়া জানা যায়।

গামলার উপর ত্রিভুজ রাখিয়া তদুপরি পোত স্থাপিত করিতে হয়। পোত বসাইবার জন্য ত্রিভুজের আবশ্যক। নাগরী ভাঙ্গিয়া গুড় দিয়া পোত পূর্ণ করিয়া তাহা শৈবাল দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

পাটারস্তর বেশ স্থূল ভাবে দিতে হয়। পাটার সঞ্চিত জলীয় পদার্থ গুড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিনি হইতে মাত পৃথক করে। মাত নিম্নাভিমুখী হইয়া গামলায় সঞ্চিত হয়। ৭।৮ দিন এই প্রকারে রাখিয়া শৈবাল তুলিয়া ফেলিয়া ছুরি দিয়া পোতের মধ্য হইতে চিনি কাটিয়া তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। ৩।৪ ইঞ্চি গভীর পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যায়। পুনরায় নূতন পাটা ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। এমনি করিয়া ৭।৮

দিন অন্তর চিনি তুলিয়া লইতে হয়। ঝরা মাত জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া পুনরায় ঐ প্রকার চিনি প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় বারের মাতে আর শর্করার অংশ পাওয়া যায় না। মাতের চিনি নিকৃষ্ট সাধারণতঃ চিনি তিন প্রকার আথরা, দলুয়া ও গোঁড়। আথরা চিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দলুয়া অপেক্ষা গোঁড় আরও নিকৃষ্ট। পোত হইতে চিনি তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইলেই বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী হয়।

সাধারণতঃ গুড় হইতে শতকরা ২৫ ভাগ দলুয়া, ৩০ ভাগ গোঁড় ও ৩৪ ভাগ আথড়া চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমি বহুদিনব্যাপী বহু কারখানায় অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, গড়ে ২০।২৫ এবং ৩০ ভাগের বেশী তিন প্রকার উপরোক্ত জিনিষ পাওয়া যায় না। শতকরা ২০।২৫ ভাগ গুড় নানা প্রকারে নষ্ট হয় অবশিষ্ট অংশ মাত। এই মাত জ্বাল দিয়া চিটা তৈয়ার হয়। ইহা তামাকে মাখিতে এবং মদ প্রস্তুতের জন্য বহুল পরিমাণে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশে কেপ জাভা ও সুমাত্রাদি দেশ হইতে বহু পরিমাণ চিটে আসিয়া থাকে; ইহাও তামাকে ও মদ প্রস্তুতে ব্যয়িত হয়। ঐ সকল দেশ হইতে ভারতে সস্তা দরের ইক্ষু ও বীট, চিনি আমদানী হওয়ায় আমাদের দেশের গুড় ও চিনির ব্যবসা প্রতিযোগিতায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

বৈদেশিকগণ উন্নত কল কব্জার সাহায্যে কারখানা চালাইবার কারণ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ চিনি পাইয়া থাকে। তাহারা বর্ত্তমান যুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কাজ করে। আমাদের এবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানাভাব বলিয়া কিছুই করিতে পারি না। আমেরিকার অন্তর্গত সিন্‌সিনাটি নগরের চিল্‌মার আয়রণ ওয়ার্কস্ কোংর নিকট বেশ সস্তাদরে ধান মাড়াই, ইক্ষু মাড়াই এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুতের কল পাওয়া যায়। আমরা মূল্যের বার আনা অগ্রিম মূল্য পাইলে ঐ কল আনাইয়া দিতে পারি। আমেরিকার গুড় তৈয়ারির নব প্রণালী আমাদের দেশে. উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কৃষি বিভাগের মিঃ এস্ হাদী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার আনীত কলের কার্য্য ও গুড় প্রস্তুত প্রণালী রঙ্গপুর কৃষি ফারমে কর্ণেল প্রত্যাগত বিশিষ্ট কৃষিজ্ঞ মিঃ জে এন্ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধারণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা খুব সুন্দর; চিনির ফলন বুঝিতে হইলে রসের পরিমাণাদি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

খেজুর গাছের অবস্থানুসারে রসের পরিমাণের তারতম্য হয়। এমন গাছ আছে যে, প্রত্যহ ৮ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত রস দান করে। জিরেন কাটের রস বেশী হয়। দোকাট অপেক্ষা তেকাটের রস কম হয়। আরামের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে রস কম হয়, ডিসেম্বরের শেষ হইতে ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রস খুব বেশী হয়। গুণেও ঐ সময়ের রস ভাল হয়। ফাল্গুন মাসে. রস কমিয়া যায়। ঐ সময়ে গড়ে প্রত্যেক গাছে ৫ পাঁচ সের করিয়া রস প্রত্যহ আশা করা খুব বেশী মনে হয়। সমগ্র আরামে বিশ্রাম বাদে ৪৫ বা ৫০ দিন করিয়া প্রত্যেক বৃক্ষে রস পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে

আরামের প্রথম ও শেষভাগে রস কম হয়। বৃষ্টি বাদল মেঘাচ্ছন্ন ও কোয়াশাযুক্ত রাত্রে রস ঘোলা হয়, এবং পরিমাণেও কম হয়। প্রতি সতেজ বৃক্ষে প্রতি আরামে ছয় মণ রস পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে এক মণ গুড় হইতে পারে; এই পরিমাণ গুড় আশা করা অন্যায় নহে। আমার মনে হয় যে, গয়া পাটনাদি জেলায় যেরূপ খেজুর ও তাল গাছের বাহুল্য দেখা যায় তাহাতে ঐ সকল দেশে তাল ও খেজুর গুড়ের কারবার বেশ চলিতে পারে; কিন্তু এই সকল দেশে গেছোর অভাবে এই কারবার চালান বড়ই সঙ্কট। মধ্য প্রদেশের বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গেছো সঙ্কটের জন্য গুড়ের ব্যবসা পুর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিতেছেন না। মধ্য প্রদেশে বন্য ভাবে বহু খেজুর গাছ জন্মায়। আমার ৪০ হাজার খেজুর গাছ ও লক্ষাধিক তাল গাছ গয়া ও পালামু জেলায় আছে, কিন্তু গেছো সঙ্কট ও শরিকী বিবাদের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না। সকল দিক বাদসাদ দিয়া প্রতি গাছে দুই মণ রস পাওয়া যায় এবং চৌদ্দ সের গুড় মোটামোটী হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে। প্রতি একারে ৫০০ গাছ জন্মিতে পারে; কিন্তু ৩৫০টি গাছ যদি একার প্রতি ধরা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত হিসাবে কত গুড় জন্মিতে পারে তাহা হিসাব করিয়া লউন, এখন গুড় প্রস্তুতের হিসাব নিম্নে দিলাম।

২ জন গাছী	...	...	৪৮৲
১ সহকারী	...	...	১৫৲
উহাদের খোরাকী	...	...	৩৮৲
জ্বালানি কাঠ	...	...	৩০৲
নাগরী ইত্যাদি	...	...	১৫৲
গাছ কাটা	...	...	১৲
দড়া দড়ী ইত্যাদি	...	...	১৸০
এক একর জমির খাজানা		...	১৫৲
আবাদী খরচ	...	...	৯৲
গাছীদের কাপড়	...	...	২৷০
অন্যান্য বাজে খরচ	...	...	২৲
		মোট—	১৭৭৲

৩৫০টি বৃক্ষে উপরোক্ত হিসাবে বাদসাদ দিয়া ১০০ মণ গুড় যদি ধরা হয়, এবং তাহার গড়ে মূল্য ২৷৷০ ধরিলে ২৫০৲ হয়; তাহা হইলে ২৫০৲ হইতে ১৭৭৲ বাদ দিয়া ৭৩৲ টাকা লাভ থাকে। আমার মনে হয় যে, ৫০০৲ মূল ধনে খেজুর গুড়ের কারবার বেশ চলিতে পারে। এইরূপ সুলভ জীবিকা ধারণের উপায় থাকিতে আমাদের দেশের

লোক কেন যে চাকুরীর জন্য লালায়িত তাহা বলিতে পারি না। খেজুর ক্ষেতে অপর ফসলও অল্প বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে; তাহা ছাড়া পাতায় ব্যাগ, মাদুর, চুবড়ী ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বেশ দু পয়সা আয় করা যাইতে পারে। একটি খেজুর ক্ষেত্র ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে; তবে উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ ও দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন গাছীর আবশ্যক, যেহেতু গাছীর হাতেই উদ্যানের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। খেজুর বা তাল গাছে পোকা ধরিলে বোর্দো দ্রাবণ প্রয়োগে বেশ ফল দেখা যায়। এসম্বন্ধে আমি তাল ও নারিকেল গাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার প্রবন্ধে আমুল আলোচনা করিয়াছি। বোর্দো দ্রাবণ নিম্নরূপ প্রস্তুত করিতে হয়; টাটকা চুণ ৪ পাউণ্ড এবং তুঁতে (Copper sulp) ৪ পাউণ্ড এবং জল ৫০ পাউণ্ড মিশাইলে বেশ কার্য্যোপযোগী দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। এই দ্রাবণ পিচকারীর সাহায্যে গাছে ছিটাইতে হয়। খেজুর চাষে সেচ বিশেষ আবশ্যক তাহা যেন মনে রাখিয়া কৃষক কার্য্য করে। গোয়ালের আবর্জ্জনা বা ঘোড়ার লিদি মূত্র গাছের গোড়ায় শীতকালে প্রয়োগ করিলে গ্রীষ্মে ফল ফুল হয়।

রস সঞ্চয় প্রণালী।—বেলা ২।২॥টা হইতে পর দিন প্রাতে প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত ভাণ্ডে রস সঞ্চিত হয়। সুতরাং রস মাতিয়া গিয়া, উহা শর্করা ভাগের হানি করে। ধূম্র শোধিত ভাণ্ডে সঞ্চিত হইলেও এই প্রাকৃতিক ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয় না। ধূম শোধিত ভাণ্ড ব্যবহার করিলে প্রাকৃতিক ক্রিয়া কেবলমাত্র সমধিক উত্তেজিত হইতে পারে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পতর শীতের দিনে এই মাতন ক্রিয়া (Fermentation) পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যত শীত অধিক হয় এবং আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, ততই রসের শর্করাভাগ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আরামের মধ্যাবস্থায় এইজন্য রসে শর্করার ভাগ বেশী পাওয়া যায়। রসের এই "মাতন" ক্রিয়া বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হয় না বলিয়া খেজুর গুড়ে চিনির ভাগ কম পাওয়া যায়। খেজুর রসে শর্করাংশ ইক্ষু রস অপেক্ষা স্বভাবতঃই অল্পতর, এবং ইহার উপর যদি আরও অল্প হইয়া যায়, তবে ক্ষতির ভাগ অধিক হয়। সাধারণতঃ জিরেন কাটের রস অপেক্ষা দোকাট এবং তদপেক্ষা তেকাটের রস ঘন। ইহা কেবল রসের অল্পতা হেতু। কিন্তু দানাদার শর্করা (Sucrose) জিরেন কাটেই বেশী। দোকাট এবং তেকাটে (Reducing sugar) বেশী। অজ্ঞ কৃষকেরা জিরেন কাটের রসের সহিত দোকাট বা তেকাট রস মিশ্রিত করে বলিয়া জিরেন রসও মাতিয়া উঠিয়া (Sucrose)এর ভাগ নষ্ট করে। অন্যদিকে গাছের সংখ্যা বেশী না হইলেও জিরেন রসের পরিমাণ বাড়ে না। সকল কৃষক বেশী গাছও পায় না; এইরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী। গাছও এই কারণে জিরেন কাটের গুড়ের সহিত দোকাট তেকাটের গুড় মিশ্রিত হইয়া গুড় নষ্ট হয়।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রসের ক্ষার পদার্থ পরিমাণ মত থাকিলে জ্বাল দিবার সময় শর্করাংশ বেশী নষ্ট হয় না।

কিন্তু সাধারণতঃ কৃষক রস জ্বাল দিবারকালে বুঝিতে পারে যে, রস টক্ হইয়াছে কি না বা মাতন ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে কি না। গাছীর দোষে রস বা গুড় ময়লা হয়। রস জ্বাল দিবার পাত্র বা গাছের মাথী বা পাত্র পরিষ্কার না করিলে এবং রস ছাঁকিয়া লইয়া জ্বাল না দিলে গুড় ময়লা হয়। রসের ময়লা বা গাদ পরিষ্কার করিবার অনেক প্রকার জিনিষ আমাদের দেশের গাছীরা ব্যবহার করে। হাড়ের গুঁড়া, দুগ্ধ, পুঁইডাঁটা ছেঁচা, ঢেঁড়শ ছেঁচা ইত্যাদি দ্রব্যে গাদ তোলা হইয়া থাকে। শর্করাংশ নষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, গুড় বা রস টক হইয়াছে। গাছীর অসাবধানতা বশতঃ খেজুর গুড় ময়লা হয় বলিয়া খেজুর চিনি পরিষ্কার করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ পড়ে। সেইজন্য খেজুর গুড় তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করা সমীচীন ব্যবসা বলিয়া আমার মনে হয়। যাহাহউক পরীক্ষার দ্বারায় জানা গিয়াছে যে, খেজুর রস হইতে গুড় প্রস্তত করিবার সময়ে (Sucrose)এর ভাগ শতকরা ১২.৫৫ অংশ এবং ঐ পরিমাণে মোট শর্করা (Total sugar) নষ্ট হইয়া যায়। রস জ্বাল দিবার জন্য লৌহ কটাহ ব্যবহার করা ভাল; কিন্তু কৃষক ৫০।৬০টী মাত্র গাছ লইয়া কারবার করে, তাহার পক্ষে ব্যয়সাধ্য লৌহপাত্র ব্যবহার অসম্ভব।

রস সংগ্রহের সময়।—প্রত্যূষে ৫টার মধ্যে সকল গাছ হইতে রস সংগ্রহকরা কর্ত্তব্য, কারণ ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে প্রথম রৌদ্রে রস বেশী মাতিয়া উঠে। মিঃ এনেট্ ও মিঃ ড্রিয়ার পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছেন। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তক যত্নসহকারে পাঠ করিলে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভকরা যায়, এবং হাতে হাতিয়ারে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোট চাঁদপুর, তারাপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মিঃ হাদীর নিকট অথবা রঙ্গপুরের গভর্ণমেণ্ট ডেয়ারি ফারমের বর্ত্তমান কর্ত্তা ও পরিচালক মিঃ জে এন্ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইয়া কাজ শিখিতে পারা যায়।

Practical with sugar manufacture by H. C. Pruisen Geerlig, (London Norman Rodger, Street Dunstan's Hill, E. C. 128), Sugar cane its cultivation and Gur manufacture by J. B. Knight M Sc, Bull No. 61, of the Bombay Depot of Agriculture. Improved method of making Jaggery by Alfred Chatterton, Director of Industries and Commerce, Mysore, No. 21, of the Mysore Industries &c.

হিজলী বাদাম

—:o:—

হিজলী বাদামের সহিত অনেক বঙ্গবাসীই পরিচিত নহেন। তাহার প্রধানতম কারণ এই যে ইহার উৎপাদন বাঙলাদেশের সামান্য অংশ মাত্রে আবদ্ধ। হিজলী বাদাম ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। কাঁঠাল, জাম, বেল প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে ইহাকে নব্য আগন্তুক বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ এতদ্দেশে ইহার প্রবর্ত্তন পর্ত্তুগীজগণের সমসাময়িক। তাঁহারাই প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের অরণ্য হইতে ইহার বীজ আনায়ন করিয়া গোয়া অঞ্চলে চাষ আরম্ভ করেন। পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় এক্ষণে ইহার অনেক আবাদ হইয়াছে এবং অর্দ্ধ বন্য গাছের সংখ্যাও অনেক। পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেন্ট হিজলী বাদামের চাষ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ করও পাইয়া থাকেন। গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে নানাস্থানে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলে মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও মেদনীপুর জেলায় ইহা পাওয়া যায়। মেদনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানেই হিজলী বাদাম জন্মিয়া থাকে এবং কাঁথির পুরাতন নাম হিজলী বলিয়া, ইহা হিজলী বাদাম নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত দুই স্থান ভিন্ন বঙ্গদেশের অন্য কোনও স্থানে হিজলী বাদামের প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। অবশ্য বাগান বাগিচায় সখের জন্য উৎপাদিত দুই চারিটা গাছ স্থানে স্থানে আছে। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলে হিজলী বাদাম Anacardium Occidentale Liun নামে পরিচিত এবং ইহা আম্রের সহিত সম প্রাকৃতিক বর্গের (Natural Order) উদ্ভিদ।

সমুদ্রের উপকূলে, বড় বড় নদী সমূহের সাগর সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থানে, যে সমুদয় স্থলে অসীম বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে, বালি আড়িসমূহ কেবল ২।১ প্রকার মাত্র উদ্ভিদে আবৃত অথবা একবারেই নগ্ন সেইরূপ স্থানে বেলাভূমি হইতে সামান্য অন্তরেই, প্রায় অবিমিশ্র বালুময় জমিই হিজলী বাদামের জন্মভূমি। দুই চারি প্রকারের ঘাস ও মুথা, কেয়া, সেয়াকুল, লালভেরেণ্ডা ও বন্য করমচা ইহার সহচর। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিপাতের দিন কয়েক পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থূল, হরিতাভ দুইটি বীজ দলের মধ্যে উর্দ্ধদেশ আচ্ছাদিত করিয়া হিজলী বাদাম মিশ্র মৃত্তিকা হইতে নির্গমণ করিতেছে। সে সময় মৃত্তিকার উপরিস্থিত দেহাংশ ক্ষুদ্র হইলেও মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ মূল অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। বলুকাময় অথবা তরল কর্দ্দমময় স্থানের উদ্ভিদের প্রকৃতিই এইরূপ। অন্যান্য অবয়বের অনুপাতে মূল বৃহত্তর। চতুর্দ্দিকে আগাছা সমূহের প্রতিদ্বন্দীতা যতই অধিক হউক না কেন, হিজলী বাদামের বীজদলের সঞ্চিত খাদ্যের প্রাচুর্য্যতা ও দেহ গঠনের দৃঢ়তার জন্য ইহার বৃদ্ধি কিছুতেই প্রতিহত হয় না। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইহা পার্শ্ববর্ত্তী নব অঙ্কুরিত গাছ সমূহকে ছাড়াইয়া উঠে। শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিলেই

হিজলী বাদামের যৌবনে আর বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকে না। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি কীট পতঙ্গ, বন্য অথবা গৃহ পালিত পশ্বাদি ইঁহার সামান্যই অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম। ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত শক্ত চর্ম্মাক্ত ত্যক বিশিষ্ঠ, সুতরাং গবাদির সুখাদ্য নহে। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষের প্রায় সর্ব্বাংশ অল্পবিস্তর মাত্রায় এক প্রাকার প্রদাহ উৎপাদনকারী পদার্থ আছে; ফলে তাহার সম্পুর্ণ পরিণতি। এই তীব্র রাসায়নিক যৌগিকই হিজলী বাদামকে অনেক পরিমাণে আত্ম রক্ষার সহায়তা করে।

হিজলী বাদামের গাছ বিশেষ বড় হয় না। স্থানে স্থানে ২৫।৩০ হাত উচ্চ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃক্ষ ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণে উচ্চ হয়। অধিকাংশ স্থলেই বৃক্ষের কাণ্ড সরল ও ঋজু হয় না। ইতস্ততঃ ভাবে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয় এবং কাণ্ড বক্র হইয়া নানা প্রকার আকার ধারণ করে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে হিজলী বাদামের বসতি স্থানে বৎসরের অনেক সময়ই প্রবলবেগে বাতাস বহিয়া থাকে সেই উদ্দান বায়ু প্রবাহে কোন বৃক্ষই অধিক উচ্চে মস্তক উন্নত করিতে পারে না। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বৃক্ষাবলী প্রায়ই অনুন্নত অঋজু কাণ্ড বিশিষ্ঠ।

প্রায় তিন বৎসরেই হিজলী বাদামের ফল হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখে শ্বেতবর্ণ বেগুণি রঙের রেখা বিশিষ্ট পুস্পভারে অবনত বৃক্ষাবলীর সমষ্টি বালুকাময় বেলাভূমির অন্তরালে নিতান্ত মন্দ দেখায় না। হিজলী বাদাম ফলের গঠন হিসাবে একটু বিশেষত্ব আছে। পুর্ব্ববৃন্ত ফলের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সূচাগ্র স্তম্ভাকার ধারণ করে। ইহার প্রসস্থ প্রান্তেই প্রকৃত ফল সংলগ্ন। ফলের আকৃতি ৫ অঙ্কের ন্যায়। অপরিণত অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত স্থুল রসাল বৃন্ত হরিদ্বর্ণ থাকে কিন্তু পক হইলে পীত অথবা রক্তবর্ণ হইয়া যায়। এই পীত ও রক্তবর্ণ কোনরূপ প্রকারগত পার্থক্যতার লক্ষণ কি না তাহা সঠিক বলা যায় না অন্ততঃ এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সাবকাশ লেখকের হইয়া উঠে নাই। সুপক্ক বৃন্তের ত্বক একটু বিকৃত স্বাদ বিশিষ্ট হইলেও ইহার শাঁষ বেশ অম্ল মধুর। কিন্তু স্থানীয় ভদ্রব্যক্তি গণের মধ্যে ইহা বড় একটা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। ইতর সাধারণে ইহা কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করে কিম্বা অম্লরসযুক্ত তরকারিতেও দেয়। স্থানান্তরে আমরা ইহার ব্যবহারের উল্লেখ করিব। দুই এক জাতীর পক্ষী এই পক বৃন্তের বিশেষ ভক্ত। তাহারা প্রায়ই সুপক্ক ফলের শাঁষ খাইয়া থাকে এবং অজ্ঞাত হিজলী বাদামের বংশ বৃদ্ধির সাহয়তা করে। কারণ উহাদিগের দ্বারা ফল সমেত বৃন্ত স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয় এবং বৃক্ষের বসতি স্থানেরও পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃত ফলের বর্ণ প্রথমে সবুজই থাকে, পরে পরিণতির সহিত ধুসর বর্ণ হইয়া যায়। ইহার ফলে এত অধিক মাত্রায় প্রদাহজনক তৈল আছে যে কোন পশুপক্ষী অথবা কীট পতঙ্গ উহাকে স্পর্শ করে না। সুতরাং উহা নির্ব্বিবাদে যে স্থলে পতিত হয়, সেই স্থলেই অঙ্কুরিত হইতে পারে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, হিজলী বাদমের যে

সমস্ত বৃক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই বীজ প্রসূত। কিন্তু হিজলী বাদামের কলম করিলেও যে গাছ হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। জঙ্গলের মধ্যে এমন অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; যাহা অনেক বৃক্ষের শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোনরূপ নৈসর্গিক কারণে ইহারা প্রথমে জনক বৃক্ষ হইতে অর্দ্ধ চ্যুত হইয়াছিল; তৎপরে জল হাওয়া ও মৃত্তিকার অনুকুল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হইয়া নিজেই স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। গুল ও ধাপ কলমই হিজলী বাদামের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যে প্রকারে উৎপাদিত হউক, হিজলী বাদাম অতি অল্প মাত্রায়ই মানবের সাহায্য সাপেক্ষ। সার, পাইট, জল এসমুদয় বিজলী বাদামের পক্ষে অজ্ঞাত পালন প্রণালী। অনুর্ব্বর বালুময় মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সামর্থে বৃদ্ধি, পরিণত ও সন্তানোৎপাদন এই তিনটি জীব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফলপূর্ব্বক হিজলী বাদাম পরদেশে আসিয়াও নিজের সংকীর্ণ সমাজে কাহারও অপেক্ষা হীনপ্রভ হইয়া যায় নাই।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার স্থল বিশেষে হিজলী বাদাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় স্থানে যে সকল অঞ্চলে হিজলী বাদাম জন্মায় সে সমুদয় স্থানের ভূম্যধিকারীগণ যে উহা উৎপাদন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন তাহা নহে। তবুও ইহা হইতে তাঁহাদের অল্প বিস্তর আয় আছে। গ্রীষ্মকালে বাদাম জন্মিলেই ফল একবার সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। এইটিই প্রধান ফসল; তাহার পর অবশ্য গাছগুলিতে আরও কিছু বাদাম জন্মায় কিন্তু জমিদারগণের তাহা তুলিতে ততটা সচেষ্ট হন না। ফসল সংগৃহীত হইলেই তাঁহারা নিজেদের আবশ্যক মত ফল রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ফোড়েগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। বাদাম ব্যবসায়ে যাহা প্রকৃত লাভ আছে তাহা এই ফোড়ে সকলের হাতেই যায়। জমিদারগণ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে লভ্যাংশ পইয়া থাকেন।

হিজলী বাদামের ফলকে কাঁথির লোকেরা চলিত ভাষায় বাদাম বীজ অথবা সংক্ষেপে "বীচা" বলিয়া থাকে। বাদামের ফসল হইয়া যাওয়ার কিয়দ্দিবস পরেই অর্থাৎ আষাঢ় মাসেই ফোড়েরা সাধারণতঃ পাঁচ হইতে ছয় কাহস দরে বীজ ক্রয় করে এবং তিন হইতে চারি কাহন দরে বিক্রয় করে। এক কাহন বীজের ওজন প্রায় ৪৷৷০ সের। আকৃতির পার্থক্যে ও আদ্রতার পরিমাণের বিভিন্নতায় ২৫০ হইতে ৩০০ বীজে ১ সের হয়। গড়-পড়তায় সমস্ত বৎসর হিসাব করিলে বীজের দর মণ করা প্রায় ২৲ টাকা হয়। বলা আবশ্যক যে ইহা খোসা সমেত বীজ। খোসা ছাড়ান কেবল মাত্র শাঁসের মূল্য মণ করা প্রায় ৮৲ টাকা হইবে। স্থানীয় গরিবলোকেরা আনিয়া অনেক সময় সস্তাদরে কাঁচা বীজ ক্রয় করিয়া উহা ভাজিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে। তাহাতে কতক পরিমাণে মুনাফা থাকে। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাদাম ফলে এক প্রকার প্রদাহ উৎপাদক তৈল

আছে। তাহার রাসায়নিক নাম কার্ডোল। তাপ দ্বারা ইহা বাহির করিয়া না লইলে বাদাম বীজ ভক্ষণোপযুক্ত হয় না। এই জন্তই ভাজিবার প্রথা। কাঁথি হিজলী বাদাম ব্যবসায়ের প্রাধান কেন্দ্র।

হিজলী বাদাম বৃক্ষ হইতে পাঁচ প্রকারের দ্রব্য পাওয়া যায়।—

১। রসাল পুষ্পবৃন্ত; ২। ফলের খোসার তৈল; ৩। শাঁষের তৈল; ৪। শাঁষ এবং ৫। আটা। আমরা ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটির গুণাবলী ও ব্যবহারাদি আলেচনা করিব ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সুপুষ্ট ফল বৃন্তের আস্বাদ অনেকটা অম্ল মধুর। বিশেষ পক্ক অবস্থায় মিষ্ট স্বাদই অধিক। ইহাতে যে কতক পরিমাণে শর্করা আছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে শতকরা কত অনুপাতে আছে তাহা এখনও পর্য্যন্ত ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। এপর্য্যন্ত এতদঞ্চলে কোন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু গোয়া প্রদেশে ইহা হইতে সুপ্রসিদ্ধ 'মেদিরা' মদ্যের ন্যায় এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা উক্ত অঞ্চলে ।০ আনা গ্যালন প্রায় ৫ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। আপাততঃ ইহার উপর কোন সরকারী শুল্ক বাসান হয় নাই। মেদিরা মদ্যের বিশেষ গুণ এই যে ইহা গ্রীষ্ম প্রধানদেশে যকৃতের কার্য্যের সহায়তা করে। যদ্যপি উক্ত মদ্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট মদ্য পুষ্পবৃন্ত হইতে এতদ্দেশে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহা হইলে যে বিশেষ লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ইহা হইতে কোন প্রকার অবিমিশ্র শর্করা প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি না ও ব্যবসার হিসাবে তাহা লাভজনক হয় কি না তাহাও পরীক্ষা যোগ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হিজলী বাদাম হইতে দুই প্রকার তৈল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ফলের খোসার তৈল। সাধারণতঃ ইহা উত্তাপ দ্বারা বহিষ্কৃত করা হয়। কাঁথি অঞ্চলে এই তৈল বাহির কারার প্রথা নিম্নরূপ। একটি বড় প্রশস্ত মুখ মৃত্তিকা পাত্রের উপরি ভাগে অর্থাৎ কানার নিকটে একটি ছিদ্র করা হয়। পরে উহাতে বাদাম ছাড়াইয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ জ্বাল দিলে প্রথমতঃ ধীরে ধীরে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত অধিক পরিমাণে তৈল বাহির হইতে থাকে। যখন বীজগুলি বাদামী রং ধারণ করে তখনই নামাইয়া ফেলা উচিত কিন্তু তাহা ঠিক হয় না। প্রায় বীজগুলির অল্প বিস্তর কাল রং হইয়া যায়। এই সময় পাত্র আস্তে আস্তে একদিকে হেলাইয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ তৈল ঢালিয়া লওয়া হয় এবং বীজগুলি শুষ্ক করিবার জন্য বালির উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ভর্জ্জিত বাদাম অল্প আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিয়াই ভিতরকার পাতলা পরদা ছাড়াইয়া আহার চলে।

উপরোক্ত প্রথায় যে সম্পূর্ণ পরিমাণে তৈল পাওয়া যায় না এবং তৈলেরও অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহাহউক এই খোশা তৈল অতি সাবধানে ব্যবহার করা আবশ্যক। ত্বকে লাগিলে ফোস্কা হইয়া চামড়া উঠিয়া যায়, এবং গলাধঃ-

করণ করিলে উদর প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহার রং পাকা বলিয়া ইহা ভেলার রংয়ের ন্যায় বস্ত্রে দাগ দেওয়ার কার্য্যে লাগিতে পারে। ইহার অন্যতম গুণ এই যে ইহার সংস্পর্শে আদৌ কীট আসে না। সুতরাং ইহা কীট নিবারক দ্রাবণ বার্ণিস ও রংরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাদ্রাজের কোন কোন স্থানে এই তৈলের সহিত দগ্ধ নারিকেল খোলা মিশ্রিত করিয়া নৌকারও নানা প্রকার কারুকার্য্যে বার্ণিসরূপে ব্যবহৃত হয়। এই তৈলে "কার্ডোল" নামক যে যৌগিক আছে তাহা এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় যে, মার্কিনের যুক্তরাজ্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকাদি বাঁধিবার কার্য্যে আইসে। তাহাতে কীট দ্বারা কাগজের অনিষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

হিজলী বাদামের দ্বিতীয় প্রকার তৈল শাঁষ হইতে উৎপাদিত হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার রং হরিদ্রাভ এবং দেখিতে অনেকটা সাধারণ বাদাম তৈলের ন্যায়। অন্যান্য গুণেও হিজলী বাদামের তৈল কয়েকটী বাদামের তৈল সমধর্ম্ম বিশিষ্ট। শাঁষে তৈলের মাত্রাও অত্যধিক। ওজনে ১০০ ভাগ শাঁষে ৪০ হইতে ৫০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলে হঠাৎ ইহা বাদামের তৈল বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান সময় আসল ফরাসী দেশীয় বাদাম তৈলের অথবা অন্যান্য বিদেশীয় স্থানের বাদাম তৈলের যেরূপ দর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে হিজলী বাদামের তৈল দ্বারা আসল বাদাম তৈলের কার্য্য হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক। তৈল বাহির করিয়া লইবার পর যে খৈল থাকে, তাহা কাঁথি অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর সন্দেশ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহাতে স্বাদের অনেক পরিমাণে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বোধহয় যে যথেষ্ট পরিমাণে পাইলে এই খোসার খৈল বিস্কুট প্রস্তুত কারকগণের বিশেষ কার্য্যে লাগিতে পারে।

তৈলের অনুপাত হইতে হিজলী বাদামের শাঁষ যে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে হিজলী বাদাম জন্মায় সেই সমুদয় স্থানের লোকেরা ইহাকে একটি উপাদেয় পদার্থ মনে করে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের তত্ত্ব-তল্লাসে "বীচা" একটা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। ঝোল, ঝাল ও চচ্চড়িতেও বাদাম ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতের প্রণালী হিসাবে যত সময়ে যে বাদাম হইতে প্রস্তুতীকৃত ভোজ্যাদি সুখাদ্য হয় তাহা বলা যায় না। অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে কিম্বা ফলের খোসার ও শাঁষের মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা উত্তমরূপে না ছাড়াইলে শাঁষের অল্প বিস্তর স্বাদের পার্থক্য হয়। ইউরোপীয়গণ সেইজন্য ভক্ষণের পূর্ব্বে ভাজা শাঁষ আর একবার ভাজিয়া লন। ফলতঃ যে প্রকারেরই ভোজ্যের সহিত ব্যবহৃত হউক না কেন হিজলী বাদামের ন্যায় পুষ্টিকর দ্রব্যের অধিক প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভাজিবার সময় শাঁষ যত পরিমাণে পুড়িয়া যায় তৈলজ পুষ্টিকর পদার্থের অনুপাতও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়।

বৎসরের সকল সময়েই হিজলী বাদামের গাছে এক প্রকার আঠা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মাধিক্যের সময় ইহার পরিমাণ অত্যধিক এবং বর্ষাধিক্যের সময় অত্যল্প। বৃক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র বিন্দু আকার হইতে বৃহৎ পিণ্ডাকার এই নির্য্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার রঙ ঈষৎ রক্তাভ ধূসর বর্ণ হইতে গাঢ় রক্তাভ ধূসর বর্ণ। জলে ইহা সামান্ত পরিমাণেই দ্রবনীয়, তজ্জন্য শিল্পকার্য্যে ইহার ব্যবহার অধিক পরিমাণে হওয়ার সম্ভব নাই। কিন্তু এই আঠারও কীট নাশক শক্তি বিদ্যমান থাকায় ইহার বিস্তৃত ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। জর্ম্মনী ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে এই আঠা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনুসন্ধান হইয়া থাকে। তাহাতে বোধহয় যে উক্ত দেশ সম্বন্ধে এই আঠা ব্যবহারিক কার্য্যের নিয়োগ করিবার কোন প্রকার পন্থা বাহির হইয়াছে।

হিজলী বাদামের ছাল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা চামড়া রং হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু কোনস্থানে এই রংয়ের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে বৃক্ষ হইতে একাধারে খাদ্য, তৈল, রঞ্জক পদার্থ ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়, এবং যাহার চাষে সার, জল ও পাইটের প্রয়োজনীয়তা অত্যল্প সেই বৃক্ষ উৎপাদনের পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নারিকেলের ন্যায় হিজলী বাদামের জমিতেও কিয়ৎপরিমাণে লবণ থাকা আবশ্যক। যে সমুদয় স্থলে নারিকেল জন্মাইয়া থাকে, সে সকল স্থানেই হিজলী বাদামের আবাদ হইতে পারে। বরং আদর্শ নারিকেলের জমি অপেক্ষা কম সারযুক্ত জমি হইলেও হিজলী বাদামের ক্ষতি হয় না। আপাততঃ কোন নর্শরী ওয়ালা হিজলী বাদামের কলম বিক্রয় করেন না কিন্তু সুপুষ্ট টাটকা বীজ হয়ত অনেকেই সরবরাহ করিতে পারেন। বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপনের প্রশস্ত সময়।

কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল।

পানা (পানীয়) বা সরবত

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সরবতের আদর খুবই দেখা যায়। এমন কি গ্রীষ্মকালে গরম দেশে সরবত ব্যবহার না করিলে চলে না। ধাতু ঠাণ্ডা রাখিতে সরবতের মত উপকারী পানীয় নাই বলিলেই হয়। লোণা জায়গায় ডাব প্রচুর জন্মে কিন্তু মিটেন জায়গায়ও গরম কম নহে বরং বেশী তথায় সরবত ভিন্ন গতি নাই। ভগবানের বিধানে কোন জায়গায় আয়োজনের ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে ডাবের জল পান করিতে না পাওয়া যায়, সেখানে তালের বা খেজুরের বা ইক্ষুরসে সরবতের তৃষ্ণা মিটান যাইতে পারে। এইগুলি সবই সুপেয় ও হিতকারী এই পানীয় ব্যবহারে দারুণ গ্রীষ্ম বিকারও কাটিয়া যায়। অম্লরসাত্মক ফলে অতি সুস্বাদু সরবত প্রস্তুত হইতে পারে। কাগজী ও পাতি লেবু, কমলা লেবু, আমড়া, কাঁচা আম, আঙ্গুর, বেদানা, দালিম, আনারস, কলা প্রভৃতি ফলগুলিকে অম্লরসাত্মক ফলের মধ্যে গণ্যকরা হইয়া থাকে। ফলের সরবতগুলি বড়ই স্নিগ্ধ মধুর এবং দেবভোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কেবলমাত্র ফলের রসে জল মিশ্রিত করিলেই সরবত হয় না। ফলের রসের সহিত চিনির রস মিশ্রিত করিতে হয় এবং আবশ্যক মত জল প্রয়োগেরও প্রয়োজন। সন্দেসের পাক যেমন যার তার হাতে উত্‌রায় না তেমনি যার তার দ্বারা ভাল সরবত প্রস্তুত হয় না। কোন কোন সরবতে অধিক ফলের রস মিশ্রিত করিতে হয়। কাঁচা আম পুড়াইয়া তাহার শাঁসের সহিত পাতীলেবুর রস ও চিনির রস মিশাইয়া যে সরবত প্রস্তুত হয় তাহা অতীব উপাদেয়। যিনি এই সরবত একবার পান করিয়াছেন, নাম শুনিলে গ্রীষ্মকালে উহা পানের জন্য তাঁহার রসনায় নিশ্চিতই রস সঞ্চার হইবে। আমপোড়া সরবত ব্যবহারে "লু" লাগা প্রভৃতি দারুণ গ্রীষ্ম বিকার অবিলম্বে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

পাকা আমের সরবত ভাল হয় না। পাকা আমামের রস শর্করা সংযোগে অতি উপাদেয়। ইহাকে, রসের গাঢ়ত্বের তারতম্য হিসাবে লেহ্য পেয় উভয়ই বলা যায়। যখন পাকা কিম্বা কাঁচা কোন আমই পাওয়া যায় না তখন আমাদার রসসংযোগে আমের সরবত

প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ময়রারা আমআদা দ্বারাই আমসন্দেশ তৈয়ারি করে। স্নিগ্ধত্বগুণে ফলসা কিম্বা টেপারির সরবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুই সরবত দুই চারি দিন উপর্য্যুপরি পান করিলে কফের সঞ্চার হয়। কালজামের সরবত পরম হিতকারী। আনারসের সরবতের মত ইহা পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর, ক্রিমী নষ্ট হইয়া রক্ত পরিষ্কার হয়। বনে বঁইচ প্রচুর জন্মে। বালক বালিকার ইহা অতি মুখ প্রিয়। ইহারও সুপেয় সরবত হইতে পারে। কাঁচা কুলের সরবত হয় না কিন্তু পাকা পুরাতন দেশী কুলের বেশ ভাল সরবত হয়। কাঁচা, পাকা, পুরাতন তেঁতুলের সরবত সকলের নিকট সুপরিচিত, ইহা বড় স্নিগ্ধকারী। পুরাতন তেঁতুলের সরবত অম্লবিকার কিম্বা কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগ উপশমনার্থ কবিরাজগণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সরবত প্রস্তুতের খরচ এমন কিছু অধিক নহে। দুই চারি পয়সা খরচ করিয়া বিশেষ বিশেষ সরবত ব্যবহার করিলে অনেক সময় হাজার টাকার ব্যায়ারাম সারিয়া যাইতে পারে। অম্লাস্বাদ নাই বলিলেই হয় এমন ফলেরও সরবত হইতে পারে। তরমুজ, খরমুজা, ফুটীর সরবত সকলেরই রসনায় পরম উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইবে। এই সকল ফলে যদি বা কিঞ্চিৎ অম্লাস্বাদ থাকে কিন্তু বেল, কিম্বা কাঁটালি জাতীয় মিষ্ট কলার অম্লত্ব অতি বিরল। তাহাতেও সুন্দর সরবত হয়।

কাঁটালের সরবত হয় না কিন্তু কাঁটালের রস ক্ষীর ও শর্করা সংযোগে অতি সুপেয়। ক্ষীরের মালাই বরফ সংযোগে যেমন পরম লোভনীয় লেহ্য, কাঁটালের মালাই তদপেক্ষা লোভনীয়, লিচু, গোলাপজাম বা লকেটের সরবত হয় না, কষ্ট কল্পনা করিলেও ভাল হয় না। পীচের কিন্তু ভাল সরবত হয়। দেশী আমড়া ও আমলকীর সরবত অতি উপকারী ও অতি সুপেয়।

কাঁচা বেলের সরবত হয় না কিন্তু পাকা বেলের অতি সুঘ্রাণ সুপেয় সরবত হয় এবং ইহার সহিত দধি গোলাপজল সংযোগ করিলে অতি অপূর্ব্ব সরবত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাট্‌কা ফলের সরবতের কথা বলা হইল কিন্তু শুষ্ক ফলেরও সরবত হইতে পারে। আলুবোখারা, মনাক্কা, কিস্‌মিস, শুষ্ক খেজুর, খোবানি প্রভৃতির সরবত অতি প্রসিদ্ধ। ফলগুলি গুঁড়াইয়া বা বাটিয়া ইহাদের সরবত বানাইতে হয়। পেস্তা বাদামের সরবত অতিশয় বলকারক এবং স্নিগ্ধ মধুর। সরবত করিবার জন্য পেস্তা বাদামও বাটিয়া লইতে হইবে।

সরবতের কথা লিখিতে বসিয়া আমরা সুধু ফলের সরবতের বিষয় বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলে সরবত পর্ব্বের একটা স্থানে খালি থাকিয়া যায়। সেটী সরবতের শীর্ষস্থান। এই স্থানটি ঘোলদ্বারা অধিকৃত। আবাল বৃদ্ধ বনিতার পক্ষে এমন সুপেয় সুপথ্য পানীয় আর দ্বিতীয় নাই। ঘোল দুই রকমে প্রস্তুত হইতে পারে। টাট্‌কা দুগ্ধ মন্থন করিয়া তাহা হইতে ননী তুলিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এক রকম ঘোল। আবার দুগ্ধকে

দধিতে পরিণত করিয়া সেই দধি মন্থন দ্বারা মাখন তুলিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও এক রকম ঘোল। ঘোলের সরবত শর্করা ও পাতীলেবুর রস সংযোগে নিরতিশয় সুপেয়। ঘোল পরম হিতকারী যে সংসারে নিত্য ঘোলের ব্যবহার আছে সে সংসারে সহজে বার্দ্ধক্য ঘেঁসিতে পারে না।

শুষ্ক বা ঝুনা নারিকেল বাটিয়া তাহা হইতেও ঘোল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাও পরম হিতকারী পেয় এবং গুণে গন্ধে অনেকটা গাভী দুগ্ধোৎপন্ন ঘোলেরই মত। শুষ্ক নারিকেলের রস দেখিতে অবিকল দুগ্ধের মত এবং ইহাকে নারিকেলের দুধ বলে। নারিকেল দুগ্ধ হইতে গাভী দুগ্ধের মত ননী মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। কাবুলী বাদাম হইতেও ঘোল ও অনুরূপ খাদ্য পদার্থগুলি উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

ফলের দুধের যেমন সরবত হয় ফুলেরও তেমনি সরবত হয়। গোলাপ ফুলের পাতা চূর্ণ দিয়া চিনির রসের সহিত উত্তম গোলাপী সরবত প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। এই সরবত পানে পেটের ময়লা কাটিয়া যায়। মানুষের যত কিছু রোগের কেন্দ্রস্থল পাকস্থলী। ভুঁড়ী পরিষ্কার থাকিলে মুড়ীও (মস্তক) পরিষ্কার থাকে। কেঁয়া ফুলের আরক কেওড়া দিয়াও সুপেয় সরবত প্রস্তুত করা বিচিত্র নহে। চিনির রসে বেল, জুঁই, পদ্ম প্রভৃতি ফুলের গন্ধ ধরান অতি সহজেই যায় কিন্তু সরবতে গোলাপ গন্ধটাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর বলিয়া মনে হয়।

——*——

সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা—ডায়মণ্ডহারবার হইতে সুদূর দক্ষিণে হুগলী ও মাতালা নদীদ্বয়ের মহানায় মধ্যস্থলে যে বিস্তৃত ভূমিভাগ অবস্থিত তাহা সাগরদ্বীপ নামে খ্যাত। বঙ্গোপসাগর হইতে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে গেলে এই ভূখণ্ডেই সর্ব্বাগ্রে নাবিকগণের নজর পড়ে। ইহার অধিকংশই এক কালে জঙ্গলাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র ও বরাহের আবাসভূমি ছিল। গভর্ণমেণ্টের একটি বাতিঘর এবং বাৎসরিক গঙ্গসাগর সমাগম ভিন্ন লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। বাতিঘরে যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইত তাঁহারা কি দিবসে কিম্বা রাত্রে কোন সময়েই বাঘের ভয়ে বাহিরে আসিতে সাহস করিতেন না। এক্ষণে সাগর দ্বীপের বন অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে, বহু বিস্তৃত ভূমিতে রীতিমত চাষাবাদ হইতেছে, লোকের বসতি হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। লোকে ধান্যাবাদের সময় যাইয়া তথায় কিয়ৎদ্দিন বাসও করে এবং আবাদ উঠিয়া গেলে চলিয়া আসে এবং পুনরায় ধান কাটিয়া ও ঝাড়িয়া মাড়িয়া লইয়া আনিবার জন্য যায়। এতদঞ্চল হইতে ধান খড় বহিয়া আনা বড় কষ্টকর। নৌকা ভিন্ন গতি নাই; নদীর মহানায় খালের মধ্যে নৌকা চালানও কষ্টসাধ্য; তদুপরি আবার ফাল্গুনমাস হইতে যেরূপ জোর বাতাস চলে যে নৌকা ও মাল রক্ষা করা নিতান্ত বিপদজনক। বৈশাখের ঝড় বাতাসের দিনের ত কথাই নাই। বড়ই সন্তোষের বিষয় এই যে ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড দক্ষিণ ধবলাট হইতে কচুবেড়িয়া (কাকুদ্বীপ ফেরিঘাট পর্য্যন্ত) একটা রাস্তা নির্ম্মাণের

মঞ্জুর করিতেছেন। রাস্তাটি কাঁচা রাস্তা হইবে এবং ইহাতেই আনুমানিক ২৫,০০০, টাকা ব্যয় পড়িবে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বলিতেছেন যে, যে জমির উপর দিয়া এই রাস্তা যাইবে সেই সেই জমির সত্বাধিকারীদিগকে জমি বিনামূল্যে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এই সর্ত্ত আমাদের নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয় না, কেন না ইহাতে ভূম্যাধিকারীগণের লাভই ষোল আনা, কারণ তাঁহারাই তাঁহাদের মালপত্র আনিবার বিশেষ সুবিধা উপভোগ করিবেন। গতায়াতের রাস্তার সুবিধা পাইলে আরও অধিক প্রজা এতদঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ঝুঁকিবে এবং জমিদারের জমি দরে বিলি হইবে। যাঁহার জমির উপর দিয়া রাস্তা যাইবে তিনিই যে কেবল উপকৃত হইবেন এমন নহে, পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যাধিকারীগণও সমানভাবে লাভবান হইবেন, সুতরাং তাঁহাদেরও উচিত তাঁহাদের জমি হইতে যাঁহাদের জমি রাস্তায় পড়িতেছে তাঁহাদের কতক ক্ষতিপুরণ করা।

কাকদ্বীপ হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত রাস্তা এক রকম চলতি অবস্থায় আছে। এই রাস্তারও কিন্তু সংস্কার আবশ্যক। এই রাস্তার নাম কুলপী চ্যানালক্রীক রোড। কচুবেড়ে হইতে ধবলাট পর্য্যন্ত এই রাস্তার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। মড়িগঙ্গা খালের ধারের জায়গা ছাড়িয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে শীঘ্রই আবেদন করা হইবে। ধবলাটের জায়গার জন্য কলিকাতা শিকদার পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু লালবিহারী দত্তকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনিও এই জায়গা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত আছেন।

ডায়মণ্ড হারবার হইতে সরাসর কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে ধবলাট পর্য্যন্ত রাস্তার কল্পনাতেও আনন্দ হয়, কারণ রাস্তাটি কাজে পরিণত হইলে অনেকের অনেক সুবিধা হইবে। অধিকন্তু যদি আবার ডায়মণ্ড হারবার রেলটি কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত আপাততঃ বাড়াইয়া লওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে যদি সেইটি সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত পৌছে তবে সোণায় সোহাগা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধবলাটও সাগর দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র খাল ব্যবধান।

সুধু চাষাদের সুবিধা এমন নহে, বঙ্গোপসাগরের কুলে লোকের বসবাসের মত কতকটা স্থান মিলিলে বাঙ্গালায় এতদঞ্চলের লোকেরা সাগর উপকূলে স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া সুখী হইবেন এবং কালে এইস্থানে পুরী চট্টগ্রাম হইতে উৎকৃষ্টতর স্থান যে না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

এই খালটিমাত্র পার হইলে লোকে এই স্থান হইতে স্থলপথেই কলিকাতাভিমুখে আসিতে পারিবে, তাহাকে আর জল পথের আশ্রয় লইতে হইবে না।

দারিদ্র্য ও কৃষির দুরবস্থা—বাংলা-গবর্ণমেণ্ট আর্থিক দুর্দ্দশাজনিত জীবনীশক্তির হ্রাস ও কৃষির দুরবস্থা, অত্যধিক মৃত্যুর এই দুটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, দেশের লোক বড় গরীব, চাষের উপরই তাদের প্রধান নির্ভর, ১৯১৫ সালে চাষ নানা কারণে অনেক জায়গায় ভাল না হওয়ায়, লোক মরিয়াছে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা এই দারিদ্র্যের কথাটা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে বা বলিতে দিতে চান না। অন্নাভাবে বা অন্নকষ্টে কেহ মরিয়াছে, তাহাও স্বীকার পারত পক্ষে করেন না; বলেন উদরাময়ে বা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় বা আর কোন রকমে মরিয়াছে। কিন্তু উদরাময়টা হয় কেন? হৃৎপিণ্ডের কাজই বা থামে কেন? অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা কি কারণ হইতে পারে না?

আর্থিক দুরাবস্থাবশতঃ লোকের জীবনীশক্তির হ্রাস বন্ধ করিতে হইলে, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা দিয়া এবং নানা উপায়ে পুরাতন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা লোকের কৃষি ছাড়া অন্য উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে। তা ছাড়া কৃষিরও উন্নতি করা চাই। আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে কত কৃষিকলেজ, কৃষির কত উচ্চ মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া চাই। কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। খাল প্রভৃতি খনন করা আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় যে এত দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, কিন্তু পুরাতন খালের সংস্কার বা নূতন খালের খনন কোথাও সরকার বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড করিয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই। বাঁধ বন্ধন হইয়াছে বটে, তাহা প্রশংসনীয়। প্রবাসী।

আলুর চাষ। শ্রীরাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রাজেন্দ্র বাবু বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ও "কৃষি-কার্য্য" ও "কৃষি-প্রবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। বর্ত্তমান পুস্তিকার উদ্দেশ্য বোধহয় স্বল্প মূল্যে জন সাধারণকে আলু চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা। পুস্তিকার মূল্য দুই আনা মাত্র এবং ১৩ পৃষ্ঠার মধ্যে আলুর জাতি, বীজ, জমি, সার, পাইট প্রভৃতি ১৫টি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে এবং আমরা আশা করি যে কৃষি উৎসাহী ব্যক্তি বর্গের নিকট পুস্তিকা খানি আদরনীয় হইবে। কিন্তু দুই একটি বিষয়ে গ্রন্থকার সমীচীনতা প্রকাশ করেন নাই। এত ক্ষুদ্র পুস্তকে কৃষি ক্ষেত্রের ফলা ফলের তালিকা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ, না দিয়া পাইট সম্বন্ধে আরও ২।১টি আবশ্যকীয় কথা বলিলে ভাল হইত। ভবিষ্যত সংস্করণে আশা করি গ্রন্থকার 'বালিসা', 'সবজীসার' "সমান্তরাল গুলি', আলু 'বোনা,' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সাধারণ প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিবেন।

"রেশম শিল্পের উন্নতি কল্পে তুঁত দ্বারা রেশম কীট জাতি সম্বন্ধে পরীক্ষার প্রথম বিবরনী"—ভারত গবর্ণমেণ্টের কীট তত্ত্ববিদের সহকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে প্রণীত। ইহা পুষা কৃষি তত্ত্বানুসন্ধানাগার হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরাজি বুলেটিনের বঙ্গানুবাদ। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতে পারি না, তবে আমাদের বোধ হয় যে কোন ইংরাজী বিবরনীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশকরার প্রধানতম উদ্দেশ্য এই যে উহা দেশীয় জনসাধারণের পাঠ যোগ্য হইবে। কিন্তু তালিকা, অঙ্ক ও বৈজ্ঞানিক খুঁটি নাটিতে বঙ্গানুবাদ পরিপূর্ণ করিয়া দিলে তাহা আর লোক রঞ্জন হয় না। যাঁহারা যেরূপ পুংঙ্খানু পংঙ্খনুরূপে পরীক্ষা সমূহের বিবরণ জানিতে চান তাঁহারাত ইরাজি বিবরনী পাঠ করিবেনই। সাধারণলোকে চায় সহজ ভাষায় পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির বিবরণ। তাহা না দিতে পারিলে বঙ্গানুবাদের চরম উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া গেল।

রেশম কীট সম্বন্ধে পরীক্ষা এখনও চলিতেছে। সে সমুদয়ের শেষ ফল প্রকাশ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। বর্ত্তমান পুস্তকে প্রাথমিক পরীক্ষা সমূহই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পরীক্ষাদির বিবরণ প্রভৃতি না দিয়া স্থূলতঃ পরীক্ষা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষগণ যে কয়েকটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

(১) দেশী বর্ষবহুজনমক্ষম বর্ণসঙ্কর কীট, দেশী বর্ণ শুদ্ধ কীট অপেক্ষা অধিক রেশম প্রদান করে।

(২) একই জাতীয় স্থানীয় কীটের সহিত ঐ জাতীয় স্থানান্তার হইতে আনীত কীটের সংসর্গে যে ডিম ও পলু উৎপন্ন হয় তাহা বিশুদ্ধ স্থানীয় কীট হইতে অধিক রোগ-সহসক্ষম হয় ও বলবান হয়।

(৩) মহীশূরজাত রেশমকীট দেশীয় অন্যান্য কীট অপেক্ষা বৃহত্তর ডিম্ব ও অধিকতর রেশম প্রদান করে।

(৪) সকল জাতীয় রেশম কীটই বড়তুঁতের পাতা খাইলে বড় ডিম্ব ও অধিকতর রেশম প্রদাম করে। ছোট তুঁতের পাতার ডিম্বের আকৃতি ছোট হয় ও রেশম কম হয়।

(৫) প্রথমে কিছু দিনের জন্য বিদেশ হইতে আনীত ডিম্ব শীত খাওয়াইয়া পালন করা উচিত।

(৬) বর্ণশুদ্ধ বর্ষ একজনম জাতি অপেক্ষা ইতালী ও জাপানের বর্ষ একজাতীয় প্রজাপতির সংসর্গে উৎপাদিত বর্ণ সঙ্কর জাতি উৎকৃষ্টতর ফল প্রদান করে।

(৭) পলু বাহিরে তুঁতগাছে বাগিচার মধ্যে পালন করিলে গুটি কিছু ছোট হয় ও রেশমও কম হয় বটে, কিন্তু প্রজাপতিগুলি সুপুষ্ট হয় ও ভাল ডিম পাড়ে এবং ঐ ডিম হইতে উত্তম ফল পওয়া যায়; কিন্তু বাহিরে পলু পালনের খরচ অনেক।

পুস্তকখানিতে রেশম চাষীগণের জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। স্থানাভাবে আমরা তৎসমুদয় এস্থলে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার রেশম বিশেষজ্ঞ এবং তাহার ইংরাজি পুস্তকাদিতে তাঁহার গবেষনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বর্ত্তমান অনুবাদে ভাষা অনেক স্থলেই দুর্ব্বোধ্য এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও স্থান বিশেষে আদৌ সুখ-পাঠ্য অথবা সঠিক হয় নাই। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে সাধারণ রেশম চাষীর জন্য এরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন নাই। পড়িলে অথবা পড়িয়া বুঝিতে পারিলে তাহাদের যে উপকার দর্শিবে না তাহা নহে; তবে উক্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন ইহা পড়ে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালা কৃষি সাহিত্য হিসাবে এরূপ পুস্তকের কতকটা সার্থকতা আছে তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। ভবিষ্যতে এইরূপ পুস্তক প্রনয়নে আশা করি গ্রন্থকার সহজবোধ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিবেন।

অজয়ের বন্যা—

অজয়ের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ এখন সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। প্রথম বন্যায় ধানের তত ক্ষতি হয় নাই—জল সরিয়া গেলে ধান আবার গজাইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় বন্যায় ধানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সরকার সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্যদান করিতেছেন। বর্দ্ধমান জিলায় সরকার কৃষি-ঋণ বাবদে সত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন—এককালীন দান বাবদেও প্রায় পনের হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কাটোয়ায় ও কেতুগ্রামে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা ও তেত্রিশ শত টাকার চাউল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্য-প্রার্থীদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

(১) কৃষিঋণপ্রার্থী। ইহাদিগকে সরকারী ঋণ দান করা হইতেছে। তাহাতেই তাহারা জীবনধারণ করিতে ও ভগ্ন গৃহ নির্ম্মিত করিতে পারিবে।

(২) বৃদ্ধ, বিধবা, শিশু, স্থবির প্রভৃতি যাহারা বন্যায় গৃহহীন হইয়াছে। ইহাদিগকে সরকারী এককালীন অর্থদান করা হইতেছে।

(৩) ভূমিশূন্য শ্রমজীবী। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। কারণ, সরকারী নিয়মে ইহারা কৃষিঋণ পাইতে পারে না; কার্য্যক্ষম বলিয়া ইহারা এককালীন দানেও বঞ্চিত কাজেই ইহারা দেশের লোকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। . . .

বাঁকুড়ায় অন্নাভাব—

রিলিফের কার্য্য এখনও চলিতেছে, প্রলয়োপযোগী ঝড় বাতাসে এখানে ক্ষতির উপর ক্ষতি হইয়াছে,—ছেদনোপযোগী আশু ধান্য ও আশ্বিন পক কেলেশধান্য ওতপ্রোত আঁছাড় দিয়া জলপূর্ণ কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে প্রোথিত হইয়াছে এবং শেষ ভাদ্রে রোপিত আমন ধান্যগুচ্ছে যে দুই একটি চারা সজীব হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা ক্রমাগত দুইবারে ৫।৬দিন ডুবাইয়া রাখিয়া পচাইয়া দিয়াছে। আশু ও আশ্বিনপক ধান্য গৃহজাত করিতে পাইলে কৃষিজীবীদিগের অন্ততঃ মাসত্রয় গুজরাণের সংস্থান হইত; তাহাতে বঞ্চিত হইয়া সাশ্রু নয়নে তাহারা বিচালি কাটিয়া ভগ্ন গৃহে আসিতেছে মাত্র।

পত্রাদি

সর্প দংশনের ঔষধ—

শ্রীনফরদাস রায়, বহরমপুর, বেঙ্গল।

সঞ্জীবনী পত্রে প্রকাশ হিজলীর বাদামের মত কোন ফল সর্প দংশনের ঔষধ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলীতে হিজলীর বাদাম বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবশ্যই মনে পড়িতে পারে। সেই বাদামের কেমন আশ্চর্য্য শক্তি দেখুন। উক্ত বাদাম বৃক্ষগুলি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলী কাঁথী মহকুমায় বঙ্গোপসাগরের অনতিদূরে বালুকাময়স্থানে আম্রবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে গ্রীষ্মারম্ভে ইহার ফল সুপক হইয়া পথিকগণের ক্ষুধা পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। উক্ত ফলের নিম্নদেশে যে বীজটী সংলগ্ন থাকে, তাহার অভ্যন্তরের সারাংশটী বিশেষ উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আর খোলার রস রেড়ীর তৈলের ন্যায় প্রদীপে জ্বলিয়া থাকে এবং লিখিত হইয়াছে যে একজন সন্ন্যাসীকে একটী তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পে দংশন করিলে এই ফল ৩০।৪০ টী খাইয়া এক প্রহর মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

যদি ইহা সত্য হয় তবে ইহার গাছ যথা তথা থাকা আবশ্য। মহাশয়দিগের দ্বারায় ইহার বীজ ইতঃস্তত ছড়াইয়া পড়িতে পারে কি না ও বীজের মূল্য লিখিলে বাধিত হইব।

উত্তর—বর্ত্তমান সংখ্যা কৃষকে হিজলী বাদাম সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই ফলের তৎকথিত গুণের বহুল পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চারা জন্মাইবার জন্য ইহার বীজ পাওয়া যায়। বীজের মূল্য ১০০ শত এক টাকায় কলিকাতা ভারতীয় কৃষিসমিতির কৃষক আফিসে পত্র লিখিলে পাইবেন।

নাইট্রেট অব লাইম সার—

শ্রীমহাম্মদ সোলেমান, বান্দিগড়, পোঃ বসন্তনগর দিনাজপুর।

প্রশ্ন—নাইট্রেট অব লাইম সার ইক্ষু আলুতে কি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয় এবং সরিষা কলাই প্রভৃতি রবিশস্য চাষে ব্যবহার চলে কি না?

উত্তর—সাধারণতঃ আলু কিম্বা ইক্ষু ক্ষেতে বিঘা প্রতি ১/০ মণ হিসাবে এই সার ব্যবহারই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ ফসলের জন্য কেবল মাত্র এই সার একৈক ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। আলুর ক্ষেতে আবশ্যক মত খৈলের সহিত এবং ইক্ষুর ক্ষেতে প্রথমে ক্ষেত তৈয়ারি করিবার সময় মাটি ছড়াইয়া লইয়া ইক্ষু চারা জন্মিলে গোড়ায় মাটি দিবার সময় নাইট্রেট অব লাইম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রবিখন্দে পটাস সার প্রয়োগ আবশ্যক, নাইট্রেট সারের প্রয়োজন নাই।

ইক্ষু ও খর্জ্জুর চিনি প্রস্তুত প্রণালী—

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস, তাড়গাঁও পোঃ মহারাজগঞ্জ।

প্রশ্ন—ইক্ষু ও খর্জ্জুর চিনি প্রস্তুত সম্বন্ধে জানিতে চান ও কৃষকে বিস্তৃত আলোচনা করিতে বলেন।

উত্তর—ইক্ষু ও খর্জ্জুর চাষ সম্বন্ধে কৃষকে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে। আবশ্যকানুযায়ী খবরগুলি সংক্ষেপে "কৃষকেই" পাইবেন।

বঙ্গে চিনি গুড়ের ব্যবসা—

সে দিবস ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে মাননীয় সভ্য শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গের চিনি, গুড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্টের কৃষিরসায়নবিৎ পণ্ডিত মিঃ আনেট ইক্ষু ও খেজুর বৃক্ষের তত্ত্বানুসন্ধান জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। ১৯১৩—১৪ খৃঃ অব্দে ২১৮৩০০ একর ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল; ১৯১৪—১৫ খৃঃ অব্দে ২৩৩৪০০ একর এবং ১৯১৫—১৬ খৃষ্টাব্দে ২৩৩৫০০ একর ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। অনেক খেজুর গাছ ইতিপূর্ব্বে কাটা হইত না যাহাতে সকল গাছ হইতেই গুড় উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। মিঃ আনেট তাল গাছের রস হইতেও গুড় প্রস্তুত করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

উদ্ভিদ্দানুরোগ

ধানের কৃমিরোগ পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থান বিশেষতঃ ঢাকা, ত্রিপুরা নোয়াখালি জেলায় এক নূতন উৎকট রোগে ধান প্রতিবৎসর অনেক পরিমাণে মরিয়া যাইতেছে এবং এজন্য কৃষকের দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া এই রোগের কারণ জানা গিয়াছে।

এই রোগের কারণ, অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার কৃমি (কেঁচো) ইংরাজীতে ইহাকে ইল্ওয়ার্ম (Eelworm) কহে। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলার স্থানীয় লোক এই ব্যাধিকে উফ্রা এবং ঢাকা জেলায় ডাক বা থোরমরা কহে।

সরকারী উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ মহাশয় এই কৃমির জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ ভালরূপ জানিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। এই রোগসম্বন্ধে সকল তথ্য এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এই সকল জানিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই রোগ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে পারা যাইবে এরূপ আশা করা যায়। এখন ইহার বিষয় যতদূর জানা গিয়াছে এবং উপস্থিত যে সকল উপায় এই রোগ নিবারণের জন্য যে সকল পরীক্ষা নোয়াখালি, কুমিল্লা এবং ঢাকার নানা স্থানে করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের ফলাফল দেখিয়া প্রয়োজনমত কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

এই কৃমিরোগ ধান বপনের ৪।৫ মাস পর আষাঢ় মাসে এবং কোথায় ভাদ্র মাসে ধানে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। প্রথমে নীচু জমির আউস ধানে যেখানে জল থাকে এইরূপ ক্ষেতের আমন ধানে রোগ বিস্তার করে এমন কি যে সকল রোয়া আমন জমিতে জল থাকে ঐরূপ আমনও নষ্ট করে। এই কৃমিরোগ প্রথমে ধানক্ষেতের মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে সেইজন্য আক্রান্ত স্থান সমূহের চারিদিকে কোন কোন গাছ নীরোগ দেখা যায়। কোন কোন মাঠে ক্ষতির পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের বেশী দেখা যায় নাই আবার কোথাও কোন মাঠের সমস্ত ধানই নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। বোনা আমন ধান অধিক দিনে হয় বলিয়া এই রোগ বাড়িবার সময় পায় এবং সেই কারণে এই ধানের আউস ধান অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশী ক্ষতি হয়।

এই রোগের প্রারম্ভেই গাছের আগা শুখাইতে আরম্ভ করে এবং কচি ডগা ও শীষগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়। গাছ আক্রান্ত হইবার পরই কচি পাতা, ডগা এমন কি শীষের স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ নষ্ট হয় এবং অল্প লাল বাদামে রং ধারণ করে, এবং ক্রমে ক্রমে ধান গাছের অগ্রভাগ স্বাভাবিক হইতে বেশী ফুলিয়া যায় অর্থাৎ থোরটা বাহির হইতে পারে না, হঠাৎ ভিতরে আটকাইয়া যায় সেইজন্যই অনেক স্থানে ইহাকে থোরমরা বলে।

এই কৃমি এত ক্ষুদ্র যে ইহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কৃমিগুলিকে ধান গাছের উপরের কচি ডগার নিকটবর্ত্তী স্থানে নরম পাতার ভিতরে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য খালি চক্ষুতে ইহাদিগকে দেখা যায় না। ডাঁটার কাল দাগবিশিষ্ট অংশে এবং শীষের ভিতরেও পাওয়া যায়। শীষে যে সকল ক্ষুত্র ক্ষুত্র পাতা বীজগুলিকে ঢাকিয়া রাখে বীজ বড় হইবার পূর্ব্বে ইহারা সেই সকল বীজ আবরণের পাতার ভিতর লুকাইয়া থাকে। শীষের ভিতরই ইহারা অধিক জন্মে। বীজ বড় হইলেও ইহারা বীজ আবরণ পাতার ভিতরই বীজের চারিদিকে থাকে।

প্রত্যেক কৃমি এত ক্ষুদ্র যে সচরাচর ইহারা লম্বায় এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও ছোট এবং ইহার পরিসর এক ইঞ্চির পনর শত ভাগের এক অংশ হইতে পারে। যখন অনেকগুলি এক জায়গায় জমা হয় তখন কতকটা সাদা সূতারমত দেখা যায়।

পূর্ণ বয়স্ক পুং ও স্ত্রী জাতীয় কৃমি এবং অপূর্ণ বয়স্ক কৃমি এবং ডিম সকলই সচরাচর একত্রে মিশিয়া থাকে। ইহাদের মুখে একটী অতি ক্ষুদ্র সুঙ্গ আছে এবং খাইবার সময় ইহা বাহির করিতে এবং ঢুকাইয়া লইতে পারে গলনালীতে মাংসপেশী একটী গোলাকার থলি আছে, ইহার সঞ্চালনে কচি পাতা, ডগা কি শীষের পেশীগুলিতে ঐ সুঙ্গদ্বারা প্রবেশ করিয়া রস চুষিয়া লয়।

অন্যান্য কীটের মত ইহারা ধান গাছের পাতা, ডগা কি শীষ কাটিয়া খায় না। শুধু অতি কোমল পাতা, ডগার কি শীষের রসটুকু খাইয়া ফেলিলে গাছের থোর বাহির হইতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে শুখাইয়া মরিয়া যায়, আর যদি ফুল বাহির হইবার পর গাছ আক্রমণ করে তবে ধান চিটা হইয়া যায় এবং এই চিটার ভিতরও অসংখ্য কৃমি পাওয়া যায়। গাছগুলি এইরূপভাবে আক্রান্ত হইলে থোর শুখাইয়া মরিয়া যায়। যখন কোন গাছ এইরূপভাবে মরিতে থাকে এ সময় বর্ষাকাল বলিয়াই আকাশে মেঘের গর্জ্জন হইতে থাকে এবং লোকে মনে করে যে মেঘের ডাকেই ধান গাছ মারিয়া যায় এই জন্যই ইহাকে ঢাকার অঞ্চলে ডাক এবং নোয়াখালির দিকে উফ্রা কহে। কারণ মেঘের ডাক উপরে হয়।

অনেক সময় ধানগাছের শীষটী বাহির না হইয়া আবদ্ধ অবস্থাতেই ধান কাটার সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় এবং সেই সময় দেখা যায় যে পাতার পেটের মধ্যে অপরিপুষ্ট শীষ বা থোরটী রহিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উহা পচিয়া গিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং পরে উহার উপর ছাতা ধরিয়া থাকে।

নোয়াখালির অঞ্চলে ধান বাহির হইলে পর গাছ যখন এই কৃমিদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ধান চিটা হইয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে স্থানীয় লোক পাফ উফ্রা কহে এবং থোর আটকাইয়া গেলে ইহাকে থোর উফ্রা কহে। থোরের আবরণটী ক্রমে শুখাইয়া

যায় এবং আবরণ পাতাগুলি খুলিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে ডাঁটার ডগের দিকের গিঁট সকলের ঠিক উপরে ঈষৎ কাল রং হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ শীষের গোড়া এবং তাহারই নীচের পাঁপটীর গোড়ার এই অবস্থা।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সামান্য লক্ষণও সময় সময় বর্ত্তমান থাকে কিন্তু উপরি উক্ত চিহ্নগুলিই এই রোগের বাহ্যিক বিশেষ লক্ষণ।

স্ত্রী কৃমিগুলি কি পরিমাণ ডিম পাড়ে এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। ডাক্তার বাটলার সাহেব বলেন "সম্ভবতঃ ৫০ হইতে ১০২টী হইবে। গমের কৃমি টাইলেন্‌কাস টি্টিসাই প্রায় ২০০০ ডিম পাড়ে। ধানের এই কৃমি যদ্যপি ১০০টী করিয়াও ডিম পাড়ে এবং ঐ সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধেক পুং ও অর্দ্ধেক স্ত্রী কৃমি হয় তবে তিন পুরুষেই এক জোড়া কৃমির বংশ প্রায় আড়াই লক্ষ হয়।

ধান গাছের যে অংশ মাটীর উপরে থাকে কৃমিগুলিকে কেবল সেই অংশেই দেখা গিয়াছে। ইহারা পাতার পেটের ভিতরে থাকিয়া গুটান পাতার কিনারা দিয়া থোরের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করে। ধান গাছের শিকড়ে কিম্বা মৃত্তিকায় এ কৃমি এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! যে ক্ষেতে এ রোগ লাগে সেই ক্ষেতের শুষ্ক নাড়ার মধ্যে এই কৃমি পাওয়া যায় এবং ১৫ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবাইয়া রাখিলে ইহারা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং জল বেশী পরিষ্কার না হইলে ৪ মাসের অধিক একটীও বাঁচিয়া থাকে না। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কৃমিগুলি গতিশীল থাকে এবং মোচড়ান পাক দিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া জলে দ্রুত চলাচল করিতে থাকে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহাদের গতিশক্তি হ্রাস পায় এবং তখন কুণ্ডলী হইয়া ধানের শীষে, নাড়ার ভিতরে এবং চিটা ধানে বাস করে। মাঠে জল না আসা পর্য্যন্ত ইহাদের চলাচল সম্ভবপর হয় না। কেবল বর্ষার সময় এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের মধ্যে কতবার ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এ পর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই তবে ডাক্তার বাটলার বলেন তিন বারের কম নয়।

অনুসন্ধানদ্বারা যতদুর জানা গিয়াছে এই অনিষ্টকারী কৃমি কেবল সজীব ধান গাছ ছাড়া অন্য কিছু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না।

ধান যখন জন্মে না তখন ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না এবং ইহারা আহারও করে না। ধান পাকিবার পর ইহারা কুণ্ডলী হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং জলের মধ্য দিয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি পীড়িত ধান গাছ ও ভাল ধান গাছের গোড়া জলে যোগ করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে ইহারা পীড়িত গাছ হইতে বাহির হইয়া জলে সাঁতরাইয়া ভাল ধান গাছ আক্রমণ করে এবং ডগের পত্র কোরকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাল গাছ পূর্ব্বমত মারিয়া ফেলে। ইহাদের ঐ সূক্ষ্ম শুঙ্গদ্বারা ধান গাছের স্থূল আবরণ ভেদ করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত,

এই কারণেই বোধ হয় ডাঁটা, শীষ, পাতা ইত্যাদির নরম অংশ ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

যে ধান গভীর জলে জন্মে তাহাই এই রোগে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় আউস, আমন এমন কি রোয়া আমন ধানে যে সকল ক্ষেতে জল থাকে এই রোগ সেই ক্ষেতেরই ধান আক্রমণ করে। ঢাকা জেলায় এ পর্য্যন্ত নীচু জমির আমন ধান ব্যতীত আর কোনও ধান এই রোগে মরিতে দেখা যায় নাই।

এই রোগ নিবারণের যে সকল উপায় সম্ভব তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, প্রথম কৃমিদিগকে বিনাশ করা যাহাতে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়, দ্বিতীয় এমন ধান উৎপন্ন করা কৃমিরা যাহার ক্ষতি করিতে পারে না বা খুব কম ক্ষতি করে। ধান যখন ক্ষেতে থাকে এবং কৃমি বর্ষাকালে যখন চারিদিকে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে তখন ফসলে ঔষধের আরক ছিটান অসম্ভব। কোন রকম বিনাশকারী ঔষধ জলে মিশাইয়া কৃমি বিনাশ করাও সম্ভবপর নয় কারণ ইহাদের অধিকাংশই জলে না থাকিয়া পত্রকোরকের অভ্যন্তরে এবং গাছের উপরভাগে থাকে। বিস্তৃত ক্ষেতে ঔষধ প্রয়োগও বহু ব্যয়সাধ্য।

শীতকালে যখন কৃমিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষেতের নাড়ার ভিতর এবং চিটা ধানে থাকে তখনই ইহাদিগকে বিনষ্ট করা কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রথমত একশত ক্ষেতের যাবতীয় কৃমি বিনাশ করা, দ্বিতীয়তঃ একেবারে খুব বেশী পরিমাণ কৃমি বিনাশ করার দরকার যাহাতে পুনরায় আক্রমণ না হইতে পারে। একেত কৃমিরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে জলে গমন করিতে পারে তাহার উপর জোয়ার ভাটার দরুণ জমির উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে অনেক দূরে জলস্রোতে চলিয়া যায়।

হৈমন্তিক ধান কাটিয়া লইবার পর নাড়াগুলিকে বেশ ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিলে এবং বেশ পরিষ্কারভাবে ক্ষেতে চাষ করিলে ইহা অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে ইহা ছাড়া যে বীজে এই কৃমি নাই এইরূপ বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং নানা রকমে জমির উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

নাড়াগুলি জ্বালাইয়া যে উপকার হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। ধান আবাদের পর ডাঁটা ও নাড়া বেশ ভাল করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

২। অন্য ফসল না বুনা পর্য্যন্ত ক্ষেতে পুনঃ পুনঃ চাষ করিবে।

৩। যেস্থানে এই ব্যাধি না লাগে ঐ স্থান হইতে কিছু ধান সংগ্রহ করিবে।

৪। ধান বাইন করিবার পূর্ব্বে একটী গামলা জলে ভরিয়া তাহাতে বীজ ধানগুলি

অল্প সময় ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। বীজ ধানগুলি ভিজাইবার পূর্ব্বে গামলার জলে দুই কি এক মুষ্টি লবণ মিশাইয়া লইলে আরও ভাল হয়। তাহার পর যে সমুদয় হাল্‌কা ধানগুলি ভাসিয়া উঠিবে সেগুলি গামলা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া যে ধান গামলায় পড়িয়াছে উহা বপন করিবে।

৫। কোনও ক্ষেতে প্রথমে রোগ দেখা দিবামাত্র পীড়িত গাছগুলিকে উঠাইয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিবে নতুবা রোগ ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই কৃমিরোগ ঢাকা জেলায় কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, কোথা হইতে কোন স্থান দিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইতেছে, কি পরিমাণ অনিষ্ট ইহাদ্বারা সাধিত হইতেছে, কি কি ধান বিশেষরূপ মরিতেছে এবং কোন্ ধান মরে না এবং অন্যান্য অবস্থা জানিবার জন্য সহকারী উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ মহাশয় বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন। এ বিষয় অনুসন্ধানের পর ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগে গত বৎসর হৈমন্তিক ধানের বিশেষরূপ অনিষ্ট হইয়াছে উফ্রা (কৃমিরোগ) ইহার কারণ বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা করিয়া সহকারী উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ এবং কীটতত্ত্ববিদ মহাশয়গণ দেখিয়াছেন যে উফ্রা উহার কারণ নয়। তবে নানা প্রকার সামান্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফাঙ্গাস্ এবং কীট পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ সকল রোগও ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয় না, গত বৎসর ৩।৪ মাস বৃষ্টির অভাবেই ধান শুখাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বাঁকুড়া জেলায় ভেঁপু নামে এক প্রকার বিশেষ রোগ আছে তাহার কারণ এ যাবৎ কাল অজ্ঞাত ছিল, সহকারী উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ, মহাশয়গণ এক প্রকার নূতন কীট ধান মারিয়া ফেলিতেছে, ইহা বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষাদ্বারা জানিতে সক্ষম হইয়াছেন ; ইহার জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য সহকারী কীটতত্ত্ববিদ মহাশয় নিযুক্ত আছেন।

বগুরা জেলায় এক প্রকার উদ্ভিদরোগ পানের অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। কি প্রকার রোগে এইরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা জানিবার জন্য সহকারী উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ ইম্পিরিয়াল উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদসহ অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন।

রাণাঘাটে অনেক নারিকেল গাছের মাথা পচিয়া যাওয়ায় যথাসময়ে ঔষধ (তুঁতে ও চূণের জল) প্রয়োগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ রোগসম্বন্ধে বিশেষ জানিবার জন্য সহকারী উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ নিযুক্ত আছেন।

রঙ্গপুর জেলায় আলু কালরোগে (Phytophthora Infestans) আক্রান্ত না হইতে পারে তজ্জন্য স্থানে স্থানে দম কলদ্বারা "বোর্ডো মিকশ্চার" (তুঁতে ও চূণের জল) যথাসময়ে ফসলে ছিটাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ছিটাইয়া দেখান হইয়াছে যেন কৃষকেরা পূর্ব্বেই সতর্ক হইতে পারে।

এই রোগের জীবনবৃত্তান্ত এবং নিবারণের উপায় বিস্তারিতভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিতরণ করা হইয়াছে।

এই ব্যাধির বিস্তারিত বিবরণ গত বৎসর কৃষি সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় আলুর শিকর পচা এক প্রকার উদ্ভিদ রোগ (রাইজক্টানিয়া ভাওলেসিয়া) উপস্থিত হওয়াতে, ক্ষেতে আলু রোপণ করিবার পূর্ব্বে চূণ ছিটান উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যাধি উপস্থিত হইলে পর বোর্ডো মিকশ্চার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ফলের গুণাগুণ।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে যাহার ভিতরে বীজ থাকে, তাহাই ফল। কিন্তু খাদ্য তত্ত্বের হিসাবে, এরূপ অনেক বীজাধার বা ফল শাক সব্জীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি; এবং যে অংশে বীজ উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ বৃক্ষাংশও ফলের ন্যায় ব্যবহৃত হয় যেমন শাঁক আলু, মূলা ইত্যাদি।

খাদ্যের গুণ এবং উপকারিতা হিসাবে ফলের মূল্য অতি অল্প। কেননা ইহাতে শরীরের পুষ্টিকারক প্রোটীন বা নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান এবং মাখন জাতীয় উপাদান অতি সামান্য। কিন্তু ইহার আস্বাদ, মিষ্টতা, সুঘ্রাণ ইত্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এরূপ প্রিয় এবং মুখমিষ্ট খাদ্য দ্বিতীয় নাই। শিশুও ফলের মিষ্ট আঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া খাইতে ইচ্ছা করে। যাহারা অপরিমিত ভোজী, তাহাদের শারীর-যন্ত্র ফলের দ্বারা উপকার পাইয়া থাকে। অতএব ফল প্রয়োজনীয় খাদ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই খাদ্য হিসাবে ফলের মূল্য রাসায়নিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; জন সাধারণের ভোজন প্রবৃত্তি ইহার মূল্য নির্দ্ধারক। ফলের রূপ, রস, গন্ধ, অবয়ব ইত্যাদি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তিলাভ করে।

সাধারণতঃ ফল প্রচুর না খাইলে শরীরের পুষ্টিসাধন হইতেই পারে না। ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ৮৫ হইতে ৯৭; প্রোটীন ০.৩ হইতে ২ ভাগ; মাখন জাতীয় উপাদান ০.১৩; শর্করা জাতীয় বা অঙ্গার হাইড্রোজেন ঘটিত উপাদান ২ হইতে ১৫; ধাতব পদার্থ ০.২ হইতে ১; এবং উদ্ভিজ্জ দ্রাবক ০.৫ হইতে ৭।

অম্লতা।—ফল রসনায় সংস্পৃষ্ট হইলেই অম্লাস্বাদ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে ইহাতে অযুক্ত (free) অম্ল থাকে, অথবা পটাশ লাইম বা সোডার অম্লতাবিশিষ্ট লবণ থাকে। লেবু, বাতাবী, কমলা, টোমাটো, ট্যাপারীতে সাধারণতঃ সাইট্রিক দ্রাবক থাকে। ন্যাসপাতি আপেল ইত্যাদিতে ম্যালিক দ্রাবক থাকে। রেউচিনি, টোমাটো, ইত্যাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্জালিক দ্রাবক স্বভাবতঃই পাওয়া যায়। করাত গুঁড়ার সাহায্যে এই দ্রাবক কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার

পূর্ব্বে এসিটোসেলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই দ্রাবক প্রচুর উৎপাদিত হইত। টারটারিক দ্রাবক তিন্তিড়িতে প্রচুর বর্ত্তমান আছে। এই দ্রাবকের অস্তিত্বই আঙ্গুরের বিশেষত্ব। অতএব সাইটিক, ম্যালিক এবং অক্‌জালিক দ্রাবকই উদ্ভিদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কোন কোন উদ্ভিদে বেনজোয়িক দ্রাবকও পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রাবকের অধিকাংশই হয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পোটাসিয়াম বা লাইমের সহিত রাসায়নিক যৌগিক হইয়া বর্ত্তমান থাকে।

পক্কতা।—ফল পাকিয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ফলের চোঁচ (fibre) অম্লত্ব, প্রোটিন এবং শ্বেতসার ইত্যাদি অল্প হয় এবং শর্করা, ইথার ও তৈল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আম্র ইত্যাদি ফলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ইহা পাকিয়া উঠে। একরূপ গাঁজন (firmetation) দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইংরাজিতে এই গাঁজনকে অক্সিডাসেস (Oxydases) বলে।

যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, অক্সিজেন প্রস্তুত করিবার জন্য পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার অক্সিজেন, পোটাসিয়াম এবং ক্লোরিণের যৌগিককে উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। তবে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার সহিত পরিমাণ অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্‌সাইড নামক এক প্রকার দ্রব্য অথবা সাধারণ বালি মিশাইয়া দিলে অতি অল্প উত্তাপেই পোটাসিয়াম ক্লোরেটের অক্সিজেন বিশিষ্ট হয়; অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্‌সাইড বা বালির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। যে দ্রব্য নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে, তাহাকে ইংরাজিতে ক্যাটালিটিক দ্রব্য বলে, এই ক্রিয়াকে ক্যাটালিটিক ক্রিয়া বলে, এবং এই প্রণালীর নাম ক্যাটালিসিস। পূর্ব্বোক্ত অক্সিডাসেস্ ক্যাটালিটিক ক্রিয়ার দ্বারা ফলের অদ্রবণীয় উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় করিয়া তুলে। সাধারণ আনারসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিডাসেস বর্ত্তমান আছে।

পাচ্যতা।—আমরা যত প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহা প্রায় সমস্তই পরিপাক পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ফলের পাচ্যতা সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশই পরিপাক হয়। ফলের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই শরীরের ব্যবহারে লাগে। অতএব ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলেই অনায়াসে শরীর সুস্থ এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকিতে পারে। যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে দ্রবীভূত করিতে অন্ততঃ ১ পাঁইট জল প্রয়োজনীয়। সেই জল খাদ্যকে তরল করিয়া শরীরে চলাচল করে। এক্ষণে কোন লোক যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক কোন ফল যেমন

নারিকেল ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ফলে এত জল থাকে যে তাহাকে পুনরায় জল পান করিতে হয় না। কাজেই যাহারা ফলভোজী তাহাদিগকে মাংসভোজীর ন্যায় অত্যধিক জল পান করিতে হয় না।

ধাতব পদার্থ।—ফলে যে ধাতব পদার্থ থাকে তাহা পরিমাণে অতি সামান্য হইলেও শরীর রক্ষার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে মানবের বহুবিধ পীড়ার কারণ শরীরের ধাতব পদার্থের অসামঞ্জস্য—আধিক্য বা অল্পত্ব। কাজেই ফল ভোজনে শরীরে ধাতব পদার্থের সামঞ্জস্য বেশ রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আপেল উল্লিখিত হইতে পারে। অর্দ্ধসের আপেলে প্রায় ⅓ গ্রেণ লৌহ আছে। সেইরূপ ন্যাসপাতিতে লৌহ অপেক্ষা পোটাসিয়াম অধিকতর বর্ত্তমান। এই ধাতব যৌগিক পদার্থ বা ধাতব লবণ এবং অযুক্ত অম্লতা বর্ত্তমান থাকায় গ্রীষ্ম ঋতুতে ফল অতি উপাদেয় এবং স্নিগ্ধকর হইয়া থাকে। ঘর্ম্মাদির সহিত শরীর হইতে এই সমস্ত পদার্থ নিস্ক্রান্ত হইয়া যায় এবং ফল ভোজনে তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় আম, জাম, আনারসাদি ভোজনে শরীর নবজীবন লাভ করে।

কদর্য্য ফল।—ফল নানাকারণে ভোজনের অনুপযোগী হইয়া উঠে। ইহার ভোজ্য অংশ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং জল সহযোগে উৎপাদিত হয়। কাজেই ফল অতি অল্প কারণেই খারাপ হইয়া পড়ে। বাজারে যে সমস্ত ফল আমদানী হয় তাহাদিগকে প্রায়ই কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। ফল অতিশয় পাকিয়া যাইলেও আহারের উপযোগী থাকে না। ফল এইরূপ কোন অবস্থায়—অর্থাৎ গলিত, অতিপক্ক বা কাঁচা—উপযুক্ত আহার্য্য নহে। ইহারা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং রোগ উৎপাদক। যদি ফলের খোসা কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু খোসা কোনরূপে ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পচনউৎপাদক পদার্থ বা ছ্যাতার বীজ প্রবেশ করে এবং ফলটিকে পচাইয়া ফেলে। ফলকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিয়া পাকাইয়া তুলা প্রায় সর্ব্বত্রই অনিবার্য্য। এরূপ করিতে হইলে যে গৃহে ফল রক্ষা করা হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুষ্ক এবং দুর্গন্ধ বা সর্ব্বগন্ধ বিহীন হওয়া উচিত। কোন সময়ে এক গৃহস্থ ২০।২৫ কান্দি কলা যে ঘরে পাকাইতে ছিল, সেই ঘরেরই এক কোণে হামে আক্রান্ত একটি শিশু শুইয়াছিল, অন্য কোণে রসুন সহযোগে তরকারী পাক হইতেছিল। এরূপ গৃহের পক্ক ফল তত নিরাপদ নহে।

শুষ্ক ফল।—পূর্ব্বে ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী অতি কদর্য্য ছিল; তখন ছাদের উপরে ধূলি, জঞ্জাল, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিব্যাপ্ত স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ফল শুষ্ক বা দগ্ধ হইত। ইহাতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণ বিশ্রী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ফলগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুষ্ক করা হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও ইহার সুগন্ধ ইত্যাদি নষ্ট হয় না।

আপেল, নাশপাতি, কুল ইত্যাদিই এই সমস্ত শুষ্ক ফলের মধ্যে প্রধান। সমান ওজনের টাটকা ফল অপেক্ষা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত ফলের পুষ্টিকারিতা আট গুণ অধিক। ইহার মধ্যে যে অম্লতা থাকে, তাহা কোনরূপে অপচিত হয় না।

উপসংহার।—উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহাহইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, মুখমিষ্ট এবং প্রিয় খাদ্য। আমাদের দেশে ফল যেরূপ প্রচুর উৎপন্ন হয়, তাহার বহুল ভোজন মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির অনুকূল। ফল ভোজনে উদর স্নিগ্ধ থাকে, এবং রক্ত পাতলা হয়। ফলের দ্বারা লৌহ, পোটাসিয়াম লাইম, ম্যাগনেসিয়া, সোডিয়াম ইত্যাদি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান ধাতব উপাদান সমূহ যথোপযুক্ত পরিমাণে গৃহীত হয়। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ফল তাহাদের মহোপকারী ঔষধ।

যে ঋতুতে যে শাক সব্জী বা ফল উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতে সেই ফল নিশ্চয়ই উপকারী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক সব্জী ভোজনে শরীর সুস্থ থাকে। "গাছ পাকা" ফল দুর্লভ বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফলও বিশেষ হানি কর হয় না। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যখন অতিমাত্রায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তখন ফল ভোজন স্বাস্থ্য সাধক।

বিজ্ঞান।—

———:*:———

রেল বিস্তারে শিল্প প্রতিষ্ঠা।—কানপুর চিনির ও নীলের কারখানা ওয়ালারা বলিয়াছেন—ভারতে আগে রেল বিস্তার না হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইবে না। সরকার যাহাই কেন করুন না, রেলের সুবিধা করিয়া না দিলে হইবে না। অর্থাৎ এ যেন আবার একটা কমিশন বসাইয়া মীমাংসা বিলম্বিত করা। ভারতে রেল বিস্তার নিতান্ত কম হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল চলিত—তাহার পর আজ দেশ রেলের জালে জড়ান। তাহার ফলে এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কতটা সুবিধা হইয়াছে, সেটা বিচার করিয়া তবে একথাটা বলিলেই ভাল হয়। আজ কানপুরের চিনির ও নীলের কারখানা ওয়ালারা যে এই কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা কি করিয়াছিলেন? এই দুই ব্যবসায়ই আজ মুমূর্ষু—যায় যায়। কিন্তু বাঙ্গালার পূর্ব্বে এই দুই ব্যবসারই বাহার ছিল। যমুনা, ইচ্ছামতী, ভৈরব, কপোতাক্ষী, হরিহর এই সব নদীর কূলে গোবরডাঙ্গা, চাঁদপুর, তারপুর, চৌগাছা, কেশবপুর এই সব স্থানে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত; আর মোল্লাহাট, কাঠগড়া, চৌগাছা, সিন্দুরিয়া, নিশ্চিন্দিপুর, বিজলে প্রভৃতি স্থানে নীল উৎপন্ন হইত। তখন এই দুই ব্যবসায় এত লাভ ছিল যে, বহু স্থানেই ইউরোপীয়েরা কারখানা ও কুঠী করিয়া বাস করিতেন, অথচ তখন এদেশে রেল ছিলনা। নৌকা ও পাল্কী ব্যতীত যাতায়াত করিতে হইলে অশ্বারোহণ ব্যতীত গতি ছিল না। যাঁহারা সে সব সময়ের ইংরাজ কারখানা ওয়ালাদের বসবাসের ব্যবস্থা জানিতে চাহেন, তাঁহারা কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্টের—Rural life in Bengal ও সার হেনরী কটনের স্মৃতিকথা পাঠ করিয়া দেখিবেন। তখন মাল রপ্তানি করিবার যানই ছিল—নৌকা, এই নদীমাতৃক দেশে তখন জলযানেরই প্রচলন অধিক ছিল। অথচ তখনই চিনিতে ও নীলে লাভ ছিল—আর এখন লোকশানের পালা। সে কেবল বিদেশী পণ্যে অসম ও বিষম প্রতিযোগিতার ফলে। সুতরাং রেলপথ বিস্তার ব্যতীত শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইবে না—এ কথা বাজে কথা; বিশেষ কারণ এদেশে রেল অন্য দেশের মত অন্তর্ব্বাণিজ্যে সহায় না হইয়া বহির্বাণিজ্যেরই সহায়তা করে। এ অবস্থায় রেল

বিস্তারে কেবল কাঁচামাল অর্থাৎ পণ্যের উপকরণ রপ্তানীই বাড়িবার সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনা যত তিরোহিত হয়, ততই এদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে। তাই আমরা বলি, শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য রেলবিস্তারের প্রস্তাবে সরকার যেন আবার অর্থব্যয় না করেন।

—বাঙ্গালী।

——:০:——

কমলালেবুর বরফী—(ক) ক্ষীরের সহিত।—সুপক্ক কমলালেবুর কোয়া ৴২৷৷• সের লইয়া তাহাদের পাতলা আবরণটা ছাড়াইয়া এবং বীজ ফেলিয়া দিয়া একটী প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর দুগ্ধ ৴২৷৷• সের, চিনির রস ৴২৷৷০ সের, এলাচ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা সংগ্রহ কর।

প্রথমে পরিস্কৃত কড়াইয়ে দুগ্ধটাকে জ্বালে চড়াইবে এবং মৃদু জ্বালে ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। দুগ্ধ যেন ধরিয়া বা চুঁইয়া না যায়, দুগ্ধ ঘন হইলে তাহাতে ছাড়ান লেবুগুলি দিয়া নাড়িতে থাকিবে যখন আরও ঘন হইয়া আসিবে, তখন চিনির রস তাহাতে ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন মৃদু জ্বালে হাতার দ্বারা নাড়িয়া নাড়িয়া যখন পাক হইয়াছে (অর্থাৎ হাতায় করিয়া একটী শীতল পাত্রে একটু লাগাইলে বেশ জমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিবে) তখন কড়াহ খানিকে নামাইয়া ছোট এলাচের গুড়া গুলি দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করত একখানা পিতলের পরাতে বা থালায় ঢলিয়া দিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে জিনিসটা বিস্তৃত করিয়া দিবে। যখন বেশ জমিয়া যাইবে, তখন ছুরি দ্বারা চৌকা আকারে কাটিয়া লইলেই কমলালেবুর বরফী হইল। কেহ কেহ ক্ষীরের সহিত কেবল কমলালেবুর খোসা দিয়া থাকেন এবং তাহা পাক শেষ হইলে বাছিয়া ফেলিয়া দেন। এ উপায়েও সুন্দর কমলা লেবুর গন্ধ হইয়া থাকে কেহ কেহ গোলাপী আতরও দেন।

(খ) ছানার সহিত—বান্ধা জলশূন্য ছানা ৴২৷৷০, ৪টা কমলালেবুর ছাল; চিনি তিন পোয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক ও প্রথমত চিনির রস করিয়া ছানাও ঐ রস তাড়ু বা খুন্তি দ্বারা নাড়ীতে হইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন কমলালেবুর ছালগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যখন পাক হইয়া যাইবে, তখন নামাইয়া উহাতে সামান্য ছোট এলাচের চূর্ণ দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হইবে তাহার পর কাষ্ঠের বারকোশে বা থালায় ঢালিয়া সমভাবে বিস্তৃত করিয়া দিবে। শীতল হইলে ছুরি দ্বারা বরফীর আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। ছেনার সন্দেশ নরম ও কড়া দুই প্রকার পাকের হইয়া থাকে। নরম পাকের সন্দেশ কোমল হয়, কিন্তু কড়া পাকের সন্দেশ একটু অধিক সময় ভাল থাকে।　　　—কাজের লোক।

——:*——

ঘৃত সুগন্ধি করার উপায়—কতবেল শুকাইয়া তাহার চূর্ণ অথবা দধির মাত (বাসি দধির যে জলীয় অংশ গড়াইয়া যায়), অথবা দুগ্ধ অথবা যব দিয়া জ্বাল দিলে ঘৃত সুগন্ধি হয়।

কপিত্থ চূর্ণ যোগেন তথা দধ্নঃ শ্রজাতথ।
ঘৃতং সুগন্ধি ভবতি ক্ষিপ্তৈর্দুগ্ধৈ র্যবৈস্তথা॥

——:*:——

পেস্তার বরফী—বান্ধা ছানা ২॥০ পেস্তা ২॥০ চিনি ৩ পুয়া প্রথমে ছানার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সন্দেশের পাক করিয়া তাহার পর পেস্তাকে শীলে বাটিয়া ঐ সন্দেশের পাকে দিয়া তাড় দ্বারা নাড়িয়া মিশাইতে হইবে, শীতল হইলে বরফীর মত কাটিয়া লইতে হইবে।

——:*:——

সজিনার গুণ—বাঙ্গালাদেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই সজিনা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পত্র, পুষ্প, ফল (খাড়া) বীজ, সমুদায়ই আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সজিনার নিম্নলিখিতরূপ গুণের বর্ণনা আছে। 'যথা তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ, বাত, শোথ, কৃমি, মেদ, প্লীহা, গলগণ্ড ও ব্রণ রোগের প্রতীকারক। সজিনার ছাল এবং পাতার রস "বেদনা নাশক", সজিনার বীজ "চক্ষুর পক্ষে হিতকারক এবং কফ বাত নাশক।" সজিনার মূলের রস পাচক কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুনাশক, অম্লশূল নিবারক এবং মূত্র নিঃসারক-রূপে পশ্চিম দেশীয় হাকিম ও বৈদ্যগণ বহুলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; নানাবিধ প্রদাহরোগে শরীরের কোন সন্ধিস্থল মচকিয়া গেলে এবং বাতরোগে সজিনার মূলের ছাল পেষণ করিয়া উষ্ণ করত প্রলেপ দিলে প্রাদাহ এবং বেদনা নিবারিত হয়।

——:*:——

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারসুী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র। আলু গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু সমুদয় ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতি-মধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে সারমিশ্রিত গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে কয়েকবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। আলু বসাইবার তারিখ হইতে ৩ চাঁদে আলু তৈয়ারি হয়। পাকা দুই মাসের কম আলুর ফসল তৈয়ারি হয় না। এই দুই মাসের মধ্যে ৮টা সেচ দিবার আবশ্যক। জমির অবস্থা বুঝিয়া সেচের কম বেশী করা যায়। প্রত্যেকবার সেচ দিবার পর আলুর দাঁড়া টানিয়া দিয়া গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুণ, চৈতেশসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

—:*:—

অগ্রহায়ণ ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

কাঁঠাল প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার ফল জন্মিয়া থাকে কিন্তু তন্মধ্যে কাঁঠালের ন্যায় বৃহদাকারের ফল আর নাই। এই জন্য ইহার এক নাম "অতি বৃহৎ ফল"।

"পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোতি বৃহৎ ফলঃ।"

পণস, পনশ কণ্টকিফলঃ অতি বৃহৎ ফল এই কয়টিই কাঁঠালের সংস্কৃত পর্য্যায়। ফলের বহিরাবরণ কণ্টকাবৃত বলিয়াই ইহার নাম কণ্টকীফল হইয়াছে। কণ্টকীফলের অপভ্রংশেই বাঙ্গালায় কাঁঠাল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই ফল "কটহর বা কটহল" নামে পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে কাঁঠালের নিম্নলিখিত গুণগুলি বর্ণিত আছে,—

পাকা কাঁটাল শীতবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিকর, মাংসবর্দ্ধক, পিচ্ছিল দুর্জ্জর, রুচিকর মলরোধক, বলবীর্য্য বর্দ্ধক, শুক্রজনক ও কফবর্দ্ধক, ইহা বায়ুপিত্ত ক্ষত ও ব্রণ নাশক এবং দাহ, শ্রম, শোথরোগে উপকারক। অপক কাঁঠাল বা ইচড়, মধুর কষায় রসযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক, গুরুপাক, শীতল, বলকর, দাহজনক, রুচিকর, ইহা কফ ও মেদধাতুর বৃদ্ধিকর। কাঁঠাল বীজ শুক্রবর্দ্ধক, মধুর রস, গুরুপাক, মলরোধক, ঈষৎ কষায়যুক্ত, মূত্র বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পাকা কাঁঠাল ভোজনজনিত অজীর্ণাদি নিবারক কাঁঠাল বীজের তরকারী অতি উৎকৃষ্ঠ, গোল আলু অপেক্ষাও পুষ্টিকর। কেহ কেহ ভাতের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া এবং দাউলের সহ পাক করিয়া ভক্ষণ করেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আগুণে পোড়াইয়া খায় তাহাও বেশ মুখরোচক হয়। কাঁঠালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ নাশক। মাংগ্রন্থি শোথে কাঁঠালের কাথ, অন্ত্রবৃদ্ধিতে কাঁঠালের ভোতা (মজ্জা) এবং চর্ম্মরোগে কাটালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক।

কাঁঠালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধি সেবনজনিত মত্ততা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বহু গুণ সম্পন্ন ফল পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আকার ও গুণে ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ফল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

কাঁঠালের জন্মস্থান ভারতবর্ষ, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র কাঁঠাল জন্মে না। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের কোন কোন স্থানের লোকের নিকট ইহার নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত। বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে কাঁঠাল জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল জন্মে এবং ইহার গাছ জঙ্গলা গাছের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে কাঁঠালের "মহাফল" নামে অভিহিত করা হইয়াছে বাস্তবিকই ইহা মহাফল। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী সকল প্রাণীই কাঁঠাল খাইতে ভালবাসে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই কাঁঠাল পরিপক্ক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ধান্য চাউল মহার্ঘ্য হয় বলিয়া, এ সময়ে বঙ্গের অনেক দুঃস্থ পরিবারের লোক অত্যল্প পরিমাণ ভাতের সহিত অত্যধিক পরিমাণ কাঁঠাল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। বর্ষাকালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু লোক কেবল কাঁঠাল খাইয়াও জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। অন্যান্য ফলের তুলনায় কাঁঠালের মূল্য কিছু সুলভ। বিশেষতঃ ইহার একটী ফলেই তিন চারি বা ততোধিক ব্যক্তিরও উদর পূর্ত্তি হইতে পারে, এইজন্যই এদেশের গরীব লোকে কাঁঠালকে জীবন রক্ষক মহাফল বলিয়াই মনে করে। এক একটী কাঁঠালের ওজন উহার আয়তন অনুসারে দুই তিন সের হইতে পনর বিশ সের বা একমণ পর্য্যন্তও হইতে পারে। তবে যে গাছে বেশী ফল রাখা হয় তাহাতে আকার ক্ষুদ্র এবং অল্প ফল থাকিলে আকার বৃহৎ হয়। আমার উদ্যানস্থ একটী গাছে মাত্র দশটী কাঁঠাল রাখিয়া দেখিয়াছি প্রত্যেকটী ২৫ ২৬ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল, বোধ হয় আরও কম রাখিলে এবং বৃক্ষ যথোপযুক্ত সার ও রস প্রাপ্ত হইলে একমণও হইতে পারিত। ফলে পঞ্চাশ হইতে চারি পাঁচশত বা ততোধিক কোষ জন্মে। সাধারণতঃ কাঁঠালের কোষ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণেরই হইয়া থাকে। তবে কোন কোন জাতীয় কাঁঠালের কোষ শ্বেতবর্ণ বা লাল আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণের হয়। কাঁঠাল পরিপক্ক হইলেও উহার সকলগুলি কোষই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেক কাঁঠালের মধ্যেই দুই চারিটী বা ততোধিক কোষ চেপ্টা হইয়া কাণের পাতের আকার ধারণ করে। সুপুষ্ট কোয়া অপেক্ষা এই সকল চেপ্টা কোয়াই অপেক্ষাকৃত অধিক মিষ্ট হয়। কোন কোন গাছের ফল পূর্ণরূপে উৎপাদিকা শক্তি লাভ করে না। কোন নৈসর্গিক কারণে পুষ্পপরাগ বিতরিত হইবার ব্যাঘাত ঘটিলেই উহা রীতিমত গর্ভ ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং উহার ফল কোষ উৎপন্ন করিবার শক্তিও হ্রাস হইয়া পড়ে। তদবস্থায় কাঁঠালে যথোপযুক্ত পরিমাণে কোষ জন্মে না অনেক স্থলেই কোষ শূন্য হয়। এইরূপ উপযুক্ত কোষ হীন কাঁঠালকে "ধোন্দা" বা ভুয়া কাঁঠাল কহে।

ফল পুষ্ট হইলে উহার বহির্ভাগ কঠিনতা লাভ করিয়া থাকে এবং ফলের উপরিস্থ কণ্টক সকলের উচ্চতা খর্ব্ব হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কণ্টকের মূলদেশের বিস্তৃতি ঘটে। কোন কোন জাতীয় কাঁঠালের বহিরাবরণের কণ্টকগুলি প্রায় সমান হইয়া যায়। এই অবস্থা ঘটিলেই উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কাঁঠাল সুপুষ্ট হইয়াছে কিনা, তাহা অন্য রূপেও স্থির করা যাইতে পারে। কাঁঠালের উপরে নখের পিঠ দ্বারা টোকা দিলে যদি উহা হইতে ধপ্ ধপ্ বা ঢপ ঢপ শব্দ বাহির হয়, তবে উহা সুপুষ্ট হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুপুষ্ট কাঁঠালের উপর টোকা দিলে ঠন্ ঠন্ শব্দ হইয়া থাকে। গাছে কাঁঠাল পাকিলে কাক শালিক প্রভৃতি পক্ষী উহা হইতে কোষ বাহির করিয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। বাঁদর, শৃগাল, ভল্লুক, বাদুড় প্রভৃতি জন্তুগণও পাকা কাঁঠাল খাইতে ভালবাসে। গাছপাকা কাঁঠালের অনেক শত্রু আছে বলিয়াই উহা সুপুষ্ট হইবামাত্রই গাছ হইতে কাটিয়া আনা হয়। তবে অধিক সংখ্যক কাঁঠাল গাছ থাকিলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কাঁঠালের কোষ মধুর, সুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুস্বাদু কিন্তু তন্মধ্যস্থ আঁশ গুরুপাক বলিয়া সহজে জীর্ণ হয় না। এই জন্যই কাঁঠালের কোষের আঁশ ত্যাগ করিয়া কেবল রস খাওয়াই সঙ্গত কিন্তু খাজা বা শক্ত কোষ ঐরূপে খাওয়া যায় না। গলা কাঁঠালের রস দুগ্ধ সহযোগে রসনার তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। কাঁঠালের কোষের রস দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তাহা ঘনীভূত করিয়া লইলে উহা ক্ষীর আস্বাদযুক্ত ও সুখাদ্য হয়। কাচা কাঁঠাল বা ইচড় ও কাঁঠালের বীজ সুখাদ্য তরকারী। কাঁঠালের বীজ বালীতে রক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়, ইহা ভাজিয়াও খাওয়া যায়। কাঁঠাল বীজের ময়দাও একরূপ মন্দ নহে। এই বীজ বালির খোলায় ভাজিয়া তাহা ভাজা চিড়া, লবণ, তৈল ও লঙ্কামরিচের সহিত একত্র চুর্ণ করিয়া লইলে একরূপ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা সুস্বাদু ও মুখরোচক। কাঁঠাল ফলের কোন অংশই অব্যবহার্য্য নহে। ফলের বল্কল ও তদভ্যন্তরস্থ কোষাবরণ গবাদি গৃহপালিত পশুর বিশেষ প্রীতিকর খাদ্য, উহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত কাঁঠালের পরিত্যক্ত অংশ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ফলের মজ্জাকে স্থান বিশেষে বোন্দা কহে। উহা ফলবৃন্তের সহিত সংলগ্ন থাকে এবং উহাই মেরুদণ্ড স্বরূপ। ফলবৃন্ত ফলের বাহিরে ও মজ্জা ভিতরে থাকে। এই মজ্জার চতুঃপার্শ্বে কোষগুলি সংলগ্ন থাকে। কাঁঠালে মজ্জা চিরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত রাখিয়া দিলে আবশ্যক মত ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শীতঋতুর অবসানে কাঁঠলগাছ পুষ্পিত হয়। ইহার পুষ্পে একটু সামান্য সুগন্ধ আছে। দুই তিন মাসের মধ্যেই ফল পরিবর্দ্ধিত ও সুপুষ্ট হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতেই পাকিতে আরম্ভ করে। কাঁঠাল গাছ তিন প্রকারের হয়। (১) জলদি, (২) নাবি (৩) বারমেসে। কিন্তু যে কোন গাছে কচিৎ দুই চারিটী কাঁঠাল অসময়েও দেখা যায়। আমার একটী নাবি গাছে ২।৩ বৎসর গত হইল দুইটী প্রায় ৩।৪ সের

ওজনের কাঁঠাল মাঘ মাসে বেশ সুপকাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কখনই এরূপ হয় নাই, এবং এখনও আর হয় না। বারমেসে কাঁঠাল কচিৎ কোন স্থানে দেখা যায়। কোষ গুলিও তিন প্রকারের হয়। (১) খাজা (শক্ত), (২) গলা (বেশ নরম), (৩) দোরসা বা রসখাজা (অর্দ্ধ খাজা অর্দ্ধ গালা)। নাবি জাতীয় কোন কোন গাছের ফলের কোষই খাজা হয়, তবে সকল গাছের হয় না। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই কাঁঠাল পরিপক্ক হইয়া থাকে। কিন্তু নাবি জাতীয় গাছের ফল আশ্বিন মাস পর্য্যন্তও থাকে। কাঁঠাল গাছের পাদদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত কাণ্ডের গাত্রে ও উহার শাখা প্রশাখাতে কাঁঠাল জন্মে। কিন্তু কাণ্ডের গাত্রেই অধিক ও বৃহৎ ফল হয়। স্থুল শাখার ক্ষুদ্র প্রশাখা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাঁঠাল জন্মে। কাণ্ডের গাত্রে থোকে * থোকে ফল ধরিয়া থাকে, এক একটী থোকে ৩।৪ বা ততোধিক ফল ও হয়। গাছের গোড়ার ফল কখনও কখনও এত নিম্নে জন্মে যে উহার পরিবর্দ্ধণের জন্য মৃত্তিকায় গর্ত্ত খনন করিয়া দেওয়ার আবশুক হইয়া পড়ে, নচেৎ উহা পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। কাঁঠাল গাছ মুকুলিত হইলে, প্রথমতঃ উহার মুকুল গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়। তৎপর ক্রমশঃ ফল বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে পুষ্পাবরক পত্র শ্বেতাভ জরদ বর্ণ ধারণ করিয়া স্খলিত হয়। ক্ষুদ্র ফলকে কাঁঠালের "মুচি" বলে। প্রথমাবস্থায় মুচিগুলি পুষ্পাবারক পত্রে বেষ্টিত থাকে। গাছের সকল মুচিই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না, কতকগুলি শুষ্ক হইয়া পড়ে ও পচিয়া যায়। এই শুষ্ক মুচিগুলিতে সোডা বা সাজিমাটীর কাজ হইতে পারে। গাছের শুষ্ক পত্রে উত্তম ঠোঙ্গা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁঠাল গাছ ২৫।৩০ হাত বা ততোধিক উচ্চ হয়। উহার কাণ্ডের ব্যাস ৭।৮ হাতেরও বেশী হইয়া থাকে। কাণ্ডের বল্কল ধুসর বা শ্বেতাভ ধুসর বর্ণ হয়। প্রাচীন গাছের বাকল লালাভ শ্বেত বা পাটকিলে রঙ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বট পত্রের সহিত কাঁঠাল পত্রের অনেকটী সাদৃশ্য আছে। ইহার পাতা ডিম্বাকার হয়। কচিপাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং পুরাতন পাতা জরদা ও সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। পাতা পাকিলে লালের আভাযুক্ত কমলা রঙের হয়। কাঁঠাল পাতা পাকিলেই পড়িয়া যায়।

কাঁঠাল চারা রোপণের পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। দোয়াঁশ, বালি, লাল মৃত্তিকা ও কঙ্করময় ভূমিতেই কাঁঠাল গাছ বেশ জন্মে। কিন্তু দোয়াঁশ ও লাল মাটীতেই গাছগুলি বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করে ও সতেজে বর্দ্ধিত হয়। উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিই কাঁঠাল চারা রোপণের বিশেষ উপযোগী, সমুদ্রোপকূল হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চাস্থানেও কাঁঠালের চাষ হইতে পারে। কিন্তু শীত প্রধান স্থান ইহার চাষের উপযোগী নহে। অর্দ্ধ ছায়াযুক্তস্থানে গাছগুলি সত্বরে ও সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাঁঠাল গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়। এইজন্যই নিম্ন জমিতে কাঁঠালের চাষ হইতে পারে

* থোক—থলো, কতিপয় ফলের সমষ্টি।

না। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের গাছগুলি অধিকস্ফূর্ত্তিশীল হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থানে গাছ পালার পাতা পচিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতার হ্রাস ঘটিতে দেয় না বলিয়াই গাছের খাদ্যাভাব হয় না। ফলে গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া বহু ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। পাতার সার কাঁঠাল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। পত্র-সারে ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকায় পত্র-সার ব্যবহৃত মৃত্তিকায় জাত কাঁঠাল অধিক মিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ইহাতে কাষ্ঠের বর্ণের উজ্জ্বলতা ও গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পাতার সারের অভাবে গোময় সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাঁঠাল বীজের উৎপাদিকাশক্তি অধিকদিন স্থায়ী হয় না, কখনও কখনও ফলের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ফল অধিক পরিপক্ক হইলে তন্মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইরূপ ঘটিলে কাঁঠালের কোষ বিস্বাদ হয় ও উহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। অধিক পরিপক্ক ফলের কোষে একরূপ হরিদ্রাবর্ণের গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ জন্মে, এই গুঁড়াযুক্ত কোষ ভক্ষণ করিবার সময় গুঁড়াগুলি জিহ্বায় কিরকির করিয়া লাগে, ইহাতে স্বাদ গ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে। সুপক্ক কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্টস্থানে রোপণ করিতে হয়। স্থূল শাখার পরিপক্ক কাঁঠালের বীজের গাছই উৎকৃষ্ট। ২০।২৫ হাত অন্তর গাছ রোঁপণ করা প্রশস্ত। প্রথমে হাপোরে চারা উৎপাদন করিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট-রোপণ করা অপেক্ষা নির্দ্দিষ্টস্থানে বীজ রোপণ করাই সঙ্গত। যে স্থানে চারা বা বীজ রোপণ করিতে হইবে, ঐস্থানে এক হাত গভীর ও দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থেও এক হাত একটী গর্ত্ত খনন করিয়া গর্ত্তটী সার মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। বীজ বা চারা রোপণের অন্ততঃ দুইমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এই কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে প্রত্যেক গর্ত্তে ২।৩টী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের ৮।১০ দিন পরেই উহা অঙ্কুরিত হয়। বর্ষাকালে বীজ রোপণ করিলে জল সেচনের আবশ্যক হয় না। পাকা কাঁঠাল মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া রাখিলেও উহার বীজ হইতে চারাগাছ জন্মে। ইহা ৫।৬ ইঞ্চ উচ্চ হইলেও তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে রোপণ করা যাইতে পারে। খনার বচনে আছে, "গো নারিকেল নেড়ে রো। আম টেটুরে, কাঁঠাল ভো॥" অর্থাৎ সুপারি ও নারিকেল চারা নাড়িয়া পুতিলে গাছ ভাল হয়, আম চারা নাড়িয়া পুতিলে ফলের আকার ছোট ও কাঁঠাল চারা নাড়িয়া পুতিলে কোষ শূন্য ভুয়া কাঁঠাল হইয়া থাকে। এই প্রবাদের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে বলা যায় না। বস্তুতঃ কাঁঠাল চারা প্রায়ই নাড়িয়া রোপণ করা হয় এবং তাহাতে ফলও বেশ হইতেছে। একটী সুপক্ক কাঁঠাল মৃত্তিকায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহা হইতে বহুসংখ্যক চারা উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে নিস্তেজ চারাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সতেজ চারাগুলি ২।৩ ইঞ্চ বড় হইলে প্রত্যেক চারা বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে রাখিবে। দেড় হাত কি দুই হাত বাঁশ দুইভাগে চিরিয়া তন্মধ্যস্থ গিরাগুলি ফেলিয়া দিয়া সুতা বা দড়ি দ্বারা বান্ধিলেই একটী

চোঙ্গা প্রস্তুত হইল, তৎপরে তন্মধ্যে একটী গাছ এরূপভাবে রাখিবে যেন উহা ঠিক মধ্যস্থলে থাকে, গাছটী বড় হইয়া চোঙ্গার উপরে উঠিলেই চোঙ্গাটী খুলিয়া ফেলিবে ও গাছের সমগ্র কাণ্ডটী দড়ি দ্বারা পেচাইয়া বান্ধিবে, তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া ৫।৭ বৎসরেই ফল ধরিবে এবং কাণ্ডটীও খুব সরল হইয়া উঠিবে।

রোপণের পর চারাগাছগুলি মৃত্তিকায় বসিয়া গেলে সময় সময় গোড়ার মৃত্তিকা খোঁচাইয়া দিতে ও তৃণাদি নিড়াইয়া ফেলিতে হয়। গো, মহিষ, ছাগাদির অত্যাচার হইতে চারা গাছগুলি রক্ষা করিতে হইবে, আর অন্য কোন যত্ন অনাবশ্যক। কাঁঠাল গাছের কলম হয় না, আমি একবার জোড় কলম ও দ্বিতীয়বার গুল কলম করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি। যদি আপনারা কিম্বা কোন গ্রাহক মহোদয় কাঁঠালের কলম করা সম্বন্ধে জানেন ও তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক "কৃষকে" লিখিলে বহু উপকৃত হইব। কাঁঠাল গাছ ছাঁটিতে হয় না, ছাঁটিলে বরং অনিষ্টই হয়। ইহার ফল প্রথমে গাছের স্কন্ধে ও সরু ডালে, মধ্য সময়ে স্থূল ডালে ও কাণ্ডে এবং গাছ প্রাচীন হইলে কাণ্ডে, স্কন্ধে ও গোড়াতেই অধিক জন্মে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক ফলপ্রসূ হয়, প্রথম বৎসর ২।৫টী, তৎপর প্রতিবৎসরই ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক গাছে একশত হইতে ৫।৭ শত ফল ধরিতে পারে। কাঁঠাল গাছে মৃত্তিকার নিম্নে শিকড়েও ফল ধরিতে দেখিয়াছি। আমার দিনাজপুর জেলার অধীন সিংড়োর গ্রামে থাকা কালীন, একটী গাছে শ্রাবন মাসে ফল নিঃশেষ হইয়া যাবার পর হঠাৎ একদিন ঐ গাছের তল দিয়া যাইতে সুপক্ক কাঁঠালের সুগন্ধ পাওয়া গেল, অনন্তর গাছে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া কোথাও ফল দেখা গেল না, তখন গাছের মূলদেশে দৃষ্টিপাতে বুঝা গেল তৎস্থানের মৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে, তখন আমি গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া উক্ত স্থান খনন করাতে একটি ৩।৪ সের ওজনের ফল বাহির হইল, উহা একটী মোটা শিকড়ে জন্মিয়াছে এবং ফলটীও ফাটিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী বলিল পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই এবং আমিও পূর্ব্বে দেখি নাই। আম্রাদি গছের ন্যায় কাঁঠালের গাছের মূল শিকড় থাকে না। ইহার শিকড়গুলি অল্প মৃত্তিকার নিম্নে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া থাকে। এজন্য দৃঢ়রূপে মৃত্তিকায় বদ্ধমূল হইতে পারে না ও সময় সময় প্রবল বাতাস বা ঝড়ে উপাড়িয়া পড়ে। ভূপতিত মধ্যমাকারের গাছ হইলে পুনরায় তুলিয়া রোপণ করা যায়।

কাঁঠাল গছের কাষ্ঠ অত্যুৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষজাত সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠ অপেক্ষা ইহাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহাতে বাক্স, সিন্দুক, ডেস্ক, আলমারি, চৌকী, বেঞ্চ, টেবিল, টুল, খাট, কপাট, চৌকাট ইত্যাদি নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। এই কাষ্ঠের বর্ণের চাকচিক্যের সহিত কোন কাষ্ঠেরই তুলনা হইতে পারে না। অধুনা ইউরোপের নানা স্থানে ইহার বিশেষ আদর হইয়াছে। প্রতি বৎসর সিংহল দ্বীপ হইতে কাঁঠাল কাষ্ঠ

নির্ম্মিত বহুতর আসবাব ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে। কাঁঠাল কাষ্ঠ উজ্জ্বল পীতবর্ণের হয়। ইহা মেহগ্নী কাষ্ঠের ন্যায় পালিশ করা যায়। অধিক পুরাতন গাছের কাষ্ঠ ক্রমে ক্ষয় পাইয়া নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ কাষ্ঠের সারাংশ পচিয়া ক্ষয় পায়, তদবস্থায় গাছের অভ্যন্তরদেশ সার শূন্য হইয়া গহ্বরাকারে পরিণত হয়। কাণ্ডের উপরিস্থ বল্কল ও তন্নিম্নস্থ অসার কাষ্ঠই গাছের অবলম্বন হয়। মধ্যপ্রদেশ গহ্বরে পরিণত হইলেও গাছ মরিয়া যায় না। কাঁঠাল গাছ শতাধিক বর্ষও বাঁচিয়া থাকে, গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলেই গাছ মরিয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন অবস্থাতেই মরে না। ইহার তক্তা করিতে ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের গাছ কর্ত্তন করিতে হয়। ৩০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কাষ্ঠের সার বেশ তাজা থাকে, কাণ্ডের কোন অংশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে কীট প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, গাছের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সজীব গাছ কাটিলে তাহার গোড়া হইতে কখনও কখনও নূতন ফেকড়ি বহির্গত হইয়াও বর্দ্ধিত এবং ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। এইরূপ গাছ হইলে ২।৩ বৎসরেও ফল ধরে, কাণ্ডের গোড়ায় এক বা দেড় হাত রাখিয়া তির্য্যকভাবে গাছ কাটিলেই গোড়া হইতে নূতন গাছ বাহির হয়। ঘরে থাকিলে কাঁঠাল কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় কিন্তু রৌদ্রে বক্র হইয়া ফাটিয়া যায় ও জলে বা মৃত্তিকার নিম্নে পচিয়া যায়, এই গাছের বল্কল ও ফলের বৃন্ত হইতে যে একরূপ ক্ষীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট রবার প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ আঠা নেকড়াতে মাখাইয়া বাঁশের কি কাঠের শলাকায় জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে একরূপ মশাল প্রস্তুত হয় এবং জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলো বাহির হয়।

কাঁঠালের চাষ বিশেষ লাভজনক। এক বিঘাতে ২০।২৫টী গাছ রোপণ করিলে ৫।৭ বৎসর পরেই ফলিতে থাকে। সপ্তম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি গাছে এক বা দেড় টাকা আয় হইতে পারে। এই সময় পর্য্যন্ত বাগানে আদা, হলুদ, কলা চাষ করিয়া আয়ের পথ বাড়ান যায়। ১২ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি গাছে গড়ে ৪০টী কাঁঠাল ধরিলে ও উহা ✓০ এক আনা হিসাবে বিক্রী করিলেও প্রতি বিঘাতে ৫০।৬০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ২০ বৎসরের পর প্রচুর ফলিতে আরম্ভ হইলে প্রতি গাছ হইতে ৪।৫ টাকার কম আয় হয় না সুতরাং ১০।১২ বিঘা কাঁঠাল বাগান করিতে পারিলে, তাহার আয় হইতেই একটী পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নিঃসন্দেহে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

লঙ্কা CHILLIES—CAPSICUMS.

বেগুণ যে জাতীয় উদ্ভিদ লঙ্কাও সেই জাতির অন্তর্গত। এই জাতীয় উদ্ভিদের শাস্ত্রীয় নাম স্যোলেনেয়ী (Solaneæ)। বেগুণ, লঙ্কা, টেপারি, টমাটো এবং তামাকও একই জাতীয় উদ্ভিদ। ভারতবর্ষে বাখরগঞ্জ, গোয়ালন্দ অঞ্চলে পদ্মার দুই ধারে, বগুড়াতে, চাইবাঁসা, পাটনা এবং গুজরাটে লঙ্কার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

নদীর চরে পলিমাটির উপর বালি দোঁয়াশ মাটিতে লঙ্কার আবাদ ভালরূপ হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে পর্ব্বতগাত্রে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটিতে, যাহাতে চূণের ভাগ অধিক আছে, লঙ্কা বেশ ফলিতেছে। লঙ্কা ক্ষেত্রের মাটি আল্গা ও নরম হওয়া আবশ্যক। কঠিন মৃত্তিকায় লঙ্কার আবাদ হয় না। বেগুণের শিকড় বরং কিঞ্চিৎ গভীর মাটিতে প্রবেশ করে কিন্তু লঙ্কার খুব ভাসা শিকড়। ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি ভাল মাটি পাইলেই লঙ্কা চাষ করা চলিবে।

লঙ্কা ক্ষেতের পাইট বেগুণ ক্ষেতরই মত। পলিপড়া চর জমি হইলে কথা নাই, সাধারণ দোঁয়াশ মাটিতে চাষ করিতে হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টিপাত হইলে জমিটি দুইবার চষিয়া তাহা মাটি ও সার গোময় ছাড়াইয়া বেগুণ ক্ষেত তৈয়ারি করার মত ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। শ্রাবণ মাসে উক্ত ক্ষেতে চারা রোপণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে হাপরে বা বীজ তলায় বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। চারাগুলি ৬।৭ ইঞ্চ বড় হইলে তবে ক্ষেতে রোপণ করা চলিবে। বীজতলা (বীজক্ষেত্র Seed bed) হইতে চারাগুলি উপড়াইয়া লইলে চলে, কপি চারার মত মাটি সমেত চারা উঠাইবার আবশ্যক হয় না। চারাগুলি উঠাইয়া শিকড় সংলগ্ন মাটি ধৌত করিয়া এবং শিকড় অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ছাঁটিয়া তবে ক্ষেতে চারা বসান কর্ত্তব্য। বেগুণের পক্ষে যে বিধি ইহারও তাই। চারা ক্ষেতে বসাইবার পর যদি এক পস্‌লা বৃষ্টি হয় তবে একটী চরাও মরে না, বৃষ্টি না হইলে প্রত্যেক চারা বসাইয়া টোপা (Watering slowly drop by drop) জল দিতে হয়। যত দিন বৃষ্টি না হয় চারাগুলি বাঁচাইবার জন্য দুই এক দিন অন্তর এইরূপ জল দেওয়া ব্যবস্থা রাখা কর্ত্তব্য। বাঙলা দেশে অনেক চাষী বেগুণের সঙ্গেই একটা অন্তর একটা লঙ্কা রোপণ করে।

যেখানে পাল্‌টি চাষের ব্যবস্থা আছে (Crop Rotation) তথায় ক্ষেত হইতে রবিশস্য কলাই শরিষা তুলিয়া লইয়া লঙ্কার জন্য ক্ষেত তৈয়ারি করা অথবা কখন বা আলুর পর লঙ্কা কিম্বা আউস ধনের পর লঙ্কা চাষ করা হয়।

সার—বেগুণের জন্য যে সার লঙ্কার জন্যও সেই সার প্রয়োগ ব্যবস্থা। বিঘা প্রতি ১॥০।২ মণ শরিষার খৈল দিলে লঙ্কার প্রচুর ফলন হয়। আশ্বিন কার্ত্তিকে জমির যো হইলে লঙ্কা ক্ষেত চষিয়া খৈল সার দিয়া দাড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। চারা বসাইবার সময়ও

এক মুষ্টি খৈল দিয়া বসাইলে আরও ভাল হয়। খৈলের পরিমাণ ১।।০।২/০ মণের অধিক বাড়াইবার আবশ্যক নাই। ঐ পরিমাণ খৈল দুই ভাগ করিয়া দিলেই হইল—বসাইবার সময় কিছু কম, দ্বিতীয় বার কিছু অধিক। অগ্রহায়ণ মাসে একটা বা দুইটা সেচ দিবার আবশ্যক হইতে পারে; প্রত্যেক সেচের পর মাটি খুসিয়া দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। লঙ্কা ক্ষেতে ঘাস বা আগাছা জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া ক্ষেতটি পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। লঙ্কা ক্ষেতে বলিয়া কেন সমুদয় সব্জী ক্ষেতেরই এই একই নিয়ম। ক্ষেতে শস্যের জন্য যে খাদ্য আছে তাহা যদি অগাছা কুগাছায় খাইয়া ফেলে তাহা হইলে শস্যগুলি কি খাইয়া বাড়িবে বা বাঁচিবে কিম্বা ফল প্রসব করিবে? ক্ষেতে ঘাষ বা আগাছা জমিতে দিলেই গাছের বাড় কমিয়া যায় এবং ফসলের পরিমাণ কম হয়। নিড়াইয়া যেমন ঘাস মারা যায় তেমনি বিলাতী চাকাওয়ালা কোদালে খুসিয়া দিলেও ঘাষাদি মরিয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিড়ানি অপেক্ষা কম খরচে কাজ হয় কিন্তু চাকাওয়ালা কোদাল আমাদের দেশের কোন চাষীরই নাই। ৩০।৩২৲ টাকা দিয়া চাকাওয়ালা কোদাল কিনিয়া রাখে এ সামার্থ তাহাদের নাই। তাহারা হাত কোদালে কোন রকমে কাজ সারিয়া লয় এবং তাহাতে খরচ অধিক হইলেও অন্য উপায় নাই। নিজের পরিশ্রমে যতদুর সুবিধা হয় করিয়া লয়।

ক্ষেতে চারার পরিমাণ—২০×৩০ ইঞ্চ অন্তর চারা বসাইলে ১ বিঘা ক্ষেতে (১৪৪০০ বর্গ ফিট) ৩৪৫৬টা চারা বসিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে লঙ্কার গাছগুলি বড় হয়, সুতরাং চারা ইহা অপেক্ষা ঘন না বসাইলে চারা রোপণের পর ক্ষেতের পাইট করায় বিশেষ অসুবিধা হয়, বিশেষতঃ ক্ষেতে লাঙ্গল দিবার সময় লাঙ্গল চালান কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে এবং অনেক চারা মারা পড়ে। এমতাবস্থায় বাঙ্গলার চাষীরা প্রায়ই ক্ষেতে আড়ে দিঘে ৩৬×৩৬ হাত অন্তর বিঘায় ১৬০০ মাত্র চারা রোপণ করে। ইহাতে চাষ কারকিতের সুবিধা হয় এবং ফলনও অধিক হয়। পার্ব্বত্য শুষ্ক মাটিতে গাছের বাড় তাদৃশ হয় না, তথায় ২০×৩০ অন্তর চারা রোপণ করাই সুযুক্তি। এক আউন্স বা ২।।০ তোলা বীজের চারাতে এক বিঘা জমির চাষ হয়।

ফল আহরণ—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতেই লঙ্কা গাছে ফল ধরে। লঙ্কা প্রথম বাজারে আসিলেই লোকে আগ্রহ করিয়া খরিদ করে। কাঁচা লঙ্কা ১৫।২০টা এক পয়সায় বিক্রয় হয়। জলদী ফলাইতে পারিলে চাষীরা কাঁচা লঙ্কা বেচিয়া অনেকটা খরচ পুষাইয়া লয়। পৌষের শেষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত লঙ্কার পূর্ণ ফলন হয়। এই সময়ের মধ্যে ক্ষেত হইতে সমুদয় লঙ্কা তুলিয়া গৃহজাত করা হয়। পাকা লঙ্কা রৌদ্রে শিশিরে ১৫ দিন ফেলিয়া রাখিয়া রসমরা হইলে তবে বস্তাবদ্ধ করিয়া বিক্রয়ের জন্য গোলাজাত করা হয় কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করা হয়। শুকাইবার সময় বৃষ্টি পাইলে

লঙ্কা বদ রং হয় ও তাহার আস্বাদ কমিয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টি হইতে লঙ্কাগুলি রক্ষা করা আবশ্যক।

ফলন—ভাল সারাল জমি না হইলে লঙ্কা চাষে লাভ হওয়া দুষ্কর। তেজস্কর জমি হইলে তবে বিঘা প্রতি ৫ মণ লঙ্কা ফলে, কমজোর জমিতে বড় বেশী ২ মণ ফলন হয়। চাষীরা লঙ্কা ৫।৬ টাকা মণের অধিক দরে বিক্রয় করিতে পারে না; ভাল লঙ্কা হইলে তবেই ঐ দর পায় নতুবা চারি টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে হয়। ফলন ভাল হইলে তবে তাহারা বিঘায় ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা লাভ করিতে পারে। বেগুণ চাষে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ। লোকসানের ভয়ে বাঙ্গলার চাষীরা এই কারণে অনেক সময় লঙ্কার চাষ সতন্ত্র না করিয়া বেগুণ উচ্ছে প্রভৃতির সহিত একত্রে করে। সতন্ত্র চাষে লঙ্কা ভাল না ফলিলে চাষীরা খরচের টাকাও উঠাইতে পারে না।

লঙ্কা চাষে খরচ—ক্ষেতে লাঙ্গল মৈ দেওয়া, নিড়ান কোপান জল সেচন, চারা রোপণ, দাঁড়া বাঁধা, লঙ্কা তোলা, সার দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে, তাহার উপর আবার জমির খাজনা আছে। অতএব চাষীরা ক্ষেতে ৪।৫ মণ লঙ্কা না ফলিলে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না।

লঙ্কা ক্ষেতে পোকা—ইহার উপর দৈব আপদ আছে। লঙ্কা গাছে প্রায়ই ছত্রক রোগ ধরিয়া থাকে। সার প্রয়োগে গাছের তেজ বাড়ান ও ক্ষেত বার্দ্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করা ছাড়া ছত্রক রোগ তাড়াইবার উপায় নাই। লঙ্কা চাষে একেই লাভ কম তাহার উপর বোর্দ্দোঁ মিশ্রণ ছড়াইবার খরচ চাষীরা বহন করিতে পারে না বা করিলেও লাভ দেখিতে পায় না—আলু বা আখের ক্ষেতে এইরূপ অতিরিক্ত খরচ করা সাজে কিন্তু লঙ্কা ক্ষেতে সাজে না।

লঙ্কার প্রকার ভেদ—অনেক রকমের লঙ্কা এখন ভারতের হাটে বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলায় দেশী লঙ্কা—(Capsicum frutescens) নেপালী লঙ্কারই মত। ইহাকে (Capsicum annum) বলে।

এমেরিকান কেইন লঙ্কা—(Cayenne) ভারতে অনেক স্থানে চাষ হইতেছে। ইহা বাঙ্গলার লঙ্কা অপেক্ষা লম্বা চওড়া।

ধানি লঙ্কা—বাঙ্গলায় এক রকম লঙ্কা জন্মায় ইহা আকৃতিতে খুব ছোট; ইহাকে (Capsicum minimum) বলে। ব্যবসায়ের জন্য ইহার চাষ হয় না

কিন্তু বাঙ্গলার গৃহস্থ বাটিতে ইহার গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লঙ্কায় অত্যন্ত ঝাল।

সূর্য্যমণি লঙ্কা—বাঙ্গলায় এই লঙ্কাও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও ঝাল আছে তবে ধানি অপেক্ষা কম। ইহা খুব সুস্বাদু। ব্যবসায়ের হিসাবে ইহার কেহ চাষ করে না। তবে চাষারা নিজ বাস গৃহের ধারে ভিতে দুই দশটা গাছ করিয়া রাখে এবং ইহার কাঁচা লঙ্কা বিক্রয় করে। ধানি লঙ্কার মত ইহা বারমাস ফলে এবং যত্ন করিয়া রাখিলে গাছ ২।৩ বৎসর থাকে, বছরকি লঙ্কার মত ফল শেষ হইলেই মরিয়া যায় না।

মিষ্ট লঙ্কা—পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রকার লঙ্কার চাষ হয়, তাহা তাদৃশ ঝাল নহে কিন্তু স্বাদগন্ধ অতিশয় মনোহর। এই অঞ্চলের লোকে ইহার তরকারি রাঁধিয়া খায়। এই অপেক্ষাকৃত কম ঝাল লঙ্কা পক্ষিগণকে খাওয়াইবার উপযুক্ত। লঙ্কা খাওয়াইলে পাখির গায়ের পোকা মরিয়া যায় এবং তাহাদের পালকের বড় উজ্জ্বল হয়।

সুইট স্প্যানিস্—(Sweet spanish) ইহা এক প্রকার এমেরিকান লঙ্কা তাদৃশ ঝাল নহে। এই লঙ্কা পক্ষিগণকে খাওয়াইবার বেশ উপযোগী। প্রায় ৩ ইঞ্চ লম্বা ও মোটা ফল হয়।

বুল নোজ—(Bull nose) ফলগুলির আকৃতি ষাঁড়ের নাকের মত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বুল নোজ। খুব ঝাল। ফলগুলি খুব স্থূলকায়, অগ্রভাগ চওড়া।

সিলেশ্চিয়াল—(Celestial) ফলগুলি ১ হইতে ২ ইঞ্চের অধিক বড় হয় না। ফল দেখিতে বড় সুন্দর; প্রথম ইহার রং সবুজ থাকে তারপর ঈষৎ হলদে ঘোর হলদে, লাল ঘোর লাল রঙে রঞ্জিত হয়। প্রচুর ফলে একটা ১৫০ শতের অধিক ফল ধরে।

স্মল চিলি রেড—(Small Chili Red)—ফল লাল, ছোট, খুব ঝাল।

রুবিকিং—(Ruby king)—ইহা এক প্রকার এমেরিকান লঙ্কা ইহার মত বড় লঙ্কা আর দেখা যায় না। ফলগুলি ৬ ইঞ্চি লম্বা, মোটা ৩॥০ ইঞ্চি। শাস খুব পুরু, ঝাল হীন। শুষ্ক অবস্থায় যতদিন ইচ্ছা রাখা যায়। এই লঙ্কা লবন সংযোগ করিয়া আদারসের সহিত মিশাইরা মাংস প্যাক করিবার কার্য্যে এমেরিকায় ব্যবহার হয়। ইহার স্বাদ গন্ধ অতি মনোহর। লঙ্কার শ্রেষ্ঠ লঙ্কা বলা যায়। গাছে কিন্তু অধিক ফল ধরে না

১০ হইতে ১৫ টার অধিক ফল হয় না। আমাদের দেশী লম্বা লঙ্কা সেই স্থলে ১৫০ হইতে ২০০টা ফলে, গড়ে সমান ফলই দাঁড়ায়। মেলাতে বা প্রদর্শনিতে দেখাইতে বেশ ভাল

রুবি কিং

বটে কিন্তু আমাদের দেশী লঙ্কা বা এমেরিকান কেইন লঙ্কা স্বাদে গন্ধে ফলনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

ক্রিমসন্ জায়ণ্ট (Crimson Giant)—চায়না জায়ণ্টের (Chinose Giant) মত লঙ্কা। ৪ কিম্বা ৪৷৷০ ইঞ্চি লম্বা এবং উক্ত প্রকার স্থূল ফল হয়। ইহার ফলন মন্দ নহে। ৬।৮টা ফল সর্ব্বদাই গাছে দেখিতে পাওয়া যায়। জলদী ফসল হয়।

ক্রিমসন্ জয়েণ্ট লঙ্কা
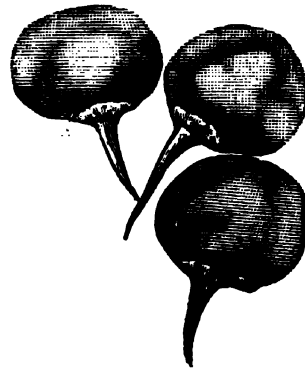
বিলাতী কুল লঙ্কা

বিলাতী কুল লঙ্কা—ইহার ফলগুলি দেশী কুলের মত গোল, আকারেও ঐরূপ। সূর্য্যমণি মত উর্দ্ধমুখে ফলে। ফল বড় ঝাল। রঙ ঈষৎ হরিদ্রাভ লাল।

স্মল কেইন—ইহা কেইন অপেক্ষা ছোট, ফলগুলি ২ ইঞ্চের অধিক বড় হয় না। বাঙলার দেশী লঙ্কার মত ইহার ফলন। গাছ বেশ তেজাল হয়।

টামাটো লঙ্কা—ইহার আকৃতি অনেকাংশে টমাটোর মত, কতটা বুলনোজের ধরণের। ইহার ফল স্থূল হয়। ফলন বুলনোজেরই মত।

পাটনাই লঙ্কা—দেশী বাঙ্গালা লঙ্কারই অনুরূপ লম্বা চওড়ায় কিছু বড়। অনেক বিলাতী ও এমেরিকান লঙ্কার এখানে চাষ হইতেছে। বড় স্থূলকায় লঙ্কাগুলি বাগান জমিতেই ভাল মতে জন্মায়। বাগানের সব্জী ক্ষেতে শোভাবর্দ্ধনের জন্য অনেকে ইহার চাষ করেন। ব্যবসায়ের জন্য চাষীরা দেশী লঙ্কা, এমেরিকান ছোট বড় কেইন লঙ্কা, পাটনাই লঙ্কারই চাষ করে।

দেশী বা পাটনাই লঙ্কা

লঙ্কার গুণ—লঙ্কা তরকারিতে মসালারূপে ব্যবহার করিলে তরকারি সুস্বাদু হয়। ইহা কফঘ্ন ও বাত ব্যাধি নাশক। যে সকল স্থানে বর্ষা অধিক হয় ও জলাজমি অধিক তথাকার লোকদিগকে স্বাভাবতই অধিক পরিমাণে লঙ্কা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হয়। নৌকায় মাঝিমাল্লারা সর্ব্বদা জলের উপর থাকে বলিয়া অধিক মাত্রায় লঙ্কা ব্যবহার করে। লোনা জায়গারও লঙ্কার ব্যবহার অত্যধিক। ব্রিটেন দেশের (যেখানকার জল হাওয়া লবনাক্ত নহে) লোক লঙ্কার ব্যবহারে তাদৃশ সমুৎসুক নহে।

লঙ্কার সুনিয়মিত ব্যবহারে উপকার আছে। লঙ্কার কতকগুলি জীবাণু নাশের ক্ষমতা আছে এবং রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে নষ্ট করিতে পারে। মচ্‌কান ব্যথা বা ফুলায় লঙ্কা বাটার প্রলেপ দিলে অতি সহজে ব্যাধি বিদুরিত হয়।

লঙ্কার ব্যবহার—লঙ্কা যে কেবল রন্ধনের মসালারূপে ব্যবহার হয় এমন নহে ইহার সতন্ত্র তরকারি, চাট্‌নি ও আচার হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে মিষ্ট লঙ্কার তরকারি খায়। তৈল লবণ পেয়াজ বা রসুন সংযোগে লঙ্কার অতি উপাদেয় আচার তৈয়ারি হইতে পারে। অম্ল, লবণ চিনি সংযোগে লঙ্কার সাতিশয় রসনা তৃপ্তিকর চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এমন কোন আচার কমই দৃষ্ট হয় যাহাতে লঙ্কার গুঁড়া নাই। রসনায় রস সঞ্চার করিতে লঙ্কার মত মসালা দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অত্যধিক ব্যবহারে কিন্তু দারুণ ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। উদরাময় অজীর্ণ রোগের হেতু অনেক সময় অতিরিক্ত লঙ্কা ব্যবহার বা অন্য কারণে ঐ সকল রোগ জন্মিলে লঙ্কা মুখরোচক বলিয়া ব্যবহার করিয়া অনেকে রোগ বাড়াইয়া ফেলেন। যাহা হউক লঙ্কার যত দোষই থাকুক্ গুণের তুলনায় তাহা ধর্ত্তব্য নহে এবং ইহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসালা তাহা স্বীকার করিতেই হইাব। শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল।

মাটি উল্টান পাখাওয়ালা লাঙ্গল

শিবপুরলাঙ্গল, মেষ্টনলাঙ্গল, হিন্দুস্থানলাঙ্গল প্রভৃতি লাঙ্গলগুলি পাখাওয়ালা লাঙ্গল এবং এই সকল লাঙ্গল দ্বারা জমি চষিলে জমির মাটি উল্টাইয়া যায় এবং দেশীলাঙ্গল অপেক্ষা ইহাদের দ্বারা এক চাষে গভীর কর্ষণ হয়। দেশী লাঙ্গলেও মাটি উল্টায় বটে কি তাহা অতি সামান্য মাত্রায়। পাখাওয়ালা ঐ সকল লাঙ্গলে কেবল যে গভীর কর্ষণ হয় এমন নহে এই সকল লাঙ্গলের ফলা অপেক্ষাকৃত চওড়া সুতরাং দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা এই সকল লাঙ্গলে চষিলে জমির শিরালগুলি (Furrows) চওড়া হয় এবয়ং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক জমি চষা যায়। পাখাওয়ালা লাঙ্গলগুলি দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা কিন্তু অধিক ভারি ও তাহাদের চওড়া ফলা ও পাখা আছে বলিয়া এইগুলি টানিতে কিছু অধিক বলের প্রয়োজন হয়। ছোট, কমজোর বা রোগা বলদে ঐ সকল টানিতে পারে না। আমাদের দেশের নিঃস্ব চাষীদের অনেকেরই হালের বলদ অতি নিকৃষ্ট ধরণের। তাহারা জমিতে এক চাষের পরিবর্ত্তে দুই বা তিন চাষ দিয়া তবে জমি তৈয়ারি করিতে পারে এবং তাহারা নাতোয়ান বলিয়া তহোদের একগুণের পরিবার্ত্ত দ্বিগুণ খরচ হয়। তাহারা অর্থাভাব বশতঃ বাধ্য হইয়া সময় ও শ্রম নষ্ট করিয়া লাভের অর্দ্ধেকও ঘরে লইয়া যাইতে পারে না। আমাদের দেশের জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারীর উন্নতিকল্পে সচেষ্ট না হইলে এই সমস্যার প্রতি-বিধান হওয়ার উপায় নাই। তাঁহারা প্রজাগণের হাল লাঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে এবং সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্য না করিলে চাষের সম্পূর্ণ উন্নতির আশা কোন কালেই সম্ভবপর হইবে না এবং তাঁহাদের নাতোয়ান প্রজাগণের কোন কালেই দারিদ্র ঘুচিবে না।

যখন জমির গভীর কর্ষণ আবশ্যক তখন চষীরা দেশী লাঙ্গলের চাষের ভরসায় থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে কোদালের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে কিন্তু খরচ চারিগুণ পড়ে, এক বিঘা জমি লাঙ্গলে চষিতে ৷৷৵৹ দশ আনার অধিক খরচ পড়ে না, কোদাল দ্বারা এই এক বিঘা জমি কোপাইলে ২৷৷৹ আড়াই টাকা খরচ হয়। কোদাল অপেক্ষা লাঙ্গলের চাষ নিশ্চয়ই অনতিগভীর হয়। পাখাওয়ালা লাঙ্গলের কাজ প্রায় কোদালেরই সমান হয়। শিবপুর কিম্বা শিবপুর লাঙ্গলের মত পাখাওয়ালা লাঙ্গল

দ্বারা এক বিঘা জমিতে দুইটি চাষ দিতে ১৲ এক টাকার অধিক ব্যয় হয় না, এবং ঐরূপ লাঙ্গল দ্বারা দীর্ঘ প্রস্থে দুইটি চাষ দিলে জমির পাইট কোদালের চাষের অনুরূপই হয়। সাধারণতঃ চাষীরা পাখাওয়ালা লাঙ্গল ব্যবহার করিতে উৎসুক নহে তাহার প্রধান কারণ তাহাদের বলদ তাদৃশ বলবান নহে এবং পাখাওয়ালা লাঙ্গলের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা গ্রাম্য কামার দ্বারা মেরামত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। চাষীদের এই শেষোক্ত ধারণাটি ভুল, শিবপুর লাঙ্গল যাহা আগাগোড়া লৌহ নির্ম্মিত তাহা ভাঙ্গিলে গ্রামে সারাইবার উপায় নাই বটে কারণ সহরে ভিন্ন ঢালাইয়ের কারখানা মিলিবে না কিন্তু মেষ্টন লাঙ্গলের মত লাঙ্গল যাহা কাষ্ঠ ও লৌহ নির্ম্মিত, যাহার ভিন্ন অংশ খোলা ও জোড়া যায় তাহা অনায়াসেই দেশী কামার দ্বারা মেরামত হইতে পারে। নূতন কোন চাষের যন্ত্রের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের চাষীর ত্রাস উপস্থিত হয়। সব যন্ত্র ব্যবহারের একটা কৌশল আছে এবং ব্যবহারে কি গুণ আছে তাহা একবার বুঝিয়া লইলে সকল বাধা অপসৃত হয়। এই সকল অবোধ চাষীগণকে শিখাইয়া বুঝাইয়া তাহাদের ভ্রম দূর করিয়া কাজে লাগাইবার লোক আমাদের দেশে কে আছে!

মজবুত পাখাওয়লা লাঙ্গল আচট (বহুকালের পতিত) জমি চষিতে অদ্বিতীয়। যে জমি বহুকাল পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, যাহা হাওয়ায় চাপে ও মনুষ্য ও পশুগণের পদদলিত হইয়া অতিশয় কঠিন হইয়াছে এবং যাহাতে আগাছা কুগাছার শিকড় জাল স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া মৃত্তিকাকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে এরূপ জমি ভাঙ্গা কোদাল ভিন্ন উপায় নাই। আচট অবস্থায় সাধারণ বলদ বাহিত লাঙ্গল উক্ত জমির দুই এক ইঞ্চ মাটিও কর্ষণ করিতে পারে না অধিকন্তু আবার শিকড়ে আটকাইয়া লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা পদে পদে দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কোদাল দ্বারা জমিটি কোপাইয়া তাহা হইতে আগাছা কুগাছার শিকড় ও গোড়া উঠাইয়া ফেলিবার পর তবে দেশী লাঙ্গলে চাষ কারকিতের সুবিধা হয়। কোদাল দ্বারা কোপাইবার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে এতদ্বারা ঘাসের শিকড়গুলি মৃত্তিকার নিম্নস্তরে যাইয়া প্রোথিত হয় এবং নিম্নস্তরের ভাল মৃত্তিকা উপরে উঠিয়া আসিয়া জমিটিকে শিঘ্রই আবাদের উপযুক্ত করিয়া তুলে। নিম্নস্তরের প্রোথিত ঘাসের শিকড় হইতে পুনরায় অঙ্কুর গজাইতে পারে না। লৌহ নির্ম্মিত মজবুত বিলাতী লাঙ্গল দ্বারা এই কার্য্য কম খরচে সাধিত হইতে পারে এবং কাজ কোন অংশে খারাপ হইবে না। জমিতে বড় গাছ থাকিলে তাহার গোড়াগুলি নিশ্চয়ই কোদাল দ্বারা অগ্রে উঠাইয়া ফেলিতে হয় নতুবা মৃত্তিকা নিহিত মোটা শিকড়ে লাগিলে বিলাতী লাঙ্গলও ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী কিম্বা জমিদারগণ ভিন্ন কার্য্যোপযোগী বিলাতী লাঙ্গল আনাইয়া বা দেশী লঙ্গলের উন্নতি বিধান করিয়া চাষীদের সাহায্যে ব্রতী না হইলে তাহারা পুরাতন চাষ পদ্ধতি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না বা ত্যাগ করিতে সাহসে কুলাইবে না।

কোন কোন সময় চাষের জমিতেও ঘাস ও আগাছা জমিয়া জমিটিকে নিস্তেজ ও আকর্ম্মন্য করিয়া ফেলে। ঐ জমি তখন দেশী লাঙ্গলে চষিয়া খুঁড়িয়া শস্য উৎপাদন করা কিছুতেই লাভজনক হয় না। তখন চাষীর কর্ত্তব্য জমিটি কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ফেলিয়া রাখা এবং তার পর জমিটি কোপাইয়া জমির ঘাস ও আগাছার শিকড় সমেত জমির নিম্নস্তরের মাটিতে প্রোথিত করিয়া ফেলা। নিম্নস্তরের কোমল ও কঠিন মাটি উপরের স্তরে আনিয়া জল বাতাস ও রৌদ্রে বৎসরের মধ্যেই সারবান হইয়া উঠে এবং নিম্নস্তরে ঘাস ও আগছাদি পচিয়াও সারে পরিণত হয়। কোদাল দ্বারা কোপাই-বার কালে মাটির চাপগুলি বড় কঠিন আকার ধারণ করে এবং তখনই সেগুলি ভাঙ্গিয়া শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করিলে বহু খরচের ব্যাপার হইয়া উঠে, কিন্তু এক বৎসর বৃষ্টির জল ও রোদ্র পাইলে এই গুলি স্বাভাবতই নরম ও চাষের উপযুক্ত হয়। যে সকল চাষী দীর্ঘ এক বৎসর কাল জমি ফেলিয়া রাখিতে না পারে তাহাদিগকে নিতান্তপক্ষে ছয় মাস বাধ্য হইয়া জমি ফেলিয়া রাখিতে হইবে নতুবা জমিটি পুনরায় সারবান হইবে না। বাঙলাদেশে শীতকালের শেষে প্রায়ই দুই তিন বার বৃষ্টি হয়। এই শীতকালীন বৃষ্টির পর জমি একটু নরম হইলে জমি কোপাইয়া ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ছয় মাসের পর বর্ষা শেষে আশ্বিন আবার চাষের কার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও একটু দোষ ঘটে কারণ পুরা এক বৎসরের কম ঘাষ ও আগাছাগুলি পচিয়া সার হয় না। বর্ষার পূর্ব্বে জমিতে অল্পমাত্রায় চুণ ছড়াইয়া দিতে পারিলে আগাছার পচন কার্য্য শিঘ্র সমাধা হয়। মাটি উল্টান লাঙ্গল দ্বারা এইরূপ জমির চাষ কারকিত করিতে পারিলে অনেক কম খরচে কার্য্য সমাধা হয়। এইপ্রকার জিরেন জমিতে (Fallow) চাষ কারকিত করিয়া আখ, আলু, তামাক প্রভৃতি চাষের উপযুক্ত অরা যায়। এই সকল ফসলের জন্য জমির বিশেষ পাইট করিতে হয় এবং জমিও সারবান হওয়া আবশ্যক।

ঘাষও আগাছা যেমন চষিয়া জমিতে প্রোথিত করিয়া মারিতে হয় তেমনি জমিতে প্রদত্ত সারও প্রোথিত করিতে হয়। সার মাটি চাপা না পড়িলে গলিয়া শস্যের খাদ্যোপযোগী হয় না। যে সকল ফসলে গভীর কর্ষণ আবশ্যক তাহাতে সারাদি ছড়াইয়া মাটি উল্টান লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সার জমির উপর ভাসিয়া থাকিলে শস্যের গ্রহনোপযোগী হয় না এবং জমির উপর সার ভাসিয়া থাকিলে বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই কার্য্য ভারি লাঙ্গল দ্বারা সম্পাদিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু আবার ধান কলাই, মটর, মুগ, মুসুর প্রভৃতি গুচ্ছ মূল শস্যের শিকড় অধিক মাটির নিম্নে যায় না। এই সকল ফসলের ক্ষেতে সার মাটির ৪।৫ ইঞ্চ নিম্নেই থাকিলেই ভাল হয়। এই সকল ফসলের জন্য দেশী লাঙ্গলের চাষই উপযুক্ত।

ধান চাষে পরীক্ষা হইয়াছে যে জমির নিম্নস্তরের মাটি উপরে উঠাইলে সদ্য বৎসরে তাহাতে ধান ভাল হয় না। ধানজমি দেশী লাঙ্গলে চষিয়া ৯ ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাটি আলা

করিয়া ধান রোপণ করিলে মাটি উল্টান লাঙ্গলে দ্বারা চষা জমির অপেক্ষা ধান প্রায় ৩ গুণ অধিক হয়, কিন্তু পর বৎসর আবার এই শেষোক্ত জমির ধান দেশী লাঙ্গলে চষা পূর্ব্বোক্ত জমিতে উৎপন্ন ধান অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক হয়। একটু অনুধাবন করিলে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। মাটির নিম্নস্তরে পটাস, ফস্ফরস, চুণ ও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই খাদ্যগুলি মৃত্তিকার সহিত মাটির উপরস্তরে উঠিবা মাত্রই উহারা উদ্ভিদের আহার যোগাইতে পারে না। আবহাওয়ার গুণে এই উদ্ভিদখাদ্যগুলি রূপান্তরিত হইয়া দ্রবনীয় না হইলে উদ্ভিদগণ শিকড় দ্বারা ঐ সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এই হেতু দেখা যায় যে এই নিম্নস্তরের মৃত্তিকায় সদ্য বৎসর অপেক্ষা পরবর্ত্তী বর্ষে ধান চাষে বিশেষ লাভ হয়। বৎসরের পর বৎসর যে জমিতে ধান হইতেছে সেই জমি যদি এক বৎসর শুকার সময় মাটি উল্টান লাঙ্গল দ্বারা উপরের মাটি নিচে, নিচের মাটি উপরে উল্টাইয়া ফেলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর ধানের ফসল অন্যান্য জমি অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। যে সকল চাষী সামান্য কিছু জমি লইয়া চাষাবাদ করে তাহাদের পক্ষে কখন কখন আবশ্যক বলিয়া একখানা পাখাওয়ালা লাঙ্গল রাখা সম্ভব নহে। যাহারা সমর্থ চাষী, যাহাদের অনেক জমি জামা আছে তাহাদের এরূপ লাঙ্গল আবশ্যক কারণ জমি রীতিমত চাষ কারকিত করাতে বিশেষ লাভ।

জমির অধিক নিম্নস্তরের মাটি এককালে উপরে না উঠাইয়া প্রত্যেক চাষে এক বা আধ ইঞ্চ হিসাবে নিম্নের মাটি উপরে উঠাইলে সদ্য ফসলের কোন বিশেষ অপকার হয় না। সময় বুঝিয়া গভীর কর্ষণ বা জমির মাটি উল্টাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিম্নস্তরে মাটি যদি রসা থাকে তবে সেই মাটি উল্টাইয়া জমির উপরস্তরে আসিলে মাটির চাপগুলি শুষ্ক হইয়া ইটের মত শক্ত হইয়া যায়। সেই মাটি রোদ বৃষ্টিতে গলিতে অনেক সময় আবশ্যক এবং যতদিন না গলিবে ততদিন তাহাতে শস্যোৎপাদন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। কর্দ্দমাক্ত মাটিতে সাধারণতঃ এই ব্যাপার ঘটে, বালি দোঁয়াষ মাটির একপ্রকার শক্ত চাপ হয় না এবং বালি দোঁয়াষ মাটি চাষ কারকিতে সহজেই চাষোপযোগী করা যায়। এই হেতু কর্দ্দমাক্ত ম্যাটিতে বা যে মাটির নিম্নস্তর সাধারণতঃ রসা তাহাতে পাখাওয়ালা লাঙ্গল সাবধানে সময় বুঝিয়া ব্যবহার না করিলে ফল খারাপই হয়।

নদীর চরের বা পাহাড় তলীর পলিপড়া জমিতে পাখাওয়ালা লাঙ্গল ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। পলিমাটির অনতি গভীরস্তরের নিম্নেই বালি কাঁকর থাকে তাহা ফসলের পক্ষে কিছুতেই অনুকূল নহে সুতরাং সেই মাটি উপরস্তরে উঠিয়া জমিটিকে খারাপ করিয়া না-ফলে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় ঐ সকল স্থানে দেশী লাঙ্গল দ্বারা অনতি গভীর চাষই প্রশস্ত। এই প্রকার জমিতে রবিশস্য ধান গম প্রভৃতিই ভালরূপ জন্মায়। আলু, মুলা কিম্বা বেগুণ চাষ এই সকল জমির উপযুক্ত নহে।

গঙ্গার দুই ধারে যে সকল চর ভরাটি জমি হইয়াছে তাহার প্রকৃতি বেশ চাষের

অনুকুল ইহার অধিকাংশ জমিতে দেশী লাঙ্গলে বেশ চাষ হয় এবং খুব গভীর কর্ষণ করিয়া জমির প্রকৃতির বিকৃতি ঘটাইলে অনেক সময় অনিষ্ট হয় ।

বঙ্গোপসাগরকূলে জমির লবন রৌদ্র বৃষ্টিতে বাতাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ধান চাষের উপযুক্ত হয় কিন্তু ঐ সকল জমির নিম্নস্তরে লবনাক্ত মৃত্তিকা থাকে ; গভীর চাষে নিচের মাটি উপর উঠিলে ধান্যাবাদের ক্ষতি হয় । জলা জমির ধান চাষে গভীর কর্ষণে আর একটি বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে । জলা জমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত জীবজ পদার্থ পচিয়া ও তাহা রৌদ্রে বাতাসে সংশোধিত হইতে না পাইয়া এক প্রকার অম্লের (Humic acid) সৃষ্টি হয় যাহা উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্ত হানিকর। গভীর কর্ষণে নিম্নস্তরের মাটি উপরে উঠিলে জমির অম্লাক্ততা বৃদ্ধি পায় ।

গভীর ও অনতি গভীর চাষ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা বুঝিলাম যে—

(১) আচট জমি চাষে পাখাওয়ালা লাঙ্গল অধিকতর উপযোগী ।

(২) জিরেন জমি চাষে পাখাওয়ালা লাঙ্গল অধিকতর কার্য্যকরী ।

(৩) আলু আখ চাষে পাখাওয়ালা লাঙ্গল সাতিশয় উপযুক্ত ।

(৪) পাখাওয়ালা লাঙ্গলে চাষ ও কোদালের চাষ অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে অথচ ইহাতে খরচ অনেক কম ।

(৫) উপরের মাটি শুষ্ক হইলে দেশী লাঙ্গলের চাষে সুবিধা হয় না । এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের রসা মাটি উপরে উঠিলে সদ্য ফসল জন্মাইবার সুযোগ ঘটে । বালি দোঁয়াষ মাটিতে এই সুযোগ পাওয়া যায়, অন্য মাটিতে বরং অপকারের সম্ভাবনা । এখানে পাখাওয়ালা লাঙ্গল আবশ্যক ।

(৬) রবিশস্য বা ধান চাষের ক্ষেতে দেশী লাঙ্গলে চাষ কিছুতেই খারাপ হয় না বরং গভীর চাষে সদ্য শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত হইতে পারে ।

(৭) সার দেওয়া জমিতে গভীর চাষ দিলে সার নিম্নস্তরে পড়িয়া ফসলের কোন উপকারে আসে না এবং এস্থলে দেশী লাঙ্গল ব্যবহার করা ভাল ।

পল্লী জীবন ও সহুরে জীবন

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ
শ্রীযুক্ত শারদাচরণ মিত্র এম,এ, বি,এল, লিখিত

বর্ত্তমান যুগে সহর নগরে বাস করিবার জন্য সকলেরই একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে এবং সহরবাসী ও পল্লীবাসীর মধ্যে একটা ছাড়াছাড়ি ও বিরোধী ভাবের সঞ্চার হইয়াছে সহরবাসীরা যেন পল্লীবাসীদিগকে চায় না। সহরবাসীরা ঐহিক জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা ও বিলাসিতায় মত্ত, পল্লীবাসীরা নিতান্ত সাদাসিধে একঘেয়ে, পাড়াগেঁয়ে রকমের। সহরে আমোদ আহ্লাদের সুযোগ কত, পল্লীগ্রামে কিছুই নাই। সহরের আকর্ষণ কেবল আমোদ আহ্লাদের জন্য নয়—সহরে আসিলে লোকে চাকুরি করিয়া হউক বা যেমন তেমন করিয়া কিছু রোজগার করিতে পারে। পল্লীগ্রামের অবস্থা বর্ত্তমানকালে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রোজগারের কোন পন্থা নাই। নানা কারণে এখন লোকে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করিতেছে—ইহাতে পল্লীগুলি ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে এবং সহরে অতিরিক্ত ভিড় বাড়ায় এখানেও অসুবিধা হইতেছে। সুদূর পল্লীগ্রামে কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য নাই—গ্রামে গ্রামে লোক ভরা থাকিলে অধিক খরিদ্দার যুটিলে তবেত দ্রব্যের দাম বাড়িবে! সহর ও নগরের বাজারে দ্রব্যের দাম বাড়িতেছে, খরিদ্দারের বাহুল্য হেতু। সকলেই আসিয়া সহর নগরের নিকট ব্যবসা করিতে চাহিতেছে। দূরস্থিত পল্লীগ্রামের চাষীরা জমি চষিয়া খুঁড়িয়া তাহাদের নিজের ও পরিবারবর্গের আহার সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না এবং তাহারা একাহারে বা অনাহারে মরিতেছে। লোকাভাবে গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, পুষ্করিণী জলাশয়াদি মজিয়া যাইতেছে, গ্রামগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে—চিকিৎসার সুবিধা নাই। এই অবস্থায় যাহারা পল্লীগ্রামে থাকিতে চায় তাহারাও পালাইতে বাধ্য হইতেছে।

সহরের লোক পল্লীবাসীগণকে চায় না—কিন্তু সহরের লোকে কি পল্লীগ্রামের সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? পল্লীর লোক ভিন্ন কে তাহাদিগকে খাদ্যবস্তু যোগাইবে? তাহারা কি কোন কালে ফল শস্য সবজীর পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত কৃত্রিম খাদ্যে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এমন আশা রাখে? তাহা কোনকালে কোনমতে সম্ভব হইবে না। এমতাবস্থায় সহরবাসীকে পল্লীবাসীর সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে না কি? সহরের লোকে পল্লীর কৃষিজাত দ্রব্য খরিদ করিলে পল্লীর চাষীরা লাভবান হইতে এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারিত। কিন্তু যাহারা কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিবে তাহাদিগের রক্ষার বিধান ত আগে করা চাই। সহরবাসীরা যে পল্লীবাসীর ঘেঁষ সহ্য করিতে পারে না। সহরবাসীরা পল্লীর অবস্থা দেখিতে যাইতেও

কুণ্ঠিত। পল্লীগ্রাম ও পল্লীবাসীরা তাহাদের অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিষ। পল্লীবাসীরাও এই কারণে সহরবাসীর সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত। পরস্পরের মধ্যে এই প্রকার বিরোধী ভাব ঘুচিয়া সৌহৃদ্য স্থাপিত না হইলে কোন পক্ষেরই কল্যাণ নাই। সকলকে সহরে টানিয়া না আনিয়া যাহাতে পল্লীগুলি বাসের উপযুক্ত হয় এবং পল্লীবাসের বিশেষ বিশেষ কষ্টগুলি দূরীভূত হয়, সহরবাসীকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও পল্লীগ্রামে বাসভবন স্থাপন করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে পারিলে সহরবাসীও অপেক্ষাকৃত সস্তায় প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি খরিদ করিতে পারিবে।

আমার ধারণা সহরবাসীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালার নাগরিকগণ পল্লীবাসীর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও কতটা দায়িত্ব তাহা ভুলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদেরও যে স্বার্থহানি হইতেছে তাহাও তাঁহারা ভাবেন না। দার্শনিকগণ বলেন যে স্বার্থই লোককে কার্য্যে প্রণোদিত করে কিন্তু কৈ সহরবাসী ত তাঁহাদের নিজ স্বার্থে অন্ধ! পল্লীর উন্নতি জেলা বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড দ্বারা যতদূর সম্ভব হয় হউক, কিম্বা পল্লীবাসীরা নিজেরা যা পারে করুক। সহরবাসী তাহাদের নিকট হইতে লইবে, তাহাদিগকে কিছু দিবে বা তাহাদের বিষয় কিছু চিন্তা করিবে না কিন্তু দিলে যে আরও অধিক পাওয়া যায় সহরবাসী তাহা মনে স্থান দেন না।

এই কলিকাতাবাসীরা যদি পল্লীর চাষাবাদের উন্নতির কথা ভাবিত, চাষীদিগকে হাল লাঙ্গল বীজ কিম্বা অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিত এবং পল্লীস্বাস্থ্য উন্নতি করিতে যত্নবান হইত তাহা হইলে উভয় পক্ষের কতটা ভাল হইত, কতটা সুখের হইত। এই বিষয়টি আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল আলোচনা নহে, কাজের সময় উপস্থিত। আমরা অনেক সুবক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, অনেক মুখ সর্ব্বস্ব লোকের উপদেশে আমাদের কান জ্বালা ধরিয়াছে, আর বাক্যে কিছু হইবে না, কাজে নামা চাই, ঐকান্তিক চিন্তা এবং কার্য্য; বাক্য নহে, কাজ আবশ্যক।

এখন সমস্যা এই—

(ক) কি প্রকারে দেশের শস্য বৃদ্ধি করা যায়।

(খ) কি প্রকারে আবার পল্লীগুলি মনুষ্যবাসের উপযোগী করা যায় এবং কি প্রকারে পল্লীবাসীর সমান্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া তাহাদিগকে পল্লীবাসে পুন প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তাহাদের সহরবাসের ইচ্ছা দূর করা যায়।

(গ) কি প্রকারে পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নত হইতে পারে।

(ঘ) কি উপায়ে সামান্য খরচে পল্লীবাসীর চিকিৎসা চলিতে পারে।

সহরবাসীর অনেক জায়গায় খাতির আছে, তাঁহাদের পয়সা আছে, তাঁহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চা আছে,—তাঁহাদের এই তিনটি গুণই পল্লীবাসীর উপকারে আসিতে পারে।

পল্লীবাসী নিরক্ষর—গ্রামের সামান্য সামান্য পাঠশালাগুলি উঠিয়া গিয়াছে, মধ্যবিত্ত লোক নানা কারণে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছে ও আসিতেছে। তাহাদিগকে রোজগারের খাতিরে সহরে আসিতে হইতেছে, ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার জন্য আসিতে হইতেছে, স্বাস্থ্যের জন্য আসিতে হইতেছে। পল্লীবাসে তাহারা আর ভাত ডাল সংগ্রহ করিতে পারে না বা তাহাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। এই বিষম সমস্যার মীমাংসা চাই সহরবাসী ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

ব্রিটনবাসীগণ আমাদের বিধিমত প্রকারে উপকার করিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়া অন্য নির্ভরতা ভুলিয়াছি। মুসলমানগণের আমলে প্রজাগণ চাষাবাদ, শিল্প বানিজ্য, শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ের নিজেরাই বিধি ব্যবস্থা করিত; এক্ষণে ব্রিটিস রাজ সমস্ত বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতে যাইয়া আমাদিগকে অন্ধ, খঞ্জ, মুখ ও বধীর করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা এখন যেন ব্রিটিস রাজের আদুরে ছেলে, গভর্ণমেণ্ট আমাদের 'মা' 'বাপ' তাঁহারা যা করিবেন তাহাই হইবে আমরা নিজেরা কিছুই করিব না। ইহা বড় শোচনীয় অবস্থা আমাদের আত্ম নির্ভরতা চাই, আমাদের হস্ত পদাদিও চক্ষুর কার্য্য চাই, পল্লী সহর একত্র কার্য্য করা চাই নতুবা আমাদের রক্ষা নাই। যাহার চেষ্টা আছে সেই ভগবানের কৃপলাভ করে, নিশ্চেষ্ট কখন কৃপালাভে সমর্থ হয় না।

[লেখক বাঙ্গালার সকলের নিকট সুপরিচিত হইলেও তাঁহার একটি অসামান্য গুণের কথা অনেকেই জানে না। তিনি তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তাঁহার পানিসিহালাস্থিত পল্লীবাসে সাতিশয় অনুরক্ত। এই পল্লীবাসের রাস্তা, ঘাট, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। দুর্গোৎসবাদি যাহা কিছু ক্রিয়া কলাপ তাঁহার এই পল্লীবাসে সম্পন্ন হয়। তিনি নূতন উপায়ে নিজে চাষাবাদ করিয়া সর্ব্বদাই স্থানীয় চাষীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি চাষীগণের বন্ধু এবং তাহারাও তাঁহার প্রিয়। তাঁহার কথা ও কাজে ঠিক আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান।

এই প্রকার আর একটি সদ্‌দৃষ্টান্ত আছে—ইটাচোনা নিবাসী শ্রীযুত বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু আদর্শ জমিদার। তিনি তাঁহার জমিদারীর উন্নতি কল্পে বহু যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আমরা বারান্তরে তাঁহার প্রজাপালন পদ্ধতির আলোচনা করিব।] কৃঃ সঃ

জাপানী ও বাঙ্গালী।—জাপানীদের আহার ব্যবহার সাধারণতঃ খুব সাদাসিধা কিন্তু বাঙ্গালীর চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জাপান প্রত্যাগত যুবকগণ বলিয়াছেন যে জাপানীরা প্রায়ই ভাত মাছ খাইয়া থাকে। শিমের চাট্‌নী দিয়া তাহারা কাঁচা মাছ খায়। ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও মাছের কোন বিশেষ তদ্বির করে না, তাহারাও ভাত, মাছ, চাট্‌নী এবং এক পেয়ালা চায়ে সন্তুষ্ট, বাঙ্গালা দেশের ধনীদের ১৬।১৮টা ব্যঞ্জন না হইলে চলে না, কখন ৫০ ব্যঞ্জনের যোগাড় চাই। তাঁহাদের দুই বেলার খাওয়া লইয়া গৃহিণী হইতে বাটীর ১০।১৫ জন ঝি চাকর সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বাঙ্গালার সাধারণ গৃহস্থেরাও নিতান্ত কম তরকারী খান না। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ধনী লোকরাও খাওয়া লইয়া এত বাড়াবাড়ি কিছু করেন না। পশ্চিমের লোকেরা বলেন যে বাঙ্গালীর মেয়েদের নানা প্রকার তরকারী কুটিয়া রান্না করিতে এবং বাঙ্গালী পুরুষদের সেই সব খাইয়া হজম করিতে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহাতে তাহারা ভাল কাজ করিবে কখন ও কিরূপে? বাস্তবিক রান্না খাওয়ার এতটা বাড়াবাড়িতে যে কেবল সময় ও শক্তি নষ্ট হয় তাহা নহে অকারণ অনেক অর্থনাশও হয় এবং বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া মানুষ একটু অকেজো হইয়া পড়ে। আমরা অবশ্য জাপানীদের মত কাঁচা মাছ খাইতে বলিতেছি না; আমরা এইমাত্র বলি যে উদর পূজা জীবনের প্রধান ও অন্যতম কার্য্য করিয়া না তুলিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কয়েক রকম পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষা অধিকাংশ স্থলে ভাসা ভাসা, শিক্ষার পূর্ণতারদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি কদাচিত আকৃষ্ট হয়। কিছু শিখিয়া বাকিটা চালাকিতে মারিয়া লইব এইরূপ তাঁহাদের উদ্দেশ্য। জাপানীদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা সর্ব্বপ্রকার শিল্পে পূর্ণদক্ষতা লাভ করিয়া নিখুঁত জিনিষ প্রস্তুত করিতে চায়; ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। চরম উৎকর্ষ লাভের এই যে ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহাই তাহাদের শিল্পে অনতিকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভের মূল কারণ। আমাদের দেশে যিনি যে কাজ করেন তাঁহার কাজের দোষ দেখাইলে অনেক সময় তিনি অপমান বোধ করেন। ইংরেজের দোকানে দেশীয় লোকেই কত ভাল ও নিখুঁত কাজ করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর কারখানায় প্রায়ই নিখুঁত জিনিষ হয় না। বাঙ্গালী কাজের উপযুক্ত নয় তাহা বলা যায় না, বাঙ্গালীর কার্য্যকরী বুদ্ধি নাই তা নয়; বাঙ্গালী চায় কোন রকমে কাজ বজায় করিতে, সম্পূর্ণ দক্ষতার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই এবং প্রাণপণ অধ্যবসায় তাহার নাই।

জাপানী অধ্যবসায়গুণে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে বসিয়াছে, বর্ত্তমান যুগের রণকৌশলে ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ হইয়াছে। গোলোন্দাজী বিদ্যায় তাহারা এত সুনিপুণ হইয়াছে যে রুসিয় সৈনিকগণ তাহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে।

উদ্ভিদ লম্বা ও খর্ব্বাকৃতি হয় কেন?—স্বাভাবত দেখিতে পাওয়া যায় যে উদ্ভিদ তাহার বংশগত গুণ ও পিতামার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় উদ্ভিদের একই নিয়মে কার্য্য হয়। লম্বা উদ্ভিদের বংশে লম্বা গাছই জন্মে। আবার দেখা যায় যে উদ্ভিদগণ আলোক ও উন্মুক্ত আকাশ পাইবার জন্য সদাই ব্যস্ত। অন্ধকার ঘর হইতে আলু কলাই, আম, কাঁঠাল তালের চারা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। ছায়ার আম কাঁঠাল গাছ ঝাড়াল না হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি উর্দ্ধমুখে বাড়িতে নিয়োগ করে ও ক্ষীণায়তন হইয়া উর্দ্ধমুখে বাড়িতে থাকে। ছায়ায় কলা গাছ তাল গাছ প্রমাণ হয় কিন্তু রোদপিঠে জায়গায় কলাগাছ বেঁটে খাঁট হয়। রোদপিঠে জায়গায় কলাগাছে ফল অধিক হয়। ছায়াযুক্ত পর্ব্বত গাত্রের কিম্বা পর্ব্বতের নিম্নদেশের গাছগুলি রৌদ্র বাতাস পাইবার জন্য লম্বা হইয়া বাড়িতে থাকে। তাহাদের দেখিলেই মনে হইবে যে তাহারাও পর্ব্বত সমান বাড়িতে যায়। খুব ঘেঁসাঘেঁষি গাছ জন্মিলে তাহারা আশে পাশে বাড়িতে না পারিয়া লম্বা হইয়া উর্দ্ধে উঠে। পাট লম্বা করিবার জন্য পাটের বীজ ঘন করিয়া ফেলা হয়। উদ্ভিদ এই প্রকার বীপরিত অবস্থায় পড়িলে তাহারা যেন তাহাদের বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। লম্বা বংশের উদ্ভিদ লম্বা হইবে এবং খর্ব্বাকৃত উদ্ভিদ বংশ-পরাম্পরা খর্ব্বারাকৃতি হইবে ইহাই কিন্তু স্বাভাবিক হয়।

কাঁঠাল গাছে আয়।—"কাঁঠাল প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতি বিঘায় ২৫টা গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। ইহা কিন্তু অসম্ভব। আম, কাঁঠাল ও লিচু গাছ ৩০ ফিটের কম ব্যবধানে বসান উচিত নহে। গাছে গাছে ডালপালায় ঠেকাঠেকি হইয়া গেলে, সে সকল গাছ ভাল ফলে না। কাঁঠাল গাছ একটু ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মিতে পারে এবং কথঞ্চিৎ ঘেঁসাঘেঁষি বসাইলেও দোষ হয় না। ২৫ ফিট ব্যবধানে বসাইলেও বিঘাতে (১৪৪০০ বর্গ ফিটে) ২০।২১টা গাছের অধিক বসান যায় না। গাছ কতকটা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক গাছ হইতে পচা, ঝরা বা চুরি বাদে ২০।২৫টা বিক্রয়যোগ্য ফল পাওয়াই অধিকতর সম্ভব, ইহার দাম ১॥০ হইতে ২৲ টাকা। পূর্ণ বয়স্ক গাছ হইতে গাছ প্রতি গাছে ২৲ টাকা আয় নিশ্চিত, ৪৲ ৫৲ টাকা আয় কদাচিত হয়। লেখক দেখিতেছি কাঁটাল গাছ ছাঁটায় বিরোধী, আমরা কিন্তু ছাঁটার পক্ষপাতী। ২৪ পরগণায় ছাঁটার প্রথা প্রচলিত। কাঁঠাল গাছ ছাটিলে এবং তাহার গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষত করিয়া দিলে অধিকতর ফল লাভ হয়। গাছের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে ডাল শিকড় ছাটাই গাছকে পূর্ণমাত্রায় ফলবান করিবার উপায়, ইহার ত যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পত্রাদি

কলের লাঙ্গল—

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ সরকার। সাগর পাড়া, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

প্রশ্ন—বহুদিন হইল শুনিয়া আসিতেছি—এক প্রকার কলের লাঙ্গল হইয়াছে, তদ্বারা সহজে স্বল্পায়াসে সামান্য খরচ ও অল্প সময় মধ্যে বিস্তর ভূমি কর্ষণ করা যায়। কিন্তু এপর্য্যন্ত উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণও আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

উহা ব্যবহার করিতে কয়টী লোকের আবশ্যক হয়? বলদ লাগে কি না, লাগিলে কয়টী, মই সারা চাষ হয় কি না অথবা বলদ জুড়িয়া পরে মই দিতে হয়? অসমতল জমি (ভিটা ইত্যাদি) চাষ করা যায় কি না? বালু মাটি বা দোঁয়াশ মাটি ব্যতীত এঁটেল মাটিতে বা খুব শক্ত জমিতে অর্থাৎ যে সমস্ত জমিতে খুব বড় বড় চাপ বা ঢেলা উঠে তাহাতে চাষ দেওয়া যায় কি না? এবং দিলে লাঙ্গলের কোন ক্ষতি হয় কি না? অতিরিক্ত ঘাসযুক্ত জমি চাষ করা যায় কি না?

উত্তর—চরিদিক হইতেই কলের লাঙ্গলের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ষ্টীম বা মোটর ইঞ্জিন বাহিত কলের লাঙ্গল চালাইতে খরচ অনেক। এবং অন্ততঃ ৫০০ শত একর জমি একলপ্তে না পাওয়া যাইলে ঐ সকল লাঙ্গল চালাইবার সুবিধা হয় না। ক্ষেতটিও যতদুর সম্ভব সমতল করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। ক্ষেতের এক পাশে ইঞ্জিন স্থাপন করিয়া ক্ষেতময় লাঙ্গল চলাচলের লাইন ও দড়ি দড়া খাটাইয়া লইতে হয়। মোটর ইঞ্জিন হইলে মোটর চলাচলের রাস্তা ক্ষেতময় করা আবশ্যক। অন্ততঃ ১০ হাজার টাকার কমে এই সকল লাঙ্গাল ক্ষেতে স্থাপন করা যায় না, তদুপরি আবার কার্য্য পরিচালনের খরচ আছে। ঐ সমস্ত লাঙ্গল ছাড়া, ছোট খাঁট কলের লাঙ্গাল আছে। যাহাতে সাধারণ লাঙ্গল অপেক্ষা যাহার একটু বিশেষত্ব আছে, একটু কল কৌশল আছে তাহাকেই আমাদের দেশের লোক কলের লাঙ্গল বলে শিবপুর লাঙ্গল, মেষ্টন লাঙ্গল, হিন্দুস্থান লাঙ্গল প্রভৃতি পাখাওয়ালা লাঙ্গল গুলিকেও কলের লাঙ্গল বলা হয়। ইহাদের দাম অধিক নহে; মেষ্টন লাঙ্গলের দাম ৭৷৷০ টাকা, হিন্দুস্থান ও শিবপুর লাঙ্গলের দাম আজকাল কত জানা নাই বোধ হয় ২০৲ টাকার অধিক হইবে না। যে ক্ষেতে দেশী লাঙ্গল চলে সে ক্ষেতে এই সকল লাঙ্গল চলিবে। এই সকল লাঙ্গল এক চাষে মাটি গভীর কর্ষণ হয় ও মাটি উল্টাইয়া পড়ে।

এই সকল লাঙ্গল বলদে টানে অপেক্ষাকৃত জোরাল বলদ চাই। স্থানান্তরে এই প্রকার লাঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা পাইবেন। ছোট জমির পক্ষে এই গুলিই উপযুক্ত। বিলাতী দাঁড়া টানা, আলু তোলা, আখের গোড়া তোলা লাঙ্গল আছে, তাহাও গরু, ঘোঁড়াতে টানে দাম ৫০৲ ৬০৲ টাকার অধিক নহে। বৃহৎ ব্যাপারে না যাইয়া

এই সকল লইয়া ছোট ছোট ফার্ম্মের কাজ বেশ চালান যায়। আপনি রাজসাহি গভর্ণমেণ্ট কৃষি ক্ষেত্র যাইয়া কোন কোন বিলাতী লাঙ্গলের কার্য্য দেখিতে পাইবেন।

——:*:——

খেজুর রসের মাতন (Fermentaltion)—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তেজপুর, আসাম।

প্রশ্ন—খেজুর রস কলসীর মধ্যে থাকিয়া গাঁজিয়া উঠে ইহার প্রতি বিধান কি ?

উত্তর—সাধারণতঃ এতদঞ্চলের চাষীরা রসের ভাঁড়গুলি দুই একদিন অন্তর ধুইয়া পুঁছিয়া ধোঁয়া দ্বারা পরিশুষ্ক করিয়া লয়। উত্তাপ ও ধোঁয়াতে জীবাণু সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং উক্ত ভাঁড়ে সঞ্চিত রস মাতিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা জল দ্বারাও খেজুর গাছের কর্ত্তিতাংশ ধুইয়া ফেলে। শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার খেজুর গুড় প্রবন্ধে আর একটি প্রতি শোধক উপায়ের কথা বলিয়াছেন। সেটি—

ফর্ম্মালীন (Formaline)—

ঐ ক্রিয়ার উৎকৃষ্ট প্রতি রোধক। ফরম্যালীন জল মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দিয়া খেজুর গাছের কর্ত্তিতাংশ বেশ করিয়া ধুইয়া দেওয়া উচিত এবং প্রতি নাগরীতে সামান্য পরিমাণ ফরম্যালীন রক্ষিত হইলে সংগৃহীত রসের শর্করা ভাগ নষ্ট হইতে পারে না। শতকরা দশ ভাগ ফরম্যালীন দ্বারাই বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রতি গাছে ধৌত করিতে সপ্তাহে ১॥০ দেড় ড্রামের বড় বেশী ফরম্যালীন আবশ্যক হয় ভাঁড়ে দিতে হইলে তাও প্রতি অর্দ্ধ ড্রামও লাগে না। মোটামুটী হিসাবে দেখা যায় যে সমগ্র আয়ামে একশত গাছে ৪।৫ পাউণ্ড ফরম্যালীন লাগে। ইহার মূল্য কলিকাতা বাজারে ৩॥০ টাকা মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে গাছ প্রতি সমগ্র আয়ামে দুই পয়সা মাত্র খরচ লাগে। ইহা সামান্য খরচা বলিতে হইবে; অথচ যদি শতকরা পাঁচ ও সাত গুণ শর্করাংশ এই প্রক্রিয়ায় বাড়ে তাহা হইলে লাভের হিসাবে তাহা নিতান্ত কম নহে।

——:*:——

কয়েক প্রকার সরু বীজ ধান—

শ্রীকেদারনাথ সেন, গুপ্তিপাড়া, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—বাঁকতুলসী, বাঁকচুর, বাঁসমতি, কামিনীসরু, দাদখানি, বাঁধুনীগন্ধ, বাদাসা ভোগ, কাম্মারি ভোগ, বাদসাপসন্দ, সমুদ্র বালি, কর্পূর কাটি, রানীপাগল, ক্ষেলেজিরে, পেসোয়ারি সোয়াতি বীজ ধান কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত ?

কাসাভা ও চুবড়ী আলুর বীজ বসাইতে হয় বা অন্য কি প্রকারে গাছ করা যায়? বীজাদি কোথায় পাইব?

অপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান, কারাভোনিকা বানি ও বুড়ি কাপাস বীজ কোথায় পাইব?

উত্তর—বাঁকতুলসী, বাঁকচুর, বাঁসমতি, কামিনীসরু, দাদখানি, বাঁধুনি পাগল, কেলে জিরা প্রভৃতি ধানের আবাদ ২৪ পরগণার সদর সব সবডিভিসনে জন্মিয়া থাকে। এই সমুদয় ধানের বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতির আফিস হইতে সময় মত অনুসন্ধান করিলে পাইবেন, এখনই পাইতে পারেন। বীজ ধানের মূল্য ৬৲ ৮৲ টাকা প্রতি মণ। বাকী ধানগুলি বর্দ্ধমান জেলার ধান, বর্দ্ধমান গভর্ণমেণ্ট কৃষি ফার্ম্মে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

পেসোয়ারি সোয়াতির বীজ আমরা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। এতদঞ্চলে চাষে সুবিধা হয় নাই। ধান ক্রমশঃ মোটা হইতে লাগিল ও ফলন কম হইয়াছিল।

কাসাভার কটিং বসাইয়া এবং চুবড়ি আলু কটিয়া খণ্ড খণ্ড বসাইয়া গাছ করিতে হয়। আলুর চোখ রাখিয়া কটিতে হইবে। চুবড়ী আলু এবং কাসাভা কটিং ভারতীয় কৃষি-সমিতির নিকট পাইবেন।

তুলা চাষের আর কাহারও তত আগ্রহ নাই বলিয়া ভারতীয় কৃষি-সমিতি তুলা বীজ আমদানী বন্ধ করিয়াছে। বিদেশী তুলা বীজের জন্য আপনি Messr Shaw Wallace Co. কে পত্র লিখিবেন এবং দেশী তুলা বীজের জন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে লিখিবেন।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

চট্টগ্রাম বিভাগে সারের অভাব এবং হাড় সার প্রয়োগে সেই অভাব পূরণ চেষ্টা—এদেশে গৃহপালিত পশুর ভরণপোষণ যেরূপ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইয়াছে এবং ফলে এ সকল পশুর সংখ্যা যেরূপ হ্রাস পাইতেছে তাহাতে গোবর ও গোমূত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, তৈলজ শস্যাদি আজকাল শস্যরূপে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হওয়ায়, ইহাদের খোল এদেশের জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, এদেশের এই দুইটী সুলভ সারের অভাবে আজকাল বিজ্ঞান অনুমোদিত ভিন্ন ভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া পূরণ করিতে হয়। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে হাড়ের গুঁড়া পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানেই জমির খাদ্যাভাব পূরণ করিতে বিশেষ উপযোগী, হাড়ের গুঁড়া সার প্রচলন করিবার জন্য এ বিভাগ বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে। সকল প্রকার জমিতে এবং সকল প্রকার ফসলের পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার নয়, কারণ কোন জমিতে কোন বিশেষ খাদ্যের অভাব থাকিলে সেই পদার্থমূলক সার প্রয়োগ করিয়াই অভাব পূরণ সম্ভবপর, হাড়ের গুঁড়ার সে পদার্থটী না থাকিলে কি করিয়া এই অভাব ঘুচাইবে? আবার ফসল বিশেষের খাদ্য হাড়ের গুঁড়ায় বিদ্যমান না থাকিলে সেই ফসলের জমিতে ইহা প্রয়োগ করা অপব্যয় মাত্র। জমির অভাব এবং ফসলের প্রয়োজন দেখিয়াই সার নির্ব্বাচন করিতে হইবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ফসলের কোনটীর পক্ষে কি সার প্রয়োগ করিলে ফলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং খরচ বাদ দিয়া প্রতি বিঘা হইতে সব চেয়ে অধিক লাভ করা যায় ইহা এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কার্য্য।

গত বৎসর নোয়াখালির ১৯ জন কৃষক ১৮/ বিঘা আমন ধানের জমিতে বিঘাপ্রতি ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া হাড়ের গুঁড়ার দাম ও অতিরিক্ত খরচ বাদে প্রতি বিঘায় ।৵৹ হইতে ৯।৵৬ পাই বেশী লাভ করিয়াছে; এবং গড়ে বিঘপ্রতি ৩।৵৹ বেশী লাভ করিয়াছে। এই স্থানের ৩ জন কৃষক ১½ বিঘা জমিতে বিঘাপ্রতি ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিয়া আউস ধান আবাদ করিয়া গড়ে বিঘাপ্রতি প্রায় ৪৷৹ আনা বেশী লাভ করিয়াছে।

সাধারণ সার ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার—জমিতে সার দিয়া যে ফসলের ফলন বাড়াইতে পারা যায় ইহা আর কাহাকেও অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে জমির প্রকারভেদে এবং কোন্ প্রকার ফসলের জন্য কি

সার কত পরিমাণে কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা উচিত সেই সকল সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিব।

কেহ কেহ মনে করেন যে যত সার দেওয়া যাইবে ততই ফলন অধিক হইবে। ইহা ঠিক নহে কেবলমাত্র সারের উপর কোন গাছ জন্মাইতে পারা যায় না, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ঐ ধারণা ভুল। গাছ সকল, জমি হইতে যে যে পদার্থ গ্রহণ করে তাহাদের প্রায় সমস্তই সাধারণতঃ ঐ জমিতে বর্ত্তমান থাকে। যদি কোন জমিতে কোন সারের অংশ কম থাকে অথবা বৎসর বৎসর ফসল জন্মানর জন্য ক্রমশঃ কমিয়া যায়, তখন ঐ জমিতে সেই পদার্থমূলক সার দেওয়া আবশ্যক হয়। এমন জমি দেখিতে পাওয়া যায় যে সেখানে সাধারণতঃ কোন প্রকার সার দিবার প্রয়োজন হয় না বরং দিলে ক্ষতি হয়। সার অধিক পরিমাণে দিলে গাছ না বাড়িয়া মরিয়া যায় তাহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। কোন একটী জমিতে বিঘাপ্রতি ৮০ মণ, পাকা খাদে ভালরূপ করিয়া পচান গোবর দিয়া বাঁধাকপির চারা বসান হইয়াছিল। এক মাসের মধ্যেও ঐ কপি গাছ একেবারেই বাড়ে নাই এবং ক্রমশঃ পাতাগুলি হলদে হইয়া যায়। কিন্তু অন্যত্র ঐ গোবর বিঘাপ্রতি ৫০ মণ দিয়াও বেশ ভাল ফসল পাওয়া গিয়াছিল। অতিরিক্ত সার দিলে যে কেবল পয়সা বাজে নষ্ট হয় তাহা নহে, অনেক সময় শস্যেরও হানি হয়। কোন কোন ভদ্রলোক এইরূপ করিয়া শেষে মনে করেন যে যখন এত পয়সা খরচ করিয়া কিছু হইল না তখন কৃষিকার্য্যে লাভ করা অসম্ভব। এ ধারণা অথচ সম্পূর্ণ ভুল। ব্যবসা বাণিজ্যেও যেরূপ বিচার বুদ্ধির আবশ্যক হয়, কৃষিকার্য্যেও সেইরূপ প্রয়োজন হয়। জমির অবস্থা এবং শস্যের প্রকৃতি অনুযায়ী সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। আঁটাল মাটিতে একরূপ সারের প্রয়োজন, বালি মাটীতে অন্যরূপ সারের প্রয়োজন ; গাছ বাড়াইতে হইলে একরূপ সারের প্রয়োজন, ফুল ফলের জন্য অন্যরূপ সারের প্রয়োজন। সবুজ সার, পাতা পচা, গোবর, সোরা প্রভৃতি গাছকে বাড়াইতে বিশেষ সাহায্য করে এবং পলিমাটী, হাড়ের গুঁড়া সুপারফস্ফেট প্রভৃতি ফুল ফলের বিশেষ সহায়তা করে। বাঁধাকপি ও ফুলকপি এক জাতিয় গাছ হইলেও বাঁধাকপিতে পাতার আবশ্যক এবং ফুলকপিতে ফুলের আবশ্যক, এজন্য এই দুটীতে ভিন্ন প্রকারের সার প্রয়োজন হয়। অবশ্য প্রথম অবস্থায় উভয়েরই পক্ষে গাছের তেজ আবশ্যক বলিয়া এক রকম সার লাগিতে পারে কিন্তু শেষে ভিন্ন প্রকার সার দিতে হইবে। এমন কতকগুলি সার আছে যাহা কৃষকদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব, সেগুলির বিষয় এস্থলে আলোচনা করার প্ররোজন নাই। যেগুলি সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে অথবা চেষ্টা করিলে ব্যবহার করা যাইতে পারে সেগুলির বিষয়ই দুই একটী কথা বলা যাইতেছে—

পাঁক—পুকুর বা মরা নদী হইতে পাঁক কাটিয়া শুখাইয়া লইলে উত্তম সারের কাজ করে। এই বৎসর যশোহর ও নদীয়া জেলার কয়েকটী স্থানে ইহা ব্যবহার

করা হইয়াছে। ফলাফল আগামী বৎসর বলিতে পারিব। তবে বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষকেরা অনেক স্থানে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তুঁতের চাষে ইহার খুব ব্যবহার। ইহা বিনা খরচে অথবা অতি অল্প খরচে জমিতে দেওয়া যাইতে পারে। কৃষকেরা যদি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা জমিতে ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাদের জমিতে সার দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ জলাশয়গুলির উন্নতি হইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

গোবর সার—ইহার কথা সকলেই জানে এবং চাষীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু চাষীরা ইহা যেরূপ ভাবে এবং যে রকম স্থানে রাখে তাহাতে ইহার আবশ্যকীয় ভাগ অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে গোবর সারের সম্পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায় সেই জন্য নিম্নলিখিত ভাবে গোবর পচান আবশ্যক। ৬ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া ও ২ হাত গভীর একটি গর্ত্ত কর এবং গর্ত্ত হইতে যে মাটি বাহির হইবে তাহা গর্ত্তের চারিধারে পাড়ের মতন দুই হাত উঁচু করিয়া রাখ তাহা হইলেই গর্ত্তটি ৪ হাত গভীর হইল। ঐ গর্ত্তের উপর খড়ের একটি চালা তৈয়ার কর। ঐ গর্ত্তের ভিতর গোবর, চোনা, গোয়াল ঘরের ধুয়ানি, গোয়াল ঘরের ঝাঁট প্রত্যহ ফেল। এক বৎসর এইরূপ ভাবে পচিলে পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সবুজ সার।—আমন ধানের চাষ যাঁহারা করেন তাঁহারা জানেন যে ঘাস পচিলে সার হয়। যাহাতে বেশী পরিমাণ সার পাওয়া যায় সেই জন্য অনেক স্থানে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ২।১ পশলা বৃষ্টির পর অর্থাৎ প্রথম চাষের সময় বিঘাপ্রতি ২ সের করিয়া ধৈঞ্চা বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কাটিয়া জমির সহিত চষিয়া দিতে হয়। এই গাছ ও পাতা পচিয়া উত্তম সার হয়।

ছাই।—যাহাদের বেগুণের চাষ আছে তাঁহারা ইহার উপকার জানেন। উনানের ছাই (কয়লা ছাঁকিয়া) জমিতে বিশেষ উপকার হয়।

হাড়ের গুঁড়া।—আগে ইহার ব্যবহার ছিল না। অল্প কয় বৎসর হইল ইহার ব্যবহার হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ও লাভ-জনক। ইহা বিঘাপ্রতি ১ মণ করিয়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রথম চাষের সময় জমিতে চষিয়া দিতে হয়। ইহার মূল্য ৮৲ মণ।

সার-সংগ্রহ

——:*:——

পশুর চিকিৎসা

মানুষের মত পশুরও আধি ব্যাধি আছে ; কাজেই তাহাদেরও চিকিৎসা প্রয়োজন। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের একটি প্রকাণ্ড বিভাগ আছে। সম্প্রতি সেই বিভাগের ১৯১৫-১৬ সালের বার্ষিক বিবরণ-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পশু-চিকিৎসা বিভাগের ব্যয় সরবরাহে গভর্ণমেণ্টের খরচ কম নহে। পশু-চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বেলগেছিয়ায় একটি কলেজ আছে, তাহাতেই খরচ পড়ে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। বিবরণ-পুস্তিকায় দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে এই কলেজের সর্ব্বপ্রকারে আয় হইয়াছিল মোট ৩৭,৮২৬৸৵৯ সাইত্রিশ হাজার আট শত ছাব্বিশ টাকা চৌদ্দ আনা নয় পাই, অথচ ব্যয় হইয়াছিল ১, ৬৬,২২৬৸৴৫ এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুই শত উনত্রিশ টাকা এগার আনা পাঁচ পাই। কলেজ ছাড়া, এই বিভাগের অন্যান বাবদেও বৎসরে দুই লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়িয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকারে এই বিভাগের পোষণ বাবদে গভর্ণমেণ্টের খরচ পড়িয়াছিল,—৩,২১,৭৭৩/৫ তিন লক্ষ একুশ হাজার সাত শত তিহাত্তর টাকা এক আনা পাঁচ পাই। বৎসর বৎসর যে এত টাকা খরচ হইয়া থাকে, ইহার ফলে উপকার হয় কিরূপ, তাহাও এই বিবরণ-পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। দেখা যায়, অলোচ্য বর্ষে সংক্রামক ব্যাধির পরিমাণ অনেক কম হইয়াছিল ; ১৯১৪-১৫ সালে সংক্রামক ব্যাধির ফলে ১৫,৯৫০ পনের হাজার নয় শত পঞ্চাশটি পশু মারা পড়িয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে মারা পড়ে মাত্র ১০,৭২৫ দশ হাজার সাত শত পঁচিশটি। ইহা ছাড়া আন্যন্য রোগেও এবার পশুমৃত্যুর সংখ্যা কম হইয়াছে। এই বিভাগের কাজ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে প্রয়োজন বোধে তের জন নূতন ভেটারিনারী এসিষ্টাণ্ট লওয়া হইরাছে। ইহাঁদিগকে লইয়া জেলা সমূহে মোট ৮২ বিরাশী জন ভেটারিণারী এসিষ্টাণ্ট কাজ করিতেছেন। ইহা ছাড়া, ষ্টাফে চারিজন এবং রিজার্ভে ছয় জন। টাকা খরচ হউক, পশুর রোগের চিকিৎসা হউক,—সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গো-বংশের শ্রীবৃদ্ধি, সাধিত হইলেই সব সার্থক হয়। সে পক্ষে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা নাই, শুধু সরকারী কর্ম্মচারিগণের ঘোড়া ও কুকুরের চিকিৎসাতেই যে এই বিভাগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়,—এমন কথা বলা যায় না তবে, গো-বংশ বিস্তার পক্ষে এই বিভাগের কার্য্য যে ত্রুটি নাই এমন নহে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই। ভাল ষাঁড় মিলে না ; তাহা ছাড়া গোচর ভূমির অভাব বশতঃ খাদ্যও প্রচুর পাওয়া যায় না। এই সব কারণেই গোবংশ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। সরকারী বিবরণ-পুস্তিকায়ই প্রকাশ,—

অনেক স্থানেই ষাঁড়ের অভাব হইয়াছিল; কিন্তু ভালরূপ ষাঁড় মিলে নাই বলিয়া সরবরাহ করিতে পারা যায় নাই। আমাদের মনে হয়, পশুচর ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যদি গভর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে কিছু অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে, পশু-চিকিৎসা বিভাগের জন্য এত টাকা খরচ করিবার প্রয়োজন হইবে না; পরন্তু গোবংশেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হইবে।

———:•:———

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই সেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারশ্লি (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জর সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুগাছ মাটী দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বার উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্য নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটয়ের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আপুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় স্বতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মুসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

———

কৃষক।

সূচীপত্র।

পৌষ, ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। { পৌষ, ১৩২৩ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

উন্নত প্রণালীতে ধান চাষ

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

ভারতীয় কতিপয় প্রধান প্রধান ধান্যের বিষয় আলোচনা করিবার আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু এই কার্য্যটি নিতান্ত সহজ নহে, সেজন্য সফলকাম হইতে পারিতেছি না। বিভিন্ন জেলায় বিশেষ বিশেষ ধানের নাম সংগ্রহ করা অতীব কঠিন; কারণ একই ধান ভিন্ন জেলায় ভিন্ন নামে অভিহিত। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কোথায় কি প্রকারে ধান চাষের উন্নতি হইতেছে তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা হইয়াছে যে সম্পূর্ণ সার না পাইলে ধানের সম্পূর্ণ উন্নতির আশা করা যায় না। ধানে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল, পটাস এই তিনটিরই প্রয়োজন। যে সারে এই ৩টি পদার্থ বিদ্যমান এমন সার প্রদান করা কর্ত্তব্য অথবা কয়েকটি সার মিশাইয়া এই কয়টীর সংযোগ হয় এমন মিশ্র-সার প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভারতের অধিকাংশ নদী মাতৃক দেশে যেথানে ধান চাষ হওয়া সম্ভব নদী তীরস্থ দীর্ঘায়তন জমী সমূহ নদীর বানের জলে পলি সঞ্চিত হইয়া বেশ চাষের উপযুক্ত হইয়া থাকে। এই পলি মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য সকল রকমই আছে। যে জমিতে বানের জল উঠে তাহাতে কোন সার দিবার অবশ্যক হয় না কিন্তু যে সকল জমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়া গিয়াছে যাহাতে আর পলি পড়ে না বা নদীর মহানাগুলি সভাবত• বদ্ধ হইয়া অথবা কৃত্রিম বাঁধ পড়িয়া যাহাতে আর নদীর জল প্রবেশ করিতে পারে না সেই সকল জমি ক্রমশঃই অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে সার দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দেশে লোকে এতদিন খনিজ বা কৃত্রিম সারের কথা ভাবিত না।

তাহারা একমাত্র গোময় সারের কথাই ভাবিত এবং গবাদির মল মুত্রই একমাত্র সার বলিয়া অভিহিত হইত। কৃষি পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গোময়ের ব্যবহার ও পূজার বিধি আছে—অন্য কোন সারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাঘে গোময় কুটস্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ
তাং শুভদিনং প্রশ্য কুদ্দালৈ স্তোলয়েৎততঃ।
রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বাগুণ্ডকরূপিণম,
ফাল্গুনে প্রতিকেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো বপনকালে তু কুর্য্যাৎ সার বিমোচনম্
বিনা সারেন যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি।

প্রাচীন কালে ধান চাষই প্রধান কৃষি কর্ম্ম এবং সার অর্থে গোময় সারই বুঝিতে হইত। তখন লোক সংখ্যা এত অধিক ছিল না, বহুবিস্তীর্ণ স্বভাবত সারবান জমি পড়িয়া ছিল, একজনে অনেক জায়গা নির্ব্বিবাদে দখল পাইত, জমির এত খাজনা বা ট্যাক্স ছিল না সুতরাং সাধারণ হাল লাঙ্গলে যেমন তেমন ভাবে চাষিরা খুড়িয়া চাষ করিয়া যাহা কিছু পাইত তাহাতে তাহাদের সকল অভাব দূর হইত। তাহারা তখন অতি অল্প আয়াসে রাজভোগ্য ধান ও অন্য শস্যাদি তৈয়ারি করিতে পারিত এবং দেশী কৃষি যন্ত্র লইয়া ও সাধারণতঃ গোময় সার ব্যবহার করিয়া ভাল কার্পাসের চাষ করিয়াছে এবং রাজ পরিচ্ছদোপযোগী বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছে। বহুবিস্তীর্ণ অরণ্য তাহারা তখন নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়াছে এবং তাহাতে গরু, ছাগল, মেশ, মহিষ পালন করিয়া দুধে ভাতে জীবন যাপন করিয়াছে। পশুলোম তাহাদের শীতের বস্ত্র যোগাইয়াছে। এখন সে দিন নাই—এখন জমি লইয়া মারামারি, বন জঙ্গল লইয়া কাড়াকাড়ি। জমির ফলন না বাড়াইলে আর চলে না। রাজার রাজস্ব বাড়িয়া, গিয়াছে, ক্ষেত খামারে কাজ করিবার মজুরের দাম বাড়িয়াছে, মানুষ গরুর খোরাকী বাড়িয়াছে, কৃষি যন্ত্রের দাম শত গুণ চড়িয়াছে, এমতাবস্থায় চাষের উৎকর্ষ আবশ্যক; নতুবা তোমার খোরাক জুটিবে না। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু খরচ এত বাড়িয়াছে যে খরচ বাদে লাভ করা যে সে চাষে হয় না। যাহারা এতদিন গোময় ভিন্ন অন্য সারের খোঁজ রাখিত না, এমন কি খৈল, খোসা ভুষিগুলি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সারগুলি পর্য্যন্ত যাহাদের চক্ষে উপেক্ষিত হইত তাহারা এখন বাধ্য হইয়া খনিজ সারের সন্ধান লইতেছে। ইহা কিন্তু বলিতে হইবে যে সেকালের লোকে সারের প্রধান সারটি ধরিয়া বসিয়াছিল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক চাষীর বাটীর সম্মুখে একটি করিয়া সার গাড়া (সার গর্ত্ত) থাকিত। তাহাতে যে তাহারা কেবল পশুর মলমুত্র গরুর গামলা ধোয়া জল সঞ্চিত করে এমন নহে। তাহাতে তাহারা চুলার ছাই, খোঁসা ভুসি, ঘর ও উঠান পরিষ্কার করা জঞ্জাল প্রভৃতি

ফেলিয়া রাখে। গোময় সমেত এইগুলি এক বর্ষায় পচে এবং পরবর্ত্তী বর্ষায় সাররূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ সার যত্নে রক্ষা করে, রৌদ্রে জলে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অযত্নে রক্ষিত হয় বলিয়া সারে সারত্ব কতক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই যে আবর্জ্জনা সংমিশ্রিত পশুর মল মূত্র সার ইহাতে কি আছে দেখা যাউক—

ইহাতে শতকরা অন্ততঃ, নাইট্রোজেন—৩ হইতে ৮ ভাগ, ফস্ফরিক এসিড ১ হইতে ২ ভাগ, পটাস ৫ হইতে ১৫ ভাগ পাওয়া যাইতে পারে। এই কয়টি সারই ধানের পক্ষে আবশ্যক।

কৃষি রসায়ণ বলিতেছে, ধানের জন্য এক একর জমিতে নাইট্রোজেন ১৫ পাউণ্ড, পাটাস ৩০ পাউণ্ড, গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ৩০ পাউণ্ড আবশ্যক। কৃষকের সার গাড়ার সারে সকলই আছে তন্মধ্যে ফস্ফরিক অম্ল কিছু কম তাই বিশেষজ্ঞগণ ধান ক্ষেতে বিঘা প্রতি ১ কিম্বা ২মণ ফস্ফরিকাম্ল সার ও ॥০ কিম্বা ৸০ আধমণ কিম্বা ত্রিশসের সোরা দিবার ব্যবস্থা করেন। সোরা হাড়গুড়াকে শিঘ্র গলাইয়া উদ্ভিদের গ্রহনোপযোগী অবস্থায় আনে এবং ইহাও নাইট্রোজেন প্রধান সার বলিয়া ইহাদ্বারা জমির নাইট্রোজেনের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়।

বাঙলা দেশের একটি ধান্য ক্ষেত্রের সার পরীক্ষা আলোচনা করিলে আমরা এই বিষয়টি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

জমির পরিমাণ প্রত্যেকটি ৪॥০ বিঘা

প্রযুক্ত সার	ফলন পড়ে	সারের দাম টাকা	ধানের দাম
৬ গাড়ী সার গর্ত্তের সার ও কুটিকাটি পাতা পচা সার ৪ গাড়ী	১২৩৩	৭॥০	৭০৲
৬ গাড়ী সার গর্ত্তের সার ও হাড় চূর্ণ ১১০ সের ও খনিজ সার ৬০ সের	১৭৬৫	১৫৲	১০০৲

প্রথম ক্ষেত্রটিতে গোময় সারের সহিত পাতাপচা সার দেওয়া হইয়াছিল। পচা পাতা সারের চুণের ভাগই অধিক, সামান্য মাত্রায় নাইট্রোজেন ও পটাসও আছে। চুণ, অন্য সারগুলিকে গলাইয়া শিঘ্র উদ্ভিদের গ্রহনোপযোগী করে। পশুমলাদি সারের সহিত গর্ত্তে ছাই থাকায় তাহাতে পটাস আছে এদং মলমূত্রে ফস্ফরিক এসিড আছে। কিন্তু উপরোক্ত জমির সারের সহিত আরও কিছু ফস্ফরিক এসিড এবং আরও কিছু পটাস মিশাইলে ভাল হইত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাড়চূর্ণ ও কাইনিট দিয়া এই দুই অভাব পূরণ করা হইয়াছে। নাইট্রোজেনে গাছের বৃদ্ধি করে কিন্তু পটাসে ফলন বৃদ্ধি হয় তাই নাইট্রোজেন অপেক্ষা পটাস বেশী আবশ্যক। কাইনিট—পটাস-প্রধান খনিজ সার, ইহাতে চুণের অংশও কিঞ্চিৎ আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধানের গ্রহণোপযোগী পর্য্যাপ্ত সার পড়িয়াছে এবং এই কারণে ফলনও বাড়িয়াছে। পুরাকাল হইতে চাষীরা প্রধান সারটি ধরিয়া থাকিলেও এখন জীবন সমস্যার দিনে তাহাকে অন্য সারের সন্ধানে ফিরিতে হইতেছে।

প্রায়ই আটাল মাটিতে ধানের আবদ হয়। আটাল মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে পটাস পাওয়া যায়। বাঙলার চাষীরা অত হিসাব করিয়া বুঝুক আর না বুঝুক তাহারা ধান ক্ষেতে নাইট্রোজেন প্রধান খৈল সার দিয়া বেশ উপকার পাইতেছে। যেখানে যথোপযুক্ত পরিমাণ গোময় পাওয়া অসম্ভব, তথায় বাঙলার কৃষকগণ বিঘাতে ২ কিম্বা ৩ মণ খৈল দিয়া ধানের জমির ফলন বাড়াইতে শিখিয়াছে। আলুতে প্রায়ই রেড়ির খৈল দেয় কিন্তু ধানে সরিষার খৈলের প্রচলন দেখা যায়।

সিংহলে ধানে সার পরীক্ষা

	১নং জমি ½ একর	২নং জমি ½ একর
ধান	২১ বুসেল	২১⅞ বুসেল
খড়	৭৮০ পাউণ্ড	৮৩৬ পাউণ্ড
ধানগাছ	৪৷৷০ ফিট	৫ ফিট

১নং জমিতে কেবলমাত্র হাড়চুর্ণ দেওয়া হইয়াছিল। ২নং ক্ষেত্রে হাড়চুর্ণ, সালফেট অব পটাস এবং নাইট্রেট অব সোডা এই কয়টির মিশ্রণ সাররূপে প্রদান করা হইয়াছিল এই দ্বিতীয় প্রকার মিশ্রসারটি সম্পূর্ণ সার, কারণ ইহাতে নাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্ফরিক এসিড সকলগুলিই যথোপযুক্ত পরিমাণে ছিল। তথাপি দ্বিতীয় নং ক্ষেতের ফলন বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে নাইট্রেট্ অব সোডা শিঘ্র গলিত হইয়া সেচের জলের সহিত অন্যত্র নীত হইয়াছে নতুবা এবম্প্রকার সম্পূর্ণ সার প্রয়োগে অধিক ফলনের আশা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে।*

* এক বুসেলের ওজন ৯৷৷০ সের; এক একর=৩ বিঘা আধ কাঠা।

রোয়া ও বোনা ধান—ধানের দুই রকমে আবাদ হয়। জমিতে হাল মৈ দিয়া ধান বীজ বপন করা কিম্বা ধানের চারা তৈয়ারী করিয়া লইয়া সেই চারা বিল বা জলা জমিতে জলে কাদায় চষিয়া মৈ দিয়া, রোপণ করা। প্রায়ই দেখা যায় যে ধান বীজ বপন করিলে অনেক বীজ ধান নষ্ট হয়। এক বিঘা জমিতে আবাদ করিতে ৮।৯ সের ধানের কম কুলায় না কিন্তু ৪।৫ সের ধানের চারা তৈয়ারি করিয়া লইলে এক বিঘা জমি রোয়া (রোপন) চলে। বোনা (বপন) ধানের শীষ অপেক্ষা রোয়া ধানের শীষ বড় হয়। ধানও বড় ও সুপুষ্ট হয়। রোয়া ধানের ক্ষেতে জল থাকে বলিয়া ঘাস ও আগাছা কম হয়। জলে কাদায় পচান চাষদিবার কালে ঘাস ও আগাছা অনেক মরিয়া যায়। ঘাস ও আগাছা জন্মিলেও বোনা ধানের ক্ষেত অপেক্ষা রোয়া ধানের ক্ষেত সহজে নিড়ান যায়। ধান গাছগুলি সারিবদ্ধ রোপিত হওয়ায় নিড়াইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু ধান বপন অপেক্ষা রোপনে খরচ অধিক। এক বিঘা জমিতে ধান বুনিতে ২॥০ টাকার অধিক খরচ হয় না কিন্তু এক বিঘা জমিতে ধান রোপন করিতে খরচ ৫৲ টাকার কম নহে। ধান রোপনই ভাল। সব জমিতে ধান রোপণ করা চলে না। আশুধান প্রায় ষোল আনাই বোনা হয় কদাচিত রোপণ করা হয়। অনেক আমনের ক্ষেতেও জলাভাবে ধান রোয়া চলে না। জঙ্গল কাটা নুতন আবাদেও চাষ কারকিতের তাদৃশ সুবিধা থাকে না তখন ছিটাইয়া ধান বোনা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। রোপণের সুবিধা থাকিলে কেহ ধান বপন করে না।

বাঙলার চাষীরা আবশ্যক অপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণে বীজ বপন করে। তাহারা বলে ধান ঘন না বুনিলে অধিক ঘাষ জন্মে। ধানের ঘন চারা বাহির হইলে তাহাদের চাপে পড়িয়া ঘাষাদি মারা যায়। ধানের ঘন চারা আবার নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। ইহা তাহাদের কতকটা সত্য বিশ্বাস হইলেও নিড়াইবার কিঞ্চিৎ খরচ বাঁচাইবার চেষ্টা কতটা সুযুক্তি তাহা স্থির করা যায় না। সেইত নিড়াইতে হয় তা ধানের চারা বা ঘাষ প্রায় সমানই কথা, যদিও ঘাষ নিড়াইতে একটু কষ্টকর বটে। ধানের চারা ঘন ও পাতলা রোপণ লইয়া সমুদয় সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে ধান চাষের পরীক্ষায় বিষম হুলস্থুল পড়িয়াছে। কি প্রকারে বীজ ধানের খরচ বাঁচান যায়। যাহাদের ১০।১৫ হাজার বিঘা লইয়া চাষ তাহাদের বিঘাতে ১৲ বা ॥০ আট আনা বাঁচানতে লাভ অনেক। বাঙলার ২।৪।১০ বিঘা চাষে উহাতে বড় কিছু লাভ হয় না এবং এ লোকসান মারাত্মক লোকসান নহে। একটা জেলার হিসাবে লোকসানের গুরুত্ব বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহা বহু সংখ্যক ছোট জোতদারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ায় তাহারা ইহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। বীজের অভাব হইলে তাহা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হয় এবং তাহাই তাহাদের বিষম ভয়। অত্যন্ত সাবধানতাই এই লোকসানের মূল কারণ। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে

২।৪।৬ ইঞ্চ ব্যবধানে চারা রোপণ করাতে বিশেষ কোন লাভালাভ পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চ ব্যবধানে ধান্য রোপণ করিলেই ভাল হয়। খুব তেজস্কর জমি হইলে ১০।১১।১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ব্যবধানে চারা রোপণ চলিতে পারে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক গর্ত্তে একটি চারা রোপণ করিলে ধানের ফলন বাড়ে ব্যতীত কমে না। বিশেষজ্ঞগণ আমাদের দেশের চাষীগণকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। চাষীরা যে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিয়া কাজের একটা সাধারণ জ্ঞান ও বহুদর্শিতার ফলে কাজের বিশেষ কৌশল জানে বিজ্ঞেরা একথা মানিতে চান না। চাষীদের জানা কথা লইয়া তাঁহারা অনেক সময় নূতন তথ্য ও সুপরীক্ষার ফল বলিয়া কাগজে কলমে জাহির করেন। চাষীরা অনন্যোপায় তাহারা দেখিয়া ও শুনিয়া হাসে। ধানের চারা ঘন ও পাতলা রোপণের জ্ঞান ও ঘন ও পাতলা গোছা রোপণের অভিজ্ঞতা তাহাদের বহুদিনের এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

হস্তান্তর কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধমেবচ
রোপণং সর্ব্বধান্যাণাং কন্যায়ং চতুরঙ্গুলম
কৃষিপরাসর।

ইহার তাৎপর্য্য সকল চাষীই বুঝে। তাহারা এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া শ্রাবণে এক হাত অন্তর, ভাদ্রে আধ হাত অন্তর এবং আশ্বিনে চারি আঙ্গুল অন্তর বীজরোপণ করে। তাহারা আষাঢ় মাসে ধান রোপণ করিতে পাইলে প্রতি গর্ত্তে এক বা দুইটি চারায় অধিক রোপণ করে না। এক একটি চারার মূল হইতে এক শতের অধিক চারা নির্গত হইয়া ঝাড় বাঁধে ও তদ্রূপ ধানও হয়। ভাদ্রের চাষে তাহারা বলে যে "কোল পাতলা ঘন গুছি" না হইলে ভাল চাষ হয় না। এই সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অসাধারণ ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের কাজের কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা নাই এইটুকু তফাৎ।

কৃষকগণের বীজ তলাতে ধানবীজ ফেলিবার নিয়ম ও সময় আছে। তাহারা প্রায়ই কৃষি পরাশরের মত অবলম্বন করিয়া চলে। বার তিথির গুণে চারা ভাল মন্দ হয় ইহা অবিশ্বাস করিবার যো নাই। প্রাচীন বীজ বপন বিধি দেখুন—বৈশাখ মাসে বীজ বপন উত্তম, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম এবং শ্রাবণ মাসে বপন সর্ব্বাপেক্ষা অধম। আষাঢ় মাসে রোপণার্থ বীজের বপন উত্তম, শ্রাবণে অধম এবং ভাদ্রে অত্যন্ত অধম। উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, মঘা, মৃগশিরা, রোহিণী, হস্তা ও রেবতী নক্ষত্র বীজ বপনে প্রশস্ত। শ্রবনা, পূর্ব্বফল্গুণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, বিশাখা, ভরণী, আর্দ্রা, স্বাতী ও অশ্লেষা নক্ষত্রে বীজ বপন করিলে বীজমাত্রই লাভ হয় অর্থাৎ তাহাতে অধিক ফল হয় না। বপন বা রোপণকার্য্যে যুগ্ম (যোড়া) বার (সোম বুধ, শুক্র) ভিন্ন অন্য বার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে রোপণ করিলে ইন্দুর ভয় এবং

শনিবারে পঙ্গপাল ও কীটের ভয় হয়। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী বিশেষতঃ অমাবস্যা তিথিতে বপন কার্য্য করিবে না। এইরূপ তিথ্যাদি বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে প্রচুর শস্য লাভ হয়।

তথাচ বরাহ :—

বৃষান্তে মিথুনাদৌ চ ত্রীণ্যহানি রজস্বলা।
বীজং ন বপয়েৎ তত্র জনঃ পাপাদ্বিনশ্যতি ॥

ফল লাভেচ্ছু কৃষক জ্যৈষ্ঠের শেষ সাড়ে তিন দিন এবং আষাঢ়ের প্রথম সাড়ে তিন দিন বপনকার্য্য করিবে না। বরাহ মুনি বলেন—জ্যৈষ্ঠের শেষে এবং আষাঢ়ের প্রথমে তিন দিন পৃথিবী ঋতুমতী হয়েন, সে সময়ে কোন বীজ বপন কর্ত্তব্য নহে। বপন করিলে নষ্ট হয়। ধান সম্বন্ধেই উক্ত বিধি ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং ইহাতে ফল ভাল হইতেও দেখা যায়।

এইরূপ প্রাচীনকাল হইতে এদেশের চাষীগণের অনেক কৃষিবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া আসিতেছে। ধান চাষ সম্বন্ধে অনেক কৌশলই তাহারা জানে। আমরা তাহাদিগকে জানাইবার জন্য ধান সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। যাঁহারা নূতন চাষে ব্রতী হইতে চান তাঁহাদের ইহাতে উপকার দর্শিবে এবং ধান চাষের প্রণালীগুলি ঠিক ঠিক জানা থাকিলে তাঁহারা চাষীর কার্য্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে সময়োচিত সংস্কার ও সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন।

ধান চাষ সম্বন্ধে সেকালের লোক যত ভাবিয়াছে এ কালের লোক ততটা এখনও ভাবিতে পারে নাই। অতি অল্পদিন হইল কৃষি-বিভাগের নজর ধানের উপর পড়িয়াছে। এখনও চাষীরা যা জানে কৃষি-বিজ্ঞগণ তাহা জানিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতের কৃষিজীবি বলে যে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ধানের ক্ষেতে যে জল ধরিয়া না রাখিবে সে মূর্খ তাহার শস্যের আশা করা বৃথা। কুল রক্ষণেচ্ছু ব্যক্তিরা যেমন যত্নের সহিত কুলস্ত্রীকে রক্ষা করেন শরৎকালে সেইমত ক্ষেতে জল রক্ষা করিবে। শাস্ত্রের এই উপদেশ অধিক জল হইলে, যাহাকে ক্ষেতে জল চাপ হওয়া বলে—ক্ষেত হইতে জল বাহির করিয়া দিতে হইবে নতুবা ধান গাছ হাজিয়া বা রোগগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে। ধানের মূলদেশ মাত্র জলে ঢাকা থাকিবে। এখন বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিতেছেন যে কোন্ ধানের গোড়ায় কোন সময় কত পরিমাণ জল থাকিলে ভাল হয়। চাষীদের আবহমানকাল কিন্তু সে জ্ঞান আছে। এ দেশের লোকে প্রায়ই অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া চলে, শাস্ত্র বলিয়াছে করিতে, তাই করে, মহাজন বাক্য তাই অনুসরণ করে, তাহা ভাল কিম্বা মন্দ কখন বিচার করিয়া দেখিতে যায় না সেইজন্য তাহারা নূতন কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

এদেশের ধান কাটা, ঝাড়া, মাড়া সবই সাবেক প্রথায় চলিতেছে। কখন বিচালিগুলি একএকটা আছড়াইয়া ধান ঝাড়িয়া লওয়া হয় কখন বা ধান বলদ দ্বারা মাড়িয়া লওয়া হয়। জলা জমির ধানের প্রায়ই ডগা কাটিয়া লইয়া আসিতে হয়। এইরূপে সংগৃহিত ধান মাড়া ভিন্ন উপায় নাই। ধান পৃথক করিয়া লইয়া পোয়ালগুলি গাদা দিয়া গরুর খাদ্যের জন্য রাখা হইয়া থাকে। ধান আহরণের দোষে বিচালী খারাপ হইয়া যায়। বিচালীগুলি রৌদ্রে ভাল শুষ্ক হইতে না পাইলে, রসা অবস্থায় গাদায় তুলিলে উহা পচিবার উপক্রম হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এরূপ বিচালী (খড়) গবাদিতে আগ্রহ করিয়া খায় না। ধান পাকিলে যে জমির জল শুষ্ক হইয়া যায় সে সকল জমির বিচালী ভাল হয় ও উহা আস্ত ঝাড়া চলে। ভারতের চাষীরা ধান চাষ সুনিয়মিতরূপেই করে এবং বার, তিথি, নক্ষত্র বিচার ও বৃষ্টি বিচার করিয়া ধান রোয়া, কাটা, ঝাড়া, মাড়া সকল কার্য্যই করিয়া থাকে। তাহারা এমন কি পৌষ মাসকে সমস্ত বৎসরের পঞ্জিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পৌষ মাসের আড়াই দিন হিসাবে এক একটি মাসের ভোগ হয়। প্রত্যেক আড়াই দিন আবহাওয়া অবস্থা ও যেমন যেমন কুয়াশা হইবে তদ্বারা তাহারা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবন প্রভৃতি কবে কোন্ দিন বারিবর্ষণ হইবে, বর্ষা নাবী বা জলদি হইবে, অনাবৃষ্টি হইবে বা অতি বর্ষণ হইবে ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিয়া থাকে। এত অভিজ্ঞতা সত্বেও তাহারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না তাহার প্রধান কারণ অর্থাভাব। তাহাদের সুবীজ সঞ্চয়ের সুবিধা করিয়া দিলে, সার সংগ্রহের উপায় বিধান করিলে, সেচের জলের ব্যবস্থা করিলে, দেশীয় হাল লাঙ্গলগুলির সময়োচিত কিছু সংস্কার করিতে পারিলে বর্ত্তমানকালে বোধ করি অনেক লাভ হয়। ধান চাষে কলের লাঙ্গলের কার্য্য কিছুই নাই এবং আমরা কলের লাঙ্গলের নিতান্ত পক্ষপাতীও নহি। কলের লাঙ্গল চালাইয়া দেশের লোকগুলিকে কলের মজুর করিয়া ফেলা বোধ হয় ভাল নহে। বাঙলায় ছোট ছোট ক্ষেতে কলের লাঙ্গল চালাইবার সুবিধাও নাই।

ধান চাষ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য যে চাষীর অভিজ্ঞাতা টুকুর দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কার ও সুপ্রণালী প্রবর্ত্তন দ্বারা ধানের ফলন বাড়ান চলে কি না তাহারই বিধিমত চেষ্টা করা। কারণ ধান বাঙ্গালীর, কেবল বাঙ্গালীর কেন সমাগ্র ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। ভাত খায় না এমন ভারতবাসী অতি বিরল।

বর্দ্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলের গত দুই বৎসরের ধান চাষ

——:*:——

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত
আহারবেলমা, বর্দ্ধমান।

আমাদের এপ্রদেশ দেব মাতৃক স্থান। ধান চাষের প্রধান উপকরণ জল। জল না হইলে ধান জন্মিবার কিছুমাত্র আশা থাকে না। ধান চাষের জমিতে আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত জল থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে বৎসর ঐরূপ জল না পাওয়া যায়, সে বৎসর ভাল ধান জন্মে না। হয়ত কোন বৎসর আষাঢ় মাসে বেশ সুবৃষ্টি হইয়া ধানের আবাদ আরম্ভ হইল, তৎপরে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত জমির জল শুষ্ক হইয়া গেল। তৎপরে হয়ত শ্রাবণ মাসের শেষে বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইল; এরূপ অবস্থার পূর্ব্বের রোপিত ধান গাছ বা তাহার পরে যে ধান গাছ রোপণ করা হইবে, তাহা হইতে আশানুরূপ ফসল পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন বৎসর যদি বা আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল থাকে ও সমস্ত জমিতেই ধান্য চারা রোপণের পর ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে জমির জল শুকাইয়া যায়। তাহাতেও ভাল ধান জন্মিতে পারে না, এমনি ধান গাছ শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভাদ্র মাসে বৃষ্টি না হওয়া প্রযুক্ত জমির জল শুষ্ক হইবার পর আশ্বিন মাসে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া জমি জল পূর্ণ হয়, এবং সেই জল যদি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত থাকে তাহা হইলে আট দশ আনা ধান পাইবার আশা থাকে। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে জমিতে জল দাঁড়াইয়া, সেই জল জমিতে কিছু দিন থাকিয়া যদি সেই জল শুকাইয়া যায়, তবে আর সে বৎসর প্রচুর ফসল পাইবার আশা থাকে না। আমাদের এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে "কাদা শুকাইলে আধা" অর্থাৎ ধান রোপণের পরই হউক বা চাষ মই দিবার পর ধান গাছ রোপণের পূর্ব্বে জমির জল শুকাইয়া গেলে, সে বৎসর আর অর্দ্ধেকের বেশী ফসল পাইবার আশা থাকে না। আষাঢ় মাসের ১৫ই'র পর হইতে শ্রাবণ মাসের ২০শে পর্য্যন্ত ধান্য রোপণের মুখ্য সময়। যদি ঐ সময় মধ্যে ধান চারা রোপণ করা হয় এবং কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বরাবর জমিতে জল থাকে, তবে সে বৎসর প্রচুর ধান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি কোন বৎসর আষাঢ় মাসেই বৃষ্টি হইয়া জমিতে বেশ জল দাঁড়াইল, সেই জল ৮।১০ দিন কি ১০।১৫ দিন থাকিয়া রোপণের পরেই হউক বা রোপণের পূর্ব্বেই হউক সেই জল যদি শুকাইয়া যায়, তৎপরে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইলেও সে বৎসর আর ভাল ধান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায় না। এরূপ স্থলে প্রায়ই জমিতে

গাঁজ, গোঁট্ বা (একপ্রকার গুল্ম বিশেষ) তৃণাদি জন্মিয়া ধানগাছের বিশেষ অনিষ্ট সম্পাদন করে। জমিতে গাঁজ গোঁটয়া তৃণাদি জন্মিলে ভাল ধান জন্মিতে দেখা যায় না। ঐগুলি ধানের বিশেষ অনিষ্ট কর। শুষ্ক মৃত্তিকার পর শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইয়া জমিতে একাবারে জল দাঁড়াইলে ও তৎপরে ধানের চারা রোপণ করিলে, যদি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমিতে বরাবর জল থাকে, তবে ষোল আনা না হউক বার আনা ফসল পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দেব মাতৃক দেশে প্রতি বৎসর কেন কচিত্‌ এরূপ সুবিধা পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি প্রতি দশ বৎসরে এরূপ সুবিধা ২।৩ বৎসরের অধিক হয় না। গ্রাম ভেদে বা মাট ভেদে এরূপ সুবিধা বা অসুবিধার অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হয়ত কোন গ্রামে দুই বৎসর উপরি উপরি ঐরূপ সুবিধা হইল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সেরূপ হইল না। এমন কি একই গ্রামের কোন মাটে ঐরূপ সুবিধা হওয়ায় প্রচুর ধান জন্মিল, অন্য মাটে কিছুই হইল না। দেব মাতৃক দেশে প্রতি বৎসর ঐরূপ সুবিধা হইতে পারে না।

মৃত্তিকা ভেদে ধান্য জন্মিবার ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন এঁটেল বা বালুকাতে প্রায় কোন ফসল বা বৃক্ষাদি জন্মে না। দোঁয়াস মৃত্তিকাই ফসল বৃক্ষাদি জন্মিবার উপযোগী। সকল স্থলেই ঠিক দোঁয়াস মৃত্তিকা থাকে না, কোথাও বা মৃত্তিকায় বালুকার অংশ বেশী কোথাও বা বালুকার অংশ খুব কম। যে মৃত্তিকায় বালুকার অংশ কম, সে মৃত্তিকায় অন্যান্য ফসল বা বৃক্ষাদি ভাল না জন্মিলেও সার দিলে প্রচুর ধান জন্মিতে পারে। আমাদের এপ্রদেশের অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকায় বালুকার অংশ কম, এরূপ মৃত্তিকায় কোন কোন ফসল বা বৃক্ষাদি ভালরূপ না জন্মিলেও ধান মন্দ জন্মে না। যে সকল স্থানের মৃত্তিকায় বালুকার অংশ কম, সে স্থানের মৃত্তিকার জল দাঁড়াইবার পর জল শুষ্ক হইলে আর আশানুরূপ ধান জন্মিতে পারে না; কিন্তু দোঁয়াস বা বালুকাধিক্য মৃত্তিকায় জল দাঁড়াইয়া শুষ্ক হইয়া গেলে সেরূপ অনিষ্ট হয় না। যে মৃত্তিকায় বালুকার অংশ কম সে মৃত্তিকায় জল কিছু দিন দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শুষ্ক হইয়া গেলে, চাষ দিলেও সে মৃত্তিকা আর ভাল গলিয়া যায় না। মৃত্তিকা গলিয়া খুব কোমল না হইলে ভাল ধান জন্মে না। বালুকাধিক্য মৃত্তিকায় জল দাঁড়াইবার পর জল শুষ্ক হইলে, পুনরায় জল দাঁড়াইবার পর চাষ দিলে মাটি গলিয়া কোমল হয়, এজন্য ধানের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

যে সকল জমির মৃত্তিকায় বালুকার অংশ কম, সে সকল জমিতে চাষ মই দিয়া ধান রোপণ করিবার পর তৃণাদি দূর করিবার জন্য নিড়াইয়া দিতে হয়। নিড়াইবার সময় জমির জল খুব কম থাকা আবশ্যক। জমি ভাল করিয়া নিড়াইয়া দিলে, তৃণাদি আগাছা নষ্ট হয়, মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করার জন্য জমির মৃত্তিকাও বেশ কোমল হইয়া থাকে। যে সকল জমির মৃত্তিকায় বালুকার ভাগ বেশী, সে সকল জমিতে ধান্য রোপণের

পর জমির মাটি বসিয়া যায়, তজ্জন্য রোপিত ধানের মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক থাকে, সেই স্থানের মাটি কোদালি দ্বারা খনন করিয়া উল্টাইয়া না দিলে ভাল ধান জন্মে না। জমির মাটি এইরূপে উল্টাইয়া দিলে ঘাস ও আগাছা চাপা পড়িয়া মরিয়া যায় এবং মাটিও গলিয়া কোমল হয়। মাটি গলিয়া কোমল না হইলে ধানের গাছ বেশ তেজস্কর হয় না। উদ্ভিদ মাত্রেই মাটি হইতে জলীয় আকারে আপনাদের পোষণোপযোগী পদার্থ মূল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে। ধানগাছের মূল খুব সূক্ষ্ম ও কোমল; মাটি গলিয়া তরল না হইলে আপনাদের পোষনোপযোগী পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। জল দাঁড়াইবার পর চাষ দিলে জমির মাটি তৃণাদি সহ পচিয়া বেশ কোমল হয়। একবার জল দাঁড়াইয়া শুকাইয়া গেলে সেরূপ হয় না।

দেবমাতৃক দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর ধান জন্মিবার আশা করা যায় না। খাল, পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিলে ধানাদি চাষের বিশেষ সুবিধা হয় বটে কিন্তু দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণের দ্বারা সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট হইতেও যে, সকল স্থানে খাল, পুষ্করিণী কূপাদি খাত শীঘ্র হইবে সে আশাও নাই সুতরাং প্রতি বৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিবার আশা করা যাইতে পারে না।

আমাদের এ প্রদেশের কৃষকগণের ধানই প্রধান উপজীবিকা। ধান চাষ ব্যতীত অন্য কোন ফসলের চাষ করে না বলিলেই চলে। আমাদের ন্যায় দেবমাতৃক প্রদেশের কৃষকগণকে যে মধ্যে মধ্যে অন্ন কষ্টের দুর্ব্বীসহ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই।

এখানে কৃষিজীবী মাত্রেই দরিদ্র। আমাদের এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতি (বৈদ্যাদি জাতি এখানে নাই) ব্যতীত সকল জাতিতেই স্বহস্তে হল চালনা করিয়া থাকে। উগ্রক্ষত্রিয় সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিরা একটু সঙ্গতিপন্ন হইলেই আর প্রায় স্বহস্তে হাল চালনা করে না। সাধারণ কৃষকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া প্রচুর ধান জন্মিলেও রাজা মহাজনকে দিয়া তাহাদের ২।১ মাস ব্যবহারোপযোগী ধান থাকে কি না সন্দেহ। সাধারণ কৃষকগণের প্রায় সকলেই কোরফা (২।১ বৎসরের জন্য অধিক রাজস্ব দিবার করারে) বা ভাগ জোত (ফসলের অর্দ্ধেক দিবার করারে) অথবা সাজায় (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শস্য দিবার করারে) জমি লইয়া চাষ করিয়া থাকে। হাজা শুকা হইলেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বা শস্য জমির মালিককে দিতেই হইবে। ভাগ জোতে জমি লইয়া চাষ করিলে হাজা শুকা প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বীপাকে শস্য না জন্মিলে কৃষক জমির মালিককে শস্যাদি দিবার জন্য দায়ী হয় না; কিন্তু কৃষকের ক্রটী জন্য যদি ফসল না জন্মে তবে কৃষক মালিকের নিকট ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। এখানকার প্রায় পনর আনা লোকে কৃষিজীবী। অধিকাংশ কৃষকই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার করারে জমি লইয়া চাষ করিয়া থাকে। এরূপ কৃষকদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। উহারা

শস্যাদি জন্মিলে রাজা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া, পুনরায় ঋণ করিয়া অতি কষ্টে আপনার ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে। যদি কোন বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ধান্যাদি ফসল না জন্মে, তবে তাহাদের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে না পাওয়ার জন্য মহাজনের দ্বার রুদ্ধ থাকে। দুই বেলা আহার জোটা দূরে থাকুক, একবেলাও জোটে না। এমন কি কোন কোন দিন উপবাসীও থাকিতে হয়। গত বৎসর অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত আমাদের এখানে মোটেই আবাদ হয় নাই তজ্জন্য এখানে যে কিরূপ ভয়ানক অন্নকষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া জানান দুষ্কর। নূতন ধান উৎপন্ন হওয়ায় বহুল পরিমাণে সে কষ্ট নিবারিত হইয়াছে।

এখানকার সাধারণ কৃষকগণের নিজের স্থায়ী জমি (যে জমি জমিদার ইচ্ছামত ছাড়াইতে বা কর বৃদ্ধি করিতে পারে না) না থাকায় সার গোবর দিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিলে জমির মালিক হয় কর বৃদ্ধি করিবেন অথবা তাহার নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইয়া, অন্যকে অধিক করে বিলি করিবেন। আর এক কথা এই—জমির মালিক কোন কৃষকের নিকট দশ বৎসরের অধিক জমি রাখেন না, কোন কৃষকের নিকট একাদিক্রমে একই জমি দশ বৎসরকাল রাখিলে, জমির মালিক আইন অনুসারে সহজে আর ঐ কৃষকের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন না। একারণ জমির মালিক একই কৃষকের নিকট ২।৪ বৎসর অধিককাল জমি বিলি রাখেন না। এই সকল কারণে এখানকার কৃষকদিগকে নিতান্ত দুরবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। কৃষকের অবস্থা উন্নত না হইলে কৃষিরও উন্নতি হয় না। উচ্চহারে রাজস্ব দিয়া উচ্চহারে সুদ দিয়া এই সকল কৃষকের অবস্থা কখন উন্নত হইতে পারে না। ইহার উপর আবার অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনা আছে।

গত সন ১৩২১ সালে আষাঢ় মাসের প্রথমেই আবাদোপযোগী বৃষ্টি হইয়াছিল। যথাসময়ে আবাদি কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ভাবী ধানও বেশ আশাপ্রদ হইবে বলিয়া সকলে মনে করিয়াছিল কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সকলই বিফল হইল। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে আর বিন্দুমাত্রও বর্ষিত হইল না। ধান সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া উঠিল। ৫।৬ আনার অধিক ধান জন্মিল না। দরিদ্র কৃষকগণ সন ১৩২১ সাল অতি কষ্টে কোন দিন অর্দ্ধাশনে কোন দিন একবেলা আহার করিয়া কাটাইয়া দিল। ১৩২২ সালে প্রচুর ধান জন্মিবার আশায় আশ্বস্ত হইয়া রহিল। ভগবান তাহাতেও বঞ্চিত করিলেন।

সন ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হওয়ায় ভাবী ধান আশাপ্রদ হইবে বলিয়া কৃষকগণ মনের আনন্দে জমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করিল। মাঘ ফাল্গুন মাসে জমি কর্ষণ করিলে অনেক দিন ধরিয়া মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু রৌদ্র প্রবিষ্ট হইয়া উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। মাঘ ফাল্গুন মাসের কর্ষণে জমির খুব উপকার হয়, তজ্জন্য "ধন্য রাজা পুণ্য

দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" এই বচনটী প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত "মাঘের মাটি, সোণার পাটী" বলিয়াও একটী বচন আছে মাঘ মাসে জমির মৃত্তিকা কর্ষণ করিলে, জমিতে স্বর্ণ প্রসব করে অর্থাৎ জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ধূলায় অর্থাৎ জমিতে জল দাঁড়াইবার পূর্ব্বে জমি ভাল করিয়া খনন করিয়া রাখিতে পারিলে জমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া থাকে, জল দাঁড়াইবা মাত্র গলিয়া যায়। ধানের চাষের সমস্ত জমিই আষাঢ় মাসের জল দাঁড়াইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুইবার চাষ দিয়া রাখা খুব ভাল। কোন ক্রমে ২১ সাল চলিয়া গেল। সন ১৩২৩ সালের শুভ বৈশাখ মাসেও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় ভূমি কর্ষণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসেও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় চাষ দেওয়া ধান্য বীজ বপন প্রভৃতি চাষের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যেই উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ধান্য চারা সকল ঘোর হরিদ্রাবর্ণ পত্র বাহির করিয়া উন্নিত হইয়া কৃষকের নয়ন মন প্রফুল্ল করিতে লাগিল। কোন কৃষক জ্যৈষ্ঠ মাসে কতক জমিতে ধান বপন করিল। আমাদের এ প্রদেশে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে জমিতে ধানের চারা রোপণের প্রথা খুব কম ছিল। কৃষকেরা অধিকাংশ জমিতেই ধান বপন করিত। এখন বপণের প্রথা খুব কমিয়া গিয়াছে। বোনা ধানের জমি নিড়াইতে কষ্ট হয়, রোয়া ধানের জমি অনায়াসে নিড়ান হইয়া থাকে। বোনা ধানের জমিতে "ঝড়া" বলিয়া এক প্রকার ধান গাছ জন্মিলে, তাহা চিনিয়া উপড়াইয়া দিবার কৃষাণ আর দেখা যায় না। ধান গাছে ও ঝড়ার গাছে প্রভেদ এত অল্প যে তাহা সহজে চিনিয়া উপড়াইয়া দেওয়া কঠিন। ঝড়াও এক প্রকার ধান গাছ, উহার ধান সম্পূর্ণরূপে পাকিবার পূর্ব্বেই ধানগুলি ঝরিয়া যায়। সেই ধান হইতে পর বৎসর যে ধান গাছ বাহির হয়, তাহাও ঝড়া হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ধান পাকিলে ধান গাছ কাটিবার সময়ও সেই ধান গাছ বহন করিয়া অনিবার সময় যে সকল ধান ঝরিয়া পড়ে তৎপর বৎসর সেই ধান হইতে যে ধান গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "নাম ধান" কহে। নাম ধান খসিয়া পড়িয়া যে গাছ জন্মে তাহা ঝড়া হইয়া থাকে। নাম ধান পাকিবার পূর্ব্বে ঝরিয়া পড়ে না। তৎপর বৎসর সেই ধানের গাছ ঝড়া হয়, ও তাহার ধান পাকিবার পূর্ব্বেই খসিয়া পড়িয়া যায়। জমিতে ঝড়া ঝরিয়া পড়িলে, তৎপর বৎসর জমিতে বহুসংখ্যক ঝড়া হইবে বলিয়া ঝড়া পাকিবার পূর্ব্বেই ঝড়ার গাছ কাটীয়া আনিয়া গরুকে খওয়ায়। অযত্ন সম্ভূত ধান গাছও ২।১ বৎসর মধ্যেই ঝড়ায় পরিণত হয়। রোয়া ধানের জমিতেও মধ্যে মধ্যে ঝড়া হইয়া থাকে। বীজ ধানের মধ্যে নাম ধান থাকিলে, সেই বীজ বপন করিলে নাম ধান হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহা ঝড়া হইয়া থাকে। ধান্য বপনের প্রথা উঠিয়া যাওয়ায়, এখনকার অনেক কৃষকেই কোনটী ধান গাছ কোনটী ঝাড়া তাহা চিনিতে পারে না। ধানগাছের পত্রের মূলদেশে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া থাকে, ঝড়ার তাহা থাকে না, আসল ধানের গোড়ার রঙ্গের ঝড়ার

গাছের গোড়ায় রঙ্গের কিছু প্রভেদ আছে। ইহা ব্যতীত ধানগাছ যেরূপ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, ঝড়া সেরূপ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় না। ধান যেরূপ নানা প্রকারের ঝড়াও সেইরূপ নানা প্রকারের হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের "নামধান" হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ঝড়া হইয়া থাকে। ঝড়াও ধানগাছের প্রভেদ লিখিয়া বুঝান সুকঠিন। পুনঃ পুনঃ উভয় গাছের প্রভেদ দেখিয়াও চিনিয়া ঝড়া তুলিয়া ফেলা অনায়াস সাধ্য নহে। একারণ অনেক স্থলে ঝড়া বলিয়া প্রকৃত ধান গাছ তুলিয়া ফেলা হয় এবং ঝড়াকে প্রকৃত ধানগাছ বলিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিস্তর ক্ষতি হয় বলিয়া বোনা ধানের প্রথা খুব কমিয়া গিয়াছে। জমিতে যে সকল নাম ধানের চারা থাকে, জমিতে জল দাঁড়াইবার পর ২।৩টা চাষ মই দিলেও সমস্ত চারা নষ্ট হয় না। জমিতে ধান্য চারা রোপণ করিলে, রোপিত চারার ফাঁকে ফাঁকে ঐ নাম ধানের চারা বেশ তেজস্কর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে নিড়াইবার সময় ঐ চারা উপড়াইয়া দেয় কেহ বা লোভের বশীভূত হইয়া রাখিয়া দেয়।

সন ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ মধ্যে ধানের চারাগুলি পালম শাকের ন্যায় ঘোর হরিদ্বর্ণের হইয়া সতেজে উঠিতে লাগিল। জমিতে এত অধিক পরিমাণে ধানের চারা উৎপন্ন হইয়াছিল যে, তাহার অর্দ্ধাংশও সমস্ত জমি রোপণ করিতে লাগিবে কিনা সন্দেহ। আষাঢ় মাসের প্রথমেই বৃষ্টি হইয়া জমিতে সামান্য জল দাঁড়াইল। অনেকেই মনের আনন্দে জমিতে চাষ মই দিতে আরম্ভ করিল। ২।৪ দিন মধ্যেই জমির জল শুকাইয়া গেল। কৃষকের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। কেহবা ২।১ বিঘা জমি অতি কষ্টে রোপণ করিয়াছিল সমস্ত আষাঢ় মাসের মধ্যে আর বিন্দু পাত হইল না। শ্রাবন মাসের মধ্যে একদিন সামান্য বৃষ্টি হইয়া কোন কোন জমিতে সামান্য জল দাঁড়াইয়াছিল, কেহ কেহ তাহাতেও ২।১ বিঘা জমি রোপণ করিয়াছিল, তাহার পর সমস্ত শ্রাবন ভাদ্র মাসের মধ্যে আর কিছুমাত্র বৃষ্টি হইল না। অনেক কৃষক এক কাঠা জমিও রোপণ করিতে পারে নাই। যাহারা ২।১ বিঘা রোপণ করিয়াছিল, দুই মাসকাল বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত শুকাইয়া গেল। বীজ ধান ও রোয়া ধান শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল! সমস্ত মাঠে অবাধে গরু চরিতে লাগিল। শুষ্ক প্রায় রোয়া ধান গাছ ও বীজ তলার ধানের চারা গরুতে খাইতে লাগিল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে এরূপ জল নাই যে জল সেচন করিয়া আবাদ করে বা ২।১ বিঘা রোপিত ধান রক্ষা করে। সমস্ত মাঠ জ্বলিয়া গেল, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আশ্বিন মাসের শেষে সামান্য এক পসলা ও কার্ত্তিক মাসের শেষে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত বর্ষাকালের মধ্যে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। আমাদের গ্রামের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে কোন কোন গ্রামে কিছু জমি আবাদ হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টিও হইয়াছিল। তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে কিছু কিছু ধান জন্মিয়াছিল। আমাদের গ্রাম হইতে পশ্চিমদিকে বরাবর বাঁকুড়া জেলা পর্য্যন্ত

সমস্ত স্থানই অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ধানের আবাদ কিছুমাত্র হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ কৃষককেই চাষের ধানে নবান্ন করিতে হয় নাই।

যে সকল কৃষকের কিছু বোনা ধান ছিলএবং যাহারা গরুর মুখ হইতে ঐ সকল বোনা ধানের গাছ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা কিছু কিছু ধান ও খড় পাইয়াছিল। আশ্বিন মাসের শেষে ও কার্ত্তিক মাসে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় ধান গাছ নষ্ট না হইয়া কিছু কিছু ধান জন্মিয়াছিল এমন কি তাহারা ঐ সকল বোনা ধানে ছয় আনা রকম ফসল পাইয়াছিল, যদিও গাছের উচ্চতা নিতান্ত কম হইয়াছিল বটে, কিন্তু খড় পরিমাণে নিতান্ত কম হয় নাই। আমার এক্ষণে ৬২ বৎসর বয়স। ৫০।৫৫ বৎসরের ঘটনা আমার বেশ স্মরণ হয়, আমি জীবনে এরূপ অনাবৃষ্টি ও অজন্মা কখন দেখি নাই। ইহাদ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে দারুণ অনাবৃষ্টিতে বোনা ধান ষোল আনা না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে অথচ কৃষকদের বোনা ধানের প্রতি এরূপ অনাদর করা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। বোনা ধানে যদিও নিড়াইতে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু রোপণাদি কার্য্যে যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা প্রায় করিতে হয় না অথচ রোয়া ধানের অপেক্ষা বোনা ধান কম হয় না, বরং অধিকই হইয়া থাকে। বোনা ধানের জমিতে সার না দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বোনা ধান কেন রোয়া ধানেও সার না দিলে প্রচুর জন্মে না।

ধানের চাষে কর্ষণ, বর্ষণ, পোষণ নিতান্ত আবশ্যক। ভাল করিয়া কর্ষণ না করিলে প্রচুর ধান জন্মিতে পারে না। ধান চাষে খুব গভীর কর্ষণের আবশ্যক হয় না। বরং খুব গভীর কর্ষণে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপভাবে কর্ষণ করিতে হইবে যেন কোন স্থান খাত হইতে বাকী না থাকে। ভাল করিয়া কর্ষণ করিলে মাটি তৃণাদি সহিত পচিয়া মৃত্তিকাস্থ ধান গাছের পোষণোপযোগী পদার্থ মূল দ্বারা অনায়াসে আকৃষ্ট হইয়া পত্র মধ্যে উত্থিত হয়। ইহাতে ধান গাছ বেশী বলিষ্ঠ হয় এবং মূলদেশ হইতে বহুসংখ্যক চারা উৎপন্ন হইয়া উত্থিত হয়। উদ্ভিদ মাত্রেই মৃত্তিকা হইতে, পত্র বায়ু হইতে আপনাদের খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদের মৃত্তিকাস্থ খাদ্য মূল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পত্র মধ্যে নীত হয়। পত্র ও বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উভয়বিধ খাদ্য দ্বারা উদ্ভিদ পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হয়। সূর্য্যোত্তাপ উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সূর্য্যের উত্তাপ না পাইলে গাছের পাতা ঘোর সবুজবর্ণ হয় না। গাছের পাতা ঘোর সবুজবর্ণ হওয়া গাছের উন্নতির লক্ষণ। ভাল করিয়া কর্ষণ করিলে মাটিতে ধান গাছের যে খাদ্য থাকে, তাহা পচিয়া আহারোপযোগী হয়।

বর্ষণ ব্যতীত ধান জন্মিতেই পারে না। ধানে যত জলের প্রয়োজন অন্য গাছে প্রায় তত হয় না। গত বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত আমাদের এ প্রদেশে মোটেই ধান জন্মে নাই বলিলেও চলে। গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য অনেক তালগাছ, খেজুর গাছ, কলা

গাছ ও বাঁশ মরিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গাছের মূল ধান গাছের ন্যায় ভাসা। উহাদের মূল খুব নিম্নদিকে প্রবিষ্ট হয় না। খুব নিম্নের মৃত্তিকা অনাবৃষ্টিতেও কিয়ৎপরিমাণে সরস থাকে, তজ্জন্য যে সকল উদ্ভিদের মূল খুব নিম্নদেশে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের মূল নিম্নের সরস মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে সকল গাছের মূল অগভীর প্রদেশে থাকে, তাহারা মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া লইতে পারে না। তজ্জন্য দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিতে যে সকল গাছের মূল ভাসা তাহারা মরিয়া যায়।

নিস্তেজ ক্ষেত্রে ধান্যাদির চাষ করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, কারণ খাদ্যাদির অভাবে ধান্যাদি নিতান্ত নিস্তেজ হয়, কিছুই ফল পাওয়া যায় না। এজন্য উদ্ভিদের পোষণ জন্য জমিতে প্রতি বৎসর সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সার না দিয়া চাষ করা অপেক্ষা চাষ না করা ভাল। উদ্ভিদের পোষণ জন্য অনেকগুলি উপাদানের আবশ্যক; পোষণের অনেকগুলি উপাদান উদ্ভিদ স্বাভাবিক উপায়ে পাইয়া থাকে। কতকগুলি উপাদান মানুষকে পূরণ করিয়া দিতে হয়। যে সকল উপাদান মানুষকে পূরণ করিয়া দিতে হয়, সকল সারে সেই সকল উপাদান পাওয়া যায় না গোবরও গোমূত্রে সেই সমস্ত উপাদান পাওয়া যায়। গোবরও অন্যান্য জন্তুর বিষ্ঠা ব্যতীত ঐ সকল উপাদান পাওয়া যায় না, বলিয়া গোবর ও অন্যান্য অনেক জন্তুর বিষ্ঠা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। জমিতে সার না দিলে ধান্যাদি ফসলের পুষ্টিসাধিত হয় না। তজ্জন্য কৃষকেরা প্রতি বৎসরই ধানের জমিতে সার দিয়া থাকে। জমিতে সার না দিলে প্রচুর ফসল পাওয়া যায় না।

যে বৎসর ভাল ও প্রচুর বীজ ধান (রোপণোপযোগী ধানের চারা) জন্মে, সে বৎসর প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইয়া ভাল ধান জন্মিতে দেখা যায় না। আমি এরূপ বহুকাল দেখিয়া আসিতেছি। যে বৎসর ভাল বীজ ধান অর্থাৎ রোপণোপযোগী চারা না জন্মায় রোপণোপযোগী চারার জন্য নিয়াজ বীজ ফেলিতে হয়, সে বৎসর প্রায়ই প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে। সন ১৩২২ সাল ও সন ১৩২৩ সাল ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

সন ১৩২২ সালে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত কিছুই ধান জন্মে নাই, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এপ্রদেশের সাধারণ কৃষক মাত্রেই দরিদ্র ও এথানকার কৃষকদিগের একমাত্র ধানই উপজীবিকা। এক বৎসর অজন্মা হইলেই অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। সন ১৩২২ সাল হইতে সন ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এপ্রদেশে বিলক্ষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। গরুরও বিলক্ষণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল। গরুকে গাছের পাতা খাওয়াইয়া রাখিতে হইয়াছে। খাদ্যাভাবে অনেক গরু মরিয়া গিয়াছে, এখনও মরিতেছে। যে গুলি এখনও বাঁচিয়া আছে, সেগুলি অস্থি কঙ্কাল মাত্র সার হইয়া আছে। খাদ্যাভাবে যদিও এপ্রদেশে মানুষ মারা যায় নাই, বটে, কিন্তু অনেকেই এক বেলা খাইয়া কোন দিন বা অনাহারে কাটাইতে হইয়াছে। অনেককেই এত ঋণগ্রস্থ

হইতে হইয়াছে যে সে ঋণ হইতে তাহাদের পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। অধিকাংশ লোককেই থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি তৈজস বিক্রয় করিতে হইয়াছে। সন ১৩২৩ সালে নূতন ধান উৎপন্ন হওয়ায় এপ্রদেশের অন্নকষ্ট বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে।

যে প্রদেশের সাধারণ কৃষকগণ এত দরিদ্র, এক বৎসর অজন্মা নিবন্ধন ধান্যাদি ফসল উৎপন্ন না হইলে, যাহাদিগকে এরূপ ভীষণ অন্নকষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, সে প্রদেশের কৃষকগণের দ্বারা কখনও কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। যাহারা নিজের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে পারে না, গবাদি পশুকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিতে অক্ষম, এরূপ কৃষকগণের উপর কৃষি কার্য্যের ভার থাকিলে কখনও দেশের উন্নতি হইতে পারে না। দেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে জমীদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। কৃষির উন্নতিতেই দেশের উন্নতি কৃষির উন্নতি না হইলে কি শিল্প কি বাণিজ্য কিছুরই বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। এখন আর দরিদ্র, নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে কৃষি কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

সন ১৩২৩ সালে কিছুমাত্র ধান জন্মিল না। এমন কি মাঠে কাস্তে পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হয় নাই। সন ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে এক পশলা বৃষ্টি হইল। তৎপূর্ব্বে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে মোটে বৃষ্টি হয় নাই বৃষ্টি হইবার পর কৃষকেরা জমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করিল। বৈশাখ মাসের মধ্যে আরও একবার বৃষ্টি হইল। যে সকল জমিতে বীজ ধান বপন করিতে হইবে কৃষকেরা সেই সকল জমিতে ২।৩টা করিয়া চাষ দিয়া রাখিল; ইহার পর বৃষ্টি হইলেই বীজ ধান ঐ সকল জমিতে বপন করিবে। কিন্তু একমাস মধ্যে আর বৃষ্টি হইল না। কৃষকেরা বীজ ধানও বপন করিতে পারিল না দেশ মধ্যে ভীষণ জল কষ্ট উপস্থিত হইল। সন ১৩২২ সালে বর্ষা না হওয়ার কোন পুষ্করিণীই জল পূর্ণ হয় নাই। বহু দূর হইতে পানীয় ও ব্যবহারোপযোগী জল আনয়ন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব বৎসর কোন জমিই আবাদ না হওয়ায় পতিত অবস্থায় ছিল। সেই সকল জমিতে তৃণাদি উৎপন্ন হওয়ায় গবাদি পশু অবাধে চরিয়া ছিল। তজ্জন্য জমির মৃত্তিকা নিতান্ত কঠিন ও তৃণাবৃত হইয়া উঠিয়া ছিল। তজ্জন্য জমিতে চাষ দেওয়া নিতান্ত কষ্ট কর হইয়া উঠিয়া ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকেরা বীজ ধান ফেলিতে পারিল না কেহ কেহ বৈশাখ মাসে ২।৩ বার কর্ষিত জমিতে শুষ্ক মৃত্তিকায় ধানের বীজ ছড়াইতে লাগিল। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে একবারে বেশ বৃষ্টি হইল, তাহার পর ২।১ দিন অন্তর খুব বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রায় প্রতি দিন বৃষ্টি হওয়ায় যো না পাওয়ায় বীজ ধান বপন করিতে পারিল না। কেহ কেহ বা আর্দ্র মৃত্তিকাতেই ধানের বীজ বপন করিতে লাগিল। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই জমিতে জল দাঁড়াইয়া গেল। যাহারা শুষ্ক ও আর্দ্র মৃত্তিকায় বীজ বপন

করিয়া ছিল, তাহাদের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরই জমিতে জল দাঁড়াইয়া গেল; জল দাঁড়াইয়া থাকিলে অঙ্কুরিত চারা ও উপ্ত বীজ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জমির জল কাটাইয়া দিল। ধানের চারা কতক বাহির হইল কতক পচিয়া নষ্ট হইয়া গেল। যে সকল চারা বাহির হইল, তাহা তত তেজস্কর হইল না। শুষ্ক মৃত্তিকায় উপ্ত বীজ জল পাইয়া অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলেও সেই চারা ১০।১৫ দিন জমিতে জল না দাঁড়ায় অথচ মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয় এরূপ ভাবে থাকিলে যেরূপ তেজস্কর চারা হয়, বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় বা তৎপূর্ব্বে বা তাহার ২।৪ দিন পরে অধিক বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইলে ও সেই জল বাহির করিয়া দিলে সে চারা আর তত তেজস্কর হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতেই জমিতে জল দাঁড়াইয়া গেল। অথচ ধানের চারা ভালও পর্য্যাপ্ত হইল না। ঐ সকল নিস্তেজ চারাকে তেজস্কর করিবার জন্য রেড়ির খৈল গোহালের গোবর গোমূত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা জমিতে দিতে লাগিল। পর্য্যাপ্ত চারা উৎপন্ন হয় নাই এবং ঐ সকল নিস্তেজ অকর্ম্মণ্য চারা কার্য্যকর হইবে না বিবেচনা করিয়া সকলেই নিয়াজ করিয়া বীজ বপন করিতে লাগিল। * কৃষকেরা জমিতে জল দাঁড়াইবার পর আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই জমিতে চাষ মই দিতে লাগিল। গত বৎসর সমস্ত জমি পতিত থাকাতে ৪।৫ চাষের কম রোপণোপযোগী কাদা তৈয়ার হইবে না। যাহাদের ধূলায় ২।৩টা চাষ দেওয়া আছে, তাহাদিগকেও ২।৩টা করিয়া চাষ দিতে হইবে। কৃষকেরা জমিতে চাষ দিতে লাগিল বটে, কিন্তু ধানের চারা রোপণোপযোগী হইয়া উঠিল না। যে সকল বীজ শুষ্ক মৃত্তিকায় ফেলা হইয়াছিল, যাহাতে খইল ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল বীজ কিছু তেজস্কর হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ২০শে আষাঢ়ের পূর্ব্বে সে বীজও রোপণোপযোগী হইয়া উঠিল না। এদিকে আষাঢ় মাসের প্রথমে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর আর বৃষ্টি না হওয়ায় জমির জল শুষ্ক হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। কেহ কেহ জল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রোপণের অনুপযোগী চারাই তুলিয়া রোপণ করিতে লাগিল। এইরূপে রোপণ করিতে করিতে চারা রোপণোপযোগী হইয়া উঠিল। এদিকে আর বৃষ্টি না হওয়ায় জমির জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। অধিকাংশ জমির জল শুষ্ক হইয়া গেল। জলশূন্য জমিতেও কষ্টেস্বষ্টে কোনরূপে কাদা করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা ছিদ্র করিয়া ধান চারা রোপণ করিতে লাগিল। আষাঢ় মাসের ২৫শের মধ্যেই অধিকাংশ জমির জলই শুখাইয়া জমির মৃত্তিকা ফাটিয়া গেল। কেহ কেহ জল সেচন করিয়া অতি কষ্টে রোপণ করিতে লাগিল। আষাঢ় মাস মধ্যে আর বৃষ্টি হইল না। শ্রাবন মাসের ৪ঠা বৃষ্টি হইল, তাহাও খুব প্রচুর নহে; তবে আবাদের কার্য্য পুনরায় চলিতে লাগিল। জমিতে জল সামান্যই দাঁড়াইয়াছিল, সে জলও শুকাইবার উপক্রম হইল।

* "বর্দ্ধমান অঞ্চলের ধানের চাষ" প্রস্তাবে আমরা নিয়াজ বীজ ফেলার কথা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি।

অনেক জমির জল শুষ্কও হইয়া গেল, কেহ কেহ জল সেচন করিয়া রোপিত ধানের চারা রক্ষা করিতে কেহবা জমিতে চাষ মই দিয়া ধান চারা রোপণ করিতে লাগিল। শ্রাবণ মাসের শেষে ও ভাদ্র মাসের প্রথমে সামান্য সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় আবাদের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া উঠিল। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অতি-বর্ষণে মাঠ প্লাবিত হইতে লাগিল।

শুষ্ক মৃত্তিকায় উক্ত ধান বীজের চারা পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন না হওয়ায় নিয়াজ বীজের চারা উৎপন্ন করিতে হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নিয়াজ বীজের চারা হইতেও প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ বৎসর যে সকল জমিতে কৃষকেরা আষাঢ় মাস হইতে বরাবর জল রাখিতে পারিয়াছিল সে সকল জমিতে প্রচুর ধান জন্মিয়াছিল। যে সকল জমিতে ধান্য চারা রোপণের পর অথবা রোপণের পূর্ব্বে জমির জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল সে সকল জমিতে তাদৃশ ধান উৎপন্ন হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে জমিতে জল দাঁড়াইলে সেই জল যদি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বরাবর থাকে, এবং জমি যদি বেশ উর্ব্বরা হয়, তবে সে জমিতে চারি পোয়া স্থলে ৫।৬ পোয়া পর্য্যন্ত ধান জন্মিয়া থাকে। এমন কি ঐরূপ জল থাকা জমিতে ভাদ্র মাসে ধানের চারা রোপণ করিলেও প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে। যে সকল জমির জল ধানের চারা রোপণের পূর্ব্বে বা পরে মরিয়া গিয়াছিল, সে সকল জমিতে তাদৃশ ধান জন্মে নাই, ঐরূপ অধিকাংশ জমিতে গাঁজ গোট্রা ও আগাছা জন্মিয়া ধান জন্মিবার পক্ষে বাধা প্রদান করিয়াছিল।

গত বৎসর গরুতে উদর পূর্ণ করিয়া আহার পায় নাই, এজন্য অধিকাংশ কৃষকের গরুই নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য ভাল করিয়া চাষ দিতে পারে নাই এবং অধিক পরিমাণে জমিও কর্ষিত হয় নাই। গত বৎসর প্রায় সমস্ত জমিই পতিত থাকায়, জমি তৃণাবৃত হইয়াছিল। তৃণাবৃত ভূমি কর্ষণ শাতিশয় কষ্টসাধ্য। তৃণাবৃত ভূমি ভাল করিয়া কর্ষণ করিলে, মৃত্তিকাসহ ঘাসগুলি পচিয়া মৃত্তিকা বেশ নরম হইয়া উঠে এবং মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদের খাদ্য উদ্ভিদের আহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। ধান চাষে জমির মৃত্তিকা বেশ পচিয়া নরম হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। জমিতে উদ্ভিদের খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেই চলিবে না, তাহা উদ্ভিদের আহারোপযোগী হওয়া চাই। জমির মাটী পচিয়া নরম হইলে উদ্ভিদের খাদ্য আহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। জমি এক বা দুই বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে পতিত থাকিলে, অর্থাৎ কোন শস্যের আবাদ না হইলে, যদি তাহার পর সেই জমিতে যথা সময়ে ধান্য রোপণ করা হয় তবে বিনা সারেও সেই জমিতে প্রচুর ধান্য জন্মিয়া থাকে। গত বৎসর আমাদের এ প্রদেশের প্রায় সমস্ত জমিই পতিত ছিল, এজন্য বিনা সারেও যে সকল জমিতে বরাবর জল ছিল, তাহাতে প্রচুর ধান জন্মিয়াছে। এত অধিক ধান হইয়াছে যে সেরূপ ধান জন্মান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

জমির জল শুখাইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমাদের এ প্রদেশে এত অধিক ধান উৎপন্ন হইত যে, গত বৎসরের অজন্মা জনিত ক্ষতিও বোধ হয় পূরণ হইয়া যাইত। যে সকল জমির জল ধান্য রোপণের পর বা পূর্ব্বে শুকাইয়াছিল এবং যদিও ঐ সকল জমির অধিকাংশ জমিতেই গাঁজ গোঁটরা জন্মিয়াছিল তথায় মোটের উপর ঐ সকল জমিতেও ধান মন্দ জন্মে নাই, তবে যে সকল জমিতে বরাবর জল ছিল তাহার তুলনায় কম বটে। "আকালের পর বৎসর প্রচুর ধান জন্মে" এইরূপ একটি প্রবাদ বাক্য আছে। তাহার কারণ জমি পতিত থাকিলে ও তাহার পর বৎসর সুবর্ষা হইলে প্রায়ই প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে। জমি পতিত থাকিলে বা অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে ধান কম জন্মিলে, মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদের খাদ্য নিঃশেষিত হয় না তজ্জন্য পর বৎসর প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে। ধান চাষের জমিতে আবশ্যক মত সার দিলে ভাল করিয়া কর্ষণ করিলে এবং আবশ্যকমত জল পাইলে প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেবমাতৃক দেশবশতঃ আবশ্যকমত জল পাওয়া যায় না, তজ্জন্য অনাবৃষ্টি জন্য মধ্যে মধ্যে অজন্মা হইয়া থাকে। মোটের উপর বলিতে গেলে এ বৎসর আমাদের এ প্রদেশে ধান মন্দ হয় নাই।

আষাঢ় শ্রাবন মাসে ধান চারা রোপণের সময় অধিক জল হওয়া ভাল নহে। অথচ মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইয়া জমির জল যেন অব্যাহত থাকে। রোপণের পূর্ব্বে চাষ দিবার সময় জমিতে খুব সামান্য জল থাকা ভাল, অধিক জল থাকিলে তাহাও বাহির করিয়া দিতে হয়। জমিতে কম জল থাকিলে কোন্ স্থান কর্ষিত হইল, কোন্ স্থান কর্ষিত হইল না তাহা জানিতে পারা যায় এরূপ অবস্থায় জমির মৃত্তিকা উত্তমরূপ কর্ষিত হইয়া থাকে। জমিতে অধিক জল থাকিলে ঐরূপ ভাল করিয়া কর্ষণ করা যায় না অনেক স্থানই অকর্ষিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অধিক বৃষ্টিপাতে যদি জমির উপর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাতে ভাল করিয়া কর্ষণত হয়ই না তাহার উপর কর্ষণ কালে জমির মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সারাংশ জলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া থাকে, তৎকালে ঐরূপ জমির জল বাহির হইয়া গেলে, ঐ জলের সহিত উদ্ভিদের খাদ্য স্বরূপ সার পদার্থ বাহির হইয়া যায়। যে বৎসর আষাঢ় শ্রাবন মাসে আবাদের সময় অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া মাঠ প্লাবিত হইয়া স্রোত বহিয়া যায়, সে বৎসর প্রায়ই ভাল জন্মে না। তাহার কারণ অধিক জলে সকল স্থান ভাল করিয়া কর্ষণ করা হয় না এবং কর্ষণকালে মৃত্তিকাস্থ সার পদার্থ জলের সহিত মিলিত হইয়া স্রোতে চলিয়া স্থানান্তরিত হয়। এ বৎসর আবাদকালীন অতি বর্ষণ হয় নাই। তজ্জন্য জমির সকল স্থানই কর্ষিত হইয়াছিল, জমির সার-পদার্থও বাহির হইয়া যায় নাই।

এ বৎসর যদি আষাঢ় মাসের শেষে জমির জল শুষ্ক হইয়া না যাইত তাহা হইলে এ প্রদেশে প্রচুর ধান্য জন্মিত। যে সকল জমিতে বরাবর জল ছিল, এবং যে সকল জমিতে সার গোবর প্রভৃতি উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থ দেওয়া ছিল সে সকল জমিতে

প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। ঐ সকল জমিতে প্রতি বিঘায় পাকী ১৬ হইতে ২০ মণ পর্য্যন্ত ধান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। যে সকল জমির জল আষাঢ় মাসে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সে জমির ধান অনেক কম হইবে। যাহাদের জমি বেশ উর্ব্বরা জল শুষ্ক হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে ধান মন্দ জন্মে নাই। যে সকল জমি নিস্তেজ ও যাহার জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ভাল ধান জন্মে নাই। যে সকল নিস্তেজ জমির আষাঢ় মাসে জল শুষ্ক হয় নাই, তাহাতেও মন্দ ধান জন্মে নাই। মোটের উপর এ বৎসর এ প্রদেশে ধান মন্দ জন্মে নাই।

ভাদ্র মাসে অতি বৃষ্টি হইয়া মাঠ প্লাবিত হইলে ধান ভাল জন্মে না। ভাদ্র মাসে জমিতে খুব কম জল থাকা ভাল। কম জলে ধান গাছের মূল দেশ হইতে যেরূপ বহু সংখ্যক চারা বহির্গত হয়, অধিক জলে সেরূপ হয় না। ভাদ্র মাসই ধান গাছের মূল হইতে চারা বাহির হইবার মুখ্য সময়। আশ্বিন মাসে ধানের জমি জল পূর্ণ থাকা বিশেষ আবশ্যক। আশ্বিন মাসে জমি জল পূর্ণ থাকিলে ধান গাছগুলি সতেজে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়া ভাল নহে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে ঝড় বা জোরে বাতাস বহিলে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। এবৎসর ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অতি বর্ষণ হইয়াছিল। আশ্বিনমাসে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড় এত অধিক হইয়া ছিল, যে তাহাতে অনেক গৃহ ও বৃক্ষ পতিত হইয়াছিল, অধিকাংশ ঘরের চালের খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত জমির ধান পতিত হইয়া গিয়াছিল। কার্ত্তিক মাসেও প্রবল বায়ুর সহিত বৃষ্টি হইয়াছিল। ঝড়ে ধানগাছ পতিত হইলে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে ফলন খুব কম হয়। অনেক ধানে চাউল জন্মে না। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে ঝড় বা জোরে বাতাস বহিলে আরো বেশী অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিনা বাতাসে কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে ধানের ফলন অধিক হয়। "বিনা বায়ে (বায়ুতে) তুলা (কার্ত্তিক মাসে) বর্ষে, কোথা থোব ধান।" বিনা বাতাসে কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে ধানের ফলন খুব অধিক হয় বলিয়া ঐ বচন প্রচলিত আছে।

এবৎসর ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অতি বর্ষণে আশ্বিন মাসের ঝড়ে এবং কার্ত্তিক মাসে জোরে বাতাস বহায় এপ্রদেশের ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের এপ্রদেশের রবিশস্যের মধ্যে মসুর কলাই বেশ জন্মিয়া থাকে। কলাই বপন করিবার উপযোগী জমি সকলে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত জল কাদা থাকায় মসুর কলাই বপন করিতে পারে নাই।

পৌষ, ১৩২৩ সাল।

কর্ষণ যন্ত্র

কলের লাঙ্গল বা বাষ্পচালিত লাঙ্গল ও অন্য কর্ষণ যন্ত্র।

আমাদের দেশের লোক আজকাল কলের লাঙ্গল ও বিলাতী কৃষি যন্ত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেন বিলাতী লাঙ্গল বা যন্ত্রাদি পাইলেই তাহারা ভারতীয় কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এক মুহূর্ত্তে করিয়া ফেলিতে পারিবে। অনেকে কলের লাঙ্গল অর্থে বুঝেন যে যাহাতে দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা কিছু অধিক কল কব্জা আছে, যাহার কিছু বিশেষত্ব আছে, আবার কেহ বা কলের লাঙ্গলের প্রকৃত অর্থ বাষ্পচালিত লাঙ্গল বলিয়া জানেন।

বাষ্পচালিত লাঙ্গলের জন্য অন্ততঃ ১৮।২০ ঘোঁড়ার বলযুক্ত একটা এঞ্জিন ও তদুপযুক্ত বয়লার চাই। ইহার বলে লাঙ্গল, বিদে প্রভৃতি চলিবে। ১০হাজার টাকার কমে একটা কলের লাঙ্গল কোন খানে স্থাপন করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া যায় না। তারপর দৈনন্দিন খরচ আছে, তাহাও বৎসরে এঞ্জিন ম্যান ও মজুরের মাহিনা, কয়লা, জল তোলাই, কলে তৈল ও চর্ব্বি দেওয়া প্রভৃতিতে খরচ মাসিক ৫০০৲ টাকার হিসাবে বৎসরে ৬০০০ হাজার টাকা ধরিয়া রাখিতে হইবে।

এইরূপ প্রথমেই অত্যধিক খরচ ছাড়াও কলের লাঙ্গল চালাইবার আরও অনেক অসুবিধা আছে।

(১) ৩।৪ হাজার বিঘা জমি এক সঙ্গে, এক লপ্তে না পাইলে কলের লাঙ্গল চালাইবার সুবিধা হয় না। কলের কাজ কল চলিলে তবে লাভ, কল বসিয়া থাকিলেই লোকসান। ৩।৪ শত বিঘা জমি লইয়া চেষ্টা করিতে গেলে প্রথমতঃ লাঙ্গল বিদা প্রভৃতি চালাইবার লাইন প্রভৃতি বসাইতে যাহা খরচ হইবে ফসলে তাহা উঠিবে না এবং কল অধিকাংশ সময় বৃথা বসিয়া থাকিবে।

(২) ইয়ুরোপ ও এমেরিকার ফার্ম্মগুলি বড় এবং তথাকার মাটি দৃঢ়বদ্ধ, কলের লাঙ্গলে চষিবার উপযুক্ত। আমাদের দেশের আবাদ অঞ্চলের বা পল্লিগ্রামের রাস্তা ঘাট গুলিতে

গরুর গাড়ী অতিকষ্টে চলা ফেরা করিতে পারে, এঞ্জিন চলা চলের উপায় নাই। য়ুরোপ এমেরিকায় আবাদ অঞ্চলেরও রাস্তা ভাল। তথায় একটি কৃষি ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইলে অপর কেহ তাহার কাজের জন্য কলের লাঙ্গল ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া যাইতে রাস্তার জন্য কোন কষ্টভোগ করিতে হয় না।

(৩) ধান জমিতে, জলা বা নরম জমিতে কলের লাঙ্গল চলিবে না। আচট জমি ভাঙ্গিতে বা ঘাষের জমিকে চাষের জমিতে পরিণত করিতে কলের লাঙ্গল বিশেষ উপযোগী। ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে ইহা কোন কাজেই লাগে না।

(৪) কাঠ ও কয়লার দাম যেরূপ চড়িতেছে এবং সুদূর মফস্বলে কাঠ বা কয়লা পাওয়া যেরূপ দুষ্কর তাহাতে কলের লাঙ্গল চালাইবার অন্য সুবিধাগুলি থাকিলেও এই হেতু বিষম ব্যাঘাত জন্মে।

(৫) য়ুরোপ ও এমেরিকায় ঢালাই ও মেরামতের কারখানা অনেক। যথা তথা কল কব্জা মেরামত হইতে পারে। এখানে সহর নগর ভিন্ন অন্যত্র এঞ্জিন বা লাঙ্গলের কোন অংশ খারাপ হইলে সহজে মেরামত হওয়া কঠিন।

পশ্চিমাঞ্চলে যমুনার ধারে বান্দা জোলায় বহুদিন পূর্ব্বে কলের লাঙ্গল আনাইয়া ঘাসের জমি ভাঙ্গিয়া চাষের জমি করিবার চেষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রায় হাজার বিঘা জমি উহা দ্বারা চষা খোড়া হইয়া চাষোপযোগী হইয়াছিল। বর্ষার সময় মাটি অত্যন্ত নরম হওয়ায় কাজ বন্ধ রাখিবার আবশ্যক হইয়াছিল এবং গ্রীষ্মের সময়ও বয়লায়ের জন্য জলাভাব হওয়ায় কাজ বন্ধ ছিল। যেরূপ হারে কাজ হইতে দেখা গিয়াছিল তাহাতে উহাদ্বারা বৎসরে ৩ হইতে ৪ হাজার বিঘা জমিতে চাষ কারকিত হইতে পারিত। এই লাঙ্গলে ৫৲ টাকা খরচে এক একর (৩ বিঘা) জমির চাষ কারকিত হইতে পারে। উলু কাশ ঘাষ যুক্ত জমি ইহাদ্বারা এক বৎসরে অতি উত্তমরূপ কর্ষিত হয়। সাধারণ লাঙ্গলে এই কার্য্য করিতে বিঘা প্রতি ১০৲ টাকা খরচের কমে হয় না। কিন্তু কলের লাঙ্গলের আনুসঙ্গিক খরচ অত্যন্ত অধিক বলিয়া এবং এক সঙ্গে বিস্তৃত ক্ষেত্র মিলে না, এবম্প্রকার নানা অসুবিধা হেতু কলের লাঙ্গল ভারতে চলিল না।

এ দেশে বাষ্পচালিত কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে যদিও না পারা যায়, দেশী লাঙ্গলের আবশ্যক মত উন্নতি করা বিধেয় হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী লাঙ্গল ও কোদাল ব্যবহারে কাজের সুবিধা ও চাষের খরচ কমান যায় কি না আমাদিগকে এখন তাহা দেখিতে হইবে।

লাঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিলাম যে, বিলাতী লাঙ্গল, বা চাকাওয়ালা হাত কোদাল বা কোন কোন বিদেশী কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ঠিক করিয়া লইতে হইবে যে (১) সেগুলি ভারতের মাটি ও জলহাওয়া পক্ষে কতদূর উপযুক্ত, সে গুলি সহজে খাটান এবং চালান যায় কি না, চালাইতে বা খরচ কত? এ দেশের

বলদে বিলাতী লাঙ্গল টানিতে পারে কি না কিম্বা এ দেশের লোকে চাকাওয়ালা কোদাল চালাইতে অসুবিধা বোধ করে কি না, বিলাতী কৃষি যন্ত্রের দাম অত্যধিক কি না, এই গুলি কতদিন টিকিবে এবং ভাঙ্গিলে মেরামত হইবে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা বিলাতী কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি।

বিলাতী লাঙ্গলের কতকগুলি অসুবিধা বাদ দিয়া, কতক অংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া এ দেশের উপযোগী লাঙ্গল প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে পাখা সংযুক্ত আছে বলিয়া মাটি চষিবার কালে উল্‌টাইয়া যায়। আমাদের দেশে নিচের মাটি উপরে ও উপরের মাটি নিচে ফেলিবার আবশ্যক হইলে কোদাল ভিন্ন উপায় নাই, দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে এই কার্য্য কিছুতেই সম্ভব নহে। মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি এইজন্য লাঙ্গলে পাখা জুড়িয়া দিয়াছে।
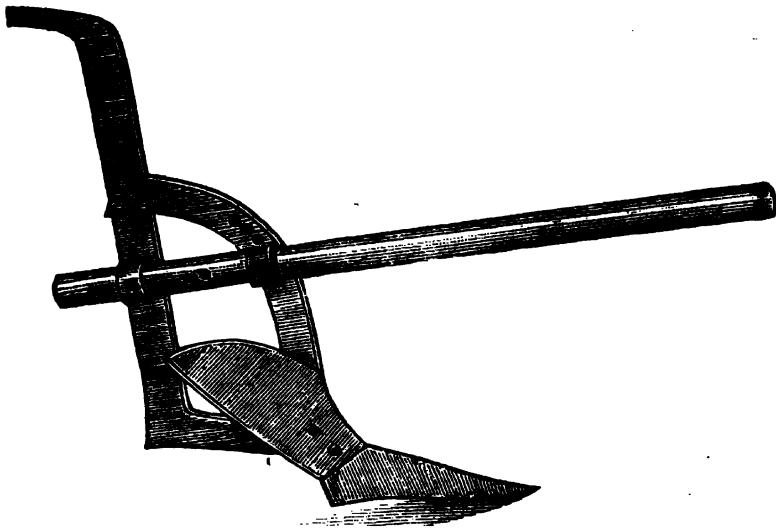
বিলাতী অনুকরণে ভারতীয় পাখাওয়ালা লাঙ্গল

হিন্দুস্থান লাঙ্গল, শিবপুর লাঙ্গল এই ধরণের লাঙ্গল।
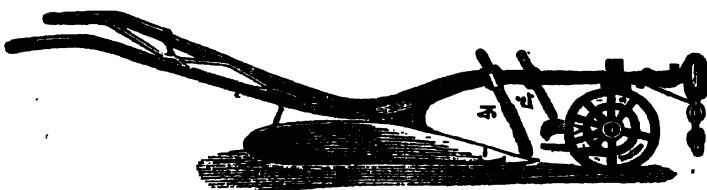
চাকাওয়ালা ইংলিশ লাঙ্গল

চাকাওয়ালা ইংলিশ লাঙ্গল

ইহাতে অনেকগুলি অংশ অধিক আছে, পাখাত আছেই। ইহার দুই খানি চাকা, এক খানি মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যায় দ্বিতীয় খানি লাঙ্গলের শিয়ারের (Furrow) মধ্য দিয়া যায়। ইহাতে দুই খানি অগ্র ফলক (Coulter) থাকে। একখানিতে (ক) মাটির চাপগুলি সোজাসুজি কটিয়া দেয়। দ্বিতীয় ফলক (খ) অনেকটা লাঙ্গল ফলকাকৃতি ইহাদ্বারা মাটির উপর অংশ চাঁচিয়া যায়। ইহার সাহায্যে আগাছা কুগাছা গুলি জমি চাষ কালে মাটির তলায় পড়িয়া যায়। সার জমির উপর ছড়াইয়া দিয়া ইহাদ্বারা মাটিতে প্রোথিত করা যায়। বিলাতী লাঙ্গলের দুইটি হাতল ধরিয়া লাঙ্গল চালাইলে অধিক জোর পাওয়া যায় এবং ইচ্ছামত সহজে লাঙ্গল ঘুরাইতে বা ফিরাইতে পারা যায়। আমাদের দেশের চাষীরা কিন্তু বামহাতে লাঙ্গল ধরে, কখন বা দুইহাতে লাঙ্গল চাপিয়া ধরে এবং প্রায় দক্ষিণ হাতে গরু চালায়, গরুর লেজ না মলিতে পাইলে তাহারা কিছুতেই সুখী বোধ করে না।

বিলাতী লাঙ্গলের ফলা চওড়া এবং ইহা অধিক মাটি ভেদ করিয়া যায় ও লাঙ্গল ভারি এই হেতু আমাদের দেশী বলদে তাহা টানিতে অক্ষম। এমেরিকান বা যুরোপীয় লাঙ্গলের অনুকরণে প্রস্তুত এ দেশীয় লাঙ্গল এ দেশের বলদের উপযোগী। তাহার অনেক অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া এ দেশের মৃত্তিকার উপযোগী করা হইয়াছে ও দামেও সুলভ হইয়াছে কোন কোন বিলাতী লাঙ্গলের দুই খানি পাখা থাকে। ইহাতে খুব গভীর খাত খননের সুবিধা হয়। কোন কোন লাঙ্গলের একখানি মাত্র চাকা, শিয়ালের মধ্য দিয়া চলিবার চাকা খানি নাই।

মৃত্তিকার অন্তরস্থল খননের বিদা
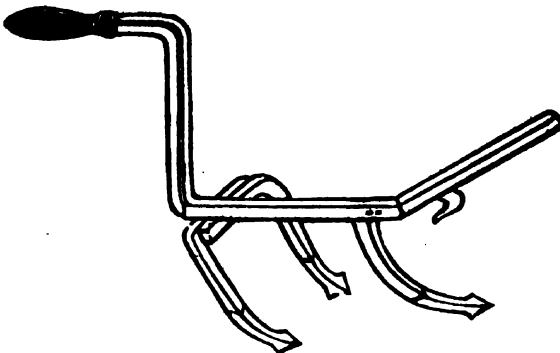
ইহাতে মাটি না উল্টাইয়া মাটির ভিতর তলাটি আল্গা করিয়া দেওয়া যায় এবং তাহাতে মাটির উপর ও নিম্নদেশ সমভাবে আল্গা হইয়া মাটিতে হাওয়া ও রস সঞ্চার হয়। ইহা ঘোঁড়া এবং গরু দ্বারা বাহিত হয়।
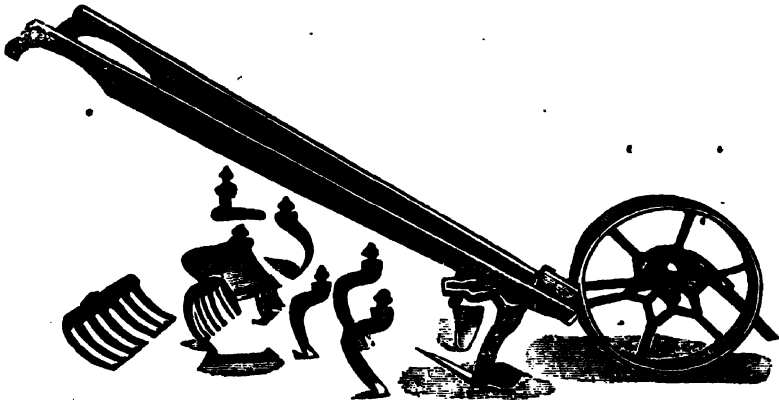
চাকাওয়ালা হাত কোদাল—পশ্চাতদিকে দুইটি হাতল ধরিয়া চাকার উপর ভর দিয়া ঠেলিয়া ইহা চালান হয়। ইহার অগ্রভাগে কোদাল বাঁধা থাকে তাহাতে মাটি খোদিত হইয়া যায়। ইহাতে ইচ্ছামত বিদা কিম্বা পটিকাটা বা আইল বাঁধা ফলক সংযোগ করা যাইতে পারে। পটিকাটা ফলক দ্বারা যে শিরাল প্রস্তুত হয় তাহাতে যদি একজন চাষী বীজ বপন করিতে করিতে যায় ও পদদ্বয় দ্বারা বীজগুলি মাটি চাপা দিয়া চলে তাহা হইলে অতি সহজে কার্য্য সমাধা হয়। এমেরিকান চাকাওয়ালা হাত কোদালির নাম Planet Junior Hoe ইহার দাম এখন ৩২৷৷০ টাকা।
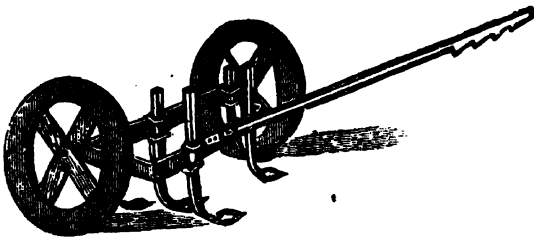
গ্রবার—ইহাও এক প্রকার মাটি আল্গা করিবার কৃষিযন্ত্র। ইহাদ্বারা মাটি খোদিত ও আল্গা করা যায়, কিন্তু মাটি উল্টান যায় না। একটা লোহার ফ্রেমে কয়েকটা ফলক আঁটা থাকে। ফলকগুলি সম্মুখের দিকে কিঞ্চিত বক্র। ইহা প্রায় মাটির অন্তরতল আল্গা করা বিদার মত। যখন মাটি উল্টাইবার আবশ্যক নাই, অথচ মাটি আল্গা করিতে হইবে তখন ইহাদ্বারা খুব ভাল কাজ হয়। জমির উপরে আগাছা কুগাছা ছিন্ন করিতেও ইহা বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশী লাঙ্গল দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে। দেশী লাঙ্গলের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহাতে ৩।৪ বা ততোধিক ফলক থাকে এবং ফলক গুলি দেশী লাঙ্গল ফলক অপেক্ষা কম চওড়া। দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে কিছু অধিক কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু অভাবে দেশী লাঙ্গলদ্বারাই কাজ চলিতে পারে। কর্ষণ কার্য্যের সহায় আমাদের আরও দুইটি যন্ত্র আছে—যেমন বিদা ও মই।

বিদ্দা—এক খণ্ড কাঠে ১৫।২০টা লৌহ ফলক আঁটা থাকে। ফলক গুলি কাষ্ঠ হইতে ৪।৫ ইঞ্চ বাহির হইয়া থাকে, ইহা সম্মুখ ভাগে ইষৎ বক্র। আশু ধান বা পাটের ক্ষেতে মাটি আল্গা করিতে বা চারা ঘন জন্মিলে পাতলা করিয়া দিতে অথবা ঘাষ মারিতে ইহার আবশ্যক। গ্রবার বা সব্‌ সয়লার (অন্তর-তল বিদা) দ্বারা এ কার্য্য হয় না। নরম মাটিতে বা চারা গাছের উপর ভারি কৃষিযন্ত্র চালাইলে ক্ষতি হয়। এই সময় গভীর মৃত্তিকা ভেদের আবশ্যকতাও নাই।

মৈ—মৈ (ladder) দ্বারা জমির ঢিল, ডেলা ভাঙ্গা হয়, জমির মাটি সমান করিয়া লওয়া হয় ও মাটি চাপিয়া রাখা হয়। মাটি চাপিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য দুইটি—১ম মাটি কর্ষণের পর মাটিতে ইচ্ছামত রস রক্ষা করা যায়; ২য়, মাটি চাপিয়া লইয়া তাহার উপর বীজ বপনের সুবিধা হয়। আল্গা মাটির উপর বীজ পড়িলে তাহা মাটির অধিক নিম্নে তলাইয়া যাইতে পারে এবং বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মাটি ভেদ করিয়া উঠিতে না পারিয়া মাটির নীচে প্রোথিত থাকিয়া মরিয়া যায়। আল্গা মাটিতে উদ্ভিদের শিকড়গুলিও ঠিকমত দাঁড়াইতে পারে না। এই সকল কারণে মাটি কর্ষণের পর কিয়ৎপরিমাণে আবার চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। বাঙ্গলা দেশে মৈ প্রচলিত কিন্তু উত্তর ভারতে ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার হয়। পঞ্জাবে কাঠের রোলারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। য়ুরোপ ও এমেরিকায় লোহার রোলার ব্যবহার হয়। মাটিকে বিশেষভাবে চূর্ণ করিবার জন্য তাহাতে আবার দাঁত থাকে। দাঁতবিহীন প্লেন রোলারও আছে। এই রোলারগুলি প্রায় ৪০০।৫০০ পাউণ্ড ভারি—বাঙ্গলা ওজন ৫।৬ মণ। ইহার পরিবর্ত্তে ভারি কাঠের বা ফাঁপা লোহার আবশ্যকানুযায়ী হাল্কা রোলার তৈয়ারি করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ড্রীল—বীজ দুই প্রকারে বপন করা যায় সমুদয় ক্ষেত জুড়িয়া হাতে ছড়াইয়া কিম্বা পটি কাটিয়া অথবা লাঙ্গলের শিয়ালে। হাতে ছড়াইয়া বীজ বোনায় অনেক অসুবিধা। বাঙলা দেশের মটর মসুরাদি বপনের একটা প্রথা দেখিতে পাই যে চাষীরা চষা জমির উপর বীজ ছড়াইয়া দিয়া জমিটি পুনরায় লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া মৈ দ্বারা চাপিয়া দেয়। ইহাতে অনেক বীজ অযথা নষ্ট হয়। অধিক মাটি চাপা পড়িয়া অনেক বীজ-অঙ্কুর মাথা তুলিয়া উঠিতেই পারে না। কতকগুলি বীজ এত ঘন বোনা হইল যে অনেকগুলি চারা একসঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি বাহির হওয়ায় কোনটাই ভাল বাড়িতে পাইল না। কোনস্থানে বা বীজ পড়িলই না অথবা মৈ দিবার সময় সরিয়া গেল তথায় জমি খালি রহিল। সমুদয় ক্ষেতের উপর বীজ বোনা থাকিলে জমি নিড়াইবার বা মাটি

আলা করিয়া দিবার বিশেষ অসুবিধা হয়। নালি কাটিয়া বীজ বপন করিলে সে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না এবং জল দিবার আবশুক হইলে সমুদয় ক্ষেতে জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না, শিয়ালগুলি ভিজাইলেই কাজ চলে। বাঙলা দেশে শিয়ালে বীজ বপনের অভাব হেতু এক বিঘা জমিতে বপনের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক বীজের আবশুক হয়। বিহারে শিয়ালে বীজ বপনের প্রথা প্রচলিত। তথাকার লাঙ্গলের পিছনে বাঁশের নল সংযুক্ত থাকে, তাহার মাথায় কাঠের বাটি। লাঙ্গলে শিয়াল (নালি) কাটিয়া যায়, পশ্চাতে কৃষক তাহার বস্ত্র মধ্যে রক্ষিত বীজ লইয়া নলমুখে শিয়ালে ফেলিতে থাকে। ইহাতেও কিন্তু চাষীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বীজ ঘন, পাতলা বোনা ও অধিক মাটির নীচে চাপা পড়িবার ভয় থাকে। মান্দ্রাজে এক প্রকার বীজ বপনের লাঙ্গল ব্যবহার হয়। ইহাতে এক সঙ্গে ৬টি শিয়াল প্রস্তুত হয় এবং ৬টি শিয়ালে সমকালে বীজ বোনা হইয়া যায়। ইহা বিহার প্রদেশে প্রচলিত বীজ বপনের লাঙ্গল অপেক্ষা উন্নত প্রণালীর হইলেও বিলাতী ডিল ভাল। বিলাতী ড্রিলে এক সঙ্গে অনেকগুলি শিয়ালে বীজ বপন হয়। ইহাতে এমন কৌশল আছে যে প্রত্যেক বীজটি সমান্তরালে পড়িবে এবং বীজগুলি কখন অতিরিক্ত মাটি চাপা পড়িবে না। প্লানেট জুনিয়র হোতে বীজ বপনের সুবিধামত নলযুক্ত কয়েকটি ফলক সংযুক্ত করিয়া দিলে ইহাদ্বারাও বীজ বোনা ড্রিলের কার্য্য হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লানেট জুনিয়ার হো এক চাকা যুক্ত বা দুই চাকা যুক্ত আছে। ইহা বলদে টানিতে পারে কিম্বা মানুষে ঠেলিয়া চালাইতে পারে। দুই চাকাযুক্ত হো মানুষের জোরে চলে না। বিলাতী উন্নত বীজবপনোপযোগী ড্রিলের দাম প্রায় ৩০০৲ টাকা। প্লাষ্টার হোতে পটি কাটা, বীজ বোনা, কোপান, দুই লাইন গাছের মধ্যে জমির কারকিত প্রভৃতি অতি সুবিধামত হয়।

মাটির কর্ষণের জন্য কয়েক প্রকার কোদাল আছে, হাত কোদাল, দাঁড়া কোদাল বিলাতী হাতওয়ালা কোদাল আছে। লাঙ্গলে যে কার্য্য কোদালেরও সেই কার্য্য, প্রকার ভেদ মাত্র। হস্তদ্বারা কোপাইবার উপযোগী কোদাল ভিন্ন বাঙলা দেশে অন্য কোদাল নাই।
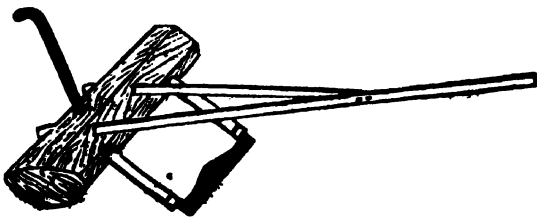
মধ্য প্রদেশে বাখার নামক কোদাল আছে, ইহা কিন্তু বলদদ্বারা বাহিত হয়। নালিকাটিয়া যে সকল ফসলের আবাদ করিতে হয় যেমন ওল, মানকচু, আলু প্রভৃতি তাহাতে বাখার বিশেষ কাজে লাগে। আইল বাঁধিবার সময় ইহা দুই লাইন গাছের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে আইল বাঁধা কার্য্য বেশ সুচারুরূপে

সম্পন্ন হয়। বাঙলাদেশে প্লানেট হোর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাখরি প্রচলন হইলেও মন্দ হয় না।

দেশী মদ্য—আমরা অভিধানে দ্বাদশবিধ মদের সন্ধান পাই—মাক্ষিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষব, তাল, খাজ্জুর, পানস, মৈরেয়, টাঙ্ক মাধুক, নারিকেলজ, অন্নবিকা রোখ। ইহঁদের মধ্যে মধু, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, তাল, খজ্জুর, মহুয়া ও অন্ন (চাউল) হইতে যে মদ প্রস্তুত হয় তাহারই প্রচলন অধিক। মদ অর্থে হৃষ্ট হওয়া—মদে মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করে। মদ খাইয়া মাতাল হওয়া দোষ কিন্তু মদ আমাদের উপকারী। শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য,শীতাতপ সহ্য করিতেও ঔষধার্থে মদ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য হই। ইহা উত্তেজক ও বলবর্দ্ধক। ইহা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। রুগ্নাবস্থায় নিয়মিত সেবনে ইহা টনিকের কার্য্য করে। দ্রাক্ষব মদ প্রায় অধিকাংশই ফ্রান্স হইতে আমদানী হয়। ঔষধার্থে ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতে আবকারী আইন প্রচলিত থাকায়, ছাড় ব্যতীত কেহ মদ তৈয়ারি করিতে পারে না এবং বিলাতী মদের সমান গুণ বিশিষ্ট মদ তৈয়ারির ছাড়ও দেওয়া হয় না। মাধ্বিক, ঐক্ষব, তাল, খাজ্জুর, মাধুক, অন্নজ, মদ এদেশে অনেক স্থানে তৈয়ারি হয়।

আজকাল মহুয়াও ইক্ষুগুড়জ মদের খুব ব্যবসা চলিতেছে। মহুয়ার ফুল শুষ্ক করিয়া ৪ দিন ভিজাইয়া পচিতে দিলেই জল চুয়াইয়া লইলে মদ প্রস্তুত হয়। ইক্ষুগুড়ও ঐ প্রকারে কয়েক দিন পচাইয়া চুয়াইলে মদ প্রস্তুত হয়।

হপ—তিক্ত বৃক্ষ বিশেষ যেমন চিরেতা। হপ ভিজাইয়া ও চুয়াইয়া বিয়ার মদ্য প্রস্তুত। ইহা পিত্তনাশক ও পিপাসা নাশক। ইহা ব্যবহারে প্রস্রাব সরল হয়। এই জন্য ইহা মহোপকারী মদ্য। দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, মৌরি প্রভৃতি হইতে যে মদ্য প্রস্তুত তাহাও অতিশয় সুগন্ধযুক্ত ও হিতকারী।

মাংসজ মদ্য—অতিশয় বলকারক ও সহজ পাচ্য হেতু দৌর্ব্বল্য নাশক। অনেক মদ্যে স্বভাবতঃ একটা সুগন্ধ আছে কিন্তু গোলাপ পাপড়ী দ্বারা অনেক মদ্য সুগন্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। মেঃ ডিঃ ওয়াল্ডি কোং ও আমুটী কোম্পানীর কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে মদের কারখানা আছে। তাঁহারা মদ প্রস্তুত করিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিতেছেন। এই সকল কারখানায় রম ব্যতীত কোন ভাল মদ প্রস্তুত হয় না। এখানে মদ প্রস্তুতোপযোগী দ্রব্যাদির অভাব নাই, এদেশীয়গণের কিন্তু ভাল কিম্বা মন্দ কোন প্রকার মদের কারখানা নাই।

শিল্প অনুসন্ধান সমিতি—"ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল" বা শিল্প অনুসন্ধান সমিতির অধিবেশনে কাগজ শিল্প সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হলেণ্ড সাহেব অনেকেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই বালি, টিটাগড় প্রভৃতি স্থলের ইউরোপীয় কাগজের কলের ম্যানেজার। অবশিষ্ট দুই এক জনের মধ্যে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সার ডোরাব তাতা ও প্রণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি ছিলেন। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ সাক্ষ্যে অনেক কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর বুদ্ধি কর্ম্মতৎপরতা যথেষ্টই আছে কিন্তু যাহা না হইলে কিছুই হয় না অর্থাৎ অর্থ নাই। স্বদেশীর দিনে দেশীয় কয়েকটী মৃত শিল্পেরই যে একটু আধটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে মধ্যবিত্ত লোকদের সাময়িক উদ্দীপনা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত লোক এমনই দরিদ্র যে তাহারা নিজ সামান্য খাওয়া পরা ব্যতীত এক পয়সাও বাঁচাইতে পারে না। যাহারা অতি কষ্টে সামান্য আয় করিতে সমর্থ হয় তাহারাও যৌথ অনুষ্ঠানের অনিশ্চিত ফলের জন্য হাত শূন্য করিতে সাহস পায় না। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথের উক্তির সমর্থন করিয়া সার ডোরাব তাতা ও সার ফজল ভাই করিম ভাই গভর্ণমেণ্টকে এই লাভজনক অনুষ্ঠানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

পত্রাদি

কাঁচা, ঘোঁড়ার নাদ—

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মিত্র। মশাট পোঃ

প্রশ্ন—আলু খুঁসিবার সময় কাঁচা, ঘোঁড়ার নাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না? আলু তুলিবার অনেক পূর্ব্বে একবার সেচ দিবার পর ঐ সার দিতে চাই।

উত্তর—কাঁচা, ঘোড়ার কিম্বা গরুর নাদ (গোবর) কোন সময়েই শস্য ক্ষেত্রে বা ফলের গাছে সাররূপে ব্যবহার করা চলে না। ইহা অধিক তেজস্কর বলিয়া গাছ জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। উহা একবৎসরকাল পচিয়া পরিণত হইলে তবে উহাদ্বারা সারের কার্য্য ভাল রকম হয়। তবে ঐ সার জলে গুলিয়া তরল সার সেচের জলের সহিত প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

শসার স্ত্রী ও পুং পুষ্প—

শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ। বাঁশাই।

প্রশ্ন—আপনারা লিখিয়াছেন যে শসার স্ত্রী ও পুং দুই রকম পুষ্প আছে। কি প্রকারে উহাদিগকে চিনিতে হইবে?

উত্তর—একটু ভাল করিয়া লক্ষ করিলেই চিনা যায়। পুং পুষ্পের ভিতর পারাগ দণ্ড (Stamen) থাকে। উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্থূল, যেন দুইটি বর্ত্তুলাকার অংশ একত্র জোড়া। ইহার ভিতর পরাগরেণু (Pollen) থাকে। স্ত্রী পুষ্পের অন্তরে গর্ভকোষ সজ্জিত থাকে, তদুপরি কতকগুলি সূত্রবৎ পদার্থ থাকে, যাহার অগ্রভাগে পরাগরেণু প্রবেশ লাভ করিয়া গর্ভকোষে নীত হয়। এই পরাগ পতিত হইলেই বীজের সঞ্চার

হয়। স্ত্রী পুষ্পের গোড়াতে প্রায়ই ফলের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। পুং পুষ্পে তাহা হয় না, সাধারণতঃ স্ত্রী পুষ্পই ফল ধারণ করে।

মিণ্ট ও ল্যাভেণ্ডার—

শ্রীমন্মথরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পোঃ, মথুরাপুর, জেলা মালদহ।

গত সন ১৩২২ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যার একখানি কৃষক পাঠ করিতে ছিলাম। তাহাতে দেখিলাম মিণ্ট আবাদ করিলে বিঘায় ২৮০৲ টাকা ও ল্যাভেণ্ডার আবাদ করিলে বিঘায় ১২০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। এইরূপ আয়কর শস্য এদেশের সাধারণ জমিতে উৎপন্ন করিতে পারিলে অনেক দুস্থ গৃহস্থের উপকার হয়। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রদানে বাধিত করিবেন।

১। মিণ্ট ও ল্যাভেণ্ডার বৎসরের কোন সময় লাগাইতে হয়, ইহার বীজ বা Cutting কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?

২। কি উপায়ে ইহার শাক হইতে তৈল প্রস্তুত করিতে হয় এবং ঐ তৈল এখানকার বাজারে বিক্রয় হইবে কি না?

৩। সাধারণ জমিতে এই দুই শাক উৎপন্ন করিতে কি প্রকার পাইট করিতে হয়, কোন সার কি পরিমাণে দিতে হয়?

৪। ল্যাভেণ্ডার ছায়াযুক্ত স্থানে লাগাইতে হয় বলিয়াছেন, আমাদের দেশে যে ভাবে বরজের মধ্যে পান লাগায় সেইরূপ ভাবে লাগাইলে চলিতে পারে কি না?

৫। এদেশে কোন আদর্শ ক্ষেত্রে বা কোন বাগানে এই দুই শাক আবাদ হইয়াছে কি না ও যদি হইয়া থাকে তাহাতে কতদূর সাফল্য লাভ হইয়াছে?

উত্তর ১—কেবল মিণ্ট ও ল্যাভেণ্ডারের চাষ করিলে হইবে না, উহা হইতে তৈল চুয়াইবার ব্যবস্থা না করিলে লাভের আশা নাই। চাষ এবং ব্যবসা এক সঙ্গে যোগ না হইলে চলিবে না। বীজ, কটিং এবং শিকড় এই তিন উপায়ে ইহার আবাদ বাড়ান যাইতে পারে। বাঙলা দেশে শীতকালে ভিন্ন লেভেণ্ডার কিম্বা মিণ্ট জন্মান যায় না এবং এখানে মরসুমী গাছের মত বৎসরে একবার দেখা যায়। ব্যবসার জন্য এখানে ইহাদের আবাদ নাই। জাপান বা এমেরিকায় ব্যবসারের জন্য ইহাদের আবাদ হয়, তথায় বারমাস ক্ষেতে ইহাদের গাছ থাকে।

মদ্যাদি যে ভাবে চোলাই করিয়া প্রস্তুত হয় ইহাদের তৈলও সেই ভাবে চুয়াইয়া লইতে হয়। চুয়ান আসব (জল) স্থিরভাবে রাখিয়া থিতাইতে দিলে তাহার উপর তৈল ভাসিয়া উঠে। এই তৈল জল হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়। যে প্রকারে গোলাপ হইতে আতর প্রস্তুত হয় সেই প্রথায় লেভেণ্ডার বা মিণ্ট হইতে তৈল বাহির হয়। কোন আতরের কারখানায় যাইয়া দেখিলে ব্যাপারটা ভালমত বুঝিতে পারা যাইবে।

ল্যাভেণ্ডার নির্য্যাস বা আতর বিক্রয়ের কোন চিন্তা নাই। সুগন্ধি হিসাবে ইহার বিক্রয় অপরিমিত। জাপানি জমান দানাদার মিণ্ট বাজারে অতিরিক্ত মাত্রায় বিক্রয় হয়। মিণ্ট ও ল্যাভেণ্ডার উভয়ের ঔষধার্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মাল তৈয়ারি হইলে বিক্রয়ের জন্য কোন চিন্তা নাই। সাধারণ বাগানের দোঁয়াস মাটিতে এই মশলার গাছ জন্মিতে দেখা যায়। জমিটি ইষৎ চুণে মেটেল হইলে গাছের আরও তেজ হয়। পাহাড়ি জায়গায় এই কারণে এই সকল গাছের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। ইহার শাক বৎসরে

দুইবার কাটীয়া লওয়া হয়। পালম, সুলফা, মেথি প্রভৃতির যেমন পাইট ও যেরূপ ভাবে সার গোবর দিতে হয় ইহারও তদ্রূপ।

৪। এখানে গাছগুলি বারমাস রাখিতে হইলে পানের বরজের মত ছায়াযুক্ত ঘর আবশ্যক, নতুবা অতিরিক্ত রৌদ্রে ও অতি বর্ষণে গাছ টিকিতে পারিবে না।

৫। এখানে কোন আদর্শ ক্ষেত্রে বা বাগানে ব্যবসায়ের জন্য ইহাদের আবাদ নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারতের মত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ইহাদের আবাদ উপযোগী ক্ষেত্র মিলিতে পারে।

লাভের অতিরিক্ত মাত্রা দেখিয়া বিস্মিত হইবে না, উদ্যোগী হইয়া কাজে লাগিলে জমি হইতে সোনার উৎপত্তি হয়।

দক্ষিণ য়ুরোপে ল্যাভেণ্ডার লাটিফোলিয়ার (L. latifolia) চাষ অধিক। এই জাতীয় ল্যাভেণ্ডার হইতে অধিক তৈল পাওয়া যায়। গ্রেট বিটনে ডরসেট সায়ারে ৪০০ একর (১২৫০ বিঘা) একটি বাগীচা আছে। তাহার ২ একর আন্দাজ জায়গায় গোলাপ ক্ষেত আছে, বাকীস্থানে থাইম, বাম, মিন্ট ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি তৈল প্রদ শাকের চাষ হয়। বাগানটি অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই আয়কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল মাত্র ১ বিঘা কিম্বা ২।৩ বিঘা জমি লইয়া চাষে নামিলে এত অত্যধিক লাভ না হইতে পারে কিন্তু জমির পরিমাণ অধিক হইলে এবং চাষের পারিপাট্য থাকিলে ও সঙ্গে বাণিজ্যোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা থাকিলে গড়ে বিঘার গাছ গাছড়া হইতে এতাদৃশ লাভ হওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:•:—

মাঘ মাস

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ও যো হইলে খুঁড়িয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁয়ে শসা, করলা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতি সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমানে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

মাঘ, ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। { মাঘ, ১৩২৩ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

উলার হ্রদের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য সম্পদ

জনৈক পরিব্রাজক লিখিত।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য কবি, ঐতিহাসিক, পর্য্যটক—সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন। এই রমণীয় কাশ্মীরদেশের রমনীয়তা যে কতকটা উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত উহার উলার হ্রদ হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ভারতের যাবতীয় স্বাদুসলিল হ্রদের মধ্যে উলারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যে, জল বায়ুতে, অধিবাসীগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উৎপাদনে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ সংস্থানে—সর্ব্ববিষয়েই উলারের প্রভাব প্রতীয়মান হয়।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন সমস্ত কাশ্মীর দেশই পূরাকালে একটি বিশাল হ্রদ ছিল। বরাহমূলার নিকট পর্ব্বতমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিরিদ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়ায়, বিতস্তা (ঝিলম) নদীপদে সেই বহুশতাব্দীসঞ্চিত জলরাশি বহির্গত হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত স্থান কেবল অত্যধিক নিম্নপ্রকৃতির ছিল সেই সকলই আজকাল হ্রদরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উলার, দাল, মানসবল প্রভৃতির উৎপত্তি এইরূপ। কাশ্মীরেও কিম্বদন্তী আছে যে পূর্ব্বকালে এই দেশে একটি দিগন্তবিস্তৃত হ্রদ ছিল। কোন বৃহদাকার মায়াবী, দুর্দ্ধর্ষ অসুর দেবতাগণের উপর যখন তখন অত্যাচার করিয়া উক্ত হ্রদের অগাধ বারিগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিত। দেবতারা বহুদিবস এইরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া কাশ্যপ মুনির শরণাপন্ন হন এবং মুনি কোন প্রকারে বর্ত্তমান কিপুসা নামক স্থানে পাহাড় ভাঙ্গিয়া জল বাহির করিয়া দেন। অসুরের প্রধান দুর্গ এইরূপে বিনষ্ট হওয়ায় সে দেবতাগণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়। প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক, বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উহা বৈজ্ঞানিক সত্যের পথই অনুসরণ করিয়াছে।

ইতিহাস কথিত পূর্ব্ব হ্রদের তরঙ্গমালার ও উদ্ভিদাদির নিদর্শন কাশ্মীর-উপত্যকার কতিপয় পর্ব্বত ও খাড়েয়া গাত্রে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত আছে দৃষ্টিগোচর হয়। খাড়েয়া অর্থাৎ গিরিপাদ দেশে কর্ষণোপযোগী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ সমূহও পুরাতন হ্রদখাতের স্তরাবলী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

উলার দর্শনের ইচ্ছা আমাদের অনেক দিন হইতেই ছিল এবং সে সময়ে আমরা কিছুকাল হইতে কাশ্মীরে অবস্থিতি করিতেছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যের গুরুত্বে সুবিধা আর কিছুতেই হইয়া উঠে না, অথচ পৌষ মাসও আগত প্রায়। সে সময় আমাদিগকে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এবং তাহা না হইলেও হিমালয়ের দারুণ তুষারপাত প্রভাবে অধিকাংশ স্থানই জড়ত্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অসীম বরফরাশি ভিন্ন আর দেখিবার বিশেষ কিছু থাকিবে না। আমরা এই ভাবনাতেই ব্যস্ত ছিলাম, এমন অকস্মাৎ এরূপ একটি কার্য্য আসিল যাহাতে বান্দীপুর যাওয়া অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিল।

বান্দীপুর উলার হ্রদের উত্তরদিকস্থ বন্দর। আমাদের তাৎকালিক বসতিস্থান, বরাহমূলা হইতে বান্দীপুর যাইতে হইলে বিতস্তা নদীপথে প্রথমে খোপর এবং তৎপরে নিন্দল নামক স্থান দিয়া হ্রদে প্রবেশ করিতে হয়। যাঁহারা কাশ্মীর পর্য্যটন করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে একরকম বরাহমূলা হইতেই প্রকৃত কাশ্মীর উপত্যকার আরম্ভ। তাহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মরী-শ্রীনগর সকট পথ যেরূপ অঞ্চল দিয়া আসিয়াছে তাহাকে এক প্রকার বিতস্তা নদীর বহির্গমনদ্বার বলিলেই হয়। উক্ত গিরিপথের উভয় পার্শ্বেই অল্প বিস্তর দূরে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা। পথ কোথাও অত্যুচ্চশৃঙ্গের গাত্র বাহিয়া কোথাও বা অল্পোন্নত অধিত্যকা দিয়া চলিয়াছে—কিন্তু সর্ব্বস্থলেই বিতস্তা নদী অনতি দূরে। কেবল বরাহমূলাতে আসিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় যে দেশ সমতলভাবাপন্ন এবং প্রস্থে বিস্তারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বরাহমূলাতেই প্রকৃত কাশ্মীরের সহিত প্রথম পরিচয়।

বান্দীপুর যাওয়ার স্থলপথ থাকিলেও জলপথ অনেক প্রকারে অধিক সুবিধাজনক বলিয়া আমরা বরাহমূলায় একটি ডুঙ্গা ভাড়া করিয়া প্রাতকালের কিছুক্ষণ পরেই উলার যাত্রা করিলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে ডুঙ্গা একপ্রকার মাঝারি গোছের কাশ্মিরী নৌকা। ইহার উপরে হোগলা বিশেষের ছাউনি; পার্শ্বে হোগলা ও কাষ্ঠ, উভয় প্রকারেরই ডুঙ্গা আছে। মাঝির সংখ্যা স্ত্রী পুরুষ সমষ্টিতে ছয়জনের অধিক নহে। আমাদের ডুঙ্গায় মোটে ৪ জন মাঝিই ছিল।

বরাহমূলা পর্য্যন্ত বিতস্তার খাতে উন্নতাবনত অংশের মাত্রা খুবই কম। সুতরাং নদী অতীব শান্তশলিলা। আমরা বরাহমূলা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ ঝিলম নদীর খাত খননের সুবিশাল বৈদ্যুতিক কারখানা অতিক্রম করি। তাহার পর দেবগ্রাম নামক স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় এবং অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোপর

নামক স্থানে উপস্থিত হই। কাশ্মীরের সহরের হিসাবে সোপর নেহাত সামান্য সহর নয়। একসময়ে ইহা কতিপয় শিল্পকার্য্যের জন্য (বিশেষতঃ দেশীয় সাবান) বিখ্যাত ছিল। একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও এস্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। সোপর একটি ডিবিজনের (ওয়াজিবাৎ) সদর ষ্টেশন এবং এখানে রাজ সরকারের তহশিল আফিস, ডাকবাঙ্গলা, বিতস্তার উপর সুগঠিত পুল, বৃহৎ মসজিদ ও অন্যূন একহাজার গৃহ রহিয়াছে। মৎস্য-শীকারী সাহেব ও দেশীয়গণের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ স্থান; কারণ এস্থলে নদী বহু বিস্তৃত এবং মহাশের নামক রোহিত জাতীয় সুস্বাদু মৎস্যও যথেষ্ট পরিমণে পাওয়া যায়। সহরের রাস্তাঘাটের অবস্থা অবশ্য ভারতের বড় বড় সহর-বাসীর চক্ষুতে ভাল বোধ হইবে না। গৃহাদি পুরাতন ধরণের পাতলা ইটে প্রস্তুত, বাহিরে উচ্চ প্রাচীর সম্পন্ন এবং সামান্য পরিমাণে আলোক ও বায়ুর গমনাগমনের পথ-সংযুক্ত। রাস্তার মধ্যে অনেকস্থলেই সিঙ্গারার (পানীফলের) স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক গৃহস্বামিনীর জানালায় অদূরবর্ত্তী আগন্তুক শীতের অভ্যর্থনা স্বরূপ লঙ্কা, বেগুণ, পেঁয়াজ প্রভৃতির মালা নয়নগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ শুষ্ক আহার্য্য পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে মাঘমাসে বরফরুদ্ধ গৃহে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক আমরা অল্পক্ষণ সহর পরিভ্রমণ করিয়া নৌকাতে আশ্রয় লইলাম এবং রাত্রেই উলার পথে অগ্রসর হইলাম।

যখন আমরা শিঙ্গল পৌছি তখন সূর্য্যদেব সবে মাত্র দেখা দিতেছেন। সেই সময়ের ক্ষীণ আলোকে সম্মুখস্থ ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন জলরাশি; উভয়পার্শ্বে ক্রোশব্যাপী অর্দ্ধ জলাশয় প্রকৃতির সমতল তীর ও স্থানে স্থানে তাহার অন্তরালে অস্পষ্ট পর্ব্বতমালা—যে কিরূপ নয়ন মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছিল তাহা কবি ভিন্ন আর কেহই সম্যক বর্ণনা করিতে পারেন না। শিঙ্গলের অদূরেই নদী এরূপভাবে ধীরে ধীরে হ্রদে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে পর্য্যটক কখন্ নদী ত্যাগ করিয়া অলক্ষে অতর্কিতে উলারে প্রবেশ করেন তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন না।—

আমাদের এই অতি প্রত্যূষে উলার অতিক্রম আরম্ভ করা কিন্তু ভ্রমণের ঘটনাচক্র নহে। ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত কারণ অপরাহ্নে উলার হ্রদে প্রায়ই ব্যাত্যা ও তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। উলার হ্রদের উত্তর দিকস্থ অর্দ্ধাংশ পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টিত। হরমুখ প্রভৃতি এই সমুদয় অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সমূহে ঝটিকার উৎপত্তি এবং হ্রদ বক্ষে নিবৃত্তি। অচঞ্চল সলিলবিহারী কাশ্মিরী মাজি এইরূপ জলবায়ুর দ্বন্দযুদ্ধকে বিষম ত্রাসের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং সকল কাশ্মীর পর্য্যটকই অপরাহ্নের পূর্ব্বেই উলারের পরপারে পৌছিতে চেষ্টা করেন।

উলার হ্রদের জলের বর্ণের স্থানভেদে মৌলিক কিছু পার্থক্য না থাকিলেও বোধ হয় গাঢ়তার ইতর বিশেষ আছে। সর্ব্বস্থলে এক রকম রঙ বলিয়া বোধ হয় না। হ্রদ

খাতের মৃত্তিকার প্রকৃতিতে, তরঙ্গের গতির বিভিন্নতায় ও জল মিশ্রিত নানা পদার্থের অল্পবিস্তর বাহুল্যেও বর্ণের ভেদ উৎপাদিত হইতে পারে। উলার হ্রদের বিপুল জলরাশির সহিত তুলনা করিলে এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য। উলার একটি ক্ষুদ্র সমুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা কাশ্মীরে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা বলেন যে নূতন বর্ষার সময় হ্রদবারি ১০০ বর্গ মাইলও অতিক্রম করিয়া উঠে। সাধারণ অবস্থায় কিন্তু ইহা প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল বিস্তৃত। গভীরতা অবশ্য সর্ব্বস্থানে সমান নহে এবং শীতের প্রারম্ভে গড়ে বোধ হয় ২০ ফুটের অধিক হইবে না।

হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই চারিদিকের দিগন্তব্যাপী বারি বক্ষে নানাপ্রকার উদ্ভিদ, অসংখ্য জলচর পক্ষী ও ছোট বড় বহুসংখ্যক নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের স্থলপথগুলি অপেক্ষা জলপথসমূহ নানাবিধ দ্রব্যাদি বহনাবহনের জন্য অধিকতর উপযোগী বলিয়া জলযানের বাহুল্য এত অধিক। বিতস্তা উলারের ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর কাশ্মীর হইতে দক্ষিণ কাশ্মীর আসিবার উলার যেমন প্রধান পথ, উত্তর পূর্ব্ব কাশ্মীর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কাশ্মীর আসিবারও হ্রদ সেইরূপ প্রশস্ত রাস্তা। মৎস্য, পাণিফল, শাক সব্জী, ইন্ধন কাষ্ঠ; গৃহ প্রস্তুতের মালমসলা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য পণ্যবাহী নৌকাদি সেইজন্য যাতায়াত করিতে স্বতঃই নয়নগোচর হয়।

উলার হ্রদে জলচর পক্ষীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম সমাগমে বহুসংখ্যক সাহেব শীকারীগণ নানাবিধ শিকারের জন্য কাশ্মীরে আসেন। তাঁহারা যে সমুদয় পশুপক্ষী শিকার করেন তন্মধ্যে উলারের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে জলচর পক্ষী শীকার অন্যতম। ঋতুবিশেষে বালহাঁস, চকোর সারস, পানিকা ও অন্যান্য নানাবিধ প্রকারের পক্ষীর বৃহৎ বৃহৎ ঝাঁক হ্রদ বক্ষে অথবা সন্নিহিত জলা সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। শীতের প্রাক্কালে ইহাদের সংখ্যা সামান্য হইলেও দুই চারি জাতীয় পক্ষী সকল সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা হ্রদপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহেও অনেক প্রকার পক্ষী দেখিয়াছি। তন্মধ্যে হাঁড়িচাঁচা, ময়না, শালিক, ঝুঁটিশালিক বুলবুল, বাবুই, বউ-কথা-কও, পেচক, বাজ, জঙ্গলী মুর্গী ও বন তিতির প্রভৃতির বঙ্গদেশীয় সব জাতীয় পক্ষীর কতকটা সাদৃশ্য আছে।

অন্যান্য দেশের বৃহৎ বৃহৎ হ্রদের ন্যায় উলারের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহও সকল সময় স্বাস্থ্যকর নহে। বিশেষতঃ এখন গ্রীষ্মের সময় মশা মাছি ও কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব এত অধিক হয় যে আগন্তুকেরা তীর হইতে বহু ব্যবধানে থাকিতে বাধ্য হন। বারিপাত কমিয়া গেলেই তৎসঙ্গে এই সমুদয় উপদ্রব কমিয়া যায় কিন্তু মশক বংশ কখনই একবারে নির্ম্মূল হয় না। কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীরে ম্যালেরিয়া ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। উপযুক্ত জল নিকাশির অভাবে এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

বিতস্তা নদীর খাঁত খননের ব্যবস্থায় উলার হ্রদের জলরাশির যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ এবং ইহাতে ভাবী ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও বলা যায় না। সেই জন্য যাহাতে এই খনন কার্য্য বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় নির্ব্বাহিত হয় তজ্জন্য কাশ্মীর দরবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ববিষয়ে কাশ্মীর দেশের উপর উলার হ্রদের প্রভাব কম নহে। হ্রদের চতুঃপার্শ্বে অনেকগুলি গ্রাম রহিয়াছে। ইহাদের অধিবাসীগণ জীবন ধারনের জন্য হ্রদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। মৎস্য, সিঙ্গার, নানা জাতীয় পক্ষী, অল্পবিস্তর পদ্মমূল (স্থানীয় নাম নেক্র), চাঁচড়া প্রভৃতি পশুখাদ্য ও স্থান বিশেষে গৃহ অথবা নৌকা ছাউনির উপযুক্ত হোগলা প্রভৃতি হ্রদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। দুই অথবা চারিজন বাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হ্রদের তীর সন্নিকটস্থ স্থানে প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা কয়েক প্রকারের উদ্ভিজ্জ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত। ধীবরের নৌকারত কথাই নাই। উহা উলরের সর্ব্বত্র বিরাজমান। প্রত্যহিক ধৃত মৎস্যের সংখ্যা অথবা পরিমাণ নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হয় না আমরা প্রায় ৭।৮টি নৌকার নিকটস্থ হইয়াছিলাম। প্রত্যেক টিতেই অল্পাধিক অর্দ্ধমণ মাছ ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রভূত নৌকা চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইতে ছিল এবং তখনও মৎস্য ধরিবার সময় শেষ হয় নাই। মৎস্যগুলি সাধারণতঃ রোহিত জাতীয়। বাটা, খরসা ও চেলার সমগণস্থ (Genus) মৎস্যের সংখ্যাই অধিক। কোন কোন মৎস্যে রক্ষণকারী রঞ্জন (Protective colouration) দৃষ্ট হয়। কিন্তু দাল হ্রদের মৎস্যের বর্ণ বৈচিত্রের ন্যায় উলারবাসী মৎস্যে বর্ণ বৈচিত্র নাই। মৎস্যের সাধারণ স্থানীয় নাম গার্ড। ধৃত মৎস্যগুলি প্রায়ই ছোট। ৫ সেরের অধিক মাছ কমই দেখিতে পাইয়া ছিলাম এবং ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমিত পোনাও নৌকাগুলিতে কম পরিমানে ছিল না। তাহাতে বোধ হয় মৎস ধরার পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই। এরূপ প্রকার মৎস ধৃত হইলে অনতিকাল পূর্ব্বে হ্রদ মৎস্য বিরল হইয়া পড়িবে।

মৎস্যের ন্যায় সিঙ্গারাও উলার হ্রদের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজসরকার হইতে প্রতি বৎসর ১২ হইতে ১৫ হাজার টাকার সিঙ্গার জমা বিলি হইয়া থাকে। ঠিকাদারগণ এই সমস্ত সিঙ্গরা তুলিয়া সহর ও গ্রামে বিক্রয় করেন এবং উক্ত স্থান সমূহে ইহা হইতে আহার্য্য প্রস্তুত হয়। সিঙ্গারার রুটি, মেঠাই অথবা ছাতু অনেক গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের ব্যবহারে আইসে। প্রস্তুতকারীগণের অজ্ঞতায় এবং উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে উৎপাদিত সিঙ্গরার আটা অথবা ময়দা ভাল হয় না। কিন্তু রীতিমত বন্দোবস্ত করিলে তাহা হওয়া সম্ভব।

উলার হ্রদ নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। আমরা অতিক্রম কালে প্রায় ৩০ প্রকারের উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া ছিলাম। আমাদের দেশীয় পাটাঝাঁজি, পানশেওলা,

পানফলস, খুঁদি শালুক, রক্তকমল, চাঁচড়া প্রভৃতি উদ্ভিদই অধিকাংশ। বান্দীপুরের যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে উদ্ভিদের ঘন সন্নিবেসে নৌক'-বহন অধিকতর আয়াস সাধ্য হইয়া পড়িতেছে।

উলার হ্রদের তীরগুলির মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কোথাও বা জল পৃষ্ঠ হইতে ঋজুভাবে একবারে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা উঠিয়াছে, কোথায় বা হ্রদবারি ও নিকটস্থ রাজপথের মধ্যে অর্দ্ধক্রোসব্যাপী কর্দ্দমাক্ত ভূমিখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে এবং কোথাও বা কর্ষিত ক্ষেত্র ফসল বহন করিতেছে। যে বৎসর যেরূপ হিম পাত হয় এবং প্রথম বসন্তের প্রাদুর্ভাবে যে পরিমাণ বারিধারা পর্ব্বতচূড়া হইতে নামিয়া আইসে সেই অনুপাতে হ্রদ পার্শ্বস্থ কর্ষনীয় জমির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে শীতকালে হ্রদের অনেক স্থল জমিয়া যায়। তীরস্থ গ্রাম সমূহে আমরা ভূট্টা, তামাক সন্‌হার (বীজের জন্য উৎপাদিত মোরগ ফুলজাতীয় উদ্ভিদ), কড়ম (পাতাকবি), শসা, বিলাতী কুমড়া, লঙ্কা প্রভৃতি ফসল দেখিয়াছিলাম এবং সে সময়ে গোধুম, যব ও শরিষা বুনিবার জন্য জমি প্রস্তুতে কোথাও কোথাও কৃষকগণ ব্যস্ত ছিল।

পুরাতন কীর্ত্তি হিসাবে উলারে দেখিবার কয়েকটি স্থান আছে। তন্মধ্যে উহার উত্তর পশ্চিমাংশে বাবসুক্রুদ্দীন। এই স্থানে উলার সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। তীরের অনতি-দূরেই পীরের জিয়ারা। কথিত আছে যে সুক্রুদ্দিন পুরউদ্দীন নামক সুপ্রসিদ্ধ সাধুর প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। এক্ষণে হ্রদ মধ্যে সামান্য ব্যবধানেই একটি অন্তর্ভৌম ঝরনা রহিয়াছে। তাহা হইতে নিসৃত বদ্বুদ জলের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তগণ বলেন যে ইহা দৈব প্রভাবের চিহ্ন। উলারের অন্য দ্রষ্টব্য স্থান বান্দীপুর নদীর মোহানার সম্মুখে। এখানে একটি ছোট দ্বীপের উপর অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি মুসলমান নির্ম্মিত বারদোয়ারী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু এস্থলের প্রধান ধ্বংসাবশেষ যে এক সময়ে সুনিপুণ কারুকার্য্যময় গৌরবান্বিত হিন্দু মন্দির ছিল, সুঠাম স্তম্ভ ও খিলান সমূহের অংশাদি হইতে তাহা বুঝা যায়।

উলার এখন জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজের আত্মীয় সম্পত্তি মাত্র। কিন্তু ইহার ব্যবসায়িক ভবিষ্যত উজ্জ্বল। জল নিকাসীর সুবন্দোবস্ত হইলে হ্রদের তীরে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপাদিত হইতে পারে। মৎস্য জনন ও পালনের উলার মহাক্ষেত্র। রাস্তাদির উন্নতিতে কাশ্মীরের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর দাঁড়াইতেছে। এরূপ অবস্থায় সকল কাশ্মীর হিতাকাঙ্ক্ষীর দেখা উচিত যে যাহাতে দেশের প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির (Raw Products) সদ্ব্যবহার ও বৃদ্ধি হয়। এতদ্বিষয়ে উলার যে নানারূপে বিশিষ্ট প্রকারে সহায়তা করিতে সমর্থ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রঞ্জনের উপাদান

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

জার্ম্মাণির সহিত কারবার বন্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে রঞ্জক পদার্থের অভাব প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। জার্ম্মণির রঞ্জক পদার্থগুলি খনিজ, প্রায় অধিকাংশ গুলিই আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। ভারতে কিন্তু রঞ্জনোপযোগী অনেক গাছ গাছড়া পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রস্তুত রঙ কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ অপেক্ষা কোন অংশ হীন নহে বরং ভাল।

ভারতে রঞ্জন ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় ছিল তাহারা বস্ত্রাদিতে সুন্দর রঙ করিতে পারিত। সেই সকল রঙ পাকাও হইত। গাছ গাছড়ায় রঙের সহিত তাহারা খনিজ পদার্থ মিশাইবার কৌশল জানিত। কিন্তু ক্রমে জার্ম্মাণির রঙ ও রঞ্জিত বস্ত্রাদি আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা তাহাদের জাতীয় ব্যবসা ভুলিল।

য়ুরোপ ও এমেরিকার অনেক প্রকার কাষ্ঠাদি রঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেই সকল রঞ্জক পদার্থের সহিত ভারতীয় রঞ্জক পদার্থ গুলির সৌসাদৃশ্য আছে। এমেরিকা যদি সে গুলি হইতে রঙ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে তবে রঞ্জক পদার্থ বহুল ভারত দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার অন্তরায় কোথায়!

ভারতীয় যুক্ত রাজ্যের কৃষি-ডিরেক্টর দেশী রঞ্জক পদার্থ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ গুলি দ্বারা তুলা ও পশম জাত দ্রব্য কি প্রকারে রঞ্জিত হইতে পারে তাহা বলিয়াছেন। ভারতীয় জোলা, যোগী ও তাঁতিরা এক কালে এই কার্য্যে সিদ্ধ হস্ত ছিল। তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লিতে নিজ নিজ কুটীরে বসিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করিত এবং সেগুলি ইচ্ছামত রঙ করিত। রঞ্জকদিগের দ্বারা সুতা প্রভৃতি রঙ করাইয়া ও তাহাদের কাজে লাগাইত। এখন এই সামান্য সামান্য কুটীর শিল্প গুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যুক্ত প্রদেশের কৃষি-ডিরেক্টর রঞ্জনের যে প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—

পশম রঞ্জন

(ক) রঞ্জক কাষ্ঠাদি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে পশম ভিজাইয়া রাখা হয় এবং সেই জলে রঙ পাকা করিবার জন্য কোন প্রকার খনিজ পদার্থ মিশান হয়।

(খ) রঙ করা জলে শতকরা ৪ ভাগ এসেটিক অম্ল যোগ করা হয়।

(গ) খ নির্দ্দিষ্ট জলে পশম রঞ্জিত করিয়া তাহা পুনরায় শতকরা ২ভাগ পোটাসিয়ম বাই কার্ব্বনেট মিশ্রিত জলে ভিজান হয়।

(ঘ) বাই কার্ব্বনেট ও অকসালিক অম্ল মিশ্রিত জলে প্রথমে ভিজাইয়া লইয়া পরে রঙ জলে ভিজান হয়।

(৬) প্রথমে ফট্‌কিরির ও টারটারিক অম্ল জলে ভিজাইয়া লইয়া পরে রঞ্জক জলে ভিজান হয়।

তুলা রঞ্জন।

তুলা ২৪ঘণ্টা হরিতকী, আমলা, বয়ড়া (Myrabolans) জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা পুনরায়,

(১) টার্টার এমেটিক
(২) ষ্টানস্ ক্লোরাইড
(৩) ফট্‌কিরি
(৪) ফেরোস সলফেট

মিশ্রিত জলে ভিজাইতে হয়। দেখা যায় যে ষ্টেনোস ক্লোরাইড ও কিম্বা টার্টারিক এমেটিক জলে ভিজাইয়া লইয়া যে কোন দেশী রঞ্জক জলে তুলা কিম্বা তুলাজাত দ্রব্য রঙ করিলে রঙ সুন্দর ও পাকা হয়।

ফুল।

(১) হর শিঙ্গার (Nyctanthes Arbor tristis) বাঙলা দেশে ইহাকে সেফালিকা বলে। ইহার ফুলে হরিদ্রা রঙ হয়। জলে সিদ্ধ করিলে কিম্বা স্পিরিটে ভিজাইলে রঙ নির্গত হয়। যুক্ত প্রদেশে ও হিমালয়ের পাদদেশে সেফালি বিস্তর জন্মায়।

তুন (Cedrela Toona) সাধারণতঃ ইহাকে সিডার গাছ বলে। হিমালয়ের পাদদেশে যে সকল জঙ্গল আছে সেই সমস্ত জঙ্গলে ইহার গাছ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার ফুলেও হরিদ্রা রঙ হয়।

ঢাক বা পলাস ফুল (Butea frondosa) যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে এই বৃক্ষ প্রচুর। বাঙলা ও আসামেও এই গাছ অনেক দেখা যায়। ইহার ফুলেও হরিদ্রা রঙ হয়। পলাস ফুলের পাপ্‌ড়ীগুলি কেবলমাত্র রঙের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেফালি ও পলাস ফুল হইতে বাসন্তি রঙ প্রস্তুত হইত। ফাল্গুন মাসে হোলীর সময় এই রঙের খুব আদর হইত। বসন্ত পঞ্চমীর সময় এই রঙে রঞ্জিত কাপড় ব্যবহারেব প্রথা অদ্যাপিও বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। পলাস ফুলের রঙ কতকটা বাদামী রঙের, উজ্জ্বল হরিদ্রা রঙ পলাস হইতে হয় না।

কুসুম ফুল—Safflower (Carthamus tinctorius) খনিজ ফোলতার রঙের আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে কুসুম ফুলের রঙের খুব পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদর ছিল। ইহাতে

শ্রীযুত জে, পি, শ্রীবষ্টভ, এম, এস, সি, ব্যবহারিক রসায়ন তত্ত্ববিদ্ লিখিত কৃষি-জর্ণালের প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচিত।

হরিদ্রা ও লাল দুই প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে; হরিদ্রার ভাগ অধিক, লাল অল্প। ইহাদ্বারা লাল রঙ ও পীতরঙ সুন্দর হয়। ইহা হইতে লাল, হরিদ্রা পৃথক করা কঠিন নহে। ফুলগুলি দলিয়া জলে গুলিলে হরিদ্রা রঙ বাহির হইয়া আসে। যখন আর হরিদ্রা রঙ বাহির হইতেছে না দেখা যায় তখন সেই ফুলগুলি সাজিমাটির জলে গুলিলে লাল রঙ বাহির হইবে। হরিদ্রা কিম্বা লাল জল টারটারিক অম্লজলে মিশাইয়া অম্লাক্ত করিয়া লইলে তুলা বা রেশম তন্তু রঞ্জনের সুবিধা হয়। টারটারিক অম্লের পরিবর্ত্তে ভারতীয় রঞ্জকগণ লেবুর রসও ব্যবহার করে। ফল সমানই হয়। রেশমও এই রঙে রঞ্জিত হইতে পারে কিন্তু পশমে এই রঙ ভাল ধরে না।

কৃত্রিম রঙের প্রচলন হইয়া কুসুম ফুলের রঙ, নীল ও আন্যান্য স্বভাবজ রঙের আদর একেবারেই কমিয়া গেল। প্রায় দুই শতবৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিলে জানা যায় যে ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকার নীল ও কুসুম ফুলের রঙ য়ুরোপে, জাপানে ও চীনরাজ্যে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বত্র কুসুম ফুলের চাষ হইত। বোম্বাই অঞ্চলে কর্ণাট ও গুজরাট প্রদেশে মান্দ্রাজে ও ব্রহ্মদেশে উত্তর ভারত ও বঙ্গদেশে কোথাও কোথাও কুসুম ফুলের চাষ এখনও হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ও উত্তর ভারতে ফুলের জন্য চাষ হয় কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বীজের জন্য ইহার আবাদ হইয়া থাকে। নদীর উপকুলে বেলে দোঁয়াস মাটিতে কুসুম ফুলের গাছ জন্মিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার ফুল ফুটে। ফুল ফুটিবার অব্যবহিত পরেই ফুল সংগ্রহ না করিলে ফুলের রঙ্গীন অংশের কিছু অপচয় ঘটে। কিছু দিন পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় কুসুম ফুলের প্রচুর পরিমাণে চাষ হইত। এখানকার ফুল হইতে রঙ ভাল হইত বলিয়া ইহার আদর ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে যথেষ্ট ছিল।

মঞ্জিষ্ঠা—Majith (Rubia Cordifolia)—ইহার শিকড় পল্লব রঞ্জনের জন্য ব্যবহার হয়। মাদার বৃক্ষ হইতে যে প্রকার রঙ উৎপন্ন হয় ইহার রঙও প্রায় তদনুরূপ। এই রঙ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। কৃত্রিম রঙ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন কৃত্রিম রঙের অভাব বোধ হওয়ায় এই স্বভাবজ রঙ খোঁজ করিয়াও মিলিতেছে না। ইহা দ্বারা লাল, মেরুন ও লালাভ অনেক রঙ প্রস্তুত হইতে পারে। ফরক্কাবাদে কেলিকো কাপড় ছাপিবার জন্য এই স্বভাবজ রঙের খুব প্রচলন ছিল। ইহাতে রঞ্জিত দ্রব্যাদির রঙ বেশ পাকা হয়। তুলা ও পশম উভয়ই ইহা দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে। সালু (Turkey Red) রঙ করিবার যে পদ্ধতি ইহারও তাই।

খয়ের—Cutch or katha (Acacia catechu)—খদির বা খয়েরকে গুজরাটি ভাষায় কাথা বলে। খয়ের গাছ ভারতের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাষ্ঠ ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিলে যে কাথ বাহির হয় তাহাই রঞ্জনের উপাদান। ইহার কষ

জলে চামড়া পরিশোধিত হয়। রঞ্জনের জন্য ও চামড়ার কষের জন্য ইহা য়ুরোপে চালান যায়।

খয়ের জলে বহুবিধ সূত্র ও সূত্রজাত দ্রব্য রঞ্জিত হইতে পারে। তুলাজাত দ্রব্যে ইহার রঙ ভাল খোলতাই হয়। খয়ের জলে শতকরা ১০ভাগ তুঁতে (Copper Sulphate) দিয়া ফুটাইয়া, গরম জলে কাপড় নিমজ্জিত করিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে কাপড় তুলিয়া লইয়া নিঙড়াইয়া পুনরায় শতকরা ২ ভাগ বাই কার্ব্বনেট অব সোডা মিশ্রিত জলে ভিজাইতে হয়। অতঃপর পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া শুকাইলে রঞ্জন কার্য্য শেষ হইল। এইরূপে রঞ্জিত হইলে খয়ের রঙ বেশ পাকা হয়। ইহাকে ব্রাউন (brown) রঙ বলে।

নীল—Indigo (Indigofera tinctoria)—শণ ধঞ্চের মত ক্ষেতে নীলের চাষ হয়। ইহার পাতা ও ছাল হইতে ভাল রঙ নির্গত হয়। বড় চৌবাচ্ছায় ইহার গাছ পাতা সমেত পচাইয়া রঞ্জক পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই রঙের আদর খুবই ছিল। ভারতে সর্ব্বত্র অনেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নীল চাষ করিত। য়ুরোপে এই রঙ প্রচুর পরিমাণে চালান যাইত। কৃত্রিম নীল উঠিয়া এই স্বভাবজ নীলের ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেলে, ভারতে নীলের চাষ লোপ পাইল।

ভারতে অনেক জাতীয় নীলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে Tinctoria জাতীয় নীল হইতেই ভাল রঙ উৎপন্ন হইত। ইহা ভারতে যথাতথা বনে জঙ্গলে জন্মিত। ক্রমে ইহার চাষ আরম্ভ হইল এবং নীলের চাষে বাঙ্গলা দেশ, পঞ্জাব মধ্য প্রদেশ, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভারতের সমুদয় ভূভাগ ছাইয়া ফেলিল।

পাট, শণ ধঞ্চের মত নদীধারে চর জমিতে ও বাগান জমিতে ইহার চাষ হইত। একরে (৩ বিঘায়) প্রায় ৫০।৬০ মণ নীলের গাছ উৎপন্ন হইতে পারে এবং ১০০মণ গাছ পচাইলে ১২ সের আন্দাজ রঙ উৎপন্ন হয়।

নীল রঙে রঞ্জনের প্রথা—নীল জলে গুলিয়া তাহাতে চূণ ও সাজিমাটি এবং কিঞ্চিৎ গুড় কিম্বা চিনি মিশান হয়। এতদ্বারা নীলের জল পচিয়া উঠে। শীতকালে পচন ক্রিয়া শিঘ্র আরম্ভ হয় না, তখন কিছু উত্তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এক পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের নীলে যে জল তৈয়ারি হইবে তাহাতে ৩ পাউণ্ড চূণ ও ৪ পাউণ্ড সাজিমাটি (Impure Carbonate of Soda) এবং অর্দ্ধপোয়া চিনি মিশাইতে হয়। মাটির গামলা বা কাঠের পিপা যাহাতে রঙ পচান হয়, সে গুলি খুব বড় এক একটাতে প্রায় ১৫০ গ্যালন জল ধরে। ১ গ্যালন প্রায় বাঙলা ৪৷৷০ সের জল। ১৫০ গ্যালন জল তৈয়ারি করিতে আন্দাজ ৫ পাউণ্ড নীলের আবশ্যক। তুলাজাত বা রেশমী সূত্র কিম্বা বস্ত্র রঞ্জনের প্রথায় কিছু ইতর বিশেষ আছে। খুব ক্ষার জলে রেশম রঞ্জনের সুবিধা হয় না।

লাক্ষা—Lac Dye—লাক্ষা, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাল রঙ উৎপন্ন হয়। লাক্ষা নামক কীট হইতে এই রঙের উৎপত্তি। অশ্বত্থ, পিপুল (অশ্বত্থজাতী বৃক্ষ), বকুল প্রভৃতি গাছ এই কীট দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই গাছের শাখা কাটিয়া এই রঙ বাহির করিয়া লইতে হয়। ইহাতে দুইটি পদার্থ থাকে রজন ও রঙ। শাখাদি ভিজাইয়া রঙ নির্গত করিয়া লইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা গালাইয়া চাঁচ, থলে, কিম্বা কলার খোলার উপর ফেলিলে গালা নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। চাঁচে ফেলিয়া তৈয়ারি করা হয় বলিয়া ইহাকে চাঁচ গালা বলে। চাঁচগালা কাঠের ও চামড়ার দ্রব্যাদি পালিশ করিবার জন্য স্পিরিট সহযোগে গলাইয়া ব্যবহার করা হয়। চাঁচ গালার ব্যবসা বড়ই লাভজনক, বিদেশে ইহার রপ্তানি বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। রঙ অংশ ছাঁকিয়া ও জমাইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠান হয়। আলকাতারার কৃত্রিম রঙ আবিষ্কৃত হইবার পর, লাক্ষা রঙের আদর কমিয়া গেল এবং লাক্ষা রস অব্যবহার্য্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। লাক্ষা রঙ হইতে অলকক্তক, আল্‌তা প্রস্তুত হয়। খাঁটি আলতা এখন পাওয়া যায় না। বাজারে যে আল্‌তা বিক্রয় হইতেছে তাহা কৃত্রিম আলকাতরা রঙে রঞ্জিত। আলতা হিন্দুর পূজাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে ও রমণীগণের হস্তপদ চিবুকাদি রঞ্জনে নিত্য ব্যবহার্য্য। স্বভাবজ আল্‌তা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও লোকে সস্তায় আকৃষ্ট হইয়া ঘরের দ্রব্যে অনাদর করিতে লাগিল। লাক্ষারঙে ফট্‌কিরি মিশাইয়া পশমাদি রঞ্জিত করা যায়। ইহার দ্বারা ঘোর লাল ও গোলাপি রঙ প্রস্তুত হইতে পারে। এখন কৃত্রিম রঙের আমদানী কমিয়াছে তাই আবার আমাদের ঘরের জিনিষের প্রতি নজর পড়িয়াছে।

হলুদ—হল্‌দে রঙের জন্য আমরা হলুদ ব্যবহার করি। হলুদ রঙ পাকা করিবার জন্য তাহাতে ফটকিরি আদি খনিজ দ্রব্য মিশাইয়া লই। জাফ্রান হইতেও হরিদ্রা রঙ উৎপন্ন হয়। হলুদ, জাফ্রান আমরা খাদ্যাদি রঙ করিতে ও সুঘ্রাণ করিতে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। চূণের সহিত হলুদ মিশ্রিত করিলে লাল রঙের উৎপত্তি হয়। খয়ের ও হলুদের সংমিশ্রণেও লাল রঙ পাওয়া যায়।

সীমপাতা—Country Beans—সীমের পাতা হইতে অত্যধিক পরিমাণে সবুজ রঙ পাওয়া যায়।

হিন্দু স্ত্রীগণ কার্ত্তিক মাসে কালী পূজার দিনে লক্ষী পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা লক্ষী, নারায়ণের মূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করেন। তাঁহারা শাদা আতপ চাউল বাটিয়া শাদা রঙ, হলুদ হইতে হল্‌দে রঙ, হলুদ খয়েরের সংমিশ্রণে লাল রঙ, সীমপাতা বাটিয়া সবুজ রঙ, ভুষা বা কয়লা হইতে কাল রঙ প্রভৃতি রঙ ফলান এবং কাল, হলদে লাল, নীল, সবুজ সংমিশ্রণে কত বিবিধপ্রকারে রঙের সৃষ্টি করেন। বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে কাষ্ঠ পীটের উপর ও ঘরের মেজের উপর বিবিধ রঙে রঞ্জিত গুঁড়ি দ্বারা বিচিত্র আল্‌পানা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে হিন্দু রমণীগণের বিচিত্র রঙ ফলাইবার

কৌশল সূচিত হয়। সুনিপুণ রঞ্জকও কয়েকটি মূল রঙ হইতে নানাপ্রকার বিচিত্র রঙ ফলাইতে পারে।

কাঁটাল—Artocarpus integrifolia—কাঁটাল কাঠের রঙ হরিদ্রা বর্ণের। কাঁটাল কাষ্ঠ হইতে হরিদ্রা রঙ বাহির করিয়া লওয়া যায়। ইহার সহিত ফটকিরি আদি মিশাইয়া রঙ পাকা করা যায়। সূতা ও সূতা বস্ত্রাদি ইহাদ্বারা রঙ করিলে বেশ খোলতাই রঙ হয় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কাঁটাল গাছ জন্মে। অযত্নে ইহা বনে জঙ্গলেও জন্মিতে পারে, যত্নে আবাদ করিলেত কথাই নাই।

পিপুল, পিপর (Ficus religiosa)—পিপুলের গাছে লাক্ষা কীট জন্মিলেত লাল রঙ উৎপন্ন হয়। ইহার শিকড় হইতেও লাল রঙ উৎপন্ন হয়।

কাঞ্চন—Bauhinia racemosa—কাঞ্চন কাষ্ঠ হইতেও লাল রঙের উৎপত্তি হয়। এই লাল রঙ খুব উজ্জ্বল নহে। সব সময়েই আমাদের উজ্জ্বল লাল রঙের আবশুক নাই, অনুজ্জ্বল, মাট লাল রঙেও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার আবশুক হয়। তুলা ও তুলা-জাত দ্রব্য রঞ্জনে ইহা বিশেষ উপযোগী। তুলার আঁশে এই রঙ ধরে ভাল। আলুমিনা প্রভৃতি সংযোগে দৃঢ় রঙ পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে কাঞ্চনের রঙ দ্বারা তুলা বা তুলাজাত দ্রব্যে কাল রঙ ধরান হয়। কাঠ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কাপড় ভিজাইলে তাহাতে মাটা মাটা লাল রঙ ধরিয়া যায়। সেই কাপড়ে কর্দ্দম মাখাইলে মাটা মাটা কাল রঙে রঞ্জিত হয়। কাঞ্চন বৃক্ষ ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঞ্চনের কাঠে কষজল প্রস্তুত হইতে পারে।

দাড়িম্ব ফল—Pomegranate Rind—দাড়িম্ব ফলের ভিতরাংশ হইতে হরিদ্রা রঙ পাওয়া যায়। ইহাতে কষজল তৈয়ারি হইতে পারে। চর্ম্মাদিতে কষ ধরাইতে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে যে হরিদ্রা রঙ পাওয়া যায় তাহা হইতে ফিকা হলদে হইতে ঘোর হলদে এমন কি ব্রাউন রঙ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে।

বাকস—Adhatoda vasica সীমের পাতা হইতে যেমন সবুজ রঙ হয় বাকস পাতা হইতে তেমন হরিদ্রা রঙ পাওয়া যায়। পাতার রস স্পিরিটের সহিত সংমিশ্রণে রঙের উৎপত্তি হয়। ইহার সহিত হরিৎ বর্ণের (Chlorophyl) সংযোগ থাকে তাহাতে রঙ মাট হয়। ইহা হইতে হরিৎ বর্ণ কিন্তু পৃথক করা যায়। পশমে ইহাদ্বারা পাকা রঙ হয়।

ঢাক—Butea frondosa—ইহার গাছ যুক্ত প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার ফুল হইতে রঙের উৎপত্তি। শুষ্ক ফুল গুড়া করিয়া লওয়া হয়। ইহাই দোল বা হোলির সময় ফাকরূপে ব্যবহার করা হয়। ঢাক ফুলের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রক্ত চন্দন—Red Sanderswood (Pterocarpus Santalinus)—দক্ষিণ

ভারতে এই গাছ অধিক। ইহার কাঠ সিদ্ধ করিয়া রঙ পাওয়া যায়। পশম রঞ্জনে ইহা উপযুক্ত।

কমলা লেবুর খোসা Orange কমলা লেবুর খোসা হইতে হরিদ্রা, অরেঞ্জ রঙ উৎপন্ন হয়। এই রঙের একটু বিশেষত্ব আছে ইহা অরেঞ্জ বা কমলা লেবুর রঙ নামেই বিখ্যাত। কমলা লেবুর খোসা গুড়া করিয়া এই রঙ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা তত পরিষ্কার হয় না। গরম জলে ফেলিয়া বা স্পিরিট সংযোগে উত্তপ্ত করিয়া রঙ পরিশ্রুত করিয়া লওয়া যায়। এ দেশের মেয়েরা ময়দার সহিত কমলা গুঁড়া মিশাইয়া জল সহযোগে গাত্র মার্জ্জনা করে ইহাতে গাত্র পরিষ্কার হয় ও গায়ের রঙ কমলাভ হয়। রোলি বা কমোলা গুড়া Mallotus philippinensis হিমালয়ের পাদ দেশে ও দক্ষিণ ভারতে এই গাছ জন্মায়।৴ ফলের উপরিভাগে এক প্রকার লাল কোষ (Glauds) উৎপন্ন হয়। এই কোষ গুলি (Caponles) ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে কম্‌লা গুড়ি পাওয়া যায়। ক্ষার যাতে ইহার রঙ পাকা হয়। রেশম রঞ্জনে ইহা উপযুক্ত।

এ পর্য্যন্ত যে সকল রঞ্জক উপাদানের কথা আমরা আলোচনা করিলাম সে গুলি সবই আমাদের অল্প বিস্তর পরিচিত। কৃষি—জর্ণালে এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি স্বভাবজ রঞ্জক উপাদানের উল্লেখ আছে।

(১) আখরোট—Juglaus regia—ইহার ছালে ঘোর হল্‌দে বা ব্রাউন রঙ হয়। খাকি রঙের ইহা হইতে উৎপত্তি। এসিটিক এসিড বা আক্‌সলিক এসিড সহযোগে রঙ পাকা হয়।

(২) বারবেরী—Raowat—ইহার ছাল শিকড় ও কাষ্ঠ হইতে হল্‌দে রঙ হয়। কুমায়ুন পর্ব্বতমালায় এই গাছ জন্মে। জলে সিদ্ধ করিয়া রঙ বাহির করিতে হয়। সিদ্ধ জলের ভেষজ গুণ আছে, চক্ষুরোগে ইহা উপকারী। ইহা হইতে উৎপন্ন রঙে রেশম রঞ্জিত হয়।

(৩) রস Rhus Cotinus—ইহার কাষ্ঠে হরিদ্রা রঙের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন প্রথায় ইহা হইতে হল্‌দে কমলা বা লাল কমলা রঙ ফলান যায়। ক্ষার জলে ও সাবান জলে রঙ পাকা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত আচমূল হইতে পীত রঙ ও লোধ ছাল (Symplacus racemosa) হইতে রক্ত ও পীত, চাঁপা ফুল (Michelia Champaca) হইতে হরিদ্রা রঙ, যাহা বাঙলা দেশে চাঁপা ফুলের রঙ বলিয়া বিখ্যাত, নাগকেশর ফুল হইতে লাল রঙ উৎপন্ন করা যায়। নাগকেশর বা নাগেশ্বর ফুলের গাছ আসামের জঙ্গলে ও মেদিনীপুরে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

লটকানের রঙ (Bixa orillana) বহু প্রাচীন কাল হইতে এই রঙে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতেছে। ফল হইতে রঙের উৎপত্তি হয়। রঙ না লাল না হরিদ্রা বরং হরিদ্রা ও

লাল মিশ্রিত রঙ বলা যায়। আলকানিমূল (Alkanet root) তৈলাদি রঞ্জনে ব্যবহার হয়। আমরান্থস্ (Amaranthus) শিকড়ই আল্‌কানেট রুট। তুরস্ক হইতে অনেক আল্‌কেনেট রুট আমদানী হয়। আমাদের দেশেও অনেক আমরান্থস্ বা নটে জাতীয় গাছ আছে। উদ্যান সৌন্দর্য্যের জন্য যে লাল আমরান্থস্ গাছ জন্মান হয় তাহার শিকড় হইতে লাল রঙ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। মোরগ ফুলের শিকড়েও লাল রঙ আছে।
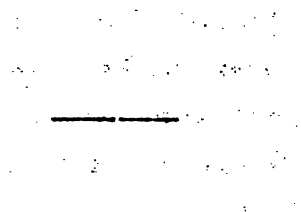
মাঘ, ১৩২৩ সাল।

বাঙ্গলার কৃষি-বিভাগ ও ধান চাষ

বঙ্গপ্রদেশের সরকারী কৃষি বিভাগের ১৯১৫-১৬ সালের বার্ষিক বিবরণী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিবরণীতে বিশুদ্ধ কৃষি কথা ভিন্ন রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব মৎস্য ও রেশম চাষ ও বয়ন শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ কৃষক অথবা কৃষি-বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান রহিত ব্যক্তি বর্গের পক্ষে বিবরণীর আলোচ্য বিষয়গুলি তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হইবে না। বস্তুতঃ কৃষি-বিভাগ হইতে অনেক মৌলিক গবেষনাও ক্ষেত্র পরীক্ষাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক লাভজনক ফলের হিসাবে ধরিতে গেলে এপর্য্যন্ত দেশবাসীগণ কৃষি বিভাগ দ্বারা সামান্য পরিমাণেই উপকৃত হইয়াছেন বলিতে হয়। কি কি কারণের সমন্বয়ে এইরূপ হইতেছে তাহা আমারা ইতিপূর্ব্বে অনেক বার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা অন্য দিকে হইতে কৃষি বিভাগের সফলতা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে ধান্য বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান ফসল। আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দ, ধন সম্পদ সকলই ধান্যের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির আর সেই পুরাতন উর্ব্বরতা নাই। ধান্য ফলনের হার অনেক জেলাতেই কমিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে ধান্য চাষের উন্নতি সাধনের জন্য কৃষি বিভাগ কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন এবং তাহাতে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে অনেকেই কৃষি বিভাগের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বশুদ্ধ ২৮টি জেলার প্রায় ৭ কোটি বিঘা জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। জেলা ভেদে বিভিন্ন জাতীয় ধানের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের জল হওয়া ও জমির প্রভেদে যে ধান্য জাতিরও বিভিন্নতা হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কৃষি-বিভাগের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বিভাগীয় ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মিঃ হেক্টর্ 'ইন্দ্রশালি' অথবা '১নং ঢাকা' নামক এক আমন জাতিয় ধান্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ঢাকা, ময়মন সিংহ, রঙ্গপুর, রাজসাহি ও

করিমগঞ্জ অঞ্চলে ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা ইহা অবধারিত হইয়াছে যে ঢাকা ১নং সাধারণ ধান্য অপেক্ষা বিঘাপ্রতি প্রায় ২॥০ মণ অধিক ফলে। চুঁচুড়া পরীক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু স্থানীয় 'নাগরা' জাতির উপর ইহা কোন উৎকর্ষতা দেখাইতে পারে নাই। এখনও এই নূতন জাতীয় ধানের চাষ অত্যন্ত সীমা বদ্ধ। সরকারী কর্ত্তরা আশা করেন যে আগামী বৎসর প্রায় ৬০০ শত কৃষকে এই ধান্যের চাষ করিবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গের চাষ আবাদাদির ও জমির অনেক পার্থক্য আছে। 'ঢাকা ১নং' পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত না হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে ও বিশেষ তত্ত্বাবধারণে চাষ এক প্রকার এবং লক্ষ লক্ষ বিঘায় সাধারণ কৃষক দ্বারা চাষ অন্য প্রকার। সুতরাং নূতন জাতি হইতে নিশ্চয়ই যে অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইবে তাহা এই সামান্য পরীক্ষা ও চাষ হইতে বলিতে পারা যায় না। উন্নত কৃষির ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে স্থানে স্থানে পরীক্ষাক্ষেত্রলব্ধ আপাততঃ সন্তোষজনক ফল দেশব্যাপী কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া তাহার গুণ গরিমা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই নব উদ্ভূতজাতি ভিন্ন অন্য উপায়েও ধান্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইতেছে। তাহা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বীজ নির্ব্বাচন। যে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিয়াছে। তাহা হইতে যদি নির্ব্বাচন করিয়া উৎকৃষ্টতর বীজ সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে যে ফলনের হার অধিক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে এইরূপ নির্ব্বাচন চলিতেছে। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রায় কার্য্যতঃ কতদূর নির্দ্দোষ ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং নির্ব্বাচিত বীজ কি পরিমাণে অবিমিশ্র অবস্থায় রক্ষিত ও বিতরিত হইতেছে, তাহা আমরা অধিক বলিতে পারি না। এই সমুদয়ের উপরেই নির্ব্বাচন প্রথার কার্য্যকারিতা নির্ভর করিতেছে।

বীজ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটিই কৃষি বিভাগের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। বীজ সম্বন্ধে অন্যান্য পরীক্ষায় মৌলিকতা কিছুই নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে চুঁচড়া ক্ষেত্রে লাভের হিসাবে 'নাগরাই' সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধান্য জাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে এস্থলে তুলনার জন্য 'দাদখানি, বাদসাভোগ, বাঁকতুলসী ও হাতিসাল' জাতিও পাঁচ বৎসর ধরিয়া জন্মান হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণতঃ বলিতে পারা যায় যে হুগলি জেলার অনেক স্থলই 'নাগরা' ধান চাষে সুবিধা হইবে। চুঁচড়ার ন্যায় বর্দ্ধমান ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে কার্ত্তিকসাল জটা কলমাই বর্দ্ধমানের ন্যায় জমির পক্ষে উপযুক্ত ধান্য।

ধান্যের সার সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশে কৃষকের সাধারণ আর্থিক অবস্থাই সার ব্যবহারের প্রধান প্রতিবন্ধক। গোবর সার ভিন্ন অপর যে সারই হউক, তাহার জন্য কৃষককে কিছু মূল ধন ব্যয় করিতে হয়।

কিন্তু তাহা করিবার উপযুক্ত অবস্থা কয়জন কৃষকের আছে। অনেকেই আশা করেন যে যৌথ ঋণ দান সমিতির বৃদ্ধির সহিত কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে এবং সারও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু যে সময় এখনও আসে নাই। সেই জন্য আমরা এস্থলে সহজ প্রাপ্য ও সুলভ দুই একটি সারের মাত্র উল্লেখ করিব।

গোবর সারের পরেই শন অথবা ধইঞ্চার সবুজ সারকেই সহজ লভ্য সার বলিতে পারা যায়। চুঁচুড়া ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে ধইঞ্চা সারে ফলনের হার প্রায় ৩৷৹ মন অধিক হয় এবং খরচও প্রায় ৩৷৹ টাকা হয়। সুতরাং ইহাতে যে কিছু লাভ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শনের সবুজ সার কার্য্যকারিতায় প্রায় ধইঞ্চার সহিত সমতুল্য।

অন্যান্য সারের মধ্যে নাইট্রেট অব্ সোডার এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহা চিলি হইতে আমদানি হয় এবং পৃথিবীর অনেক স্থলেই প্রভূত পরিমাণে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশে ইতিপূর্ব্বে এই সারের তেমন আমদানি ছিলনা। কিন্তু সম্প্রতি 'Chilian Nitrate Propaganda' নামক কোম্পানি আফিস্ খুলিয়া এই সারের সমধিক প্রচলন করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সোরার সমগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু সোরা বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে প্রায়ই পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে Chilian Nitrate কৃষি কার্য্যের পক্ষে যথোপযুক্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় সকল সময়েই পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য ইহার দর চড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধাবসানে ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে অর্থাৎ প্রতিমণ ৫॥৹ টাকায় পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। মান্দ্রাজ ও জাপানে ধান চাষে চিলি সোরা ব্যবহারে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহার অন্যতম কারণ এই যে উক্ত দেশ সমূহে ধান্য ক্ষেত্র সমূহ প্রায়ই জল প্লাবিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ইহার ব্যবহারে বিঘা প্রতি প্রায় ২॥৹ মণ ফলন অধিক হইয়াছে। ইহা অবশ্য অধিক লাভজনক নয়। কিন্তু পরীক্ষাও নূতন ও সারের দরও এখন বেশী। কালক্রমে একের বৃদ্ধি ও অপরের হ্রাস হইলে এই সারে পশ্চিম বঙ্গের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ধান্য ক্ষেত্রে অধিকতর ফল দর্শিতে পারে।

আরও কয়েকটি যুক্ত সার স্থান বিশেষে লাভজনক হইতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকায় গোবর সারের তুলনায় তিনটির উল্লেখ করা গেল। সমস্ত অঙ্কই বিঘা প্রতি প্রদত্ত হইল।

সার	পরিমাণ	ফলনের হার
গোবর সার	২০ মণ	৭ মণ
ঐ	২০ মণ	৮॥৹
ঐ ও নাইট্রেট অব সোডা	১৪ সের	

হাড়ের গুঁড়া	১ মণ	৮৸৹
সোরা	১৪ সের	
খইল		৮৸৹

দেখা যাইতেছে যে এই তিনটাই প্রায় তুল্য মূল্য লায়। পশ্চিম বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার উচ্চাংশে এই তিনটি সার প্রয়োগ দ্বারা লাভ হইতে পারে।

ধান্য চাষের প্রণালী সম্বন্ধে কৃষি বিভাগের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। বীজের পরিমাণ হ্রাস ও রোপণের চারার সংখ্যা কমান সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনেকটা অবান্তরিক বলিয়া মনে হয়। কারণ এ সম্বন্ধে কিছু একটা বাঁধা নিয়ম সমস্ত বঙ্গদেশের জন্য, এমন কি এক একটি সমস্ত জেলার জন্য করিতে পারা যায় না। সাময়িক অবস্থা, বারিপাত, বীজের উৎকর্ষতা, জমির অবস্থা এই সমুদয়ের উপর বিশেষতঃ তৎকালীন জল হওয়ার উপর কোন একটি বিশেষ প্রথার সফলতা নির্ভর করে।

স্থূলতঃ দুই একটি বিষয় ভিন্ন কৃষি-বিভাগ এখনও পর্য্যন্ত ধান্য চাষ সম্বন্ধে কোন সফলতা মূলক উন্নত প্রথায় উপনীত হইতে পারেন নাই। ধান্য এত বহু বিস্তৃত ফসল, ইহার জাতি, উপজাতি প্রভৃতি এত অধিক, স্থান বিশেষ চাষ আবাদের প্রথা এত বিভিন্ন যে কোন উন্নত প্রণালী অবিষ্কার করা অধিক সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কৃষি-বিভাগ একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া চলিলে তাঁহারা যে অল্প বিস্তর সময়ে ফল লাভে সমর্থ হইবেন তাহা আশা করা অযৌক্তিক নহে।

কৃষি বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষনায় ফল লাভের কাল বিলম্বের জন্য কৃষি বিভাগকেও সম্পূর্ণরূপে দোষী করিতে পারা যায় না। ৮৪ হাজার বর্গমাইলব্যাপী ও ৪½ কোটিরও অধিক অধিবাসীযুক্ত একটি বিশাল দেশের কৃষির উন্নতি বিধানের ভার যে ৫।৭ জন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত আছে, এরূপ দৃশ্য বঙ্গদেশ ভিন্ন সুসভ্য জগতের অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। আবার এত বড় দেশে কৃষি শিক্ষার একটি মাত্রও কলেজ নাই। বিশেষজ্ঞগণের আফিসের কার্য্য শেষে মৌলিক অনুসন্ধানের সময়ও সুবিধা প্রায়ই নাই; কৃষিজ্ঞান প্রচারের কোনই সুব্যবস্থা নাই, ঐ প্রকারের নানাবিধ প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়া কার্য্য হওয়া বড়ই দুরূহ। যতক্ষণ না ভূস্বামী ও কৃষকবর্গকে কৃষিজ্ঞান বিস্তার ও উন্নত কৃষি প্রণালী অবলম্বনে উৎসাহিত না করিতে পারা যায় ততক্ষণ কোন প্রকৃত উন্নতির আশা নাই, এবং তাহা করিতে হইলে কৃষি বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীকেই আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জনসাধারণের সহিত মিশিতে হইতে হইবে। বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের মধ্যে একটা অফিসারি চালের পর্দ্দা খাটাইয়া রাখিলে চলিবে না।

সয়াসিম ও কৃত্রিম দুগ্ধ

ইংরাজী কৃষি সাহিত্যে আমাদের পাঠক বর্গেরা অনেক স্থানেও বোধ হয় সয়াসিমের উল্লেখ দেখিয়াছেন উভয়ের নানাবিধ গুণাবলীর বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা একটি অত্যন্ত উপকারী ফসল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Glycine Soja Benth, উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে ইহা শিম্বী (Leguminosae) বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রকৃতি বরবটি কুলত্থ প্রভৃতির ন্যায় এবং কোন কোন স্থানে ইহাকে রাম-কুলত্থিও বলিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তাগণ ইহাকে কোচিন চীণ, জাপান, জবদ্বীব প্রভৃতির আদিম অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। ইংরাজিতে ইহা 'সয়া বিন্' ও 'জাপান পি' উভয় নামেই পরিচিত।

ভারতবর্ষে আপাততঃ হিমালয়ের পাদদেশে, বাঙ্গালায়, খাসিয়া ও নানা পর্ব্বতে ও ব্রহ্ম দেশে স্থানে স্থানে সয়াসিম উৎপাদিত হয়। কিন্তু কুত্রাপিই ইহার চাষ তেমন বহু বিস্তৃত নহে এবং ভারতের কোন স্থানেই ইহা বন্য অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতদ্দেশে যে সয়াসীম সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে তাহাও নিকৃষ্ট জাতির এবং সচরাচর অতি সামান্য পাইট ও সারে নিকৃষ্ট জমিতে ইহার চাষ হয়। উত্তম বীজ ও উপযুক্ত সার ও জমিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় সয়াসীম এতদ্দেশে জন্মিতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

উৎকৃষ্ট জাতীয় সয়াসীমের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মাণ হয় যে দাউল জাতীয় অথবা যাবতীয় খাদ্য শস্যের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। চীন জাপানে সয়াসীম হইতে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হয়। সয়ার সস্ অর্থাৎ চাটনি উক্ত দেশ সমূহের একটি প্রধান রপ্তানির দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন সয়াসীম পক্ক হইবার পূর্ব্বে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার পশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য।

আধুনিক বানিজ্য জগতে সয়াসীম খুব অধিক দিন পরিচিত হয় নাই। বস্তুতঃ সয়াসীমের প্রথম চালান ১৯০৬ সালে ইউরোপে যায়। কিন্তু ইহার মধ্যেই এই উৎকৃষ্ট দাউলের কাটতি এত অধিক হইয়াছে যে বৎসরে দশ লক্ষ টনেও ইউরোপের অভাব পূরণ হয় না। চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সুবিশাল ক্ষেত্র সমূহ কোটি কোটি মণ সয়াসীম উৎপাদন করিয়াও জগতের অভাব মোচন করিতে পারিতেছে না।

স্বদেশে সয়াসিমের খাদ্য ভিন্ন অপর ব্যবহার হয়। ইহাও উত্তম সার;—সেই জন্য ইক্ষু ও ধান্য ক্ষেত্রে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়। ইউরোপেও এই সীম হইতে প্রস্তুত খাদ্য শীতকালে পশুগণের ক্রমশঃ প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিতেছে।

এতদ্ভিন্ন সাবান প্রস্তুত কারকগণ তুলা বীজের পরিবর্ত্তে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন। বিলাতে হল নামক প্রসিদ্ধ স্থান সয়াসিম ব্যবসারের অন্যতম কেন্দ্র। এই স্থানের বহু সংখ্যক তৈল কলে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মণ সীম নিষ্পেষিত হইতেছে। হল্ নগরে যে সীম আমদানি হয় তাহার মাশুলেই প্রায় দেড় কোটি টাকা আবশ্যক হয়। ইহাতে পাঠকবর্গেরা অনুমান করিতে পারিবেন যে কত বহুল পরিমাণ সয়াসীম এস্থানে আমদানি হয়। এই স্থান হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে সয়া ভুষি ও খৈলের রপ্তানিও বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে নিতান্ত কম ছিল না।

কিন্তু সয়াসীমের অপরাপর ব্যবহার অপেক্ষা ইহা হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম দুগ্ধ সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার প্রথম আবিষ্কারক একজন চিনদেশবাসী। চিনে সয়াসীম হইতে এক প্রকার সরবত প্রস্তুত হয়। তাহা দেখিয়াই তাঁহার মনে প্রথমতঃ উহা হইতে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুতের ধারণা আইসে। তিনি এক প্রকার দুগ্ধও প্রস্তুত করেন কিন্তু তাহার আস্বাদন তেমন ভাল হয় নাই। তাহার পর কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করার উপায় একজন জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন করেন।

কিছু দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই দুগ্ধ সফলতা লাভ করে নাই। কিন্তু কয়েকজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের বিরাম হীন চেষ্টায় আজ সয়াসীম হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম দুগ্ধ স্বপ্ন-রাজ্য ছাড়াইয়া প্রকৃত পদার্থরূপে সাধারণের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতের সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার মতে এই কৃত্রিম দুগ্ধ বাহ্যতঃ প্রকৃত দুগ্ধের সহিত অভিন্ন। স্বাদ কোন কোন লোকের জিহ্বার একটু পৃথক বলিয়া বোধ হয়, শিঘ্র তাহাও নাকি সহজেই দূরীভূত করিতে পারা যাইবে। একজন বিচক্ষণ গোয়ালা তাহার নিজের গাভীর দুগ্ধ হইতে কৃত্রিম দুগ্ধের পার্থ্যক্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে দুগ্ধের প্রধান উপাদান কেস্রিন নামক রাসায়নিক যৌগিক। সয়াসীমেও 'কেসিন' আছে। বস্তুতঃ এই 'কেসিন'কে কেন্দ্র করিয়াই কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত হইতেছে। সয়াসীম হইতে কেসিন ব্যতীত অপর সমস্ত তৈল, তন্তু প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয়। তাহার পর উক্ত পরিশোধিত 'কেসিনে'র সহিত উপযুক্ত পরিমাণে দ্রাবণ, শর্করা ও লবণ সমূহ যোগ করিয়া যে মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয় তাহাই কৃত্রিম দুগ্ধ। বলা বাহুল্য যে স্বাভাবিক দুগ্ধও মিশ্রণ বিশেষ। কৃত্রিম দুগ্ধের প্রাকৃতিক দুগ্ধের সহিত এতদুর সৌসাদৃশ্য আছে যে ইহারও সহজ অবস্থায় সর পড়ে না।

স্বাভাবিক দুগ্ধে রাসায়নিক উপাদান সমূহ ব্যতীত কয়েক শ্রেণীর জীবাণু আছে। এই সমুদয় দুগ্ধ পরিপাক করিতে এবং উহাতে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সহায়তা করে। কৃত্রিম দুগ্ধের এই সমস্ত জীবাণু সংযোগ করা হইয়াছে এবং সাধারণতঃ যে অবস্থায়

জীবাণু সমূহ প্রকৃত দুগ্ধে পাওয়া যায় সেই অবস্থায় কৃত্রিম দুগ্ধেও পাওয়া যায়। সেইজন্য কৃত্রিম দুগ্ধ হইতেও পনিরও মাখন সহজে প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃত্রিম দুগ্ধে প্রাকৃতিক দুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা এই যে ইহাতে সাধারণ দুগ্ধের রোগ বীজাণু নাই, ইহা মূল্যে সুলভ এবং পরিপাক শক্তির তারতম্য হিসাবে ইহার নানাবিধ উপাদান কম বেশী করিয়া লইতে পারা যায়।

ব্যবসায়ে এ পর্য্যন্ত সয়াসিমের দুগ্ধ অধিক পরিমাণে চলিয়াছে কিনা তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সয়াসিম সম্বন্ধীয় পরীক্ষাবলী বর্ত্তমান মহা যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। আপাতত রণ লিপ্ত দেশ সমূহে প্রাকৃতিক খাদ্যাদি কিরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কৃত্রিম দুগ্ধের বিস্তৃত প্রচলন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক সয়াসিমের এই নূতন ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও, ইহা যে খাদ্য ও ব্যবসায় হিসাবে একটি উৎকৃষ্ট ফসল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ পাই। আমাদিগের দেশে অনেক স্থানেই ইহা জন্মিতে পারে। চাষ ও জমি, সীম বরবটি প্রভৃতির ন্যায়। আবশ্যক হইলে এবং উপযুক্ত সংখ্যক ক্রেতা হইলে ভারতীয় কৃষি সমিতিও উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া দিতে পারেন। আমরা কৃষি উৎসাহীগণকে এই লাভজনক ফসল উৎপাদন করিতে অনুমোদন করি।

পত্রাদি

—:*:—

কপি চাষে সার—

শ্রীসনাতন মণ্ডল, কল্যাণপুর, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—আমি ২॥০ বিঘা জমিতে কপি চাষ করিয়া ছিলাম। আমার গতবৎসরের সঞ্চিত পুরাতন গোবর সার ছিল। কপি বসাইবার পূর্ব্বে ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণে সার ছড়াইয়াছিলাম। চারা বসাইবার সময় ও মাটি দিবার সময়ও দুইবার সামান্য পরিমাণ সার দিয়াছি। বাঁধাকপির চাষই অধিক, ফুলকপি ৫ কাঠা মাত্র স্থানে ছিল। বাঁধা কিম্বা ফুলকপি আদৌ ভাল হইল না। গাছ একটু বড় হইয়া যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। পোকা লাগে নাই তাহা আমি ভালরূপ দেখিয়াছি। জমির দোষ কিম্বা গোবর সার দিয়া এরূপ হইল তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। দোন জমি নহে সাধারণ বাগান জমিতে কপি চাষ করিয়াছি। কপির বিশেষ সার কি?

উত্তর—বোধ হয় অতিরিক্ত গোবর (গোময়) ব্যবহারে হেতু গাছ খারাপ হইয়া যাইতেছে। বিঘা প্রতি কতমণ গোময় প্রযোগ করা হইয়াছে জানা এবং জমির অবস্থা চক্ষে দেখা আবশ্যক। বেলে দোঁয়াস অপেক্ষা কাদা দোঁয়াস জমিতে কপি চাষ ভাল হয়। চাষ কারফিত করা জমিতে কপি বসাইবার সময় ১ ছটাক ও দুইবার সেচ দিয়া মাটি টানিয়া দিবার সময় অর্দ্ধছটাক হিসাবে ১ ছটাক খৈল দিলে সারের কার্য্য উত্তমরূপ হয়। কাঁদা দোঁয়াস মাটিতে পটাস ও ফস্‌ফরিকাম্ল সার প্রায় কিছু পরিমাণে থাকেই এবং খৈল দ্বারা নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়।

মিশ্রসার অর্থাৎ গর্ত্তে সঞ্চিত গোময়, গোমূত্র, ছাই, চাল ধোয়া মাছ ধোয়া জল, খড় কুটা খোসা ভুসী মিশ্রিত পরিণত সার পাইলে বিঘা প্রতি ৪০ মণের অধিক প্রদান করিবার আবশ্যক হয় না। বিঘা প্রতি সাধারণ গোময় সার ২০ মণ ও তাহার সহিত ২ মণ শরিষার খৈল দিলেও পর্য্যাপ্ত সার দেওয়া হয়। কপিতে মনুষ্য মল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার পরই শরিষার খৈলের উল্লেখ করা যায়।

জমি ও ফসলের অবস্থা দেখিবার জন্য কৃষক অফিস হইতে লোক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

বরবটীর সবুজ সার—

শ্রীনিখিল রঞ্জন মজুমদার, চম্পাহাটি, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—বরবটী ও শন বঞ্চের সবুজ সারে প্রভেদ কি ?

উত্তর—সকল গুলিই সবুজসার হিসাবে ক্ষেতে বোনার উপযুক্ত কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর ফলদায়ী তাহা তুলনা করিয়া দেখা হয় নাই। আপনি কোন সরকারী কৃষিক্ষেত্রে অনুসন্ধান লইবেন বা কৃষি বিভাগের অফিসে পত্র লিখিবেন।

গো শালা—

শ্রীনেয়ামদ্দি সরকার, জামালপুর।

প্রশ্ন—আমি একটি ক্ষুদ্র গো-শালা স্থাপন করিতে চাই। আপনাদের কৃষি পত্রিকায় সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে কেবল চাষ লইয়া না থাকিয়া, তাহার সঙ্গে গোপালন ও পক্ষি পালন করিতে পারিলে সুবিধা হয়। আমার ৫০।৬০ বিঘা জমির চাষাবাদ আছে কিছু পতিত জমিও আছে। গো-শালা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আমার উপকার করেন ইহা আমার প্রার্থনা।

উত্তর—একেবারেই খুব বড় কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে আমরা পরামর্শ দিই না;

যদি সামর্থ থাকে তবে আপনি আপনার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। প্রথমে ১২টি গাভী পালন করিয়া দেখুন। বাঙলা দেশের গাভী অপেক্ষা ভগলপুরী নাগরা গাভীগুলি অধিক দুগ্ধবতী হয়। কিন্তু সে সকল গরু বাঙলা দেশে আসিলেই ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যায়। তাহাদের উপযুক্ত ষাঁড় অগ্রে যোগাড় না করিলে ঐ সকল গাভী প্রতিপালনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। আমাদের মতে দেশী ভাল গাভী নির্ব্বাচন করিয়া ও ভাল ষাঁড়দ্বারা বৎস্য জন্মাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের উন্নতি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা ভোগ করা যায়। বাঙলার গাভী অপেক্ষাকৃত কষ্ট সহিষ্ণু ও খোরাকে ভগলপুরী অপেক্ষা অনেক কম।

গোপালন অপেক্ষা ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুর্গী পালনে লাভ অধিক। যতদিন গরু দুধ দিতে থাকে ততক্ষণ লাভ যথেষ্টই হয় কিন্তু দুধ ছাড়িলে তাহাদিগকে বসিয়া খাওয়াইবার সময় লাভের অংশ সব চলিয়া যায়। দুধ ছাড়িলে কশাইকে বিক্রয় করিলে লাভ হয় বটে, এবং সহর বাজারের লোভী গোয়ালাগণ তাহাই প্রতিনিয়ত করিতেছে। ইহাতে গোবংশের উচ্ছেদ সাধন হইতেছে এবং ভবিষ্যতে ভারতে ভাল গাই বলদ পাওয়া মুস্কিল হইবে। গোপালন করিতে হইলে গো-শালার সংলগ্ন গোচারণের মাট না থাকিলে গরু পুষিয়া লাভ করা যায় না।

মহিষ পুষিলে গরু অপেক্ষা লাভ আছে, ইহাদের দুধও অধিক হয় এবং ইহারা জলে কাদায় ভাল থাকে, গরুর মত এত যত্ন করিতে হয় না।

১২টা গাভী, একটা ষাঁড়, ২টা মহিষ, ৬টা হিসাবে ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুর্গী পুষিতে গেলেই আপনাকে ১৫০০ টাকা হাতে লইয়া কাজে নামিতে হইবে। পশু পক্ষীগুলি খরিদ করিতে কমবেশী ১০০০৲ টাকার এবং তাহার রক্ষার জন্য ঘর দুয়ার ও প্রথমেই তাহাদের পালনের খরচ ইত্যাদির জন্য ৫০০৲ টাকার আবশ্যক। আপনার ৫০।৬০ বিঘা চাষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল যে আপনার খড় ভুসী কলাই প্রভৃতি আছে, কেবল খৈল কিনিতে হইবে।

আপনি কি আয়তন গো-শালা স্থাপন করিতে চান, আপনার অর্থবল লোকবল, জমি কত, চাষে খড়, ভুসী প্রভৃতি কি পরিমাণে পান ইত্যাদি জানাইলে আপনাকে নিদ্ধারিত খরচের হিসাব দিবার চেষ্টা করা যাইবে। দুগ্ধাদি বিক্রয়ের সুবিধা ও দর, নিকটবর্ত্তি সহর বন্দর হইতে আপনার বাসস্থান কতদূরে ইত্যাদি খবরও জানাইবেন।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

——:*:——

যুক্ত প্রদেশে ইক্ষুগুড় প্রস্তুতের কারখানা—যুক্ত প্রদেশে বেরেলী জেলায় নবাবগঞ্জ নামক স্থানে এই কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বিঁথোরিয়া নামক রেলষ্টেসনের নিকটে।

এখানকার স্থানীয় চাষীরা কাঠের আকমাড়া কল ব্যবহার করে। লোহার আক-মাড়া কলের দাম অধিক বলিয়া তাহারা খরিদ করিতে পারে না। তাহারা যে আকমাড়া কল ব্যবহার করে তাহার রোলারগুলি উপর নিচে সাজান বলিয়া আক মাড়িবার কালে অনেক রস নষ্ট হয়। উপরে ইক্ষুখণ্ড হইতে রস বাহির হইয়া নিচের মাড়া আখের খোসাতে আসিয়া পড়ে ও অনেক রস বৃথা নষ্ট হয়। লোহার আকমাড়া কলের রোলারগুলি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকে সুতরাং এই কলে রস নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে জাভায় এক একরে আক বা চিনি যাহার উৎপন্ন হয় যুক্তপ্রদেশে সে পরিমাণ উৎপন্ন করিতে ১৪॥ একর জমির আবশ্যক। নবাবগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রে বিগত বর্ষে একরে ৬০০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।

কারখানার কাজ ৫৪ দিন চলিয়াছিল তাহার মধ্যে ১৭ দিন দিনে রাতে কাজ হইয়াছে। কারখানার কার্য্যতঃ দেখা হইয়াছে যে লোহার আকমাড়া কলে ঘণ্টায় ৩০ মণ ইক্ষু মাড়া যায় এবং দিনে রাতে যদি ২২ ঘণ্টা কল চলে তবে এক মরসুমে ৯০ দিনে ৬০,০০০ মণ আক মাড়া হইতে পারে।

চাষীরা নাতোয়ান সুতরাং তাহাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিতে তাহারা বাধ্য কিন্তু ঐ পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিলে যে অনেক রসগুড় নষ্ট হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে আদর্শ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বর্ষে মোটে ১২,০৪৯ মণ ইক্ষু মাড়াই হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪,৩৩৫ মণ ইক্ষু গভর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছিল, বাকী চাষীদের দাদন দেওয়া ইক্ষু। স্থানীয় ইক্ষু খারাপ এবং চাষীরা ভাল ইক্ষুর চাষ করিতে আদৌ যত্ন করে না। স্থানীয় ইক্ষুর মধ্যে যাহা ভাল যেমন 'ধাউর, পাড়ারিয়া বা চিন—এই সকলেও শতকরা ১৫ হইতে ১৭ ভাগ আঁশ। বন্য শুকর ও শিয়ালের উৎপাত অধিক বলিয়া উহারা এত শক্ত ইক্ষুর চাষ করে। গভর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রে নরম ইক্ষুর চাষ করা হইয়াছিল। এখানে ইক্ষু রক্ষার জন্য তারের জাল ঘিরিয়া রাখিবার

ব্যবস্থা ছিল। জাভা ৩৩ নং ইক্ষুর ফলন ও তাহা হইতে শর্করার পরিমাণ খুব অধিক হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে শ্যামমাড়া, কাজলা, লাল ডোরাকাটা, মরিসস্ লাল বোম্বাই প্রভৃতি নরম ও ভাল ইক্ষুর চাষ হইতেছিল কিন্তু শিয়াল শুকরের উৎপাতে তাঁহা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। চাষীরা জাল ঘিরিয়া আক রক্ষা করিতেছিল কিন্তু বর্ত্তমাণ কালে জাল মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য সুতরাং তাহারা আর ইক্ষু চাষে সাহস করে না। বাঙ্গলা দেশে গুড় ও চিনির কারখানাও অতি বিরল হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গলার কথা ছাড়িয়াদিলেও যুক্ত প্রদেশে যেথানে এখনও ইক্ষু চাষ প্রচুর পরিমাণে হয় তথাকার ইক্ষু চাষের দুর্দ্দশা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে এক একরে ২৫০ মণের অধিক ইক্ষু জন্মে না, কিন্তু জাভাতে একরে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ ১,১০০ মণ।

আক, একর প্রতি উৎপন্ন পরিমাণ।

যুক্ত প্রদেশ জেলা বেরিলী ও ফিলিবিট	১৫০ মণ
জাভা—	১,১০০ মণ

চিনি, একর প্রতি উৎপন্ন পরিমাণ।

যুক্ত প্রদেশ স্থানীয় পুরাতন প্রথা	৭৫ মণ
জাভা—উন্নত প্রথা—	১১০ মণ

স্থানীয় চাষীরা তাহাদের সাবেক কাষ্ঠ নির্ম্মিত আকমাড়া ব্যবহারের পক্ষপাতী কেননা উহা তাহাদের বলদে টানিতে পারে ও উহার দাম যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। লোহার আকমাড়া কল খুব জোরবান বলদ ব্যতীত টানিতে পারে না।

কাঠের রোলায় যুক্ত আকমাড়া কলের একটা দোষ আছে সত্য। ইহাতে রোলারগুলি উপরে উপরে সাজান। আক পীড়িত হইবার কালে নিচে যে রস আসিয়া পড়ে তাহাতে নিম্নে পীষ্ট আকের খোসাগুলি কথঞ্চিৎ সিক্ত হইরা কিয়ৎ পরিমাণে রস নষ্ট হয়। লোহার আকমাড়া কলে তাহা হয় না, ইহার প্রত্যেক ফোঁটা নিম্নের প্রণালী বহিয়া কটাহে সঞ্চিত হয়, পীড়িত ইক্ষুরস সমুদয় নির্গত হইয়া আসে ও রসের পরিমাণও অনেক বাড়ে। কিন্তু স্থানীয় চাষীগণের লোহার কল ব্যবহারের প্রথম আপত্য যে তাহারা উহার মূল্য যোগাড় করিতে পারে না। দ্বিতীয়, আক হইতে সমুদন রসটুকু বাহির করিলে রসের সহিত আঠা প্রভৃতি অনেক হানিজনক পদার্থ বাহির হইয়া আসে, ভাল গুড় প্রস্তুতের তাহাতে ব্যাঘাত হয়। তৃতীয়, রস বাহির করিয়া লইয়া পিষ্ট ইক্ষুদণ্ডগুলি তাহারা জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে। শুষ্ক রস

বাহির হইয়াগেলে পরিত্যক্ত অংশের ওজন কমিয়া যায় ও রস জ্বাল দিবার জন্য ভিন্ন কাঠের যোগাড় করিতে হয়।

এই কারখানায় কলসীতে গুড় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলসী ভাঙ্গিয়া মাত বাহির করিবার বন্দোবস্ত করা ভাল নহে কারণ অনেক সময় কলসী ভাঙ্গা গুঁড়া গুড়ের সহিত মিশিয়া যায়। রৌদ্রে খোলা জায়গায় গুড় শুকাইবার ব্যবস্থাও খারাপ; শুকাইবার কালে উহার সহিত ধুলা বালি মিশিয়া খারাপ হয়। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য আবৃত স্থানে গুড় শুকাইবার ও মাত ঝরাইবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে।

ইক্ষু রস কল হইতে বাহির হইয়া একটি টাঁকিতে (Tank) গিয়া সঞ্চিত হয় যাইবারকালে ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকিয়া যায়। তৎপরে উক্ত রস নলযোগে পম্প সাহায্যে একটি কাঠের বাক্স উঠে এবং তথা হইতে বিভিন্ন কতকগুলি মুখ দিয়া নামিয়া আসে এবং নামিবারকালে গন্ধকের ধোঁয়া সম্পৃক্ত হইয়া আসে। এতদ্বারা রসের সহিত মিশ্রিত উদ্ভিজ্জ রঙ নষ্ট হইয়া শাদা হয়। রস পুনরায় অন্য একটি টাঁকিতে আসিয়া সঞ্চিত হইলে চূণের জল দিয়া তাহার অম্লত্ব নষ্ট করা হয়। যে প্রথায় কারখানা চালান হইতেছে তাহা অতি সহজ এবং ইহার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য কদাচিত লইতে হয়। তৈল চালিত ইঞ্জিনের কলকব্জা খুটিনটি অনেক বলিয়া এই কারখানায় অন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই কারখানায় যাহাতে ইঞ্জিনটির বয়লারের জল পিষ্ট ইক্ষুর জ্বালে ফুটাইতে পারা যায় তাহারই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যন্ত্রপাতিও সাধারণ ধরণের—একটি ১১টি রোলার যুক্ত আকমাড়া কল, একটি ইঞ্জিন ও বয়লার। বয়লারের তলদেশে পীড়িত ইক্ষুর বা কাঠের জ্বাল দিবার ব্যবস্থা আছে। রসের টাঁকি, পম্প, রস পরিষ্কারের টাঁকি, রস জ্বাল দিবার কটাহ ইত্যাদি। আমরা ব্যবসায়ীগণের সুবিধার্থ উক্ত কারখানায় যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ ইংরাজি তালিকা দিতেছি—

এই কারখানায় একটি ষ্টীম পম্প আছে যাহা দ্বারা ঘণ্টায় ৩০,০০০ গ্যালন জল উপরে উঠিতে পারে। যাহা হইতে কারখানায় সর্ব্বত্র জল সরবরাহ হয় এবং ইক্ষু ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা করা হয়।

কারখানার মূল ধন

কলকব্জার দাম, ঘর-দুয়ার ও জায়গা	৫০,০০০ টাকা।
ইক্ষু সরবরাহের জন্য দাদন	৩০,০০০ ,,

খরচ—

মূল ধনের জন্য সুদ ৫০,০০০ টাকার উপর	৪,০০০ টাকা।
সময়ে কলকজার মূল্য ঘাট্‌তি শতকরা ৬৲ হিঃ	৩,০০০ ,,
তৈল ও অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য	৫০০ ,,
ম্যানেজার মাসিক ১৫০৲ টাকা হিসাবে	১৮০০ ,,
একজন মিস্ত্রি সম্বৎসর ৫০ ,,	৬০০ ,,
,, ,, ৬ মাস ৫০ ,, ,,	৩০০ ,,
১ জন হিসাব নবিশ ৬ মাস ৪৫৲ হিসাবে	২৭০ ,,
২ ,, কেরাণী ৫ মাস ২৫৲ হিঃ	২৫০ ,,
১ ,, ,, ৫ মাস ২০৲ হিসাবে	১০০ ,,
২ ,, ইঞ্জিনম্যান ৫ মাস ১৫৲ হিঃ	১৫০ ,,
২ জন সহকারি ইঞ্জিনম্যান ৫ মাস ১০৲ হিঃ	১০০ ,,
২ ,, ওয়েলম্যান ৫ মাস ১০৲ হিঃ	১০০ ,,
২ ,, সলফার ম্যান ৫ মাস ৮৲ হিঃ	৮০ ,,

মান্দ্রাজে ইক্ষু চাষে ক্রমোন্নতি—চাষীরা এক্ষণে ইক্ষুগুলি সারিবদ্ধ বসাইতে অভ্যস্থ হওয়ায় কম ইক্ষুবীজে কাজ চলিতেছে এবং চাষের সুবিধা হইতেছে। ভিজগপট্টম জেলায় যে তুইটি কৃষিক্ষেত্র আছে তথা হইতে বিগত বর্ষে ১০০,০০০ বীজ ইক্ষু বিক্রয় হইয়াছে। দক্ষিণ কানাড়াতে লাল মরিসস্ ভালরূপ জন্মিতেছে। বিগত বর্ষে ৬০০ একর জমিতে লাল মরিসসের চাষ হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে বর্ষে উক্ত ইক্ষু ৪২৪ একর মাত্র জমিতে আবাদ হইয়াছিল। এতদঞ্চলের কৃষি বিভাগ হইতে ৪১টি আকমাড়া লোহার কল চাষীগণকে সরবরাহ করা হইয়াছে। অনেক চাষীই এক্ষণে আকমাড়া কল চাহিতেছে। স্থানে স্থানে আকমাড়া কল তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রস জাল দিবার একটি উন্নত প্রণালীর উনান শাল তৈয়ারি হইয়াছে। জমিদারগণ চাষীগণকে ভাল ইক্ষুবীজ ও সার ক্রয় করিয়া দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। কোন কোন জমিদার লোহার আকমাড়া কল পর্য্যন্ত চাষীদিগকে খরিদ করিয়া দিতেছেন। মধ্যবিভাগে জালারপেট নামক স্থানেও একটি উন্নত প্রণালীর রস জাল দিবার উনান শাল প্রস্তুত হইয়াছে। এখানের লাল মরিসস্ ইক্ষু চাষের প্রচলন হইতেছে। চিনির মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ায় নেলিকুপম চিনির কারখানার চতুপার্শ্বে ইক্ষুর আবাদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

বিহারে ইক্ষুর আবাদ—বিহারে ইক্ষুর আবাদ খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে। সরকারী বিবরনীতে প্রকাশ যে এতদঞ্চলে ১০টা বড় রকম গুড় ও চিনির কারখানা চলিতেছে। এই সকল কারখানায় গড়ে ৩ হাজার টন (১টন=২৭ মণ) ইক্ষু হইতে রস বাহির করিয়া চিনি প্রস্তত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন চিনির কারবারের অবস্থা ভাল ছিলনা তখনও কয়েকটি কারখানার লাভ হইতেছিল। এখন লাভের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে। প্রতিবৎসর ভারতে ৮ লক্ষ টন চিনির আমদানী হয়। মরিসস্ ও জাভা হইতে চিনির আমদানী বন্ধ হইয়াছে কিন্তু গত বৎসরের শেষ ভাগেও মিশর হইতে পাঁচশত টন ইক্ষু চিনি আমদানী হইয়াছে। এদেশে ইক্ষুর আবাদ ও চিনির কারখানার বিশেষ সুবিধা আছে, গভর্ণমেণ্টও এক কথা স্বীকার করিতেছেন। বাঙলার চিনির ব্যবসায়ের জন্য সরকার সাহায্য করিবেন শুনা যাইতেছে কিন্তু কার্য্যত এখনও কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাইতেছে না।

আসামে ইক্ষু চাষের পরীক্ষা—পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইক্ষু চাষে গোময় বেশ ভাল সার। যে খানে গোময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না তথায় কিছু পরিমাণে খৈল ও গোময় ব্যবহার করিলে কিছু ক্ষতি হয় না কিন্তু গোময় উপযুক্ত পরিমাণে পাইলে খৈল ব্যবহারের আদৌ আবশ্যক হয় না। এখন খৈল খরিদ করা অপেক্ষা গোময় খরিদ করা শ্রেয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। আসামে বারবেডো ও মরিসস্ ইক্ষুর চাষ বাড়িতেছে। তথাকার চাষীরা স্থানীয় ইক্ষু অপেক্ষা এই সকল ইক্ষু অনেক ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে।

মাইরাবোলান্স্ (Myrabolans)—হরিতকী, আমলা, বহেড়া এই তিনটি কষায় ফল চামড়া সংস্কার করিবার জন্য প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাদের হরিতকীর ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে বেশ কষ হয়। ব্যবসায়ী মহলে হরিতকীই মাইরাবোলান নামে অভিহিত। ভারতীয় হরিতকীর নাম Terminalia Chebula। ব্রহ্মদেশে যে হরিতকী পাওয়া যায় তাহা এই ভারতীয় হরিতকী হইতে একটু সতন্ত্র। উহা হরিতকী বটে তবে প্রকারভেদে কিঞ্চিৎ সতন্ত্র, উহার নাম Terminalia tomentella ভারতীয় হরিতকীতে কষভাগ সমধিক (tannin)। ভারতীয় হরিতকীর কষভাগ ৪০ হইতে ৫০ কিন্তু ব্রহ্মদেশের হরিতকীর কষভাগ মাত্র ২০।২৫। ব্রহ্মদেশের হরিতকীর রঙ খুব ভাল। ইহাতে লাল রঙের ভাগ ৪.৯ ও হরিদ্রার ভাগ ১৮.৩৫, ভারতীয় হরিতকীতে উহা যথাক্রমে ২.৫ ও ৭.৪ ভাগ মাত্র।

পরীক্ষায় তুলনা করা হইয়াছে যে চর্ম্মাদি সংস্কার করিতে ভারতীয় হরিতকীই শ্রেষ্ঠ। সংগ্রহের ও রক্ষার দোষে প্রায়ই হরিতকীর গুণ কমিয়া যায়।

১। সুপক্ক ফলগুলি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

২। বনে গাছতলায় যে সকল হরিতকী পড়িয়া খারাপ হইয়া যায় উহার সহিত ভাল হরিতকী মিশান ভাল নহে।

৩। ফলগুলির শাঁস ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অথবা যদি সম্ভব হয় তবে ঘরের ভিতর কাঁষ্ঠের র‍্যাকের উপর শাঁসগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া ঘরটি বাষ্পে গরম করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

৪। অপক্ক বা অর্দ্ধপক্ক ফল কদাচ সংগ্রহ করা উচিত নহে। ইহা ছাড়াইয়া শাঁস শুকাইয়া লইলেও শাঁসগুলি অধিক দিন ভাল থাকে না; কাঁচা ফলে কষের মাত্রা অপেক্ষা অন্য পদার্থ অধিক এবং এই হেতু পচন ক্রিয়ায় আতিশয্য হয়।

৫। শুষ্ক শাঁসগুলির ভার সাহায্যে এক একটি চাপ বানাইতে পারিলে অল্প স্থানে অধিক মাল রাখা যায়। যদি হাওয়া লাগিয়া কিছু খারাপ হয় তবে উপরিভাগের কিঞ্চিৎ খারাপ হইতে পারে ভিতরের শাঁসগুলি অবিকৃত থাকে।

জোড়হাটে সবুজসারের পরীক্ষা—ধঞ্চে, বরবটী ও শণ সবুজ সাররূপে ব্যবহার করিয়া দেখা হইয়াছে যে বরবটী বা ধঞ্চে বুনিয়া তাহাতে অন্য কিছু না মিশাইলেও সারের কার্য্য ভালমতই হয় কিন্তু শণ পচাইবার জন্য তাহাতে চুণ প্রদান না করিলে চলে না। ইহাও কিন্তু স্থির যে সবুজ সারের সহিত কিছু চুণ ছিটাইয়া দিলে শস্যের ফলন বাড়াইয়াই থাকে।

আসামে ভাল বীজ ধান—বাঙলা দেশে ধানের বীজ অধিকাংশ স্থলেই মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। এক ধানের সহিত এক বা ততোধিক ধান মিশ্রিত হইয়া মিশ্রবীজ হইয়াছে। ইহাতে চাষের অপকার সংঘটিত হইতেছে। আসামে করিমগঞ্জ ক্ষেত্র ধান চাষের পরীক্ষার এক কেন্দ্র। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মিঃ জি, পি, হেক্টর যাহাতে বাঙলার পৃথক পৃথক ধান পৃথক পৃথক চাষ হয় এবং ফলন বৃদ্ধি হয় তাহার বিশেষ উদ্যোগী। তিনি বিগতবর্ষে ৩টি বিশুদ্ধ ধানের করিমগঞ্জ ক্ষেত্রে পৃথক চাষ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ফলনে ভাল দাঁড়াইয়াছিল। স্থানীয় ঐ জাতীয় যে দুই প্রকার ধানের ফলন অধিক তাহাদের অপেক্ষাও ফলন অধিক হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ধানগুলি বাছাই করিয়া, বিশুদ্ধ ধান বীজ ব্যবহার করিতে পারিলে বাঙলার ধান চাষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

মিঃ হেক্টর ধানের বিশেষ নির্ব্বাচন আরম্ভ করিয়াছেন ইহা বড়ই আশার কথা।

আসামে কৃষি-শিক্ষার আয়োজন—আজ কাল বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে উদ্ভিদ-তত্ত্ব ও কৃষি তত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকে। উত্তরকালে এতদ্বারা তাহাদের শিক্ষার সাহায্য হয়।

আসামের জোড়হাট, করিমগঞ্জে, ও শিলং কৃষি-ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষিবালগণকে কর্ম্মক্ষেত্রে হাতে হাতিয়ারে কাজ শিখাইবার জন্য শিক্ষানবিশ লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ছাত্রগণ সদ্দার হইয়া ক্রমে স্থানীয় চাষীগণকে চাযের নূতন পদ্ধতি হাতে হাতিয়ারে কাজে কর্ম্মে দেখাইয়া দেয়। ইহাদিগকে (Demonstrator) বলা হয়। ইহা বেশ সন্তোষজনক ব্যবস্থা, এতদ্বারা স্থানীয় কৃষির উন্নতি হওয়া সম্ভব। যে সকল ছাত্র উচ্চ অঙ্গের কৃষি-শিক্ষা করিতে চায় তাহাদিগকে কেন কৃষি-ক্ষেত্রে দুই বৎসর শিক্ষা দিয়া সাবর কৃষি কলেজে পাঠান হয়। ইহাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট ২০৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি নিদ্ধারণ করিয়াছেন। বিগত ১৯১৫-১৬ সালে আসাম হইতে চারিটি ছাত্র সাবরে পাটান হইয়াছিল। ৪টি ছাত্রের মধ্যে একজন লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বাকী ৩ জনের শিক্ষা তাদৃশ সন্তোষজনক হইতেছে না। আষাম কৃষি বিভাগ ভবিষ্যতে ছাত্র পাঠাইবার জন্য সঙ্কল্প করিতেছেন। যাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা একটু ভালরকম হইয়াছে এবং যাহাদের কিছু কিছু বিজ্ঞান শিক্ষা হইয়া এরূপ ছাত্র নির্ব্বাচন করা হইবে। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে নবাগত ছাত্রগণের জন্য প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য কিছু সহজ করা হইয়াছে। সাবর কলেজে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। নিম্ন দুই শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চ দুই শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হয়। আসামে ছাত্রগণকে কৃষি শিক্ষা দিবায় একটু আগ্রহ দেখা যায়। যে সকল ছাত্রকে সাবরে পাঠাইবার জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে ভর্ত্তি করা হইবে তাহাদিগের খরচ সঙ্কুলানের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা মাসহরা ধার্য্য করা হইযাছে।

মৎস্যের গুঁড়া সার—সমুদ্রোপকুলের সহর গুলিতে সময় সময় মৎস্য অত্যধিক আমদানী হয়। এই মৎস্য শুষ্ক করিয়া দূরদেশে চালান যায়। এই সকল শুষ্ক মৎস্যের গুড়া এতদঞ্চলে সাররূপেও ব্যবহার হয়। ইহাতে প্রায় শতকরা ৬ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৬ ভাগ ফস্বরিক অম্ল আছে। ইহা সহজে মাটিতে গলিয়া যায়। ধান গম প্রভৃতি ঘাষ জাতীয় শস্যে ইহা অতি উত্তম সার। যেখানে ইহা পাওয়া যায় যত্ন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাঞ্জোরে ধানের ক্ষেতে সুপার ফস্কেটের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ফল ভালই হইয়াছে। ২০টা গ্রামের মধ্যে ১২জন চাষী বিগত পূর্ব্ব বর্ষে ২৫ হন্দর সুপার ফস্কেট খরিদ করিয়াছিল। গত বর্ষে ১৮০ হন্দর সুপার ফস্কেট খরিদ করিয়াছে। ১ হন্দরের ওজন ১।৪ এক মণ চোদ্দসের। ত্রিচিনাপল্লী ও কইম্বাটোর

জেলাতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। মৎস্যের গুড়া ব্যবহার করিতে পাইলে সুপার ফস্কেট ব্যবহারের আবশ্যক হইবে না।

মান্দ্রাজে সবুজ সারের ব্যবহার—আলোচ্য বর্ষে ১৭০,৫১৫ পাউণ্ড শণ ধঞ্চে জাতীয় শস্য বীজ চাষীগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে চাষীরা ১৪৫,৬৭৩ পাউণ্ড মাত্র সবুজ সারোপযোগী শস্য বীজ বপন করিয়াছিল। ধঞ্চে বীজ বাঙলা দেশ ঐ অঞ্চলে রপ্তানি হয়। কিন্তু সালেম জেলায় আলোচ্য বর্ষে ধঞ্চে বীজ উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কৃষি ইঞ্জিনিয়ার—কৃষি-বিভাগের কার্য্যের জন্য মান্দ্রাজে সতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রস্তাব হইতেছে। ইহারা কৃষি বিভাগের অধীনে কার্য্য করিবেন।

টিনিভেলিতে আইল বাঁধা ও দাঁড়া টানা যন্ত্রের ব্যবহার—এই যন্ত্রের ইংরাজি নাম ড্রিল (drill) ইহার বিবরণ স্থানান্তরে পাইবেন। এখানে ড্রিলে চাষের খুব প্রচলন হইতেছে। ১৯১০ সালে ড্রিলে চাষ আরম্ভ হয়। উক্ত বর্ষে ১,৬১৯ একর জমিতে ড্রিলে চাষ হয়। বিগত বর্ষে ১১,৩২৯ একর জমিতে ড্রিল ব্যবহার হয়। আলোচ্য বর্ষে ড্রিল চাষের জমির পরিমাণ ১৭,০৬০ একর। ৮৩ জন চাষী এক্ষণে বিলাতী ড্রিল যন্ত্র আনাইয়া ব্যবহার করিতেছে। স্থানীয় ড্রিলও তৈয়ারী হইতেছে। চাষীরা ইহা ব্যবহারে অভ্যস্থ হইতেছে ও ইহার চাষে উপকার বুঝিতেছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:*:—

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় সমস্তই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নুটে শাক উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, শরিসা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে। আদা, হলুদ এই সময় জমি হইতে উঠান হয়। হলুদ ও আদার মুখীগুলি বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে বসাইবার জন্য বাছাই করিয়া রাখিয়া, বাকী ঘর খরচ অথবা বিক্রয় হয়।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার বন্দোবস্ত ছাড়া এখন আর অন্য কার্য্য নাই। গোলাপ জামের গাছে যাহাতে ফলের চাকি ধরিয়াছে, সেই গুলি চট দিয়া বাধিয়া দিতে হয়। চট মুড়িয়া না দিলে গোলাপ জামের ফল উৎকৃষ্ট হয় না।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল ফুটিবে না এবং জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। বাঁশ পাতা পোড়াইলে এক হিসাবে উপকার হয় বটে, পক্ষান্তরে আবার গোড়ায় নূতন বাঁশের ষোঁকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া ঝাড় খারাপ হইবার সম্ভাবনা, সবদিক সামলইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৩ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৭শ খণ্ড। } ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩২৩ সাল। { ১১।১২ সংখ্যা।

আউস ও আমন ধান

শ্রীশশী ভূষণ সরকার লিখিত।

(১)

ধান Oryza Sativa—ধান সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জ্ঞান আছে তাঁহারা সকলেই জানে যে প্রকার ভেদে ধান দুই রকম আউস বা আশু ধান এবং আমন বা হৈমন্তিক ধান। আউস ধানের বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা হয় এবং ভাদ্র মাসে ধান কাটা শেষ হয়। আশু ফসল হয় বলিয়া ইহার নাম আশু বা আউস। আমন, হৈমন্তিক কথায় অপভ্রংশ, হেমন্তে ইহার ফসল হয়, সেই জন্য ইহার নাম হেমন্তিক বা আমন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহার বীজ বোনা হয়, আষাঢ় শ্রাবণে ক্ষেত্রে রোয়া হয়, অগ্রহায়ণ পৌষে ধান কাটা শেষ হইয়া যায়।

আউস ধান অনেক রকমের আছে—এক বীরভূমেই ৬৬ রকম আউস জাতীয় ধানের চাষ হয়, মেদিনিপুরে ১৬ রকম, ২৪ পরগণায় ৩০ রকম। সুন্দর বন বিভাগে ১০ রকম। দিনাজপুরে ৮ রকম এবং নদীয়া, মৈমনসিং, ঢাকা, শিবসাগর ও আসামের অন্যান্য জেলায়, চট্টগ্রাম, এক কথায় বাঙলার সর্ব্বত্র ২।৪ জাতীয় আউস ধানের চাষ হইয়া থাকে। যেখানে আমনের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বা যেখানে নিম্ন ধরনের জলা বা বিল জমি অধিক তথায় আমনের চাষই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। নদীয়ার মত স্থানে যেখানে বিল জমি কম সেখানে আউসের চাষই প্রবল। দুই কারণে চাষীগণ আউসের চাষ করিয়া থাকে—১ম যে উপযুক্ত জলাভাবে

আমনের চাষ হয় না তথায় আউসের চাষ হওয়া সম্ভব, ২য় আওধান প্রায় মোটা হয় এবং ইহার শিঘ্র ফসল তৈয়ারি হয়। চাষীরা সেই জন্য এই ধানের চাষ করিয়া তাহাদের ও পরিবারের কিছু দিনের খোরাকের সংস্থান করিয়া লয়। আমন ধান না উঠা পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা তাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়। আউসের চাউল মোটা ও অধিক আঠা যুক্ত হয় ভদ্রলোকে তাহার ব্যবহার করে না আমন ধানই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য। আউস অপেক্ষা আমনের দাম অধিক তাই চাষীরা আউস ধান নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া আমন ধান বিক্রয় করে।

মধ্য প্রদেশের আউস—C. P. Aus—মধ্য প্রদেশে যে আউস হয় তাহা খুব মিহি, প্রায় দাউদখানির তুল্য ধান। ইহার চাষ এক্ষণে বাঙলায় অনেক স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সরকারি কৃষি-ক্ষেত্র সমূহে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। ইহার চাউল ভাল ও ভদ্রলোকের ব্যবহার উপযোগী বটে কিন্তু ফলন অত্যন্ত কম। বিঘা প্রতি ২।৩ মণের অধিক হয় না। গোবিন্দপুর কৃষি-ক্ষেত্রে আমন ধানের মত রোপণ করিয়া ইহার চাষ করা হইয়াছিল তাহাতে ফলন কিঞ্চিৎ বাড়ে বটে কিন্তু ধান মোটা হইয়া যায়। সাধারণ আমনের সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ থাকে যে এই ধান ভাদ্র মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়। খুব নিম্ন জলা জমিতে ইহার চাষ হয় না।

আমন ধান—ভারতে এত প্রকার আমন ধান হয় যে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সমগ্র ভারতে প্রায় ১০ হাজার রকম আমন জাতীয় ধান চাষ হয়। বাঙলা দেশে আমন ধানের সংখ্যা ৪ হাজারের কম হইবে না।

সুন্দরবন জঙ্গল মহলে ২৫।৩০ রকম, মেদিনীপুরে ৩০।৩২ রকম, যশহরে ৬২ রকম ঢাকা বরিশালে শতাধিক রকম, ২৪ পরগণা নদীয়ায় ৬০।৬২ রকম, হুগলী, বর্দ্ধমান, পুর্ণিয়ায় ৭০।৭২ রকম, আসামেও বহু রকম ধানের আবাদ হয়।

পুর্ণিয়ায় অথানি (অগ্রহায়ণ মাসে পাকে) নামে এক প্রকার ধানের চাষ হয়। এই ধানের গোড়ায় ৫।৬ ফিট জল থাকা আবশ্যক।

ফরিদপুরে দুই জাতীয় আমন ধান জন্মায়—ছোট্না ও বোরান। যশহরেও এই ধানের চাষ হয়। বোরান ধান অধিক জলে হয়। মৈমনসিংহে ইহার চাষ আছে। বোরান ধানের গাছ খুব বড় হয়। জল যত অধিক হয় গাছও তত বড় হইয়া থাকে। ইহার চাষের বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

ছোট্না ধান—বিল জমিতে ছউপীয়া বোনা হয়। চৈত্র বৈশাখে বীজ বোনা হয়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান পাকে। ইহাও আমন ধানের জাতি। জেলাভেদে আউস কিম্বা আমনের চাষ পদ্ধতিও সতন্ত্র। এই অতি বিস্তৃত ধান্য জাতির সংখ্যা করা ও প্রত্যেক বিবরণ দেওয়া সামান্য চেষ্টায় কার্য্য নহে। আমরা বাঙলা কয়েকটি জেলায়

প্রধান প্রধান ধানগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব ও প্রত্যেক জেলায় চাষের বিশেষত্ব যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিব।

বাঙলার কয়েকটি পরীক্ষিত ধান—হুগলী জেলার সাধারণত কার্ত্তিকশাল, জটাকল্মা, ঝিঙ্গাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশাল, কামিনীশাল, সাদাশঙ্খ কাক-তুলসী, নাগরা, দাউদখানি, কাটারিভোগ, বাদসাভোগ, সমুদ্রবালি এই কয় প্রকার ধানের আবাদ হইয়া থাকে। সব ধানগুলির সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে পরীক্ষা হইয়াছে। ধানগুলির সরু মোটা হিসাবে ফলন কম বেশী হয়। সরু ধান প্রায়ই কম ফলে, মোটা ধান অধিক ফলে। সরু ধান অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে জন্মায় এবং ইহার গোড়ায় তাদৃশ অধিক জল থাকার আবশ্যক হয় না। মোটা ধানের ক্ষেতে অধিক জল থাকে। অধিক জলের ধান প্রায়ই মোটা হয়, এমন কি অধিক জলে সরু ধান রোপন করিলেও মোটা হইয়া যায়।

আমরা হুগলী জেলার যে সকল ধানের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে নাগরাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলনে অধিক। নাগরা খুব মোটা ধান নহে ইহা পাটনাই ধান যে রকম মোটা সেই রকম। ইহার ফলন বিঘা প্রতি প্রায় ৮ মণ। হাতিশাল ইহা অপেক্ষা কিছু মোটা তাহার ফলন নাগরা অপেক্ষা অধিক, বিঘায় প্রায় ১০॥ মণ। যে গুলিকে আমরা হুগলী জেলায় প্রধান ধান বলিলাম তাহার অন্যত্রও আবাদ হয় এবং স্থানান্তরে যাইয়া তাহাদের প্রকৃতি কতটা বদল হইতেও দেখা যায়।

কার্ত্তিকশাল—ইহার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বীজ ফেলিতে হয়, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে রোয়া হয় এবং অগ্রহায়ণে ধান কাটা হয়।

কার্ত্তিকশালি—দিনাজপুরে ইহার চাষ হয়। চাষের সময় হুগলী জেলারই মত। যশহর কুচবেহার ও রঙপুরে এক প্রকার কার্ত্তিকশালির ধানের আবাদ হয়। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে এই ধান রোপন হয়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান কাটা হয়। ইহাদের সহিত হুগলী জেলার কার্ত্তিকশালের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও অনেক, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে ইহারা সকলেই সরু ধানের পর্য্যায় ভুক্ত।

জটা কল্মা—এই ধান বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণারও চাষ হয়। ইহা হৈমন্তিক ধান। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার আবাদ আরম্ভ ও পৌষে শেষ হয়।

ঝিঙ্গা শাল—ইহা আমন ধান, বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়। মেদিনীপুরে ঝিঙ্গাশাল নামে আউস ও আমন দুই রকম ধান আছে। হাজারিবাগে ও সাঁওতাল পরগণায়ও আমন ঝিঙ্গাশাল ধানের চাষ হইয়া থাকে। চাষের সময় জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ।

ইন্দ্র শাল—আমন ধান, হুগলী ও রঙপুর এবং দিনাজপুরে ইহার চাষ আছে।

হাতি শাল—আমন, ধান লম্বা, রঙ কাল। অপেক্ষাকৃত মোটা বলিয়া ইহার ফলন কিছু অধিক! বিঘায় ১০॥।১১ মণ ফলিতে দেখা যায়। এই ধানের কটক, রাজসাহি, শিবপুর ও পূর্ব্ব বঙ্গের সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা হইয়াছে। আসামে যাইয়া ইহা আরও একটু মোটা হইয়াছে ও মোটা ধানের পর্য্যায় পড়িয়াছে।

কামিনী শাল—ইহা আমন ধান, হুগলীতে ইহার চাষ দেখা যায়। ঢাকায় কামিনী শাইল নামক এক প্রকার ধান আছে হুগলীর কামিণী শাল ধানের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য আছে কি না দেখা আবশ্যক।

বাঁক তুলসী—বাঙলার একটি প্রধান সরু ধান। কটক, সুন্দরবন, মৈমনসিং, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বাঙলার বহুতর স্থানে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার দানা বেশ মিহি ভাত বেশ শাদা ও নরম হয়। মাঝারি জমিতে ইহার চাষ হয়। চাষের সময় আষাড় হইতে অগ্রহায়ণ। ভর মরসুমে সুবৃষ্টি হইলে এবং কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত গোড়ায় রস থাকিলে বিঘাতে ১০ মণ ফলে। বর্ষা কম হইলে বা জমি কোনক্রমে নিরস হইলে বিঘাতে ৫ মণের অধিক ফলে না। সুন্দরবনের কোন কোন মহলে বিঘায় ১২ মণ ফলিতেও শুনা যায়। হুগলী জেলায় গড়ে ফলন ৭।৮ মণ কিন্তু সুবর্ষায় ১০ মন ফলিতে পারে।

নাগরা—ইহাকে মিহি ধান বলা যায় না কিন্তু ইহা খুব মোটা নহে। বাঙলায় সাধারণ গৃহস্থেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ধান সাঁওতাল পরগণায় ও ২৪ পরগণায় জমিতে দেখা যায়। ফলন বিঘা প্রতি সুবৎসরে ১০।১১ মণেরও অধিক হইতে পারে।

দাউদখানি, বাদলাভোগ, সমুদ্রবালি, কাটারি-ভোগ—এই গুলি মিহি ধান। অধিক জলে এই গুলি জন্মে না। কাটারিভোগ ধান দিনাজপুর ও রাজসাহি জেলায়ও জন্মিয়া থাকে। সমুদ্রবালি ধানের বিহারেও চাষ হয়। দাউদখানি ধানের চাষ হুগলিতে হয় বটে কিন্তু দিনাজপুর ও রাজসাহিতে ইহার আবাদ অধিক। এই সকল ধানের ফলন নাগরা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মোটা ধান অপেক্ষা কম বিঘাতে সুবৎসরে ৫।৬ মণের অধিক ফলে না।

বৰ্দ্ধমান জেলার ধান—হুগলী জেলার অনেক ধানেরও বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয় তন্মধ্যে জটাকস্থা, কার্ত্তিকশাল, বাসমতি ও বাদসাভোগ ধানের আবাদই অধিক।

বাসমতি—ইহা মিহি ধান। কিলিবিট অঞ্চলে যে সকল মিহি ধান উৎপন্ন ইহা তাহাদের মধ্যে একটি। বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হইতেছে। বাসমতি দুই প্রকার

আছে একটি রং লাল, আর একটি শাদা। বীরভূম, হাজারিবাগ, রাজসাহিতে ইহার চাষ হইতেছে। এই ধানের জন্য একটু অধিক জলের প্রয়োজন। বর্ষা কম হইলে বাসমতি ধান ভালরূপ পুষ্ট হয় না। ধানের গাছগুলি জলে বার আনা ভাগ নিমজ্জিত থাকিলে তবে ইহার ফসল ভাল হয়। মানভূমেও ইহার চাষ হইতেছে, বিশেষ নিম্ন ভূমি ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ২৪ পরগণাও এই ধান আছে।

বাঙলার প্রধান ধান্য-জাতির তালিকা

শ্রীশশী ভূষণ সরকার লিখিত।

(২)

ধান্য আবাদের পরিমাণ।

সমগ্র বঙ্গদেশে আবাদী জমির পরিমাণ ১৯১২-১২ সালের কৃষি বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইল। জমির পরিমাণ বর্ত্তমানকালে (১৯১৫-১৬) কিছু ইতর বিশেষ হইয়াছে।

বাঙলা দেশে ২৫, ৯৫৪, ৯০০ একর পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ হয়। ইহার মধ্যে ২১,১৬৬,০০০ একর পরিমিত জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। বাকী জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। এক একর জমির পরিমাণ বাঙলার হিসাবে তিন বিঘা অর্দ্ধ কাঠা মাত্র।

বাঙলার প্রত্যেক জেলায় সমভাবে ধান্য উৎপাদিত হয় না। আবহাওয়ার বিভিন্নতা হেতু কোন স্থানে অধিক, কোথাও বা অল্প ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আবাদী জমির পরিমাণেরও কম বেশী হইয়া থাকে।

এ স্থলে বিভিন্ন জেলায় ধানের আবাদী জমির পরিমাণ দিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে।—

১।	বর্দ্ধমান	৮৩১,৮০০	একর
২।	বাঁকুড়া	৪৮৯,৮০০	,,
৩।	বীরভূম	৬০১,২০০	,,
৪।	মেদিনীপুর	১, ৬৯২,১০০	,,
৫।	হুগলী	২৯১,০০০	,,

৬।	হাওড়া	১২৫,১০০	একর
৭।	২৪ পরগণা	৮৮৩,৩০০	,,
৮।	খুলনা	৮০১,১০০	,,
৯।	নদীয়া	৬৪২,০০০	,,
১০।	যশহর	৮১১,৪০০	,,
১১।	মুর্শীদাবাদ	৫২৬,০০০	,,
১২।	মালদা	৬১০,৯০০	,,
১৩।	দিনাজপুর	১,১৮৪,৬০০	,,
১৪।	রাজসাহী	৮৭১,২০০	,,
১৫।	রঙ্গপুর	১,১৯৮,২০০	,,
১৬।	বগুড়া	৪৪৩,৭০০	,,
১৭।	পাবনা	৫৯২,৮০০	,,
১৮।	জলপাইগুড়ী	৭৫৫,৬০০	,,
১৯।	দারজীলিং	৪১,৫০০	,,
২০।	ঢাকা	১,০২৬,৮০০	,,
২১।	ফরিদপুর	৬২৫,৫০০	,,
২২।	বাখরগঞ্জ	১,৫৬৬,৩০০	,,
২৩।	মৈমনসিং	১,৬২৪,০০০	,,
২৪।	ত্রিপুরা	১,১০৫,০০০	,,
২৫।	নোয়াখালী	১,০৮৬,৩০০	,,
২৬।	চট্টগ্রাম	৬৫২,৪০০	,,
১৭।	চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৮৬,৪০০	,,

উক্ত তালিকায় বুঝা যাইতেছে যে মেদিনীপুর, দিনাজপুর রঙপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, মৈমনসিং, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলাতে ধানের আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে ধানই প্রধান চাষ এবং তথাকার চাষীদের ইহাই প্রধান অবলম্বন।

যে বৎসরের সমালোচনা আমরা করিতেছি তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে ২,৩০,০০০০ দুই কোটী ত্রিশ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে খাদ্য শস্যের আবাদ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ধানই সর্ব্ব প্রধান খাদ্য শস্য, অন্যান্য খাদ্য শস্য যথা গম, যব, জৈ, জোয়ার, বজরা, মাড়ুয়া, ভুট্টা, ছোলা, মটর, মুগ, বরবটী, কুলত্থি, বিরি, মুসুর, গড়গড়ী, চীনা, কাওন, কদো, শামা, খেশারি। এই সকল শস্য এতদঞ্চলে খুব অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। খাদ্য শস্য ব্যতীত পাট বাঙালা দেশের নিজস্ব কৃষি বলিয়া উল্লেখ

করা যায়। বাঙলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান ও পাট সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আউস-ছোট্‌না ও বরাণ—আমরা এক্ষণে বাঙলার প্রধান জাতীয় ধানগুলির একটা তালিকা দিয়া ধানের আলোচনা শেষ করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। বাঙলার ধান চাষে বিশেষ উন্নতি আবশ্যক এবং তাহাও সম্ভব এই জন্য আমরা ধান সম্বন্ধীয় আলোচনায় এত আগ্রহান্বিত। ধানের আবাদ বাড়াইবার এবং ধানের ফসল বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট অবসর আছে। ধান্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাঙলার ধন বৃদ্ধি আবশ্যম্ভাবী। পাট চাষ হইতেও বাঙালা দেশে প্রচুর অর্থাগম হয় বটে কিন্তু ধান চাষের পরিমাণ হ্রাস করিয়া পাটের চাষের বৃদ্ধি সাধন করা কখন অনুকুল ব্যবস্থা বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বেই বাঙলা দেশের ধান্য সমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, ১ম আশু বা আউস, ২য় আমন বা হৈমান্তিক।

আউস ধান প্রায়ই মোটা হইয়া থাকে। কোন কোন আউস ধান সরুও হয়। বাঙলার চাষীগণ মোটা আউসকে ছোটনা আউস বলে। ইহা পলি পড়া জমি, মেটেল কিম্বা দোয়াস জমিতে জন্মিয়া থাকে। উর্দ্ধ জমিতে ইহার আবাদ হয়। ইহার গাছ ও পাতা সরু কিন্তু ধান মোটা। সরু বা বরান আউসের গাছ মোটা, পাতা চওড়া কিন্তু ধান সরু। ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্ন জমিতে জন্মিতে পারে। নোণা কোটা, অতিশয় আটাল কিম্বা বিল জমি ভিন্ন নিম্ন ক্ষেত্র সমূহে ইহার আবাদ সম্ভব। ছোট্‌না আউসের ক্ষেত্র সরস থাকিলেই চলে কিন্তু বরাণ আউস ক্ষেতে ধানের গোড়ায় অন্ততঃ আধ হাত জল থাকা আবশ্যক। ছোটনা আউস আগে পাকে, বরাণ আউস পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে মধ্য প্রদেশের যে এক প্রকার সরু আউস বাঙলার চাষীগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে তাহা উচ্চ ধরণের জমি না হইলে জন্মে না। ইহার ফলন কিন্তু অত্যন্ত কম। বিঘায় সাধারণতঃ ২ মণ কিম্বা ৩ মণের অধিক নহে।

বৈশাখ মাসে আউসের চাষ আরম্ভ হয় এবং ভাদ্র মাসে শেষ হয়। ভাদ্র মাসে ফসল পাকে বলিয়া আউস ধানকে ভাদুই শস্য পর্য্যায় ভুক্তও করা হয়।

যত প্রকার আউস আছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। গণনা করিয়া দেখা যায় যে—

১।	মেদিনীপুরে	১৬ প্রকার।
২।	বীরভূমে	৬৬ ,,
৩।	বর্দ্ধমানে	৪।৫ ,,
৪।	২৪ পরগণায়	৩০ ,,
৫।	সুন্দরবন বিভাগে	১০ ,,

৬। নদীয়া জেলায় (এখানে আমন অপেক্ষা আউসের চাষই অধিক)— ১০ প্রকার।
৭। জলপাইগুড়িতে ২।৩ ,,
৮। দিনাজপুরে ৮ ,,
৯। ফরিদপুরে (এখানেও আউসের চাষ অধিক) ৮ প্রকার।
১০। বাখরগঞ্জে ২১ প্রকার।
১১। আসামে ২০।২২ ,,

ঢাকা, মৈমনসিং ও রঙপুরে বহু প্রকার আউসের আবাদ হয়।

চট্টগ্রামে আউস বালাম নামে এক প্রকার আউসের চাষ হয় তাহা কিছু মিহি, আউস পাটনাই ও আউস রামশাল ধানও আউসের মধ্যে মিহি। আউস রামশাল বীরভূমের আউস। এখন ২৪ পরগণায় চাষ হইতেছে।

দুর্গাভোগ—এক প্রকার আউস, মেদিনীপুর জেলায় জন্মে। উচ্চ জমিতে ইহার বুনানি হয়। এই ধান খুব মোটা নহে।

দুধকল্মা—এক প্রকার আউস, দিনাজপুরে ইহার আবাদ হয়। উচ্চ জমিতে ইহার বুনানি হইয়া থাকে।

দুধ কল্মা নামে ফরিদপুরে এক প্রকার জলি ধান আছে, জলা জমিতে ইহার চাষ হয়। যেমন জল বাড়িতে থাকে এই ধানের গাছও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। রঙ্গপুরে এই নামে এক প্রকার আমন আছে। বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ধান্য চারা রোপন করা হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ধান কাটা হয়। বিল জমিতে ইহার আবাদ হয়। যশহরেও ঐ জাতীয় আমন আছে। বাখরগঞ্জেও ঐ জাতীয় লম্বা ডাঁটা আমনের চাষ হয়।

কেলে রস্কে—মুর্শীদাবাদের আউস বাওলায় উহার চাষ আছে। ধান মোটা।

কেলে বোগড়া—মোটা ধান। নদীয়া জেলায় ইহার প্রচুর চাষ।

লক্ষ্মী পারিজাত—মোটা আউস, ২৪ পরগণায় চাষ হয়। উচ্চ জমিতে বৈশাখে বীজ বোনা হয়, ভাদ্রে কাটা হয়।

লক্ষ্মীপুরা—ফরিদপুরে ইহার চাষ হয়। নিম্ন জমিতে চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত বীজ বোনা হয় এবং আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ধান কাটা শেষ হয়।

রাজা শাইল—নোয়াখালির আউস। আষাঢ় শ্রাবণে বীজ বপন করা হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান পাকে। চট্টগ্রামে এই ধান আছে। তথায় ইহার রোয়াধানের মত পাইট করা হয়। এই নামে বাখরগঞ্জে এক প্রকার আমন ধান আছে।

শালাই—ত্রিপুরার আউস ধান। নদীর চরে ইহার চাষ হয়। বপনের সময় চৈত্র, বৈশাখ; শ্রাবণ ভাদ্রে ধান কাটা হয়। বপনের সময় যদি ক্ষেতে জল থাকে তবে জলের উপরেই বীজ বপন করা হয় অথবা ধান্য চারা রোপণ করা হয়। ইহা বাখরগঞ্জের আউস। ইহা মোটা আউস। আমন ধান পাইলে আর লোকে এই চাউল খায় না।

সীতাহার—২৪ পরগণার আউস। উচ্চ জমিতে বৈশাখে বীজ বপন করা হয় এবং ভাদ্রমাসে কাটা হয়। যশহর জেলায় এই নামের আমন ধান আছে।

সুর্য্যমণি—২৪ পরগণার আউস, সুন্দরবন জঙ্গলবিভাগেও ইহার চাষ হয়। ইহা নদীয়া জেলারও আউস। যশোহরে ও বগুড়াতে ইহা আমন ধান কিন্তু বাখরগঞ্জে ইহা আউসের মত চাষ হয়।

সুর্য্যমুখী—বাখরগঞ্জের আউস। ভাদ্র মাসে ধান পাকে। পূর্ণীয়া জেলাতে ইহার আমনের মত রোপণ করিয়া চাষ হয়। আশ্বিনমাসে ধান পাকে। পূর্ণীয়াতে ইহা অগ্রহায়ণী নামেও খ্যাত। চাউল মোটা।

আউস চাউল মাত্রেই গুরুপাক, আউস চাউল ব্যবহার করিলেই প্রথমাবস্থায় উদরাময় হইবার সম্ভাবনা; এই হেতু লোকে আমন খাইতে পাইলে আর আউস ব্যবহার করিতে চায় না। আউসের মধ্যে যেগুলি মিহি সেগুলি ব্যবহারে পীড়ার সম্ভাবনা কম।

ধান্যসমূহকে আশু ও আমন এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিলেও উহাদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন বোরো ও জলি ধান্য। বোরো ধানকে আমন বা আউস কিছুই বলা যায় না। ইহা উহাদের মাঝামাঝি এক প্রকার মোটা ধান্য। জলি ধানকে বরং আউসের শ্রেণীতে ফেলা যায়। আমরা এস্থলে বোরো ও জলি ধানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

কোন কোন কৃষক বিবেচনা করে যে, বোরো একটী সতন্ত্র ধান্য। কিন্তু বোরর বীজের অভাব হইলে আশু ধানের বীজ পাত দিয়া বোরোর রীতিক্রমে তাহা পঙ্কিল ভূমিতে রোপণ করা হইয়া থাকে। তাহাতে বোরো ধান্যের ন্যায়ই ধান্য জন্মাইতে দেখা যায়। এই জন্য অনেকে আবার অনুমান করেন যে উহা আশু ধান্যেরই রূপান্তর মাত্র। এই উভয় মতের প্রকৃত মীমাংসা করা বড় সুকঠিন।

যাহা হউক, এ দেশে যত ভিন্ন ভিন্ন আকারের উর্ব্বরা মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, পৃথক্ পৃথক্ তত জাতীয় ধান্যও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন পঙ্কিল ভূমি অর্থাৎ একটী বহু আয়তন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে আদিকালে ধানের প্রচার ছিল না, অন্য ক্ষেত্রের ধান্য গিয়া তাহাকে শস্যশালী করিয়াছে, এরূপ

বোধ হয় না। আর সমস্ত জাতীয় আশু ধান্ত যদি বোরো ধানের স্বভাব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেও বা আশু হইতে বোরোর উৎপত্তি বলা কতকটা সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু যখন দেখা যায়, কেবল এক মাত্র সুনিকেলে ধান্তই বোরোর আকার ধারণ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বোরো ধান্ত আদৌ পঙ্কিল ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে উচ্চ ভূমিতে গিয়া স্বভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সতন্ত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোরোর আর একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে এই যে, যে সকল বোরো ধান্ত চৈত্র মাসে কর্ত্তন করা যায়, তাহার মূলদেশ হইতে তেউড় বহির্গত হইয়া থাকে। এই তেউড় গুলির ধান্ত যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে তাহা হইতে বিঘায় দুই মণ আড়াই মণ ধান্ত উৎপন্ন হইতে পারে। চাষ কারকিত করিয়া ইহার অন্ত কোন রূপে আবাদ করিতে হয় না।

যেখানে অতিশয় বৃষ্টি হয় সে সকল স্থানেই বোরোর আবাদ ভাল হয়। পাটনা জেলায় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বোরোর বীজ বোনা হয়, ধান পাকে বৈশাখ জৈষ্ঠে। হুগলী জেলাতেও ঐ সময় চাষ হয়। এখানে বোরো ধান রোয়ার ব্যবস্থা আছে। নদীয়া জেলায় বোরোর বীজ বপন করা হয়। ময়মনসিং জেলায় বোরো ধান কতক রোয়া কতক বোনা হইয়া থাকে। মালদা, বগুড়া ও দিনাজপুরে বোরোর চাষ আছে। বাখরগঞ্জ জেলায় নদীর চড়ে বোরর চাষ হয়। এতদ্দেশে বোনা ও রোয়া দুই রকমের ব্যবস্থা আছে। পৌষ মাসে বীজ বোনা হয় এবং বৈশাখ জৈষ্ঠে ধান কাটা হয়। ফরিদপুরে অধিক জলযুক্ত জমিতেও বোরোর চাষ হয়। এখানে বোরো রোয়ার ব্যবস্থা আছে। আশ্বিন মাস হইতে বীজ বপন আরম্ভ হয় এবং পৌষ পর্য্যন্ত বপন কার্য্য শেষ হয়। ত্রিপুরা জেলায় এক প্রকার বোরো আউস আছে নদীর চরে চাষ হয়। বোরো ধান প্রায়ই মোটা, গরীব লোকেই ইহার চাউল ব্যবহার করে। যশহরেও বোরোর চাষ আছে।

অন্য মরস্থমী ফুল

(২)

আমাদের দেশে সুগন্ধ বিশিষ্ট ও বিচিত্র বর্ণের ফুল আছে। বনে জঙ্গলে, পথে ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই আমরা ফুল দেখিতে পাই বলিয়া আমরা মরস্থমী বন ফুল গুলির তাদৃশ আদর করি না। শীত প্রধান দেশে ফুল কম সেইজন্য যে কোন ফুলের তথায় এত আদর অধিক। আমাদের এ দেশে প্রায় সকল ফুলেই গন্ধ আছে। ফুলে সুগন্ধ না থাকিলে তাহা দ্বারা দেবসেবা হয় না বা তাহা আমাদের কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে লাগে না।
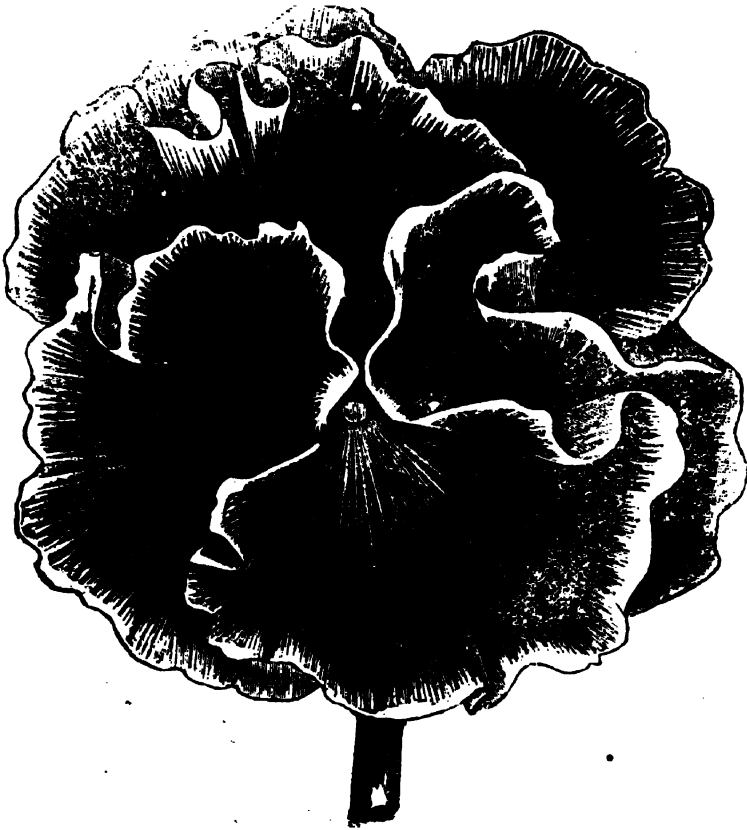
ঘাস মাঠের ইতস্ততঃ নানা জাতীয় মরস্থমী ফুল গুলি ফুটাইতে পারিলে স্থানটি বড় মনোরম দর্শন হয়। পাশ্চাত্য রিতি অনুসারে আমরা একণে সেইজন্ত বাসগৃহের চতুপার্শ্বস্থ স্থান সমূহ এবং উদ্যান মধ্যস্থ মাঠ গুলি একপ্রকারে সজ্জিত করিতে শিখিয়াছি

মরসুমী ফুলের মধ্যে এষ্টার প্যান্সির খুব খ্যাতি। এষ্টার অর্থাৎ তারা ফুল। ইহা একত্রে অনেক গুলি ফুটিয়া উঠিলে মনে হয় যেন নক্ষত্র ফুটিয়া আছে।

প্যান্সির সৌন্দর্য্য ও অতি চমৎকার। আর্দ্র পার্ব্বত্য প্রদেশে যিনি পুষ্পিত প্যান্সি দেখিয়াছেন তিনি কখন সে চিত্র ভুলিতে পারিবেন না। ঠাণ্ডা আর্দ্র জমি ইহার প্রিয় কিন্তু ইহাকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতকালে, উত্তম জলসেকের ব্যবস্থা করিয়া ফুটান কঠিন নহে। মরসুমী ফুলগুলি প্রায়ই বীজ হইতে উৎপন্ন করা যায়। ফুল ক্রমান্বয়ে ফুটিতে থাকে। প্যান্সি দ্বারা সজ্জিত এক একটি বেড ১ মাস, দুই মাস পুষ্প শোভায় সুশোভিত করিয়া রাখা যায়।

কতকগুলি মরসুমী ফুলের গাছ মাটি ছাড়িয়া অধিক উচ্চ হইয়া উঠে না তাহাদের মধ্যে প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ক্যাণ্ডিটফট্, ষ্টাষ্টরসম প্রভৃতি প্রধান। এই রকম ফুলের গাছ জন্মাইয়া শ্যামল ঘাস মাট বা ময়দানের পাড় বা হাঁসিয়া নির্ম্মান করা যায়।

ষ্টক, কার্ণেসন, করণ ফ্লাউয়ার, সুইট উইলিয়ম, গিলার্ডিয়া, জিনিয়া, লার্কস্পর, ফ্লকস সূর্য্য মুখী প্রভৃতি ফুল গুলির গাছ অল্পাধিক বড় হয়। ইহাদিগকে বাগানের বা মাঠের ইতস্ততঃ জন্মাইয়া এবং স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটাইয়া শোভা বর্দ্ধন করা যায়।

পপী বড় সুন্দর ফুল। ইহা অফিম্ জাতীয় গাছ। ফুলের জন্য যে পপীর চাষ হয় তাহা হইতে অফিম তৈয়ারি হয় না কারণ ইহার ফল ঢেঁড়ি গুলি ভাল পরিপুষ্ট হইতে পায় না। সাঙ্কর্য্যদ্বারা ফুলের উন্নতি বিধানই এস্থলে লক্ষ্য।

চন্দ্রমল্লিকা দুই রকম আছে মরসুমী ও স্থায়ী। শীত শেষে ও বসন্তকালে ফুল হয়। মরসুমী কিম্বা স্থায়ী অনেক জাতীয় চন্দ্রমল্লিকা আছে। পশ্চিম প্রদেশের শুষ্কমাটিতে ইহার চরম উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। কাশি, এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ সহরে যিনি পুষ্পিত চন্দ্রমল্লিকা দেখিয়াছেন তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

মিনালোবাটা প্রভৃতি কতকগুলি মরসুমী ফুল লতাজাতীয়। এ গুলিকে বাঁশের কেয়ারির উপর তুলিয়া দিলে শোভন দৃশ্য হয়।

গাঁদা (মেরিগোল্ড) ও ক্যালেণ্ডুলা ফুলের খুব বাহার। গাঁদা, ক্যালেণ্ডুলা, ডিজিট্যালিস্ ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। শীতকালে কতকগুলি মরসুমী ফুল ফুটে, কতকগুলি গ্রীষ্মশেষ হইতে বর্ষাকালের শোভা সম্পাদন করে। যত কিছু সুগন্ধী ভারতীয় পুষ্প প্রায় গ্রীষ্মকালে ফুটে। গোলাপ শীত একটু মন্দীভূত হইলেই ফুটিতে আরম্ভ হয়। বারমাস ফুটে এমন গোলাপও আছে। ভরা শীতে ও বর্ষায় বাগানের শোভা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে মরসুমী ফুল ফুটান ব্যতীত উপায় নাই।

এমারান্থস্, জিনিয়া, কৃষ্ণকলি গমফ্রেনা, অপরাজিতা, ধুতুরা সূর্য্যমুখী, দোপাটী, সূর্য্যমণী পাসিফ্লোরা (ঝুমকা লতা) কলমি লতা ভুঞ লতা (Ipomoea) প্রভৃতি ফুল

গুলি বর্ষাকালে শোভা সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে ধুতুরা, অপরাজিতা, সূর্য্যমুখী, সূর্য্যমণী, কৃষ্ণকলি, কলমী লতা ইহারা সকলেই দেশী ফুল। ইহারা আগে যে শোভা বিলাইত এখনও তাহাই বিলায়, তবে ইহারা বিলাতী মরসুমী দলে মিশিয়া সাহেবী বাগানে স্থান পাইতেছে। দোপাটী দেশী ও বিলাতি দুই রকম আছে। দেশীর উন্নতি নাই বলিয়া সে হীনকায় দুঃখী, বিলাতী সাজিয়া সুন্দর হইয়া আসিয়াছে। সহজে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কার্পেটের উপর যে নানারূপ পুষ্প শোভা চিত্রিত থাকে তেমনি ময়দান ও নানা পুষ্প শোভায় সজ্জিত করা যায়। কোথায় কোন্ রঙের ফুল দিলে মানাইবে, কোথায় কি আকারের ক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, ভাল মালী মাত্রেই তাহা জানে, বা জানা উচিত। তাহার পসন্দের উপর বাগানের শোভার হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। ফুল গাছ গুলির গাছ ছোট বড় হিসাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সজ্জিত করিতে হয়। বড়র পর ছোট ইহাই ক্রম, ছোটটির পর বড় গাছ বসিলে ছোটটিকে কেহ সহজে দেখিতে পাইবে না।

ক্ষেত্র গুলি ত্রিকোন, চুতুষ্কোন, গোল, অর্দ্ধগোল, বক্র, সোজা, সর্পাকার নানা প্রকার করা যায়। সকলেরই নিয়ম আছে, যাহা সুনিয়ন্ত্রিত তাহাই সুন্দর। বিসদৃশ হইতেই সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইবে ইহা নিপুণ মালীর কৌশলের পরিচয়।

আবার প্রথমে বড়, তারপর দুরে তদপেক্ষা ছোট ফুল বা ফুল গাছ, তদপেক্ষা দুরে আরও ছোট ফুল বা ফুল গাছ ইহাও এক প্রকার বাগান সাজাইবার নিয়ম। বাগান সাজান এক প্রকার চিত্র বিদ্যা, যে ভাল চিত্রকর সে ভাল মালি হইতে পারে। চিত্রকরের যেমন অনুপাতজ্ঞান থাকা চাই, দুরত্ব, নৈকট্য বুঝাইবার কৌশলজ্ঞান থাকা চাই, বর্ণজ্ঞান চাই, বর্ণে সংমিশ্রণ জানা চাই, বাগানের মালিরও সেই জ্ঞান না থাকিলে চলে না।

বড় বাগানকে ছোট করিয়া দেখান, ছোট বাগানকে বড় করিয়া দেখানও উদ্যান রচনার নিপুণতা। বিস্তৃত মাঠের উপর বাগান, তাহার ভিতর শস্যক্ষেত্র, সারগর্ত্ত সকলই আছে বড় বড় গাছ পালা, ফুল গাছ লতা দ্বারা কতক জায়গায় দৃশ্য ঢাকিয়া দেওয়া যায়। আবার একটি ঝিল কাটিয়া লইয়া যাইয়া একটা পুষ্পবিথিকার নিকট ছাড়িয়া দিয়া সুচিত্র করা হয় যে ঝিলটি আরও কত লম্বা ঐ ও পাশ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াগিয়াছে রাস্তাও ঐ রকম ইতস্ততঃ ঘুরাইয়া ও গাছ সাজাইবার কৌশলে ছোট বাগানকে বড় করা যায়। সমতল স্থানের বাগানে কৃত্রিম পাহাড়, নদ নদীর সৃষ্টী করতঃ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিধান করা যায়। পাহাড়ের উপরও সমতল বাগানের অনুকরণে বাগান রচনা করা হইয়া থাকে। সকল বাগান গুলিই যথোপযুক্ত, যথা প্রদেশে বিনিবেশিত পুষ্প শোভা দ্বারা শোভিত না হইলে বাগান গুলির মনোরম দৃশ্য হয় না। এক সময় বাগান পুষ্প শোভায় ভরিয়া গেল, কিন্তু অন্য সময় হয়ত বাগানটি যেন্ নগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিল ইহা নিয়ম নহে। বারমাস কোন না কোন্, কিছু না কিছু, ফুল থাকা চাই। যখন্ বা ফুল

না থাকিবে তখন বাগানে নানা প্রকার বৃক্ষলতাদির পত্র শোভা যেন অক্ষুন্ন থাকে। এই কারণে ভাল মালিকে বাগানের স্থানে স্থানে পাতা বাহারি গাছ রোপণ করিতে হয়। জলের ধারে কোন গাছ দিলে মানাইবে, জলে কোন গাছ হইবে ইহাও জানিতে হইবে। মালী একজন বড় দরের শিল্পী। ভাল মালীর দ্বারা রচিত উদ্যান ভাবুকের মনে ভাব জাগাইয়া দেয়। বড় বাগান, পার্ক রচনায় এক প্রকার নিয়ম, ছোট বাগান রচনার আর এক প্রকার কৌশল। সব সময়ই কিন্তু সুনিপুণ শিল্পীর মত ভালমালী নিয়ম অনিয়মের মধ্যে আপনার হস্ত চাতুর্য্য দেখাইয়া থাকে।

আমরান্থাস ও কলিউস ইহাদের ফুল হয় কিন্তু ইহাদের পাতা বাহারি বলিয়া ইহাদিগকে বৃত্তরেখায় ক্ষেত্র রেখায় ধারে ধারে বসাইলে বর্ডারের মত, কাপড়ের শালের পাড়ের মত সুন্দর দেখায়। মাট যে সব সময় সমতল হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই ইচ্ছা পূর্ব্বকও মধ্যে উচ্চ, ক্রমে নিম্ন ক্ষেত্র রচিত হয়, কোথাও উচুঁ কোথাও নিচু এক প্রকারও হইয়া থাকে। দৃশ্য মোনোহর হয় ইহাই উদ্দেশ্য। অতিরিক্ত পুষ্প সমাবেশ হইলেই যে দেখিতে সুশ্রী হয় এমন কোন কথা নাই শ্যামল শোভার মাঝে মাঝে পুষ্প শোভা, নাতিদূর দূর নাতি নিকট নিকট স্তবকে স্তবকে থাকিবে, ক্ষেত্রটি বিবিধ প্রকারে বিচিত্র প্রকারে সজ্জিত হইবে। যাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে সে ইহাতে নিপুণতা দেখাইতে পারিবে। যাহাতে প্রকৃতির ন্যায় সুরম্য দর্শন হয়, প্রকৃতির অনুকরণে কার্য্য করাই এক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা। প্রকৃতির বিরাট ব্যাপারটি নিজায়ত্ত, সীমার মধ্যে আনিয়া দেখা। এইরূপ রচনা নিশ্চয়ই ভাল দেখাইবে।

স্যুইট পি

—•:•—

স্যুইট পি ও মটর সুঁটী একই জাতীয় উদ্ভিদ, কেবল প্রকার গত ভেদ আছে, ব্যবহারেরও পার্থক্য আছে। একের আদর ফুলের জন্য, অন্যের আদর সুঁটীর জন্য মটর সুঁটী একটি বিশিষ্ট তরকারী, সিদ্ধ পক্ক করিয়া, ঝোলে, ঝালে অম্বলে ইহা অতি সহজে খাদ্যোপযোগী করা যায়। মটর সুঁটী যেমন খাইতে সুমিষ্ট, স্যুইট পির ফুলগুলিও দেখিতে তেমনি নয়নানন্দকর। উদ্যান চর্চ্চায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পড়িয়া স্যুইট পির এখন আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। শাদা, কাল, গোলাপি, লাল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের স্যুইট পি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দোঁরঙা, তেরঙা, ডোরাকাটা প্রভৃতি নানা প্রকারের স্যুইট পি দৃষ্ট হইতেছে। কোন পুষ্প প্রদর্শণীতে যাইয়া শ্রেণীবদ্ধ বিবিধ রঙের স্যুইট পি দেখিতে না পাইলে যেন মনের তৃপ্তি হয় না। মটর সুঁটির যেমন ফলের
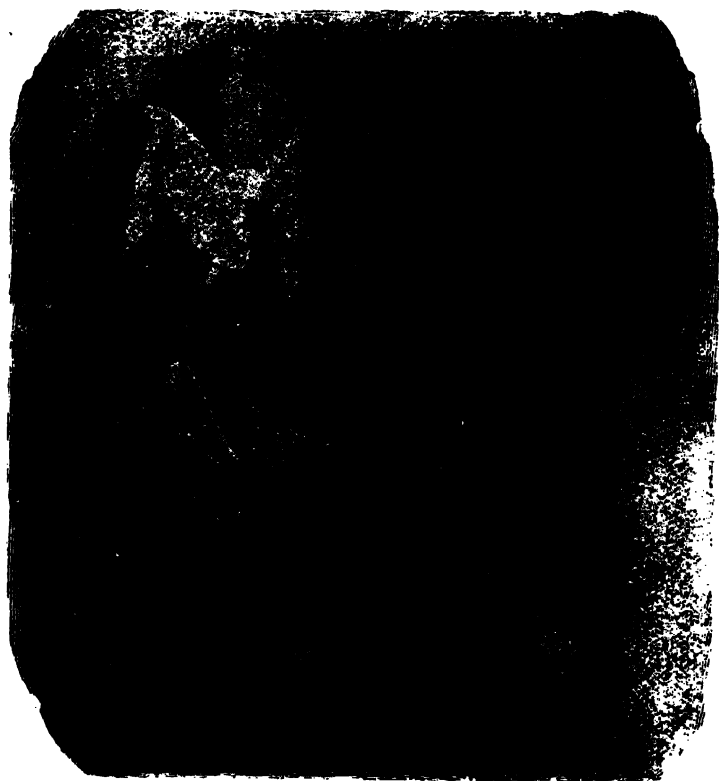
স্যুইট পি'র চিত্র নানা রঙের, নানা আকারের স্যুইট পি অন্যান্য মরসুমী ফুলের সহিত ফুটিলে শীতকালের ফুলের বাগানের পুষ্পসজ্জা কি অতুলনীয় হয় না?

দিকে সুঁটির দৃষ্টি, ইহার তেমনি ফুলের দিকে দৃষ্টি। উদ্যান পালকগণ ইহার বর্ণোৎকর্ষ সাধন ও ইহার আকার গঠন ভাল করিবার জন্য সদাই মনোযোগী, সদাই ব্যস্ত। ইহার সুঁটি তাদৃশ বড় হয় না বা মটর দানাগুলি সুঁটি মটরের দানার মত বড় হয় না। সুঁটি মটরের ফুলগুলি প্রায়ই সাদা। ভারতীয় দেশী সবুজ মটরের ফুলেই রঙ একটু বিচিত্র পার্পল, গোলাপি, লাল, সাদা প্রভৃতি সংযোগে বিচিত্র রঙে সুশোভিত। সুপ্রণালী মত চাষ করিয়া ইহার কথঞ্চিৎ উন্নতি করিতে পারিলে ইহাকে সুইট পি পর্য্যায় ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কোন কোন সুইট পির ফুল আকারেও খুব বড় বিবিধ বর্ণ সমাবেশও সংযোগে বড় মনোরম দর্শন। বর্ণগুলির সংযোগ, মিশ্রণ, ছায়াপাত দেখিয়া অনুভব করিবার জিনিষ কিন্তু তাহা বর্ণনা করিবার বুঝি ভাষা নাই। স্বাভাবতই মটরের ফুলগুলি দ্বিদল বিশিষ্টই দেখা যায়। কতকগুলি দল পুষ্পকোরকের মধ্যে অপরিণত অবস্থায় থাকিয়া যায়। ফুলের রঙের উৎকর্ষ সাধন, ফুলের অপুষ্ট পাপড়ীগুলি পুষ্ট করিয়া তুলা, ফুলের আকার ও গঠনের উন্নতি সাধনকরাই উদ্যানপালকের, ভাল মালীর লক্ষ্য। ইহার জন্য তাঁহারা অনেক কৌশল করিয়া থাকেন। গাছগুলিতে যাহাতে প্রচুর ফুল ফুটে, গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত যাহাতে ফুলে পূর্ণ হয় তাঁহারা তাহারও তদ্বির করেন। সুইট পির গাছগুলি যাহাতে বহুশাখা বিশিষ্ট হয়, প্রত্যেক শাখায় যাহাতে ৩।৪টা ফুল থাকে তাহার জন্য চেষ্টা করেন। সুইট পির গাছগুলি প্রায়ই ৩।৪ ফিট বড় হয়। ইহাদিগকে সোজা দাঁড় করাইবার জন্য প্রায়ই কাটির ঠেস দিতে হয়।

সুইটপির উন্নতি চেষ্টা সাঙ্কর্য্য দ্বারা এবং বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা প্রতিনিয়ত হইতেছে এবং প্রভূত উন্নতি ও হইয়াছে। সুইটপির গাছ সহজেই করা যায় এবং ইহার গাছগুলি তাত, বাত সহিষ্ণুও বটে। আমাদের দেশে কিন্তু সুইটপির উৎপাদনে একটা ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। বিলাতী বীজ আনিয়া চাষ করিলে সদ্য বৎসরে চারা ভাল জন্মে না। যে কয়টা চারা জন্মে তাহা হইতে বীজ লইয়া পরবর্ত্তী বর্ষে ভাল গাছ হয় সুইটপির বীজ আমাদের জল মাটিতে এইরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত হয় অথবা উহা য়ুরোপ, আমেরিকায় ও দুইবার

চাষের পর ভাল হয় কি না তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে যেমন নবীয়া কড়াইয়ের বীজ ভাদ্র আশ্বিনে রাখিয়া মাঝে ফাল্গুন চৈত্রে সেই বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া বীজটি সারাইয়া না লইলে বর্ষাকালে চাষের সময় তাহাতে কেবল গাছ হইতে থাকিবে ফল নাম মাত্র ধরিবে। সুইটপিরও বোধ হয় এই ধর্ম্ম।

বসন্ত কালেই সুইটপির ফুল ফুটে আশ্বিন কার্ত্তিকে বীজ বুনিতে হয় ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে শীত কাল পর্য্যন্ত বীজ বুনিলে বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় শীতাগম পর্য্যন্ত ফুল ফুটান যায়।

সুইটপির গন্ধ ও মন্দ নহে। অধিক গন্ধ যুক্ত সুইটপির আদরও অধিক। ফুলের তোড়া, সাজি ফুলদানি সাজাইবার জন্য সুইটপির কটিং ব্যবহার হয়। সেই ফুলের ডাঁটা লম্বা, দৃঢ় অথচ সরু, যে ফুলের গন্ধ ভাল, আকার বড়, বর্ণ মনোহর ও উজ্জ্বল তাহারই কটিং ভাল হয়। কটিং করিবার জন্য এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট সুইটপির চাষ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে বর্ষাগত না হইলে সুইটপির বীজ বপন করা চলে না।

খুৎনিবৃত্তির জন্য যেমন খাদ্য বস্তুর প্রয়োজন নয়নানন্দোৎপাদনার্থ প্রিয় দর্শন বস্তুও চাই। আমাদের এই পৃথিবীটা যদি এক ঘেয়ে হইত তাহা হইলে সৃষ্টির অনেক রহস্যই উৎঘাটিত হইত না। প্রকৃতির সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে হয় রাগ না হয় দ্বেষ এই দ্বিবিধ মানসিক বিকার উপস্থিত হইবে। যাবতীয় সৃষ্টি রহস্য এই রাগ দ্বেষ মূলক।

ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৩ সাল।

ভারতের স্বভাবজ দ্রব্য

সম্প্রতি রয়টারের সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারত সচিব, মিঃ চ্যাম্বারলেন্ বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের ভারতীয় কমিটিকে ভারতীয় স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিবরণী পেশ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্ একাধারে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রদর্শনী স্থান, গবেষণাগার ও প্রচার কেন্দ্র। বর্ত্তমান অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ প্রথায় ভারতের অসংখ্য স্বভাবজ দ্রব্যাদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যে দ্রব্যসমূহ জর্ম্মানীও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারিতে অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হইত সেগুলি সাম্রাজ্য মধ্যেই কি রূপে কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। বিলাতের বড় বড় বিশেষজ্ঞ ও সওদাগরগণ এই অনুসন্ধানে সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে ইহার ফলে ভারতীয় ব্যবসাদারের অল্প বিস্তর উন্নতি সাধিত হইবে।

ভারতের স্বভাবজ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সমিতি প্রভৃতির নিয়োগে ইহা স্পষ্টই প্রতিয়মান হইতেছে যে যাহাতে যুদ্ধাবসানে ভারতেও অন্যান্য সুসভ্য দেশের সহিত শিল্প বাণিজ্যে সমকক্ষ হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে যে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। আপাততঃ বানিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা কি? বর্ত্তমান সময়ে ভারত যে জগতের অন্যান্য দেশের জমিদারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জমিদারগণের জন্য প্রজারা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্র ও উদ্যান, পর্ব্বত ও কানন, জল ও স্থল হইতে উদ্ভিদ, খনিজ ও প্রাণীজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেয় এবং সহস্র সহস্র

ক্রোশ ব্যবধানে বিদেশে তৎসমুদয় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত হইয়া আবার ভারতে আসিয়াই বিক্রীত হয় ব্যবসায়ের এই প্রণালীতে ভারতবাসীর আর মজুরের যৎসামান্য পারিশ্রমিক এবং ব্যয়—স্বভাবজ দ্রব্যের তুলনায় বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অন্ততঃ দশ বার গুন অধিক মূল্য, যাহা প্রত্যেক ভারতবাসীই প্রতি নিয়ত অল্প বিস্তর পরিমাণে বিদেশীয় বণিকগণকে প্রদান করিতেছেন।

বহুল পরিমাণে স্বভাবজ দ্রব্য বিক্রয় করা অনেকটা মূলধন ভাজিয়া খাওয়ার ন্যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাটের উল্লেখ করিতে পারা যায়। সমস্ত পাট দেশ মধ্যে চট অথবা বস্ত্রে পরিণত করিতে পারিলে চাষী হইতে বড় বড় সওদাগর পর্য্যন্ত কত শ্রেণীর ও কত সংখ্যক লোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারিত এবং উক্ত ব্যবসায়ে সঞ্চিত অর্থে অন্য কত ব্যবসায়ের ভিত্তি গঠিত হইতে পারিত। কিন্তু বহুল পরিমাণে পাট বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় দেশের শিল্প ভবিষ্যতে অনেক পরিমানে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তবুও পাট কতক পরিমাণে দেশ মধ্যে ব্যবহারোপযুক্ত পণ্যে পরিণত হয়; কিন্তু এমন অনেক দেশীয় স্বভাবজ দ্রব্যের নাম করিতে পারা যায় যেগুলি কেবল মাত্র বিদেশে রপ্তানি হয়।

স্বভাবজ দ্রব্যাদিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও প্রাণীজ। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা সর্ব্বপ্রধান ও তৎপরেই সুবর্ণ। এতদ্ভিন্ন কেরাশিন তৈল, ম্যাঙ্গানিজ, লবণ, অভ্র, গৃহ প্রস্তুতের প্রস্তর প্রভৃতি, সোরা, ও শীষকাদির মাত্রা কয়লা ও সোণার মত না হইলেও নিতান্ত কম নহে। তাম্র, রৌপ্য, লৌহ ও বহুমূল্য রত্নাদিও ভারতে অল্প বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু উপযুক্ত চেষ্টার অভাবে সে সমুদয়ের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইতেছে না। প্রাণীজ পদার্থ সমূহের মধ্যে নানাবিধ প্রকারের চামড়া, শিং, ক্ষুর, হাড়, লাক্ষা, মধু, মোম, শুক মাছ, তৈল প্রভৃতিও প্রধান। পশুজনন এবং খাদ্য অথবা কার্জ কর্ম্মাদির জন্য পশ্বাদি বিক্রয় ভারতে এখনও পর্য্যন্ত অত্যন্ত নীচ জাতির সমূহের মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

স্বভাবজ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদিকে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রজ ও বনজ। ভারতের সর্ব্ব প্রধান ক্ষেত্রজ ফসলসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করিতে পারা যায়—যথা তিসি, সর্ষপ, তিল, চিনার বাদাম, রেড়ী তুলা, পাট; নীল, পোস্ত, তামাক; ধান, গোধুম, জোয়ার, বজরা, কাফি, চা; ইক্ষু ও অন্যান্য গৌন খাদ্য শস্যাদি। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় ফসলের অধিকাংশই বিদেশে চালান হইয়া যায়। দেশ মধ্যে কোনরূপ পণ্যে পরিবর্ত্তিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ তৈল বীজের কথা বলিতে পারা যায়। তৈল বীজ হইতে অন্যান্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত দূরের কথা আপাততঃ বহুল পরিমাণ তৈল বীজ দেশ হইতে অনিষ্পেষিত অবস্থায় বাহির হইয়া যায়। সুতরাং শুধু তৈল নহে, পশ্বাদির খাদ্য ও জমির উন্নতির

অন্যতম উপাদান তৈল হইতেও দেশ বাসীরা বঞ্চিত হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্য, বার্ণিসের উপাদান, বাতি, সাবান, গ্লিসরিণ প্রভৃতি আরও যে বহুবিধ দ্রব্য নানা প্রকারের তৈল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা এতদ্দেশে অনেকেই জানেন না, কিম্বা জানিলেও তাহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে উদাসীন।

এইরূপ তন্তু উৎপাদক ফসল হইতে তন্তুজাত দ্রব্য, রঞ্জক পদার্থ হইতে রং, খাদ্য শস্যাদি হইতে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য ও ব্যবসায়িক ফসলাদি হইতে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত না হইয়া রাশি রাশি ক্ষেত্রজ পদার্থ বিদেশে চালান হইয়া যায়। স্বভাবজ বনজ দ্রব্যাদি যে আপাততঃ বনে জঙ্গলে কত পরিমাণে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দুই চারিটি বিষয়ের এ স্থলে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আপাততঃ কাগজের বাজার যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। দেশে যে কয়েকটি কাগজের কল আছে তাহারা আর কাগজ সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এতদ্ভিন্ন কাগজ প্রস্তুতের উপাদানেরও অভাব। কিন্তু কত বন্য ঘাস ও বাঁশ অনাদরে মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত ঘাস ও বাঁশ যে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান হইতে পারে তাহা যে জানা নাই তাহা নহে, কিন্তু ব্যবসায়ীর হিসাবে উক্ত উপাদানগুলি লইয়া, পরীক্ষা করিয়া ব্যবসায় জগতের সমক্ষে ভারতীয় কাগজের নমুনা প্রদর্শন করে কে? যেরূপ কাগজের কথা বলা হইল, অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের আমদানী দ্রব্যের তালিকা অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি দ্রব্যই দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু তাহা জানিলেই কোন কাজ হইল না। কিরূপে স্বভাবজ উপাদানকে ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবিত হওয়াই প্রধান কাজ।

গবর্ণমেণ্টের বন বিভাগ, ভূতত্ত্ববিভাগ, ব্যবহারিক উদ্ভিদ ও জীবতত্ত্ব বিভাগ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বিভাগাদি প্রতি বৎসরই ভারতের স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কিছু না কিছু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের ধনাগমের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কি? আদৌ না। তাহার অন্যতম কারণ এই যে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীগণের গবেষনার ফলে যে সমুদয় তথ্য আবিষ্কৃত হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই সরকারী বিবরণী মধ্যে জন্ম ও তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে। দেশ মধ্যে সরকারী অথবা বেসরকারী এমন কোন বিভাগ, সভা, সমিতি কিম্বা ব্যক্তিমণ্ডলী নাই যাঁহারা উক্ত তথ্যকে ব্যবসায়ীর হিসাবে পরীক্ষা করেন অথবা ব্যবসায়ে পরিণত করিতে চান সুতরাং অনেক ভারতজাত স্বভাবজ দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা অর্দ্ধ জ্ঞান মাত্র।

আপাততঃ ভারত সচিবের আদেশানুসারে যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা কেবল বিলাতী সওদাগরের স্বার্থ দেখিবেন অথবা দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের স্বার্থ সমভাবে দেখিবেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পর বিলাতের অথবা উপনিবেশ সমূহের নীল রঙের কারখানাওয়ালাগণ উপযুক্ত মালের অভাবে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এই সময়ে যাহাতে ভারত হইতে স্বভাবজ দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে চালান হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হয়। আমাদের কর্ত্তাপক্ষগণ সেই পর্য্যন্ত করিয়াই নিরস্ত হইতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসী-গণের পক্ষ হইতে যদি স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হয় তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইল না। যাহাতে উক্ত দ্রব্যাদি দেশ মধ্যে একবারেই সম্পূর্ণ পণ্যে পরিণত হইতে না পারুক অন্ততঃ কতক পরিমাণে পরিণত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্বভাবজ দ্রব্যের অবাধ রপ্তানিতে যে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। হাড় ও তৈল বীজের রপ্তানিতে মৃত্তিকা অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, বিশেষ বিশেষ খনিজ দ্রব্যের রপ্তানিতে রাসায়নিক শিল্পের ব্যাঘাত জন্মিতেছে, খাদ্যশস্যের মূল্যের প্রতিদ্বন্দীতায় অনেক খাদ্য মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে দুই চারিটি বনজ অথবা পার্ব্বত্য দ্রব্য এত অধিক মাত্রায় রপ্তানি হইয়াছে যে উৎপাদন তাহার সহিত সমকক্ষ না হইতে পারিয়া অবশেষে আসল দ্রব্যই লোপ পাইতেছে।

বস্তুতঃ কোন স্বদেশ প্রেমিকের এরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না যে আমাদের দেশটা কেবল মজুরের দেশ হউক। আমরা কেবল চাষের অথবা দ্রব্যাদি সংগ্রহের মজুরী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের লাভ প্রভৃতি সমস্তই বিদেশীয়দিগের হস্তে যাউক। কিন্তু এখন হইতে সাবধান না হইলে এবং নিজ দেশের দ্রব্যাদি নিজেরাই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে না পারিলেই এইরূপ অবস্থা আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আপাততঃ যে লক্ষ লক্ষ লোক কেবল যুদ্ধ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত আছে, যুদ্ধ শেষে তাহারা সকলেই তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। সেই অভাবের টানে দেশ দেশান্তর হইতে যে স্বভাবজ দ্রব্যাদির স্রোত ইউরোপ অভিমুখে প্রধাবিত হইবে তাহাতে কি বাণিজ্যজগতে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইবে। ভারতের পক্ষে সেইটি ভয় ও ভরসা উভয়েরই মূল। ভয় কেবল স্বভাবজ দ্রব্য বাহির হইয়া যাওয়ায় ভারতের আর্থিক লোকসান, এবং ভরসা এই যে ভারতের দ্রব্য সভ্য জগতের পক্ষে যে কত আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিয়া ভারতবাসী উক্ত দ্রব্যজাত পণ্যাদি প্রস্তুত করিতে বদ্ধপরিকর হইবে এবং জগতের শিল্পপ্রধান দেশ সমূহের মধ্যে নিজস্থান অধিকার করিবে।

কোন জিনিষের অপচয় হয় না—আমরা ধান হইতে চাউল বাহির করিয়া আহার করি, ভাতের মাড় গবাদি পশুকে খাওয়াই। ধানের তুঁষ পচিয়া-

বৃক্ষলতার সার হয় এবং খুদ কুড়া গবাদির বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। কলাই শরিষা, যব, গম, জৈরের খোসা ভুসী গবাদির খাদ্য, শাঁস মানুষের ব্যবহার্য্য। গো, মহিষ, মানুষ ব্যবহার করিয়া যাহা ঝড়তি পড়তি থাকে তাহাতে জমির সার হয়। ফল মূল ভুক্ত অন্ন যাহা কিছু আমরা দৃশ্যত অপচয় হইতে দেখি তাহাও পরোক্ষে মানুষের শত উপকার সাধন করে।

যে সকল জিনিষে আমরা প্রত্যক্ষত অধিকতর উপকারে লাগাইতে না পারি তাহাই অপচয় হইল বলিয়া মনে করি। গোময় পচাইয়া সার তৈয়ারি করিতে পারিলে অধিকতর উপকার হয় কিন্তু তাহা পুড়াইয়া তাহার অনেক সারাংশের অপচয় করি। গোময় পুড়াইলে ছাই গুলিও সাররূপে ব্যবহার হয় বটে কিন্তু গোময়ের সারত্বে ও ছাইয়ের সারত্বে অনেক তফাত।

আমরা যে গুলি যে কাজে লাগে সেগুলিকেও কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিনা। হাট বাজারের ধারে কত আলু পচা, আম কাঁটাল কলা পচা পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হয় আমরা তাহাদিগকে সারের কার্য্যে লাগাইতে সামান্য যত্নও করি না। কত শুষ্ক মাছের গুঁড়া, কত পচা মাছ, কত খোসা ভুসী খানা খোন্দলে পড়িয়া, জল স্রোতে ভাসিয়া যাইয়া অপচয় হইতেছে। সেগুলি কোন না কোন সময়ে কাজে লাগিবে, কোথাও না কোথাও নীত হইয়া উপকারে আসিবে কিন্তু প্রত্যক্ষ তাহাদের অপচয় হইল ইহা সুনিশ্চিত। আবার উদ্যোগী লোকদের কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাহারা ধুলিমুঠা হইতে কড়ির মুঠা করিতে চায়। আমাদের এখানে উচ্ছিষ্ট অন্ন (ভাত) ধুলায় পড়িয়া নষ্ট হয়। জাপানে তাহা সংগ্রহ হয় এবং ধৌত ও শুষ্ক হইয়া চূর্ণ করা হইলে আবার মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। ফরাসী দেশে পচা আলু ও পচা ফল হইতে স্পিরিট তৈয়ারি হয়।

আমাদের দেশে আজকাল বিবাহাদি নানা উৎসব কার্য্যে কত সহস্র পাউণ্ড কারবাইড ক্যালসিয়ম খরচ হয়। গ্যাস খরচ হইয়া যাইবার পর চূণ পদার্থটা রাস্তা ঘাটে ছড়াছড়ি হয় কিন্তু ইহা যে জিপসমের তুল্য সার তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না এবং বিনা সঙ্কোচে এই জিনিষটা নষ্ট হইতে দেয়

পুষ্করিণীর পানা অকেজো নহে, মৎস্যগণ পানার শিকড় খায়। পুকুরে পানা হইয়া জল ছাইয়া ফেলিলে জল ও মাছের অনিষ্ট হয় কারণ ইহারা রৌদ্র ব্যতীত উভয়ই নষ্ট হইবে। আমরা সেই জন্য পানা তোলাইয়া পুকুরের পাড়ে ফেলিয়া রাখি এবং সে গুলি পচিয়া পুনর্বার জলে পড়িয়া জল দূষিত করিতে দিই। অথচ পানা পচা শুষ্ক উৎকৃষ্ট পাতা সার। গো নারিকেলে পানার সার বিশেষ ফলপ্রদ। আম লিচু গাছের গোড়ার মাটি ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য গোড়ায় পানা চাপাইয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

আগে পুরাতন কাগজের কত অপব্যয় হইত এখন মানুষে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজও ফেলে না। এখন অভাব বশতঃ কাগজ বড় মূল্যবান হইয়াছে। সস্তার সময় সাদা কাগজে ঠোঙ্গা তৈয়ারী হইয়াছে এখন ঠোঙ্গার জন্য লেখা কাগজই মেলা ভার, কাগজ প্রস্তুতের জন্য ছেঁড়া টুক্‌রা কাগজ পড়িতে পায় না।

পূর্ব্বে লোক তৈল ঢালিয়া লইয়া কেরোশিনের টিনগুলি দশ বা বার পয়সার বেচিতে পারিত না, এখন তাহার দাম আট আনা। কত পুরাতন টীন বা টীনের কৌটা আমাদের দেশে পড়িয়া নষ্ট হইত। জার্ম্মানগণ সেই পুরাতন টীন অতি অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া তাহা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আবার বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিত। পুরাতন টীন হইতে জার্ম্মানিতে যে সকল দ্রব্য তৈয়ারী হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া লণ্ডন মিউনিসিপাল অফিসে একটি প্রদর্শণী খোলা হইয়াছে পুরাতন টীন হইতে ইংলণ্ডেও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

অভাব হইলেই অপচয় নিবারণের উপর খর নজর পড়ে, যখন অভাব থাকে না তখন মানুষে সামান্য জিনিষের উপর স্বভাবতঃ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে।

আমরা শুনিয়াছি যে পাশ্চাত্য দেশে ভুক্তাবশিষ্ট চুরুটটি পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার যো নাই। সে গুলিও সংগ্রহ হয় এবং তাহা হইতে সিগারেট ও পাইপে খাইবার তামাক প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে কিন্তু ভুক্তাবশিষ্ট জিনিষটা উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তাহা জানিয়া শুনিয়া পুনরায় ব্যবহারে সহজে কেহ রাজী হয় না।

———:*:———

শস্যের ফলন বৃদ্ধি—সকলেরই জানা আছে যে সারবান জমি না হইলে ফসল ভাল হয় না। জমি যদি স্বভাবত উর্ব্বরা হয় তাহাতে সার প্রদান না করিলেও যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন পলি পাড়া জমিতে ধান কিম্বা পাটের চাষে সার প্রয়োগের অপেক্ষা থাকে না, পতিত জমির জঙ্গল তুলিয়া তাহাতে বেগুণ চাষ করিলে বিণা সারে অতি উৎকৃষ্ট ফসল হয়। বেগুণের পর পটল দিলেও পটলও ভাল ফলে। ক্রমান্বয়ে ২।৩ বৎসর তাহাতে যাহা ফসল হয় তাহা সার প্রযুক্ত জমি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং অধিক। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। ঐ সকল জমিতে স্বভাবতই উদ্ভিদের খাদ্য সার সঞ্চিত থাকে। এরূপ জমিতে গাছ সহজেই জন্মান যায় সেগুলি অনায়াসেই সতেজে বাড়িয়া উঠে এবং তাহাতে ফল শস্যেরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উপর্য্যুপরি শস্য উৎপাদন দ্বারা যে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে উপযুক্ত ফসল পাইবার আশা করিলে সার প্রয়োগ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

———

আমাদের দেশে সহজ প্রাপ্য সার হইতেছে—গোময়। নানা কারণে কিন্তু এই গোময় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। গবাদি পশুর অবাধ হনন হেতু প্রত্যেক কৃষক পল্লীতে গবাদির সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, গোচারণের জমি গুলি পর্য্যন্ত আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ায় নিঃস্ব কৃষকগণ উপযুক্ত সংখ্যক গোপালন করিতে পারে না, উপরন্তু আবার জ্বালানী কাঠ ও কয়লার অভাব বশতঃ তাহারা গোময়, জমির সাররূপে ব্যবহার না করিয়া জ্বালানার্থে ব্যবহার করিতেছে। এক্ষণে জমির সার যোগানের উপায় কি? তৈলপ্রদ বীজের খৈল মাত্রেই জমির উপযুক্ত সার, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার তৈল বীজের সমুদয় খৈল কৃষকের করায়ত্ব নহে। বহুপরিমাণ তৈল বীজ ও খৈল বিদেশে অবাধে রপ্তানি হইয়া যায়! উহাদের মূল্যও দিন দিন বাড়িতেছে। পূর্ব্বে, বার, চৌদ্দ আনায় অথবা বড় জোর ১৲ একটাকায় একমণ শরিষার কিম্বা রেড়ীর খৈল মিলিত, এখন তাহার মূল্য ২৷৹, ৩৲ বা ৪৲ চারি টাকা। সুতরাং জমিতে খৈল ব্যবহার করা কৃষকের অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। শরিষা, নারিকেল, মহুয়া প্রভৃতির খৈল আবার গবাদির পুষ্টিকর খাদ্য। তৈল বীজ ও খৈল রপ্তানি হেতু গবাদি প্রতিপালনও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চাষীরা জলাভূমির ধানের লম্বা গোড়া (যাহাকে স্থানীয় চাষীরা নাড়া বলে) গুলি ক্ষেতেই পুড়াইয়া ও পচাইয়া জমিটিকে সারবান করিবার চেষ্টা করে। জ্বালানী কাষ্ঠাদির অভাবশতঃ কৃষগণ নাড়া, তৃণ, খড় পাতা পর্য্যন্ত খাদ্যাদি পাকের জন্য পুড়াইয়া ফেলিতেছে সুতরাং অতর্কিত ভাবে জমির সারের অপব্যবহার হইতেছে। এই শঙ্কটের প্রতিবিধান কি? অনেকেই খণিজ, রাসায়নিক বা কৃত্রিম সারের ব্যবস্থা দিয়া বসিবেন কেহ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারের পরামর্শ দিবেন। তাহাই বা সস্তায় মিলে কৈ? হাড়ের গুঁড়া বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, হাড়ের গুঁড়ার মণ ৩৲।৪৲ টাকার কম নহে। তাহা লইয়া যাইবার মাশুল আছে—চাষীর ক্ষেতে ১মণ হাড়ের গুঁড়া ৫৲।৬৲ টাকার কমে পৌছে না। তখন দেশের হাড় দেশের গো-ভাগাড়ে গো-ভাগাড়ে পড়িয়া থাকিত এবং সেই সকল হাড় ধোয়া জল ইতস্ততঃ চারি পার্শ্বের নিম্ন জমিতে যাইয়া অলক্ষ্যে জমির উর্ব্বরতা সাধন করিত। চাষীরা কোন গাছ অফলা হইলে তাহার গোড়ায় হাড় পুতিয়া দিত বা তাহার গায়ে দুই চারি খানা হাড় বাঁধিয়া দিত কিম্বা শস্য ক্ষেতে পয়নালীতে হাড়ের টুকরা ফেলিয়া রাখিত। এখন সুদূর পল্লীভূমিতেও এক টুকরা হাড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কতকগুলি ধনী ব্যবসায়ী আসিয়া এই সকল জঞ্জাল ঘটাইতেছে, তাহাদের পয়সা রোজগার লইয়া কথা, দরিদ্র কৃষকের অভাবের দিকে তাহারা তাকাইবে কেন? অবাধ বাণিজ্যের গতি যখন রোধ হইবার নহে, তখন দরিদ্রের অনুযোগ শুনিবেই বা কে? তাহাদের গাই বলদ লইয়া নির্ব্বেঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অবসর নাই তাহারা দরিদ্র এবং সহজে ব্যবসায়ীর প্রোলোভনে মুগ্ধ সুতরাং অনায়াসে তাহাদের মুখের

গ্রাস এমন কি খোসা ভুসী, খুঁদ কুড়া খৈল, ভাগাড়ে পতিত মৃত গবাদির হাড় চামড়া শিঙ, ক্ষুর সবই চলিয়া যাইতেছে। তাহারা এখন করে কি! আত্মরক্ষার জন্য কোন একটা পথ অবলম্বন না করিলে উপায় নাই। প্রত্যেক কৃষক যেন ছাইগুলি অযত্নে ফেলিয়া না দেয়। ছাই হইতে সে পটাস সার পাইবে। নাইট্রোজেন সারের জন্য গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত পুকুরে ও খাল বিলের পাঁক মাটির উপর নির্ভর করিতে হইবে। ক্ষেত খামারের চারি পার্শ্বের পগারের পলি মাটিতেও উদ্ভিদের খাদ্য বিদ্যমান আছে, সেই মাটি তুলিয়া ক্ষেতে ছড়াইলে সে কথঞ্চিৎ কাজ পাইবে।

চাউল ধোয়া জল, মাছ ধোয়া জল, সম্ভব হইলে পচা মাছ শস্য ক্ষেত্রে দিবার জন্য যেন সে সঞ্চয় করিয়া রাখে। গোমুত্রের অপব্যবহার যেন না হয়। ছাই মাটির সহিত গবাদিরমুত্র সংগ্রহ করিয়া যেন ক্ষেতে দেওয়া হয়।

পুকুরের পানা ও নদী কিম্বা খাল বিল সমুদ্রজাত জলজ উদ্ভিদগুলির যেন হতাদর না হয়। সযত্নে সেগুলি আনিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় এবং ক্ষেত পাথারে দিতে পারিলে উপকার দর্শিবে।

শণ, ধঞ্চে, বরবটী বুনিয়া শস্য ক্ষেতের তেজ বৃদ্ধির সুবিধা পাইলে সে যেন সে সুবিধা কদাপি অবহেলা না করে।

দেশে আজ কাল যে কোন কাজ কর্ম্মে কার্ব্বাইড জলে। কার্ব্বাইড অব কালসিয়মে জল প্রযুক্ত হইলে তাহাতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা উত্তম আলোক প্রজ্জ্বলিত করা যায়। গ্যাস উবিয়া গেলে চুণ পদার্থ পড়িয়া থাকে। ইহা উত্তম চুণ প্রধান সার। সেগুলি আজকাল অযত্নে ফেলিয়া দেওয়া হয়। মনে রাখিও ইহা উৎকৃষ্ট চুন প্রধান সার প্রায় জীপসমের সমতুল্য। যতদিন পারা যায় সুবিধা মত ইহা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্য মল ও মুত্র নাইট্রোজেন প্রধান মহা মূল্যবান সার। ছাই ও চুণ সংযোগে ইহার গন্ধ বিদুরীত হইতে পারে। জাপানের শস্য ও সব্জী ক্ষেতে ইহার প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ চিঙড়িঘাটার ধাপা ক্ষেতের কপি প্রভৃতি শাক সব্জী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বিস্মিত হইও না—মনুষ্য মল মুত্রের তরল সারের সেচ না পাইলে এরূপ শাক সব্জী জন্মান অসম্ভব। তোমার শুভাদৃষ্ট যে আজিও কোন ব্যবসায়ী এদিকে লক্ষ্য করেন নাই। কোন দিন দেখিবে যে এই মলমুত্রের বড় বড় চাপ খৈল প্রস্তুত হইয়া ইতঃস্তত রপ্তানি হইতেছে। যতদিন না হয় তুমি এগুলি সংগ্রহের চেষ্টা কর। একটু রূপান্তরিত করিয়া লইলে ইহা তোমার ব্যবহার-উপযোগী হইবে। শুচি, অশুচি নানা কথা তুলিয়া জঞ্জাল বাড়াইও না। হাড়ের গুঁড়া তুমি অনায়াসে ব্যবহার করিতে পার, মাছ পচায় তোমার আপত্য নাই, জন্তু জানোয়ারের অস্থি, মজ্জা, বসায় হাত দিতে

তোমার কুণ্ঠা নাই, ইহার ব্যবহার কালে তুমি নাসিকা কুঞ্চিত করিবে কেন? এখন হাতের কাছে পাইয়া অবহেলা করিতেছ কিন্তু কোন দিন তুমি কোন বিলাতী কোম্পানির ছাপ দেওয়া মনুষ্য মলমুত্রজ থৈল লইয়া আসিয়া পরম পবিত্র বোধে দুই হাতে গুঁড়াইয়া ব্যবহার করিবে।

কোনটাইত তুমি তোমার নিজস্ব বলিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। পরে তোমার ঘরের জিনিষের খোঁজ রাখিতেছে। তাহারা তোমাকে তোমার সুবিধা বুঝাইয়া দিতে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ষোল অনা সুবিধা করিয়া লইবে। তোমার জিনিষের তুমি নিজে সদ্ ব্যবহার করিবে না বা তাহা আগলাইয়া গুছাইয়া রক্ষা করিতে এবং পরকে তোমার হাত তোলার উপর রাখিতে পারিবে না, কারণ তুমি যে অলস, তুমি গৃহী হইয়াও উদাসীন!

বোরো ধান্য

বোরো ধান্য সর্ব্বত্রই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধান্য প্রায় বারমাসই জন্মিয়া থাকে। ইহা অন্যান্য সকল ধান্য হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। বোরো ধান্য দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কচিৎ শ্বেতবর্ণও লক্ষিত হয়। কিন্তু শ্বেত, কৃষ্ণ, পৃথক জাতি বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণবর্ণ ধান্য কোন কারণ বশতঃ ঈষৎ শ্বেতাভ হইয়া যায়। একটি শীষে শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণের ধান্যই দেখা গিয়াছে।

বোরোর গাছ কিঞ্চিৎ চিকণ; তাহা দুই হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার চাউল প্রায় আশু ধান্যের তুল্য, কিন্তু ভাত উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বোরো ধান্যের অন্ন একটু খস্‌খসে ও মিষ্ট কম। কিন্তু ইহার সদৃশ ফলন কোন ধান্যেরই নহে। ইহা সচরাচর বিঘায় ষোল মণ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। এই ধান্যের আবাদ দ্বিবিধ প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা, রোয়া ও বুনানি।

রোপিত বোরো—বিলগর্ত্তে ও পুষ্করিণী গর্ত্তে যে পঙ্কিল ভূমি থাকে, তথায় রোপিত বোরো উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে ও অন্য কোন মৃত্তিকায় রোয়া বোরো জন্মে না। ইহার রোপণ প্রক্রিয়া আমনেরই তুল্য। প্রভেদের মধ্যে আমনের গুছি অপেক্ষা বোরোর গুছি কিঞ্চিৎ ঘণ করিয়া বসাইতে হয়। প্রত্যেক গুছি প্রায় অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে

প্রোথিত করা হইয়া থাকে। আমনের গুছিতে একটি বা দুইটির অধিক গাছ থাকে না; কিন্তু বোরোর গুছিতে চারি পাঁচটি পর্য্যন্ত গাছ দেওয়া হয়। বোরো ধান্যের ক্ষেত্র কর্দ্দমময়, তথাপিও বোরোর প্রকৃতিগুণে পঙ্কোপরে কিয়ৎ পরিমাণে জল বদ্ধ থাকা আবশ্যক করে।

বীজ প্রস্তুত প্রণালী—একটি কলসের মধ্যে বীজ পুরিয়া তাহাতে জল পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। অষ্ট প্রহরের পর কলসের মুখে বস্ত্র বা তৃণগুচ্ছের আবরণ দিয়া, কলসটি উল্‌টাইয়া দিলে ক্রমে সমুদয় জল নিষ্কাশিত হইয়া যায়। তদনন্তর কোনস্থানে কতকগুলি শুষ্ক তৃণ বা পোয়াল বিছাইয়া তাহার উপর কদলী পত্র বা মান পত্র পাতিয়া ঐ পত্রোপরি তিন বুরুল পরিমিত উচ্চ করিয়া বীজগুলি পাত দিতে হয়। পুনর্ব্বার ধান্যোপরি কদলী পত্রের আচ্ছাদন দিয়া একটা চটের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠে কিন্তু প্রত্যহ বীজের উপরিস্থিত আচ্ছাদন সকল উঠাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করিতে হয়। জল সিঞ্চনের পর আবার পূর্ব্ববৎ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

উক্তরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বীজের অঙ্কুর সকল ক্রমশ দেড় ইঞ্চ দুই ইঞ্চ লম্বা হইয়া উঠিলে তাহাকে "তুলামুখি" বলে। তুলামুখি বীজ পরস্পর শিকড়ে শিকড়ে সংযোজিত হইয়া থাকে। সাবধানতা পূর্ব্বক জড়িত অঙ্কুর সমুদয় ছাড়াইয়া বীজ পৃথক করিতে হয়। তাহার পর জলাশয়ের নিকটস্থ (পূর্ব্বের পাইট করা) কর্দ্দমময় ক্ষেত্রে বপন করিলে চারি পাঁচ দিনের পরে গাছ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু যে অবধি ধান্যের চারা চারি পাঁচ অঙ্গুলি উচ্চ না হইয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত বীজতলায় জল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্রমে চারা বা বাওয়ালি সকল একটু উচ্চ ও পত্রবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে, তখন বীজতালা সর্ব্বদা জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়।

কোন কোন বিলের উভয় তীরে অনেক উৎস বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। বোরো ধান্যের বীজতালা সেই সকল উৎসের নিকটেই প্রায় মনোনীত হইয়া থাকে। উৎসের একটি দাঁড়া বীজতালার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলে বীজতলা সর্ব্বদা জলপূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে, এবং পুনঃ পুনঃ জল পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন জলে বীজের যথেষ্ট তেজ বৃদ্ধি করে। উৎসের জলযুক্ত বীজতালায় বোরোর বীজ অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। কিন্তু এরূপ সুবিধা সর্ব্বদা ঘটে না।

যথায় উৎসের অভাব হয়, তথায় এরূপ কৌশলে বীজতালা প্রস্তুত করিতে পারা যায় যে, নিকটস্থ জলাশয়ের জল আনিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া রাখে। যে কৌশল অতি সহজ। যে স্থানে বীজতালা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই স্থানের মাটী উঠাইয়া নিকটস্থ জলসীমা হইতে স্থানটী কিঞ্চিৎ নিম্ন করিয়া জলের দিকে একটি বাঁধ দিয়া রাখিতে হয়।

প্রয়োজন মতে বাঁধটি কাটিয়া দিলে আপনাপনি জল আসিয়া বীজতালা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে স্থানে উৎস নাই এবং এরূপ কার্য্যগুলা ঘটে, তথায় অগত্যা সেচনের দ্বারা বীজতালা জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। বীজতালায় জল বদ্ধ হইয়া না থাকিলে বোরোর বীজ ভালরূপ অঙ্কুরিত হয় না।

বীজ আধ হাত আড়াই পোয়া উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারা যায়। রোয়ার বীজ প্রতি বিঘায় /৬ ছয় সের হারে পাত দিবার (১) নিয়ম আছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ তিন মাসের মধ্যে সময়ে সময়ে বোরোর বীজ পাত দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসে তাহা রোপণ করা হইয়া থাকে। পৌষের বোরো চৈত্রে, মাঘের বোরো বৈশাখে ও ফাল্গুনের বোরো জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া উঠে। প্রদেশ বিশেষে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বোরো রোপণ হইয়া থাকে। আবাদের নিয়ম রোয়া আমনেরই মত।

বুনানি বোরো—রোপিত বোরোর বীজ লইয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আশুধান্যের রীতি ক্রমে অল্প গভীর ক্ষেত্র সকলে বুনানী করা হয়, অথবা আমনের মত রোপণ করাও যাইতে পারে। এই উভয় মতেই উত্তমরূপ ধান্য জন্মিয়া থাকে। বুনানি বোরোর আবাদ আশু বা রোয়া আমন ধান্যের রীত্যানুসারে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। বীজ প্রতি বিঘায় বুনানিতে।৬ ষোল সের ও রোয়াতে /৪ চারি সের হিসাবে লাগিয়া থাকে। কিন্তু বোরো ধান্যের ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে জল বদ্ধ থাকা আবশ্যক করে।

কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা মনে করে যে, পঙ্কিল ভূমিতে উৎপন্ন রোপিত বোরোর বীজ হইতে পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভূমিতে রোয়া ধান্য জন্মে না। এই জন্য পঙ্কিল ভূমিস্থ রোপিত বোরো, যাহা চৈত্র বৈশাখ মাসে উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উচ্চ প্রদেশস্থ ক্ষেত্রে বুনানী করা আবশ্যক এবং ঐ ক্ষেত্রের বীজ লইয়া পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভুমিতে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলেই পঙ্কিল ভুমির ধান্যবীজ চৈত্র বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, এবং কার্ত্তিক মাসে তাহা পাত দিয়া পৌষ মাঘ মাসে পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভুমিতেই রোপণ করা হইয়া থাকে। তাহাতে ধান্যোৎপন্নের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।

---

(১) পাত দিবার—বীজ অঙ্কুরিত করিবার।

পত্রাদি

ফল বা সব্জী, খাদ্য সংরক্ষণের উপায় কি ?—

প্রশ্ন—বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি যে লোকের ব্যবসায় প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রায় শতাধিক লোক ফল সংরক্ষণের উপায় জানিতে চাহিতেছেন এবং য়ুরোপ, এমেরিকায়, সংরক্ষিত ফল ও খাদ্যের খরিদ্দার জুটিবে কি না ভাবিতেছেন।

উত্তর—আমরা বহুলোকের চিঠির উত্তর সতন্ত্র না দিয়া কৃষকেই আমাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিতেছি। আগে ফসল উৎপাদনের আয়োজন হউক, তার পর ফল সংরক্ষণের কথা। ফল উৎপাদন করিতে পারিলে এবং তাহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিলে ক্রেতার অভাব হইবে না। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ফলের ব্যবসা চলিবে।

চিনি দ্বারা পাক করিয়া ফল কিম্বা খাদ্যাদি অধিক কাল অবিকৃত রাখা যায় কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয় না। জীবাণু দ্বারা পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং বায়ু সম্পর্কে জীবাণু খাদ্যাদিতে প্রবেশ করে। চিনির রসে কিম্বা মধুতে বহুবিধ জীবাণুর ক্রিয়া কম হয়। বোরিক এসিড, স্যালিসিলিক এসিড, সোডা বেনজয়েট প্রভৃতি রাসয়নিক দ্রব্য সহযোগে ফল ও খাদ্যাদি সহজে ও বোধ হয় স্বল্প ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে খাদ্যের গুণের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। এই সকল নানারূপ বিচার করিয়া আজ কাল ফল, মূল বা খাদ্য কোনমতে হাওয়া সম্পর্ক শূন্য করাই সর্ব্বতোভাবে ভাল বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উত্তাপ দ্বারা বায়ু নিষ্কাষণ করিয়া সম্পূর্ণ বায়ুদ্ধ পাত্রে খাদ্যাদি সংরক্ষণ প্রথারই অধুনা প্রচলিত। ফল বা খাদ্যাদি উত্তপ্ত করিলে তৎসংলগ্ন জীবাণু নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন তাহাদিগকে বায়ু সম্পর্ক শূন্য পাত্রে রাখিলে তাহা আর কোনমতে খারাপ হইতে পায় না।

ফল ও সব্জী রক্ষার কথা আমরা কৃষকে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। আলু রক্ষার নানা প্রকার উপায় আমাদের যতদূর জানা আছে বলিয়া দিয়াছি। আলুগুলি তুঁতের জল দিয়া ধুইয়া পুঁছিয়া সম-শীতল স্থানে বালির স্তরের উপর সাজাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। এত সাবধান হইলেও আলুর অন্তরনিহিত কীড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। আলু কিম্বা মটরশুটি বায়ুবদ্ধ টীনে রাখিলে অবশ্য ঠিক থাকে কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক। যাহাতে খরচ অধিক, ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেখিলে তাহা কাজের মত নয় বলিয়াই মনে হইবে। অসময়ের জন্য রাখিলে বা বিদেশে পাঠাইলে লাভ হইবে বটে কিন্তু খরচ বাদে তাবত লাভ।

শীতল অবস্থায় অনেক জীবাণুর ক্রিয়া হয় না, কতকগুলি জীবাণু ঠাণ্ডায় মরিয়া যায়। এই কারণে দুধ, মাছ, ফল, পিষ্টক, সন্দেশাদি বরফ গুদামে বা বরফ সংযোগে দীর্ঘকাল

অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যায়। কলিকাতা সহরে সন্দেশের খুব বড় কারবার চলে। ছানা চিনিতে পাক করিয়া সন্দেশ হয়। চিনির যদি সংরক্ষণ শক্তি থাকিত তাহা হইলে সন্দেশ কোন কালে খারাপ হইত না। তাহা না থাকুক্ অধিক চিনি সংযোগে ছানার খাসা কিছু দিন ঠিক থাকিতে পারে এবং বায়ুবদ্ধ টীনে রাখিলে ইহা ত ঠিক থাকিবেই। সময় সময় সন্দেশের দাম ৮০৲, ১০০৲, ও ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ হয়। কৌশল করিয়া ছানার খাসা রাখিতে পারিলে ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

যে কোন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে রসায়ন তত্ত্ববিদের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। চাষী, ব্যবসায়ী মাত্রেই যে রসায়ন্ তত্ত্ববিদ হইবে এমন আশা করা যায় না এবং এমন কখন হয় না।

রসায়ন তত্ত্ববিদ ও চাষী বা ব্যবসায়ী একত্রে কার্য্য করিবেন এই নিয়ম। এই নিয়মে কার্য্য হইলে চাষের উন্নতি, ব্যবসায়ের উন্নতি নিশ্চিত।

মার্ব্বেল পাথরের কুচি—

থাকুর কোম্পানি (চুণার) আমাদিগকে জানাইতেছেন যে তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট নানা রঙের মার্ব্বেলের কুচি পাওয়া যায়। এইগুলি ফ্লাওয়ার বেডের, ফোয়ারা বা উদ্যান মধ্যস্থ পুতুল স্তম্ভের চারিদিকে সাজাইয়া দিবার উপযুক্ত। ফুলের টব বা ভাসের চতুঃপার্শ্বেও দেওয়া চলে। কৃত্রিম পাহাড়ের ঝরণা তৈয়ারী করিতে এই রূপ পাথর কুচির বিশেষ প্রয়োজন হয়। উক্ত কোম্পানি টাকায় এক মণ পাথরের কুচি সরবরাহ করিতেছেন, আবশ্যক হইলে আমরা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

পেঁপে গাছ পুরুষ ও স্ত্রী—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদারী কাছারী, সাউথ
মোহনপুর, পোঃ ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে পেঁপের দানা রোপন করিলেই পুরুষ পেঁপের গাছ বেশীর ভাগ হয়, কি উপায়ে স্ত্রী পেঁপের গাছ পাওয়া যাইতে পারে?

উত্তর—পেঁপে বীজ চারাইলে তাহা হইতে কতগুলি স্ত্রী বৃক্ষ এবং কতগুলি পুং বৃক্ষ জন্মিবে তাঁহা স্থির করা কঠিন। এক্ষেত্রে দৈবের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে পেঁপের আবাদের মধ্যে উপযুক্ত পুং বৃক্ষ না থাকিলে স্ত্রী পেঁপের ফুলগুলিতে যথোপযুক্ত পরাগ সংযোগ হয় না এবং বীজও নিয়মিত পুষ্ট হয়

না সুতরাং ঐ সমুদয় বীজ হইতে প্রায়ই গাছ হয় না বা গাছ জন্মিলেও সব গাছ স্ত্রী গাছে পরিণত হইতে পারে না অধিকাংশ পুং গাছই জন্মিয়া থাকে।

পটল শুকাইয়া লাল হইয়া যায় কেন ?—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদারী কাছারী, সাউথ
মোহনপুর পোঃ ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—পটলের ক্ষেত্রে গাছগুলি বেশ সতেজ আবস্থায় অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার ছোট ছোট পটলগুলি শুকাইয়া লাল হইয়া যায় ইহার কারণ কি ? জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বৃষ্টির সময়ও ঐ রকম ছোট ছোট পটলগুলি শুকাইয়া লাল হইয়া যায় কি উপায়ে উহা নিবারিত হইতে পারে ? অধিকাংশ পটল ঐ রকমে নষ্ট হইয়া যায়। এখন হইতে ঐ রকম লাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

উত্তর—পটল ক্ষেতের মাটি গরম হইলে কচি পটল লাল হইয়া শুকাইয়া যায়। এই জন্য পটলের যাদা পোয়ালের বা কুটি দ্বারা ঢাকিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্ষেতে জল বসিলেও পটল ঐ প্রকারে নষ্ট হইতে পারে। পটল ক্ষেতের জল নিকাশ প্রণালীগুলি ভালরূপ হওয়া আবশ্যক। পোকা লাগিলে পটল নষ্ট হয়। পোকা নিবারনের নানাপ্রকার কৌশল "ফসলের পোকা নামক" পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। কীট নিবারক আরোক ছিটাইলে পোকা নিবারণ হইতে পারে। আরক ভারতীয় কৃষি-সমিতি আফিসে পাইবেন।

ফুটি কাঁকুড় গাছে পোকা—

প্রশ্ন—বিলাতি কুমড়া, ফুটি ও খরমুজা গাছ একটু বাহির হইলেই একরকম লাল ছোট পোকা গাছগুলি পাতা সমেত খাইয়া ফেলে, কি উপায়ে গাছগুলি উক্ত পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে পারে ?

উত্তর—লাউ, কুমড়া, ফুটি তরমুজের পোকা সম্বন্ধে ফসলের পোকা পুস্তকে দেখুন। কীট নিবারক আরক লইয়াও পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়াই আমাদের বোধ হয়।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

—•:•—

কলিমপঙে ধানের পরীক্ষা—হেকটর সাহেবের নির্ব্বাচিত ইন্দ্রশালি ধান্য পরীক্ষায় এখানে ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে এই ধান্যটির বহুবার পরীক্ষা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে ইহার ফলন বিঘায় ১০ মণের কম হয় নাই। শিলঙে বর্ত্তমান পরীক্ষায় একরে গড়ে ৩২॥০ সাড়ে বত্রিশ মণ দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ বিঘায় প্রায় ১১ মণ। এখন স্থানীয় চেরাবালি ধান একরে ৩৩৮৬ তেত্রিস মণ ছত্রিশ সের ফলিয়াছে।

হেকটর সাহেবের নির্ব্বাচিত লম্বা চিকণ, কেন্দুলি নামে আরও দুইটি ধান আছে।

জোড়হাটে ইক্ষু চাষের পরীক্ষা—এইখানে ডোরাকাটা মরিসস্ ইক্ষুর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যাইতেছে। এক একরে ৮০০ মণ পর্য্যন্ত ইক্ষু এবং নিষ্পেষিত করিয়া ৫০/০ মণ রস উৎপন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ইক্ষুর মধ্যে গাণ্ডারি, খেড়ী ও টানায় ফলন মন্দ নহে। একর প্রতি গাণ্ডারি ৩০০ মণ, খেড়ী ৬৫৭ মণ, টানা ৪১০ মণ পরিমাণ জন্মিয়াছিল।

কাঠ কয়লায় ছাই—আসামের জোড়হাট ক্ষেত্রে পরিক্ষা হইয়া দেখা যায় যে নিস্তেজ জমিকে সতেজ করিতে গেলে জমিতে সারের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ চূণ দিবার প্রয়োজন হয়। চূণ প্রদানে জমির আগাছা কুগাছাও কতক পরিমাণে নষ্ট হয়। ছাই প্রদান করিলেও চূণ দিবার মত কাজ হয়—চুণের দাম অধিক কিন্তু ছাই অনায়াসে বিনা খরচে সংগ্রহ হইতে পারে। চূণ অধিক দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিন্তু ছাই বিঘাতে ২।৩ মণ দিলেও কোন ক্ষতি নাই।

খেজুর বা তাল চিনির ব্যবসায়ের উন্নতি

শ্রীযুত এচ, ই, এনেট, বি, এসি, এফ্ আই, সি,

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কৃষি-রসায়নবিদ লিখিত।

পুষা কৃষি জর্ণালে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। অত্র প্রবন্ধ তাহার সঙ্কলন মাত্র। ভারতবর্ষে বৎসরে মোটে প্রায় ৩০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে খেজুর জাতীয় চিনির পরিমাণ ৩ লক্ষ মণ মাত্র। বাঙলা দেশে খেজুর জাতীয় গুড়ের পরিমাণ ১ লক্ষ টন মাত্র। ইহার দাম ৮ লক্ষ টাকার কম হইবে না। এত বড় একটা

কারবারের উন্নতি সাধন হইতে পারে কি না দেখা উচিত। যশহরে খেজুর গুড়ের কারবার অধিক। এই যশহর কেন্দ্রের উপরই এনেট সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে।

তিনি যশহরের খেজুর বাগানগুলির নিকটবর্ত্তী ময়দানেই অস্থায়ী ভাবে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া গুড় চিনির ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

খেজুর বা তালের রস গাঁজিয়া বা টকিয়া গিয়া অনেক সময় রসের চিনির ভাগ নষ্ট হয়। খেঁজুর বা তালের রসে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু শর্করা বিদ্যমান আছে, অন্যান্য শর্করাভাগ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। খেঁজুর বা তালের রসে ইষ্ট বা অন্য জীবাণু থাকিতে দেখা যায়। তাহারা শর্করাভাগ দ্বারা জীবন ধারণ করে। ঐ সকল জীবাণু ইক্ষু শর্করাকে অন্যবিধ শর্করায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। এই প্রকারে পরিবর্ত্তন ঘটিলে সে শর্করার দানা বাঁধে না। রস এই রূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলেই গাঁজিয়া যায় ও রস ক্রমশঃ সুরাসারে পরিণত হয়। যাহারা রস হইতে তাড়ি প্রস্তুত করে তাহাদের ইহাতে সুবিধা হয়, কিন্তু ইহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে শর্করা পাইতে হইলে রসের জীবাণুগুলি ধ্বংস করিতে পারিলে ভাল হয়। স্থানীয় চাষীরা জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য রসের ভাঁড়গুলির অন্তর ভাগ ধোঁয়া দ্বারা শোধিত করিয়া লয়। ইহাতে উপকার হয় বটে কিন্তু গাছে ভাঁড় পাতিবার পূর্ব্বে যদি ভাঁড়গুলি চূণের জলে ধৌত করিয়া লওয়া যায় তবে আরও ভাল হয়। শীতকাল অপেক্ষা মরসুমের শেষভাগে গরম পড়িলে রস অতি শীঘ্র গাঁজিয়া যায়। সেই সময় ভাঁড়গুলি চুণের জল দ্বারা ধৌত করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। চূণ দ্বারা জীবাণুগুলি নষ্ট হয় এবং রসের শর্করা ভাগ সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজের আবগারী বিভাগে শর্করা জন্য রস সংগ্রহ কালে ভাঁড়ে চূণ দিবার জন্য চাষীগণকে বাধ্য করিয়া থাকেন। যে কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। এই রূপ কড়া নিয়ম মান্দ্রাজে চলে বলিয়া রাত্র কিম্বা দিবাভাগে যে কোন সময় রস সংগ্রহ হউক না কেন তাহা হইতে শর্করা উৎপাদন করা যায়। বাঙলা দেশের চাষীরা দিবা ভাগের রস বৃথা নষ্ট হইতে দেয়। উহা গাছ বাহিয়া পড়িয়া নষ্ট হয়। তাহারা দেখিতে পায় যে দিবা ভাগের রস গরমে সত্বরেই গাঁজিয়া উঠে এবং তাহা হইতে ভাল গুড় উৎপন্ন করা যায় না। যে সকল গাছ হইতে বেশী বেশী রস ঝরে সেই সকল গাছের রস চাষীরা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় গুড়, অথবা চিটা গুড় তৈয়ারি করিয়া থাকে।

চূণ ব্যবহার করিলে রসের এই প্রকার বৃথা অপচয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এনেট সাহেব চূণ প্রয়োগ দ্বারা দিবাভাগের রস রক্ষা এবং তাহা হইতে ভাল গুড় তৈয়ারি করিয়া চাষীদিগকে দেখাইয়াছেন। দিবা ভাগে কম রস নষ্ট হয় না। অনেকগুলি বৃক্ষ হইতে দিবসের ঝরা রস সংগ্রহ করিয়া ও মাপিয়া দেখা হইয়াছে যে রাত্রে যে

পরিমাণ রস পাওয়া যায় দিবসে রস বৃথা ঝরিয়া পড়িয়া প্রায় তাহার একের পঞ্চমাংশ নষ্ট হয়। দিবসের রসে আবার অধিক মাত্র শর্করা পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে দিবসের রস নষ্ট হইতে না দিলে চাষীরা শতকরা ২০ ভাগ অধিক চিনি উৎপন্ন করিতে পারিবে।

চূণ সংযোগে রস অধিকক্ষণ অবিকৃত রাখা যায় এবং অন্যকার সংগৃহিত রস কল্য পর্য্যন্ত জ্বাল দিবার অবসর পাওয়া যায়। ইহা কম সুবিধার কথা নহে, কারণ যদি সমস্ত রস দিবা ভাগের মধ্যে জ্বাল দেওয়া শেষ না হয় তবে সারা রাত জাগিয়া ঐ কার্য্য সমাপন করিতে হইলে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে।

গুড় তৈয়ারির খরচের বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে সাধারণতঃ চাষীরা যে প্রকার চুলাতে (উনান) গুড় জ্বাল দেয় তাহাতে অধিক কাঠ খরচ হয়। এই প্রকার চুলা নির্ম্মানের কোন পারিপাট্য নাই। মাটিতে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার তিন কোণ (ঝিঁক) কথঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া লইলেই চুলা নির্ম্মান হইয়া গেল। এই সকল চুলায় কাঠ অধিক খরচ হয়। এনেট সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে ৬॥ মণ কাঠের কম ১ মণ গুড় তৈয়ারি হয় না। চুলাগুলির উন্নতি করিতে পারিলে কাঠের খরচ কিয়ৎ পরিমাণে কমিতে পারে। যেমন কয়লার উনান প্রস্তুত করে সেইরূপে যদি উনান বা চুলার মধ্যে লোহার শিক দিয়া লইয়া তাহার উপর কাঠ পুড়াইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে চুলার তলদেশে হাওয়া প্রবেশের পথ থাকা হেতু আগুণের খুব জোর হয় এবং অল্প কাঠে অধিক কাজ হয়। এরূপ চুলাতে ৫ মণ কাঠে ১ মণ গুড় তৈয়ারী হইতে পারে। এনেট সাহেব কাঠের মণ ৵১০ পয়সা হিসাবে ধরিয়া দেখিয়াছেন যে সাধারণ চুলাতে এক মণ গুড়ের জন্য যদি ১৲ টাকার কাঠ খরচ হয়, সে ক্ষেত্রে লোহার শিকযুক্ত চুলাতে ৸১০ সাড়ে বার আনার অধিক খরচ হইবে না। মণ করা যাহা কিছু খরচ বাঁচাইতে পারা যায় তাহাই লাভ। লোহার শিক যুক্ত চুলা ব্যতীত কয়লা পুড়াইবার সুবিধা হয় না। কয়লার জ্বালে আরও খরচ কম হয়। ২।৩ মণ কয়লাতেই ১ মণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। কয়লা সুলভ হইলে এতদ্বারা খরচের বিশেষ আনুকূল্য হয়।

মাটির গামলা অপেক্ষা চেপ্টা লোহার কটাহ ব্যবহার করিলে খরচের সাহায্য হয়। মাটির গামলা অপেক্ষা লোহার কটাহ অধিক কাল স্থায়ী এবং ইহাতে অধিক গুড় এক সঙ্গে জ্বাল দেওয়া যায়।

গুড়ের রঙের উপর গুড়ের দাম নির্ভর করে। গুড় যত সোণালী রঙের হইবে ততই লোকে আদর করিয়া খরিদ করে। কালচে রঙের গুড় কম দরে বিক্রয় হয়।

ইক্ষু গুড় অপেক্ষা খেজুর গুড় সাধারণতই কৃষ্ণ বর্ণ হয়; তাহার কারণ খেজুর গুড় প্রস্তুত জন্য তাদৃশ যত্ন লওয়া হয় না। চূণ প্রয়োগ দ্বারা রসের ক্ষারত্ব নাশ করিয়া সেই

রসে গুড় প্রস্তুত করিলে গুড়ের রঙ ভাল হয়। আমরা দেখিয়াছি যে টাটকা খেজুর রসে স্বভাবতই ক্ষার পদার্থ (Alkaline Substances) বিদ্যমান থাকে।

এই সকল ক্ষার পদার্থ গুড়ের সহিত উত্তপ্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং গুড়ের রঙকেও কাল করিয়া তুলে। ক্ষারত্ব নাশ করিতে হইলে রস জ্বালে চড়াইবার পূর্ব্বে তাহাতে অম্লাত্মক দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। সাইট্রিক, সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ফট্‌কিরি, তেতুল, লেবুর রস ব্যবহারে ক্ষারত্ব নষ্ট হইতে পারে এবং এবম্প্রকারে ক্ষারত্ব নষ্ট হইলে গুড়ের রঙ ভাল হইবে।

গুড় হইতে স্বদেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত প্রণালী—গুড় হইতে স্বদেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত প্রণালী। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। ঝুড়িতে গুড় ঢালিয়া দিয়া ও সেই গুড় পাটা শেওলা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। মাত গুড় তলায় ঝরিয়া পড়ে। এইরূপে প্রস্তুত চিনিকে আখড়া চিনি বলে। ঝুড়ির উপর পাটা শেওলা চাপাইয়া দিলে উপরি স্তর ক্রমশঃ শাদা হয় ও দানা বাঁধিয়া চিনিতে পরিণত হয়। উপরের শর্করাভাগ চাঁচিয়া পৃথক করিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। ঝুড়ীতে আবার পাটা শেওলা দেওয়া হয় এবং আবার কয়েক দিন পরে উপরি স্তর চাঁচিয়া লওয়া যায়। এই প্রকার প্রথায় অতিশয় সময় নষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক মাল তৈয়ারি করিতে না পারিলে ব্যবসায় তাদৃশ লাভ হওয়া কঠিন।

ঘুরাণ যন্ত্রের (Centrifugal cup) সাহায্যে গুড় হইতে অতি শিঘ্র ও অতি সহজে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

এই যন্ত্রটি খুব সাদাসিধা, একটি ধাতু পাত্রের মধ্যে আর একটি ধাতু পাত্র বসান থাকে। প্রথম পাত্রটি স্থির থাকে, ভিতরের পাত্রটি অতি বেগে ঘুরিতে থাকে। মিনিটে হাজার, বারশত পাক ঘুরে। এই পাত্রটি বহু ছিদ্র বিশিষ্ট। ঘুরিবার কালে এই পাত্র হইতে মাত গুড় বাহির হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় পাত্রে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতে ছিদ্র মুখে অন্য পাত্রে সঞ্চিত হয়। মাতভাগ বাহির হইয়া আসিলেই চিনির ভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম পাত্রে পড়িয়া থাকে এবং হাওয়া লাগিয়া চিনি শাদা হয়। স্বদেশী প্রথায় কিছু পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করিতে যেখানে ৩ সপ্তাহ কাটিয়া যায়, ঘুরাণ যন্ত্র সাহায্যে সেই পরিমাণ চিনি ২০ হইতে ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। চিনির কারখানার মালিকগণ অনেকে বলেন যে এই যন্ত্র দ্বারা তাদৃশ সুবিধা হয় না। ইহা কিন্তু ভুল ধারণা। তারপুর চিনির কারখানায় ইহা দ্বারা ফল বেশ ভাল হইয়াছে।

চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি—ইহাও দেখা যাইতেছে যে চাষীরা যে প্রথায় গুড় তৈয়ারি করে তাহাতে ২ মণ ১৭ সের গুড়ে ৩১ সের মাত্র চিনি উৎপন্ন হয়। রস চূণ দ্বারা পরিশোধিত হইলে এবং ভাল প্রকার গুড় তৈয়ারি হইলে উৎপন্ন চিনির মাত্রা বাড়িয়া

যায়—১ মণ গুড়ে ২৩॥ সাড়ে তৈইশ সের চিনি উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে বেশ সপ্রমাণ হইতেছে যে চূণ প্রয়োগ দ্বারা এই রূপ লাভ দর্শিতেছে। চূণ প্রয়োগের আর একটু বিশেষত্ব এই যে রস চূণ দ্বারা শোধিত হইলে তাহাতে যে গুড় উৎপন্ন হয় তাহার রঙ ভাল হয় এবং উৎপন্ন চিনি অপেক্ষাকৃত শুভ্র হয় এবং ইহার মাত লইয়া পুনরায় জাল দিয়া আর এক প্রস্থ কিয়ৎ পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

খেঁজুর বা তালের চিনি ও গুড় সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও উন্নতির চেষ্টার জন্য আমরা এনেট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। পাম চিনির ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর আবশ্যক হইলে তাঁহার নিকট হইতে জানা যাইতে পারিবে। তিনি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কৃষি-রসায়ন তত্ত্ববিদ। যে কোন ব্যবসায়ের সহিত রাসায়নিক তত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা না থাকিলে কোন ব্যবসায়ই উন্নতি লাভ করে না।

মিঠা জলের কচ্ছপের বিষয় অনুসন্ধান—এই বৎসর শ্রীযুক্ত ডেপুটী ডিরেক্টর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বি, দাস ফিসারি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কচ্ছপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে বাখরগঞ্জ, খুলনা এবং ফরিদপুর জেলায় এই সকল কচ্ছপের কারবার হইয়া থাকে। বিহারে, রাজমহলে কচ্ছপের কারবার হইয়া থাকে। কিন্তু কত পরিমাণে কচ্ছপ বৎসরে ধরা হয় কত লোক এবং নৌকা ইহাতে নিযুক্ত থাকে এবং কত টাকায় এই কারবার চলে এই বিষয় সঠিক খবর পাওয়া এক রকম অসম্ভব হইয়াছিল।

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে বৎসরে ৭০,০০০ হাজারের কম কচ্ছপ ধরা হয় না এবং ইহার পাইকারি দাম ৪২,০০০ টাকা হইবে এবং খুচরা দাম উহার দ্বিগুণ হইবে।

যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে কচ্ছপ সকলকে রেলে লইয়া যাওয়া হইত তাহাতে যাবতীয় রেল সম্প্রদায় কচ্ছপ আর রেলে লইয়া যাইবেন না বলিয়া ১৯১৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণে কচ্ছপের কারবার অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতার আমদানি বিষয়ে অনেক হ্রাস হইয়াছে। কলিকাতার চীনেরা কয়েক রকমের কচ্ছপ খাইয়া থাকে এবং হিন্দুদের মধ্যে ইহা সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত কিন্তু মুসলমানদের যদিও কচ্ছপ খাইতে কোন বিশেষ বারণ নাই তথাপি শাফী মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ই ইহা খায় না।

কচ্ছপ এবং কাঠুয়া বাঙ্গালাদেশে মাছের মত কমিয়া যাইতেছে না। এই ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে কেবলমাত্র কোন উপায়ে ইহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার উপায় করিতে হইবে, এবং সেই উপায়ে যেন ইহাদিগের অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নিষ্ঠুরতা না করা হয়।

মাছের আমদানী—মৎস্যবিভাগ প্রথমে মাছের আমদানী রপ্তানি বিষয়ে ১৯১৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক হিসাব সংগ্রহ করিয়া ৪নং বুলেটিনে প্রকাশ করিয়াছে। এ বৎসরে ঐ প্রকার ১৯১৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মাছ আমদানীর হিসাব সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে কলিকাতায় রেল এবং খালের পথে যত মাছ আইসে তাহার সংখ্যা কম হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪০০০০ মণ কমিয়াছে। ১৯১৩ সালে সর্ব্বসমেত ২০৩৯২৯ মণ ছিল এবং ১৯১৪ সালে তাহার স্থানে ১৬৩৬১৩ মণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান হইয়াছে যে এই মাছ, ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের মৎস্য পরিমাণ অপেক্ষা কত কম।

	লোকসংখ্যা।	এক বৎসরে কত মাছ পাওয়া যায়।	মূল্য ষ্টারলিং পাউণ্ড।	এক বৎসরে প্রত্যেক লোকের জন্য কত মাছ যোগান হয়।
ইংলণ্ডে এবং ওয়েলস	৩৫০০০০০০	২১৯৬৬৭২০ মণ	১০০০৯৯১	॥৫ সের
কলিকাতা	৯০০০০০	১৬৩৬১৩ মণ	১০৯০৭৫	/৭॥০ সের

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকে যত মাছ পায় কলিকাতার লোকে তাহার সাড়ে তিন ভাগের একভাগ পাইয়া থাকে।

১৯১৫ সালের মাছ আমদানী সম্বন্ধে হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এ বৎসর আমদানী মাছ আরও কমিয়া গিয়াছে।

আমরা এই মাছ আমদানী বিষয়ে গত ১০ বৎসরের হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছি। ১৯০৫ সালে খালের পথ দিয়া কলিকাতায় আমদানী মাছ ৫৩০৪০ মণ ছিল এবং ১৯১৫ সালে ঐ আমদানী ৪১০০০ মণ হইয়াছে। সমস্ত খালপথ দিয়া কলিকাতায় মাছ আমদানী রপ্তানি ১৯০৬ সালে ১৪১৫২২ মণ ছিল এবং ১৯১৫ সালে ঐ জায়গায় কেবল ৫২২৬৪ মণ হইয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং বোধ হয় মাছ স্থানীয় কারবারে ব্যবহার হইয়া থাকিবে কিম্বা রেলপথ দিয়া চালান দেওয়া হইয়া থাকিবে। কিম্বা মাছের অভাবের জন্যও হইতে পারে এবং অনেক জেলেরা তাহাদের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে তাহার জন্যও হইতে পারে।

মৎস্যের পরিমাণ হ্রাস—এই বিবরণী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই বিভাগের কার্য্যও অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। মাছ প্রচুর পরিমাণে অল্প মূল্যে সরবরাহ করিবার এই প্রদেশে অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন মাছ যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অল্প পাওয়া যাইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমাদের নদী এবং জলপথগুলি যে মাছে পরিপূর্ণ এরূপ বিশ্বাস একেবারেই ভুল। এতৎ প্রদেশের জলাশয়ে মাছের অবনতি অনেকদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এই অবস্থা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি, যথা :—

(১) বহু রকম জল যোগাইবার জন্য আয়োজন করায় অনেক খাল প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সেই জন্য ছোট বড় সমস্ত মাছই ঐ সকল ক্ষুদ্র জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং তথায় ধৃত হয়। মহানদী এবং শোণ নদে যে সকল খাল করা হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল বড় বড় নদীর মাছ বড়ই কমিয়া গিয়াছে এবং একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রদেশের ঐ প্রকার জল বিতরণের আয়োজনের ফলে মৎস্যসম্বন্ধে অনেক ক্ষতি হইয়াছে ; এই স্থানের জমি প্রায়ই নীচু এবং সেইজন্য যে সকল পোনা মাছের ডিম এবং বাচ্ছা নদীতে উৎপন্ন হয় সে সকল প্রায় সমস্তই ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

(২) কোনওরূপ উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ মৎস্যজাতির উন্নতির এবং রক্ষার জন্য কোনওরূপ যত্ন অভাবে মৎস্যসম্বন্ধে বড়ই অনিষ্ট হইয়াছে। নদী এবং জলপথের মাছ বাড়াইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে কোন প্রকার যত্ন কেহই করে নাই, কেবল ক্রমান্বয়ে বহুকাল হইতে মাছ ধরিয়া ব্যবহারই করা হইয়াছে। এজন্য এখন দেখা যাইতেছে কেবল প্রকৃতির উৎপাদিত মাছ আর অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। এই প্রকার অবস্থা ডাক্তার ফ্রান্সিস ডে সাহেব ১৮৭৯ সালে ভবিষ্যৎবাণীরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত সভ্যদেশেই মৎস্যজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন করা হয়। তাহা না হইলে তত্রস্থ মাছ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। মানুষের অপরিমিত মাছ খাইবার লালসা সকল স্থানেই অনিষ্টকর বলিয়া দেখা গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কেবল নদী এবং জলপথের মৎস্যস্বত্ব বিলি করিয়া ইজারা দেওয়া ব্যতীত আর অন্য কিছু করিতে কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিলি বন্দোবস্ত জেলার কলেক্টার মহাশয়ই করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও অন্য কারণে মৎস্যের অবনতি হইয়াছে। এস্থলে সেই সমুদায় বিবরণ পুনরুল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই বোধে সে সকল পরিত্যাগ করা গেল।

কর্ণওয়ালিস সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক নদী এবং জলাশয়ের মৎস্যস্বত্ব অনেক জমিদারীর অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ ঐ সকল মৎস্যস্বত্বের অধিকারীগণ এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্থানে মৎস্যের এবং জেলেদের উন্নতিসাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন। মৎস্যবিভাগের এ বিষয়ে কোনও হাত নাই।

কারণ যাহাই হউক না কেন আমরা মৎস্যের এত হীনাবস্থা করিয়াছি যে ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে যতদিনে এত অনিষ্ট হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা অধি

সময় অবশ্যক। যে সকল অশানুরূপ ফল অন্য অন্য দেশে পাওয়া গিয়াছে জানা উচিত ঐরূপ ফল অনেক খরচায়, বিশেষরূপে শিক্ষিত অনেক লোক অনেক দিন ধরিয়া কার্য্য করার পর পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশে মৎস্যবিভাগ অতি অল্প দিনের। আমাদের কাজ কতদূর বিস্তৃত তাহা বিশেষরূপ অনুভব করিয়াছি। ফল কথা আজ পর্য্যন্ত আমরা কেবল আমাদের কি প্রকারে এবং কত কাজ করিতে হইবে তাহাই বিশেষরূপে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে মনে রাখা উচিত যে আমাদের কার্য্য কতদূর বিস্তৃত এবং কত অল্প ও কিরূপ শিক্ষিত লোক লইয়া আমরা কার্য্য করিতেছি। এক্ষণে আমরা যাহাতে নদীতে এবং জলাশয়ে প্রকৃতরূপে মাছ বাড়াইতে পারা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। এই জন্য প্রধান প্রধান মিঠা জলের মাছ (যেমন রোহিত, কাতলা প্রভৃতি) গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করা হইতেছে। এইরূপ কাজ অত্যন্ত বেশী করিয়া করা উচিত। কিন্তু প্রথমে ঠিক উপায়টি বাহির করিতে হইবে এই বৎসর আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ বিষয় কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আর কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা নদীর এবং পুষ্করিণীর মৎস্য প্রকৃতরূপে পরিবর্দ্ধন করিতে পারিব। এইরূপ কাজ আমরা ইলিশ মাছের জন্যও করিতেছি। ভেট্‌কী এবং তপসি মাছের কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করিতে হইলে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আবশ্যক। এইরূপে মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই মৎস্যের দাম কমিয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত সমবায় সমিতি জেলেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য অন্য অনেক মধ্যস্থ লোক আর থাকিবে না এবং তন্নিবন্ধন জেলেদের অবস্থা অনেক ভাল হইবে।

সমুদ্রের মাছ আনিয়া বাজারে জোগাইলে মাছের পরিমাণ যথার্থরূপ বাড়িয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় সাধারণের এ বিষয়ে কোনরূপ উদ্যমের বড়ই অভাব।

আমাদের নূতন জাহাজের সাহায্যে সুন্দরবনের মৎস্য অনুসন্ধান নিয়মিতরূপে করা হইতেছে কিন্তু এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে অনেক সময় লাগিবে। এই অনুসন্ধানের সহিত ভেট্‌কী এবং তপসি প্রভৃতি মাছের প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে।

আমাদের মৎস্যবিষয়ক অনুসন্ধান যাহা আমরা বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় করিয়াছি যদিও তাহা হইতে কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই তথাপি ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। এখন এই অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে এবং মৎস্যবিভাগ যাহাতে ভাল ভাল খাইবার মাছ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। এখন আমরা নিশ্চয় আশা করিতে পারি যে প্রতি বৎসর আমাদের উদ্যম ক্রমান্বয়ে অধিক সফল ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইবে।

সার সংগ্রহ

চর্ম্ম-সংস্কার—ভাল চামড়ার অভাব হেতু এখন অনেকেই চামড়া সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ভারতে চামড়া কিম্বা সূতার কষ ধরাইবার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। চামড়া সংস্কারের উৎপাদনগুলিও এখানে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। চামড়া সংস্কার পদ্ধতি জানিবার জন্ত কেহ কেহ উৎসুক হইয়াছেন। সকলকে সব বিষয়ের উপদেশ দিই এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে শিল্প সমিতিতে চামড়া সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শিল্প সমিতির প্রবন্ধগুলি বিস্তৃত ভাবে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং কৃষকেও তাহার সার সঙ্কলিত হইয়াছিল। আমরা শ্রীমধুপ্রিয় মালাকার লিখিত শিল্প সমিতির প্রবন্ধটি এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

চর্ম্ম সংস্কারের পূর্ব্বানুষ্ঠান—প্রথমত চামড়া উত্তমরূপে রক্ত ও ধূলিকর্দ্দম শূন্ত করিয়া লইয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। চামড়া বেশ নরম হইলে কয়েকবার জল বদলাইয়া উহা বেশ করিয়া ধৌত করিতে হইবে। লবণরক্ষিত বা টাটকা চামড়া খুব ভাল করিয়া ধুইতে হয়। তৎপরে চুণের হ্রদে ফেলিতে হয়। চুণের চারিটি হ্রদ করিয়া প্রথমটাতে অতি পুরাতন পর পর অপেক্ষাকৃত নূতন নূতন চুণ রাখিতে হয়; চতুর্থ হ্রদে টাটকা চুণ থাকিবে। চামড়া প্রত্যেক হ্রদে ২॥০ দিবস করিয়া রাখিয়া একে একে চারিটাতেই রাখিতে হয়; এই চুণখাওয়ানতে এইরূপে ১০ দিন ব্যয়িত হয়। তৎপরে প্রচলিত উপায়ে চামড়াকে মাংসলোম শূন্ত করিয়া চামড়া Scudding করিতে হয়। চুণখাওয়ানর সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে চুণের তেজে চামড়া ফুলিয়া উঠিবে কিন্তু চামড়া অত্যাধিক খাইয়া যাইবে না। ইহাতে সাবধান না হইলে প্রস্তুত চর্ম্ম উত্তম হইতে পারে না। জুতার তলার জন্ত চামড়া তৈয়ারি করিতে অধিক সতর্কতা আবশুক। Sulphide of Sodium ব্যবহার করিলে অল্প চুণ খাওয়াইলে চলে। উহার ব্যবহার প্রণালী এইরূপ—এক পাউণ্ড (আধ সের) সোডিয়ম সলফাইড যত অল্প পরিমাণ জলে সম্ভব গুলিয়া তাহাতে ৩ হইতে ৮ পাউণ্ড টাটকা জলসংযোগে স্ফুটিত গুঁড়া শামুকের চুণ যোগ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তাহাকে ক্রমে ক্রমে জল মিশ্রিত করিয়া ঘন লেই তৈয়ার করিতে হইবে। এই লেই তিন ঘণ্টা ভিজাইলে চামড়ার মাংসের দিকে মাখাইয়া চামড়া ভাঁজিয়া ঠাণ্ডা স্যাঁতা জায়গায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে লোম সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। তখন সাধারণ উপায়ে চামড়া লোম শূন্ত করিয়া ফেলিতে হয়। লোম শূন্ত করিয়া চামড়া জলে ধুইয়া ফেলিয়া টাটকা চুণের গামলায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে ফুলিয়া উঠে। তখন

তাহাকে Scudding করিতে হয়। তৎপরে চামড়া একেবারে চুণ হীন করিবার জন্য জলে ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া রগড়াইয়া কাচিতে হয়। তৎপরেও যে চুণ লাগিয়া থাকে তাহা ১০০ ভাগ জলে ৭৫ ভাগ lactic acid মিশাইয়া মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া চামড়া ভিজাইয়া দিতে হয়। এই মিশ্রণে ভিজিলে চামড়ার ফুলা কমিয়া যায় এবং স্পর্শে মসৃণ পিচ্ছল বোধ হয়। চামড়া একেবারে চুণহীন হইয়াছে কি না জানিতে হইলে স্থূলাংশ হইতে একটু চামড়া কাটিয়া সেই কাটা চামড়ায় এক ফোঁটা সুরাসারমিশ্রিত phenol phthalein দিলে যদি চামড়াখণ্ড লাল হইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে তখনো তাহাতে চুণ আছে এবং চর্ম্মখণ্ডের বর্ণব্যতিক্রম না ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে উহা চুণ হীন হইয়াছে। প্রত্যেক চর্ম্ম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহা lactic acid solution হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়।

চামড়া জরান—তৎপরে চামড়ার লোমের দিকে আঁশে টান নিবারণের জন্য চামড়ায় যে ফটকিরি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে pickling বা জরান কহে। pickling solution এইরূপ :—চুণহীণ জলশূন্য চামড়ার প্রত্যেক ১০০ পাউণ্ডের জন্য পটাশ ফটকিরি (patash alum) ৬ পাউণ্ড এবং ৪ পাউণ্ড সাধারণ লবণ একটা বড় আবর্ত্তনসম্ভব পিপার মধ্যে রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণ জলে গুলিতে হইবে। এই মিশ্রণ-পিপায় চামড়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পিপা ঘুরাইয়া পাক দিতে হইবে।

ক্রোম ট্যানিঙ যদিও হ্রদে বা গামলায় হইতে পারে, তথাপি ঐরূপ আবর্ত্তন-সম্ভব পিপা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এই পিপা অনেকটা বিলাতী মাখনতোলা কলের প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে ব্যবহৃত পিপার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ফুট এবং চৌড়া ৩ হইতে সাড়ে ৪ ফুট। বর্ত্তমানে উহা কুলি সাহায্যে ঘুরান হয়; পরে কর্ম্ম বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে কলের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। হাতের বলে মিনিটে ২।৩ বারের অধিক পিপা ঘুরান যায় না, কলের সাহায্যে পিপার আয়তন অনুযায়ী মিনিটে ৪ হইতে ৮ বার ঘুরান যাইবে। ট্যানিঙের জন্য অল্পবেগ চলিতে পারে; কিন্তু ধৌত করার ও চুণশূন্য করিতে খুব জোরে পাক দেওয়া দরকার। পিপার মধ্যে শক্ত কাঠের খোঁটা সংলগ্ন করা দরকার তাহাতে পিপার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ফিরিয়া ঘুরিয়া উল্টিয়া যায়। উপরি বর্ণিত সকল প্রক্রিয়ায় এই পিপা কল ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ইহাতে কর্ম্মও সহজ ও সুবিধাজনক হইয়া থাকে।

ক্রোমট্যানিঙ—এই উপায়ে চামড়া তৈয়ারি করিবার, দুইটি প্রণালী আছে; উহা (১) সকৃৎধাবন ও (২) দ্বিধাবন বলা যাইতে পারে। দ্বিধাবন প্রণালীতে চর্ম্ম ভাল হয় এবং অল্প অসতর্কতায়ও চর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ট্যানিঙের জন্য বাজারে বহুবিধ ট্যানিঙ-দ্রব্য বিক্রয় হয়; নানাবিধ রাসায়নিক

দ্রব্য নিয়েয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে কিন্তু সেই সকল প্রস্তুত মিশ্রদ্রব ব্যবহারে প্রতিবারে এক প্রকার চর্ম্ম উৎপাদন করা যায় এবং তাহা নষ্ট হইবারও আশঙ্কা থাকে না। সকল তৈয়ারী মসলার মধ্যে Martin Dennis Chrome Tannage Company of Newark, New Jersey, কৃত Tanolin ও Lepitil, Dollfus and Gausser of Milan কৃত Chromo-Chrome পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। Procter সাহেবের পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠা লিখিত সরল পদ্ধতিতেও ঠিক তুল্য ফল পাওয়া যায়। তাহা এই:—১০ পাউণ্ড ক্রোম এলাম (ফটকিরি) ৪ গ্যালন জলে গুলিয়া ট্যানিঙ-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়। ফটকিরি গুঁড়া করিয়া লইলে মিশ্রণ-কার্য্য শীঘ্র হয়। তৎপরে সাধারণ কাপড়কাচা সোডা ৩ বা সাড়ে তিন পাউণ্ড জলে গুলিয়া ফটকিরির জলে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়। মিশ্রিত হইয়া জলে ফুটিয়া উঠিলে মিশ্রণটিকে বেশ করিয়া নাড়িয়া গুলিয়া লইলেই ক্রোমট্যানিঙের মসলা হইল। সোডা অধিক সংযুক্ত হইলে জলের তলায় থিতানি পড়ে। ইহাতে মূল্যবান মসলা অনর্থক নষ্ট হয়। এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। মান্দ্রাজে Chrome alum ছ আনায় এক পাউণ্ড পাওয়া যায়, এবং সেই মসলায় তিন পাউণ্ড তৈয়ারি চামড়া প্রস্তুত পাওয়া যায়। সোডা এক আনায় এক পাউণ্ড * এবং এক পাউণ্ড সোডায় ১০ পাউণ্ড চামড়া তৈয়ার হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে সাধারণ প্রচলিত বল্কল-কষ প্রণালী হইতে ক্রোমকষ প্রণালী ব্যয়সাধ্য নহে। উপরে ক্রোমদ্রব্য প্রস্তুতের যে ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১০ পাউণ্ড ক্রোম ৪ গ্যালন জলে) তাহাতে ক্রোম শতকরা ২৫ ভাগ থাকে; উহা হইতে জল সংযোগে তরল করিয়া কাজ করিতে হয়। ট্যানিঙ শতকরা একভাগে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ভাগে শেষ করিতে হয়।

ট্যানিঙ পূর্ব্বোল্লিখিত পিপার মধ্যে করিতে হয়। সারি সারি পিপা রাখিয়া প্রথমটিতে অল্প মসলার ট্যানিং-দ্রব্য রাখিয়া ক্রমশ ভাগ বাড়াইতে হয়; এবং ৫০০ হইতে ৬০০ পাউণ্ড চামড়া প্রথম হইতে শেষ পিপা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া লইয়া যাইতে হয়। চামড়ার drawn grain না হয়, এজন্য প্রথম পিপায় ১৫ পাউণ্ড সোডিয়ম্ সলফেট (Sodium Sulphate) যোগ করা উচিত। ট্যানিঙ সম্পন্ন করার সময় চামড়ার স্থূলতার উপর নির্ভর করে। ছাগল ভেড়ার চামড়া কয়েক ঘণ্টায়, গরুর চামড়া এক হইতে তিন দিনে এবং মহিষের চামড়া ৭ হইতে ১০ দিনে সমাপ্ত কষ হয়। দিবারাত্রি পিপা ঘুরাইলে সময় কম লাগে, কলে ঘুরাইলে আরো অল্প সময়ে হয়। যখন চামড়ায় নীল রং হয় এবং চামড়ার মধ্যেও শাদা শাদা দাগ দেখা যায় না, তখন ট্যানিং সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতিরিক্ত ট্যানিঙে চামড়া খারাপ হয় এবং শীঘ্র ভঙ্গুর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে; ইহার প্রতিকার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। চামড়া সমস্থূল না হইলে ট্যানিঙ দ্রবে দিবার

* এক্ষণে এই সকলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বে চাঁছিয়া সমস্থূল করিয়া লওয়া দরকার, কারণ স্থূলাংশ বিলম্বে এবং পাতলা অংশ শীঘ্র কষ হইয়া যায়।

যখন বুঝা গেল যে ট্যানিঙ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন চামড়া মসলার জল হইতে তুলিয়া কাঠের ঘোড়্‌ঞ্চির উপর উপর্য্যুপরি মেলিয়া রাখিতে হয়, ২৪ ঘণ্টায় মসলা ভিতরে শুষিয়া চামড়া শুকায়। চামড়ায় তৎপরেও যে মসলা থাকে তাহাতে গন্ধকদ্রাবক)Salphuric acid) থাকে, উহা চামড়ার অনিষ্টকারক। ক্রোম চামড়া ভাল না হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ (১) অতিরিক্ত চুণ খাওয়ান (২) অতিরিক্ত মসলা খাওয়ান এবং (৩) গন্ধকদ্রাবক দূর না করা। দ্রাবক দূর করিবার জন্য চামড়া উত্তমরূপে জল বদলাইয়া বদলাইয়া ধৌত করিয়া পিপায় সোহাগা মিশ্রিত জলে ধৌত করিতে হয়। সেই মিশ্রণে শতকরা আধভাগ এবং ১০০ পাউণ্ড ভিজা চামড়ার জন্য ৩ পাউণ্ড হিসাবে সোহাগা সংযোগ করিতে হয়। দ্রাবক সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে কিনা তজ্জন্য লিট্‌মস্ কাগজ (Litmus Paper)* ভিজাইয়া দেখিতে হয়। যখন পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গেল যে চামড়া দ্রাবকশূন্য হইয়াছে, তখন সোহাগা মিশ্রণ হইতে তুলিয়া কয়েকবার জল বদলাইয়া ধুইয়া ফেলা দরকার।

চামড়ায় তেল-সাবান প্রয়োগ—সাবানের জলে তেল ফেটিয়া ফেনা হইলে তাহাতে ক্রোম চামড়া ভিজাইলে চামড়া বেশ নরম ও নমনীয় হয়। যদি চামড়ার রং করা না হয়, তবে ক্রোমট্যানিঙের ইহাই শেষ প্রক্রিয়া। ইহাকে ইংরাজিতে fat-liquoring বলে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য সাবান নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়—

একটা কাঠের টবে ১০০ পাউণ্ড রেড়ির তেল রাখ এবং ২০ পাউণ্ড কষ্টিক পটাশ (Caustic Potash) জলে গুলিয়া ঠাণ্ডা হইতে দেও। ঠাণ্ডা হইলে পটাশ দ্রব ধীরে ধীরে তেলে ঢাল এবং তেল ক্রমাগত নাড়িতে থাক। পনর মিনিট নাড়িয়া বেশ করিয়া উভয় পদার্থ মিশ্রিত কর। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই সাবন ব্যবহার উপযোগী হইবে।

Fat-liquor করিতে ৭ পাউণ্ড সাবান ২ গ্যালন ফুটন্ত গরম জলে গুলিয়া সমপরিমাণ রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশাইয়া ফুটাইয়া লইয়া ফেনন যন্ত্রে (Emulsifier) ঢালিয়া ফেনাইয়া তুলিতে হয়; ২ পাউণ্ড ডিমের হরিদ্রা-অংশ যোগ করিলে চামড়া অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি টিনের চোং সাড়ে তিন ফুট উচ্চ দশ ইঞ্চি বেধ, তাহাতে পিচকারীর

* হলুদমাখা ও জবাফুলমাখা কাগজ সহজে তৈয়ারি করা যায় এবং উহা লিটমাস কাগজের কাজ করে। লিটমাস কাগজের বর্ণ দ্রাবকসংযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে চামড়ায় দ্রাবক আছে কিনা।—লেখক।

মত দাঁটি এক মুখে সংলগ্ন, এবং দাঁটির মুখ বহু ছিদ্রময় হইলেই ফেননযন্ত্র হয়। সাবান মিশ্রিত তেল উহাতে ঢালিয়া দাঁটি চালাইলে ফেনিত হইয়া উঠিবে। ফেনিত তেল গরম জলের সহিত নির্ব্বিবাদে মিশাইয়া যায়। জলের কাজ বা সাধারণ মোটামুটি কাজের জন্য চামড়ায় যথাশক্তি তেল শোষণ করান ভাল; ইহাতে চামড়ার মূর্ত্তি কিছু ময়লা হইলেও মজবুত ও স্থায়ী হয়।

চামড়ায় সাবান ফেনা সংযোগের জন্যও ঘূর্ণীপিপা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে পিপায় জল ঢালিয়া গরম করিয়া লইতে হয়। তৎপরে ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহিট তাপপ্রাপ্ত জলে সাবান-ফেনা তরল করিয়া লইয়া পিপায় চামড়ায় ঢালিয়া পিপা পাক দিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে সব জল চামড়া শোষণ করিয়া লইয়াছে। তখন চামড়া উঠাইয়া কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর ছড়াইয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য শুকাইতে দিতে হয়। তৎপরে পাথরের টেবিলের উপর ফেলিয়া পালিশ করিয়া কাঠের ফ্রেমে টাঙাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইলে খোঁটাঘসা (পশ্চিমে মুচিরা এই খোঁটাকে 'বেউড়ি' বলে) করিয়া লইলে চামড়া অতি কোমল, মসৃণ ও চকচকে হয়। এতক্ষণে প্রকৃত ক্রোমচামড়া প্রস্তুত হইল। যদি চামড়া দেখিতে সুশ্রী করিতে হয়, তবে সাবান ফেনা কম শোষণ করাইতে হয়, এবং খোঁটাই করিয়া ফরাশী-খড়ির গুঁড়া সোজা পিঠে ছড়াইয়া দিতে হয়। চামড়ার যে পিঠে মাংস থাকে সে পিঠ অসমতল ও কর্কশ হয়, তাহার নিবারণ আবশ্যক হইলে কলের অভাবে হাতে চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

জুতারতলার চামড়া—তৈয়ার করিতে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রণালীই অবলম্বন করিতে হয়; মোটা চামড়া বলিয়া সম্পন্ন হইতে ৭ হইতে ১০ দিন সময় লয় এবং দ্রাবকশূন্য হইয়াছে কিনা খুব সতর্কতা-সহকারে পরীক্ষা করা দরকার। ইহাতে সাবান-ফেনা প্রয়োগের বোধ হয় দরকার হয় না। ৫০ পাউণ্ড বর্ম্মাপ্যারাফিন, সাড়ে বার পাউণ্ড চর্ব্বি ও আড়াই পাউণ্ড ধুনা একত্র চিটকে তামার বা এল্যুমিনিয়ম পাত্রে রাখিয়া আগুনে গালাইয়া খুব উত্তপ্ত থাকিতে চামড়া তাহাতে ডুবাইলে চামড়ার ভিতরের ছিদ্র সকল ভরিয়া চামড়া নিরেট বায়ুশূন্য হয়। বায়ু বুদ্বুদ উদ্গত হওয়া বন্ধ হইলে চামড়া তুলিয়া মিশ্রপ্রলেপ ঝরিতে দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে চামড়া খুব চাপ দিয়া গুটাইয়া লইতে হয়।

রঙিন চামড়া—জুতা, ঘোড়ার সাজ, প্রভৃতির জন্য চামড়া কালো বা বাদামি রং করিতে হয়; ইহাতেই চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। Aniline (নীল বা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত এক প্রকার রঙ) বড় মহার্ঘ। Avaram গাছের ছাল ইহার সস্তা পরিবর্ত্ত। ট্যানিঙ-দ্রবে শতকরা ৫ ভাগ ছাল দিয়া চামড়া আধঘণ্টা পিপাই

করিতে হয়; তারপর ধৌত করিয়া বাইক্রোমেট পটাশদ্রবে পুনরায় পিপাই করিতে হইবে। ১০০ পাউণ্ড চামড়ার জন্য ৮ আউন্স উক্ত লবণ দরকার। তৎপরে সাবান-ফেনাই করিয়া সাধারণ উপায়ে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ত্বকের কষ বিলম্বিত করিলে রং গাঢ় হয়, অল্প কম করিলে বাদামি রং হয়।

জুতার উপরের সাজের চামড়া খুব নরম করিতে হইলে একটু অধিক চুণ খাওয়াইতে হয়। aniline রঙ করিয়া রংটাকে স্থায়ী করিবার জন্য উদ্ভিজ্জকষপ্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। ইহাতেও avaram ছাল বেশ উপযোগী। চামড়ার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ ছাল হইলে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে mordant বলে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া ১৪০° ফা তাপে পিপাই করিয়া কয়েকবার জল বদলাইয়া ধুইয়া ছড়াইয়া শুকাইয়া লইলে চামড়ার পীতাভ রং হয়। এক্ষণে ১৬০° ফা তাপে পিপার মধ্যে চামড়ার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ সাবান ফেনাই করিয়া শীতল ও শুষ্ক করিবার জন্য ছড়াইয়া টেবিলে বিছাইয়া দিতে হয়। শীতল হইলে গরম জলে চামড়ার উপরের তেল ধুইয়া ফেলা দরকার নতুবা রঙ সর্ব্বত্র সমভাবের হয় না। আজ কাল বহুবিধ রঙের মসলা পাওয়া যায়, সে সকল দ্বারা ইচ্ছামত রং হইতে পারে।

মান্দ্রাজের কারখানায় প্রধানত নিম্নলিখিত চারিটি মিশ্রণ বিভিন্ন রং উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(১) ৪ আউন্স Phosphine substitute ও ১ আউন্স new acide brown.

(২) ৩ আউন্স Phosphine substitute, ও ৩ আউন্স new acid brown, সিকি আউন্স acid green.

(৩) ৪ আউন্স Phosphine substitute, ৩ আউন্স new acide brown.

(৪) ৫ আউন্স Phosphine substitute, ২ আউন্স new acid brown, এক-পঞ্চমাংশ আউন্স acid green.

রঙিন্ মসলার পরিমাণ চামড়া অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। ভেড়ার চামড়ার জন্য আধ আউন্স গরুর পাতলা চামড়ার জন্য এক আউন্সের কিছু বেশী। aniline রং গরম জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া ফিলটার করিয়া লওয়া উচিত; ১৫০° ফা তাপে পিপার মধ্যে রং করা দরকার। প্রথমে আবশ্যকীয় রঙের অর্দ্ধেকটা দিয়া পিপাই করিয়া ১৫ মিনিট পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক রং যোগ করিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে বার আনা অংশ রং পিপা হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া ডিম্বের হরিদ্রাংশ চামড়ার ওজনের শতকরা ১ ভাগ হিসাবে যোগ করিয়া আরো ২০ মিনিট পিপাই করিয়া ঘোড়াঞ্চির উপর শুকাইতে দিয়া চামড়ার উপর পিঠ ২০ ভাগ গ্লিশারিন মিশ্রিত জল দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া দিতে হয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে উঠাইয়া খোঁটাই করিতে হয়। তৎপরে রং আরো ভাল করিতে হইলে শতকরা আধ ভাগ রঙ, মিশ্রিত জলের প্রলেপ নরম তুলি দিয়া চামড়ার সদর পিঠে মাথাইয়া

দিতে হয়। এবং তৎপরে আবার খোঁটাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া season করিতে হয়।

সিজন্ করা—(SEASONING)—৩ আউন্স ডিমের সাদা ও এক পাউণ্ড দুধ জলে মিশাইয়া এক গ্যালন কর এবং সমস্ত মিশ্রণ রঙিন হয় এমত পরিমাণ রঙ সংযোগ কর। পাতলা করিয়া এই রঙ চামড়ার সোজা পিঠে মাখাইয়া শুকাইয়া দোলন যন্ত্রে পালিশ করিয়া পুনরায় খোঁটাই করিয়া পুনরায় seasoning মিশ্রণ মাখাইয়া পালিশ করিয়া লইলেই চামড়া ব্যবহারোপযোগী হয়।

চামড়ায় কালো রং—Corvoline B. T. aniline রঙের উপর থয়েরের প্রলেপ দেওয়া অপেক্ষা Haematine বা logwood কাঠের তরলসারের প্রয়োগের পর হীরাকষের প্রলেপ (ferrous sulphate) লাগাইলে কার্য্য ভাল হয়। চামড়ার ওজনের শতকরা দেড় ভাগ লগউডসার জল নিশ্রিত করিয়া লগউডসারের দুই আনা অংশ কাপড় কাচা সোডা তাহাতে মিশ্রিত কর। এই মিশ্রণে চামড়া প্রথমে পিপাই করিয়া আধ ঘণ্টায় চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ হইলে পিপা হইতে উঠাইয়া চামড়ার সদর পিঠ ভাল করিয়া পালিশ কর। তৎপরে টেবিলের উপর মাংসপিঠ উপর দিকে করিয়া চামড়া বিছাইয়া দুই পাশ মুড়িয়া মাংসপিঠ একেবারে ঢাকিয়া ফেল এবং চাপিয়া ঘসিয়া এমন ভাবে দুই পার্শ্ব আটকাইয়া দেও যেন খুলিয়া মাংসপিঠ বাহির হইয়া না পড়ে। তৎপরে শতকরা ১ ভাগ হীরাকষের মিশ্রণে চামড়া দুইবার চুবাইয়া তুলিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে হীরাকষের লোহা লগউডসারের সহিত রাসায়নিক সংযোগে চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ হইতে গাঢ়কৃষ্ণ করিয়া দিয়াছে। এই লোহা মাংসপিঠে লাগিলে চামড়া খারাপ হইয়া যায় এবং হীরাকষ চামড়ায় লাগিয়া থাকিলে সাবান ফেনাই কার্য্যকর হয় না; এজন্য হীরাকষের সামান্য কণাও ধুইয়া দূর করা উচিত। সাবান ফেনাই সর্ব্বত্র সমান। কেবল seasoning মসলা বাদামি চামড়ার মসলা হইতে পৃথক। কালো চামড়ার seasoning মসলা এই—

এক কোয়ার্ট গরম জলে, ২ আউন্স লগউড্সার গুলিয়া ঠাণ্ডা হইতে দেও; ১ কোয়ার্ট ঠাণ্ডা জলে তিন-চতুর্থাংশ আউন্স হীরাকষ গুলিয়া দেও। ১ পাঁইট রক্ত, ১ পাঁইট দুধ ও আধ আউন্স গ্লিসিরিন এক কোয়ার্ট জলে তরল করিয়া লও। ইহার সহিত লগউড্সার মিশ্র ভাল করিয়া মিশ্রিত কর তৎপরে হীরাকষের জল ঢালিয়া মিশাইয়া আরো জল ঢালিয়া সমস্ত মিশ্রটাকে ১ গ্যালন কর। একটা স্পঞ্জ দিয়া পাতলা করিয়া চামড়ায় মাখাইয়া চামড়া অল্প ভিজা থাকিতে পূর্ব্ববৎ খোঁটাই পালিশ করিলেই চামড়া ব্যবহার্য্য হইল।

মিশ্র কষন—কোন কোন অংশে ক্রোম চামড়া বল্কলকষের চামড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এ জন্য মিশ্র-কষ প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় প্রণালীর সুবিধা ও সদ্গুণ

সংযোগে চামড়া অতি উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু মিশ্র-কষ ব্যয়সাধ্য। যদি মিশ্র-কষের পর পুনরায় রং করা না হয়, তাহা হইলে বাদামি রং করা ক্রোম চামড়ার তুল্য মূল্য হয়। মিশ্র-কষের স্বাভাবিক রং অরুচিকর নহে।

মিশ্র-কষের ত্রিবিধ উপায়। (১) উভয় কষের মসলা মিশ্রিত করিয়া কষ করা। এ উপায় এখনো পরীক্ষিত হয় নাই। (২) ক্রোম-কষ করিয়া পরে বল্কল-কষ করা বা (৩) বল্কল-কষ করিয়া ক্রোম-কষ করা এই উভয় প্রণালীতে ফল একবিধই হয়।

Avaram বল্কলে কষ করার পর হরিতকীর কষ বা চর্ব্বী শোষণ করাইবার পূর্ব্বে দেশী চামারের কাছে কষকরা চামড়া কিনিয়া ক্রোম-কষ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট চামড়া উৎপন্ন হইয়াছে। খুব সৌখীন জুতার তলার জন্য এই চামড়া অতি উপযুক্ত। ঘোড়ার সাজ করিলে বর্ষার জলে অবিকৃত থাকে। জুতার উপরের সাজও খুব ভাল ও মজবুত হয়, অথচ নরম জলবারক প্রভৃতি ক্রোম চামড়ার সকল গুণই ইহাতে থাকে।

ক্রোম-কষের খরচ—সম্পন্ন চামড়ার প্রতি পাউণ্ডে দেশীয় কারখানায় দুই হইতে আড়াই আনা খরচ পড়ে। ক্রোম কষে তিন আনা খরচ পড়ে। ক্রোম-কষে চামড়ার ওজন বৃদ্ধি হয় না; ইহা ধরিয়া হিসাব করিলে বল্কলকষের অপেক্ষা অধিক ব্যয়সঙ্কুল নহে। রঙিন্ চামড়ার অবশ্য খরচ অত্যন্ত অধিক পড়ে; কিন্তু সে সব চামড়া কেবল ভাল কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রোম-কষের কারবারে অধিক মূলধন আবদ্ধ করিতে হয় না, কারণ ইহাতে কাজ খুব শীঘ্র সম্পন্ন হয়। দেশীয় প্রণালীতে কলকারখানার দরকার নাই। ইহাতে দরকার। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন মুক্ত থাকে তাহা ব্যয় করিলে যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে পারে।

উপসংহার—বই বাঁধার চামড়ার জন্য avaram বল্কলের কষকরা চামড়া উপযুক্ত নহে। উহাতে catechol tannin থাকে, তাহা বই বাঁধার চামড়ার উপযোগী নহে; বই বাঁধার চামড়া pyrogallol tannin দ্বারা উৎকৃষ্ট হয়। হরিতকী বহেড়া ও divi-divi কষে pyrogallol tannin আছে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ হরিতকী বহেড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের কাজে লাগান যায় কি না একবার চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া দেখা দরকার। গৃহপালিত পশুচর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায় তাহাও একটা লাভজনক ব্যবসায়সামগ্রী। আমাদের দেশে গরু দাগা প্রথা বহুপ্রচলিত, ইহাতে চামড়া খারাপ হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমশ এ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করাও উচিত। একটু সতর্কতা ও চেষ্টা করিলে আমাদের লুণ্ঠিত, পরহস্তগত ধন-সামগ্রী আমরা আবার ফিরিয়া পাইতে পারি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার হইয়াছে।

শ্রীমঞ্জুপ্রিয় মালাকর।—প্রবাসী।

বাঙলায় বিলাতী বিস্কুট—অদ্যাপিও বাঙলায় বিলাতী বিস্কুটের আমদানী বন্ধ হয় নাই। বর্ত্তমান মহাসমর হেতু মালের আমদানী করা বিপদ সঙ্কুল এবং ব্যয় সাধ্য হইলেও এখনও প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় বিস্কুট কেক্ লোজেঞ্জেস ভারতে আসিতেছে, তাহার মধ্যে বাঙলায় আমদানী বিস্কুটাদির মূল্য ৪ লক্ষ টাকার কম নহে। অত্যন্ত চড়া দরে বিলাতী বিস্কুট বিক্রয় হইতেছে। প্রভাতে উঠিয়া চা বিস্কুট না খাইলে আমাদের এখন দিন চলে না। আমাদের দেশী পাউরুটি বিস্কুট অপকৃষ্ট বলিয়া আমরা বিলাতী রুটি বিস্কুটের দিকে ঝুঁকিয়া উহার আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছি। বাঙলার এ দুর্দ্দশার দিনে ইহা গৌরবের না লজ্জার তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বাঙলার অনেক সহরেই রুটি বিস্কুট তৈয়ারী হয়। ঐ সকল কারখানায় মুসলমানের সংখ্যাই অধিক, হিন্দুরও কারখানা আছে। কয়েকটি সাহেবী কারখানাও আছে। সাহেবী কারখানার রুটি বিস্কুট অপেক্ষাকৃত ভাল। অন্য কারখানাগুলির জিনিষ প্রায়ই খারাপ। বিলাতী আমদানী বিস্কুটাদি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এদেশের রুটি বিস্কুট কি ভাল করা যায় না? অনেকে অনুমান করেন যে এদেশে প্রস্তুত বিস্কুট এদেশের হওয়ায় অধিক কাল ভাল থাকে না। অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। ভাল জিনিষ প্রস্তুতের চেষ্টা নাই এবং জিনিষ ভাল করিয়া রক্ষা করিবার জন্য যত্ন লওয়া হয় না, এই জন্যই আমরা দেশী ভাল জিনিষ খাইতে পাই না।

আর এক কথা দেশী কেক্, বিস্কুট, মিঠাই না খাইলে কি আমাদের দিন চলে না। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা যে কত প্রকারের মিঠাই, মিষ্টান্ন, খাজা, গজা নিমকি প্রস্তুত করিতে পারেন। সুজির লাড়ু, শাদা গজা, রুটি, পরেটা কত উত্তম খাদ্য সহজে অল্প খরচ তৈয়ারি করিয়া দিতে পারেন। এ সকলে আমাদের মন উঠে না কেন? আমাদের বাবুয়ানার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের সাহেবীয়ানা এখন ঘৃণার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনারা মজিতেছি এবং ঘর মজাইতে বসিয়াছি।

আকের চিনি ও খেঁজুর চিনি—পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে এক বিঘায় উৎপন্ন আক হইতে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, এক বিঘায় খেঁজুর গাছের রস হইতে তদপেক্ষা অধিক চিনি পাওয়া যায়। আকের চিনি অপেক্ষা খেঁজুর চিনি প্রস্তুতের খরচও কম।

মান্দ্রাজে খেঁজুর চিনি—মান্দ্রাজের যে সকল স্থানে খেজুরের রস হইতে চিনি তৈয়ারী হয়। সেখানকার লোকেরা রসকে অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়া শক্ত (পাটালির মত) গুড় তৈয়ারী করে। এই গুড় পাটের বস্তায় ভরিয়া ইউরোপীয় এজেন্টদিগের নিকট বিক্রয় করা হয়। এজেন্টগণ ইউরোপের চিনি পরিষ্কার করিবার বড় বড় কারখানায় ইহা পাঠাইয়া দেন।

বাঙলার কৃষি-বিভাগ বলিতেছেন যে, আগামী শীতের সময় এখানে রস হইতে শক্ত গুড় তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা হইবে। হাঁড়িতে ভরিয়া ঝোলা গুড় গাড়িতে করিয়া পাঠান বড় কঠিন, কারণ হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তজ্জন্ত অনেক গুড় নষ্ট হইতে পারে শক্ত গুড় তৈয়ারী ছালায় ভরিয়া স্থানান্তর করা অতি সহজ।

বাঙ্গালার মাটিতে চুণাভাব—কৃষিরসায়নবেত্তা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জায়গা হইতে মাটীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জায়গায় মাটীতে চুণ নাই, মাটীতে চুণ না থাকিলে অধিকাংশ শস্ত জন্মিতে পারে না। ঢাকার মাটীতে চুণ দিয়া সরিষা, পাট, আখ প্রভৃতি ফসল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি মাটীতে চুণ না থাকে তাহা হইলে হাড়ের গুঁড়ায় সার দিলে ফসল বাড়িবার খুব সম্ভাবনা। কোন্ জায়গায় মাটীতে কোন্ শস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে এবং কোন সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে এই বিষয় স্থির করিবার জন্ত সরকারী কৃষি-বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটী পরীক্ষা করিতেছেন। ভারতীয় কৃষি সমিতিতেও মাটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

গরুর খাদ্য ও সার ভেজাল কি না দেখিবার জন্তও এই সকল জিনিষের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

কার্পেট বা দরি—মিশর দেশ কার্পেটের প্রাচীণ ঘর। মেমফিস্, থিবস্ ব্যাবিলন, এবং জিনেরা এই স্থান চতুষ্টয়ে কার্পেট বুনা হইত। সার জর্জ্জ বার্ডউডের মত এই যে, ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে ব্যাবিলন হতে কার্পেট আসিয়াছে। ইহার উল্লেখ আইন-ই-আকবরিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্রাট আকবর কার্পেট-বয়নের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। আকবরের সময়ে আগরা, ফতেপুর, লাহোর এলাহাবাদ, জৌনপুর, সেরোয়ান এবং আলোয়ার ইত্যাদি স্থানে কার্পেট তৈয়ারী হইত।

এক্ষণে দেখা উচিত, হিন্দুস্থানে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে কার্পেট ছিল কি না? সার জর্জ্জ বার্ডউড বলেন যে মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বারহুত স্তূপ এবং অজান্তার গুহায় কার্পেটের নক্সা বিশেষরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে. হিন্দুস্থানে অতি আদিকাল হইতেই কার্পেট বুনা হইত।

কালীন বা গালিচার কাজ ভারতবর্ষের বহু স্থানে হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের কালীন পারস্য দেশের কালীন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় কঠিন উলে উত্তমরূপে রং জমে না।

সংযুক্ত-প্রদেশের জেলখানায় যে সকল কালীন তৈয়ার হয়, তন্মধ্যে আগরার কালীন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মির্জ্জাপুরও কালীনের জন্ত বিখ্যাত। সংযুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে কালীন তৈয়ার হইয়া থাকে; যথা—মোরাদাবাদ, কানপুর, বুলন্দসহর, ঝান্সি,

এবং আগরা। জেলখানা ব্যতীত সহরেও কালীন ব্যবসায়ের অনেক ইংরেজি দোকান আছে। আগরা জেলখানায় প্রত্যেক বৎসর ৫০০০ গজ দরি তৈয়ার হইয়া থাকে। এই কাজ ৬ মাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। শিখিবার জন্য ৮৷৯ বৎসর বয়স্ক বালকগণকে নিযুক্ত করা হয় এবং তাহাদিগের সহিত এই চুক্তি হইয়া থাকে যে, যত দিন তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা বেতন পাইবে না।

শিক্ষক যদি মূর্খও হয়, তথাপি সে স্বীয় কার্য্যে নিপুণ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রচলন নাই। আড়ত হইতেই লোকের ও কার্য্যের উন্নতি হইয়া থাকে। মেলায় বস্ত্র প্রেরণ করিলে, কোন্ স্থানে কিরূপ বস্ত্র তৈয়ার হয়, তাহা জনসাধারণে জানিতে পারে। বিজ্ঞাপনের রীতিটা ভারতবাসীর শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় বিজ্ঞাপনের জোরে কাজ হয়। য়ুরোপীয়গণ বিজ্ঞাপনপ্রিয়। তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে বিজ্ঞাপনই ব্যবসায়ের মূল বস্তু বিজ্ঞাপন দিতে হইলে পূর্ব্বে অবশ্য কিছু ক্ষতি-স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সে ক্ষতির পূরণ হইয়া অবশেষে অনেক লাভ থাকে। এরূপ ক্ষতি-স্বীকার অন্তে লাভদায়ক বই ক্ষতিজনক নহে।

হিন্দুস্থানী দরি—কলিকাতা, বোম্বাই, পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে সূতি দরি আগরা হইতে প্রেরিত হয়। য়ুরোপে দরি কানপুর হইতে গিয়া থাকে। আগরা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দরি জর্ম্মণি এবং আমেরিকায় প্রেরিত হয়। Aloe fibre (মুঁজ) নির্ম্মিত চটাই সূতি বা উলী কাপড়ের স্থান অধিকার করিতেছে। বেরিলীর সেণ্ট্রাল জেলে মুঁজ নির্ম্মিত কার্পেট তৈয়ার হইয়া থাকে।

কার্পেটের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রাদি—কার্পেটের তাঁতের দুইটা খুঁটা উন্নত এবং দুইটী সমতল কড়ি থাকে। উন্নত খোঁটাদ্বয়ের উচ্চতা ৬ বা ৭ ফিট। সমতল কড়ির প্রস্থ কার্পেটের পরিমাণোপরি নির্ভর করে। দুইটী কড়ির প্রত্যেকে প্রত্যেকটীর সমান্তরালে অবস্থিত। উপরিস্থ কড়ি নীচেকার কড়ি হইতে ৬ বা ৭ ফিট উপরে থাকে।

মির্জ্জাপুরে নিম্নস্থিত কড়িটা গর্ত্তের মধ্যে নিহিত থাকে। এই গর্ত্ত দুই ফিট গভীর এবং প্রায় আড়াই ফিট চওড়া। গর্ত্তের নিম্নদেশ হইতে প্রায় একফুট উচ্চে কড়িটা লাগাইতে হয়। অন্যান্য স্থানে গর্ত্ত করিবার প্রথা নাই; নিচেকার কড়িটা জমি হইতে প্রায় ১ফুট বা আঠার ইঞ্চি উচ্চে অবস্থিত থাকে। তানার সূতা উপরিকার কড়িতে গুটাইয়া রাখা হয়, কিন্তু সূতার শেষ ভাগটা নিম্নকার কড়িতে বাঁধা গিয়া থাকে। কড়ি মাত্রেরই শেষপ্রান্তে একটা করিয়া দুইটা রন্ধ্র আছে। কড়িদ্বয় উন্নত খুঁটিতে এরূপভাবে সংলগ্ন থাকে যে, সেই গর্ত্তে কাষ্ঠ বা লৌহনির্ম্মিত দণ্ড লাগাইয়া তাহাদিগকে সহজে ঘুরাইতে পারা যায়। এই দণ্ডের নাম "টাং।" যখন অধিক তানার আবশ্যক হয়, তখন

উপরিস্থিত কড়ি দক্ষিণ হইতে বামদিকে টাংএর দ্বারা ঘুরান হয় এবং তানার স্তো আবশ্যকানুযায়ী খোলা গিয়া থাকে। কিয়ৎপরিমাণে কার্পেট বুনা হইলে তানার স্তো নিম্নকার কড়িতে বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়া গুটান হয়। উপরিস্থিত কড়িতে তানাকে দৃঢ় করিয়া ঘুরাইবার জন্যও "টাং" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরকার কড়ি যাহাতে পড়িয়া না যায় এবং স্তার টানও যাহাতে যথাবৎ রক্ষিত হয়, তজ্জন্য একটা দণ্ড অন্তস্থিত ছিদ্রের ভিতর দিয়া নিম্নস্থিত কড়ির সহিত স্তা দ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হয়। নিম্নকার কড়িও উল্লিখিত প্রণালীতে স্বস্থানে অবস্থিত থাকে। পার্থক্য এইটুকু মাত্র যে দণ্ডটা না লাগাইয়া জমির উপরে থাকে। ইহাতেই নিম্নকার কড়ি নড়িতে পারে না।

তাঁতিরা তানার সম্মুখে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাটার উপর উপবেশন করে। এই পাটা দুই ফিট চওড়া। তাঁতিদিগের পা গর্ত্তের ভিতর থাকে। যে সকল স্থানে গর্ত্ত করার প্রথা নাই, সে সকল স্থানে জমির উপর থাকে। এই পাটা যাহার উপর অবস্থিত, তাহার নাম "ওটা"। দুইটা মঞ্চ জমি হইতে এতটা উচ্চে থাকে যে, তাঁতিদিগকে উপবিষ্ট হইয়া বুনিবার সময় নত হইতে হয় না।

উলের রঙ্গিন দড়ি তাল বাঁধিয়া মস্তকোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তার সাহায্যে ঝুলিতে থাকে। এই তালকে "কুবলি" কহে।

দুইটা "বাই"—যাহার ব্যবহার আমরা পরে বর্ণনা করিব—একটা চওড়া কাষ্ঠে দুইটি দড়ি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই চওড়া কাষ্ঠ বাইয়ের সহিত তানার সমান্তরালে সন্নিবিষ্ট কড়ির উপর এবং নীচে গমন করিয়া থাকে। সমান্তরালে সন্নিবিষ্ট কড়িকে "পাশবন্দ" বলে এবং যে চওড়া কাষ্ঠ বাই-সংলগ্ন থাকে, তাহাকে "কমন" কহে।

তাঁতিরা ছুরি, কাঁচি এবং পাঞ্জা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কার্পেট বয়ন—বয়নের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ক্রিয়া ভিন্ন বয়নকার্য্য হইতে পারে না :—

(১) তানাকে জমির উপর বিস্তার করণ,—

(২) তানাকে টানা দেওয়া,—

(৩) বাই প্রস্তুতি,—

(৪) তানাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন,—

(৫) "কমন"কে বাইয়ে সংযোগ পূর্ব্বক তানাকে টানিয়া পাশবন্দের নিকটে জোর করিয়া রক্ষণ।

উল্লিখিত ক্রিয়ার প্রত্যেকটীর আমরা বর্ণনা নিম্নে করিতেছি—

তানার বিস্তৃতি—জমিতে প্রথমে তিনটী খোঁটা গাড়া হয়। তাঁতি

বৃত্তাংশ তানার সূতা লইয়া খোঁটার উপর বাঙ্গলা ৪ (চারের) আকৃতিমত দিয়া থাকে। প্রত্যেক ছিদ্র-স্থানে বনার বক্রীকৃত সূতা আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, তথায় ছুইটুকরা সূতার দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সূতার নাম "রস্মি"। ইহা দ্বারা সংলগ্নীভূত তানার সূতা ঠিক থাকে। তানার প্রান্তাবস্থিত সূতা পাছে জড়াইয়া ফাঁশ লাগিয়া যায়, তজ্জন্য দুই প্রান্তে এক-এক জোড়া সূতা দ্বারা এরূপভাবে গাঁট বাঁধা হয় যে, সে গাঁট সহজেই খুলিয়া যাইতে পারে। এই ক্রিয়াকে "চুর্চ্চন" কহে।

যথেষ্ট সংখ্যায় সূতা বিস্তার হইলে খোঁটার উপর হইতে তানার সূতাকে খুলিয়া লওয়া হয়। প্রান্তাবস্থিত খোঁটাদ্বয়ের স্থানে তানার প্রস্থ অপেক্ষা সামান্য স্থূল দুইটা লৌহদণ্ড দিয়া খোঁটার সূতা উঠাইয়া লওয়া যায়।

তানাকে টানা দেওয়া—তানার এক ইঞ্চির ভিতর কত সূতা আছে, তাহা জানিবার জন্য তানা মাপা হয়। এই সময়ে সূতা জোড়া-জোড়া হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে থাকে। তানাকে এখন গুটাইয়া লইয়া টানা দেওয়া হয়।

যেরূপ প্রথায় তানাকে টানা দিতে হয়, তাহা এই ;—উপরিস্থিত কড়িতে একটা দণ্ড সংলগ্ন করা হয়। নিম্নকার কড়ি এখন খালি পড়িয়া থাকে। সমান্তরালস্থিত কড়িতে লৌহ গজাল বা ক্ষুদ্র সূতাদ্বারা দণ্ডকে সংলগ্ন করিতে হয়। কড়িতে যে সকল ছিদ্র হয়, তাহাতে সূতা বাঁধা গিয়া থাকে। ইহাকে "নথি" বলে। তানা এখন লম্বাভাবে উপরিস্থিত কড়িতে ঝুলিতে থাকে। তানাকে গুটাইতে হইলে উপরিস্থিত কড়িকে ঘুরাইতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণে তানার সূতা গুটান হইলে, নিম্নস্থ কড়িতে দাণ্ডা লাগান হয়। পরে প্রায় কুড়িগাছা সূতা উপরকার কড়ি হইতে লইয়া পাক দেওয়া হয় এই পাক দেওয়ার নাম "মুরির"। তানা এখন ডবল সূতায় পূর্ণ; প্রত্যেক সূতার সহকারী আছে। "রশ্মির" শেষভাগ উন্নত দুই খোঁটাতে বাঁধা হইলে পরে, উপরিস্থিত কড়িতে সূতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এই ক্রিয়ার নাম "গাড় উঠানা"। চার জোড়া সূতা লইয়া শীর্ষস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং উপরিস্থ সূতার শেষভাগ সামান্য বাহির হইয়া থাকে। যখন কুড়ি জোড়া সূতা শ্রেণীবদ্ধ হয়, তখন উপরে একটুকরা বাঁশ লাগাইয়া বাঁধিতে হয়। ইহাতে সূতা ঢিলা পড়ে না। তানা এইরূপে প্রত্যেক কুড়ি জোড়া সূতায় বিভক্ত হয়। পরে তাঁতিয়া উন্নত খোঁটা হইতে "রশ্মিকে" ঢিলা করিয়া উপরকার কড়ির দিকে লইয়া যায়। অতঃপর সূতার শ্রেণী ঠিক না করিলে চলে না। ইহার নাম "তার বিঠানা"। প্রত্যেক জোড়া সূতা "রশ্মির" দুই দিকে সমানভাবে বিস্তৃত থাকে; নতুবা সূতা জড়াইয়া যাইবার বা কম হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রাগুক্ত প্রণালীতে নিম্নস্থিত কড়ির সূতা ঠিক করা হয়।

বাইভরা—সিকি ইঞ্চি মোটা একটা সরল দণ্ড তানায় লাগান হয়।

এই দণ্ডকে "বাজ" বলে। এই "বাজের" দুই প্রান্ত একটা অর্দ্ধ ইঞ্চি শক্ত বাঁশে সংলগ্ন করা হয়। ইহাকে "গুল্লা" বলে।

গুল্লায় ফাঁশ বাঁধিবার জন্য এবং সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগের তানা সুতার শ্রেণী দেখাইবার জন্যই "বাঁজের ব্যবহার"। বাজ বাঁধা হইলে "গুল্লাকে" পাশবন্দে একটুকরা সুতা দ্বারা বাঁধা হয়। তানার সুতা গুল্লায় মধ্য দিয়া গমন করে।

সম্মুখস্থ সুতার শ্রেণী এক গুল্লার মধ্য দিয়া যায়, এবং পশ্চাতের সুতার শ্রেণী অন্য গুল্লার ভিতর দিয়া গিয়া থাকে। দুই গুল্লাই পরস্পর পরস্পরের সমান্তরালে একের উপর অপরটী অবস্থিত থাকে। নিম্নস্থ গুল্লায় সম্মুখস্থ সুতার শ্রেণী থাকে, এবং সচরাচর প্রথমেই পূর্ণ করা হয়। উপরস্থ গুল্লা পশ্চাতের সুতার শ্রেণীতে পূর্ণ থাকে।

যদি প্রথম সুতাকে আমরা ১ বলিয়া গণিতে আরম্ভ করি, তবে দেখা যায় যে, সম্মুখস্থ শ্রেণী ২, ৪, ৬, ইত্যাদি সুতার দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পশ্চাতের শ্রেণীতে ১, ৩, ৫, ইত্যাদি এক গুল্লার ভিতর দিয়া যায় এবং ২, ৪, ৬, ইত্যাদি অন্য গুল্লার ভিতর দিয়া গিয়া থাকে।

বাইয়ের ক্রিয়া—তানা বর্ণনাকালে আমরা বলিয়াছি যে, দুইটা সমান্তরালাবস্থিত বাঁশের টুকরায় (গুল্লা) ফাঁশ থাকে, যাহার মধ্য দিয়া তানার একের পর অন্য সুতা গমন করে। এই গুল্লায় "কমন" সংলগ্ন থাকে। "কমন"কে পাশবন্দের নীচে এবং উপরে ঠেলিয়া দিতে পারা যায়। কমনকে উপরে উঠাইয়া দিলে সম্মুখভাগের শ্রেণীবদ্ধ সুতা আকর্ষিত হইয়া পড়ে না, যাইবার রাস্তা প্রস্তুত হয়। এইরূপে "কমনকে" নীচে ঠেলিয়া দিলে পশ্চাৎভাগে শ্রেণীবদ্ধ সুতা সম্মুখে আইসে এবং তন্মধ্যে দিয়া পড়েন যাইবার রাস্তা হয়। তাঁতিদিগের পরিভাষায় বলিতে হইলে "কমন"কে উপরিভাগে ঠেলিলে সুতাকে "দমবলা" কহে, এবং নীচে ঠেলিলে সুতার শ্রেণীকে "দমাসত্র" কহে। তানার প্রত্যেক সুতাই বাইয়ের মধ্যে দিয়া গমন করে। দুই বা ততোঽধিক বাইয়ের জোড়া তানার প্রস্থ অনুসারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক জোড়া জোড়া ২ বা ৩জন তাঁতির পর্য্যবেক্ষণে থাকে। সম্মুখস্থ চার জোড়া বাইয়ের ক্রিয়া দেখিবার জন্য ৮জন তাঁতি নিযুক্ত থাকে।

তানাকে যন্ত্রে টানা দেওয়াই শক্ত ব্যাপার। নিপুণ ব্যক্তি ব্যতীত এ কার্য্য সাধারণে পারে না। তানা রীতিমত টানা না হইলে কার্পেট ঢিলা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বয়ন কার্য্য—উপরস্থ বাই শক্ত করা হইলে, সুতার গোছা দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে, এবং নিম্নস্থ বাই শক্ত করা হইলে, সুতার গোছা বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার নাম "তার খিচনা"। সুতা দুই দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর

নিম্নস্থিত কড়িসংলগ্ন তানার প্রান্তভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অনন্তর তানার উভয় পার্শ্বে "কিনার পেঁচ" বাঁধা হয়। সূতী সুতা ২০টী হইতে ২৪টা উত্তমরূপে পাকাইয়া "কিনার পেঁচ" তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সূতার চতুর্দ্দিকে উলের টুকরা বা সূতীর গোছা বাঁধা হয়। ইহাই কার্পেটের দুই দিকে থাকে। "কিনার পেঁচ"টা তানা অপেক্ষা দৃঢ়তর না হইলে প্রান্তদেশ দৃঢ় হয় না বলিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়। কিনার পেঁচের বরাবর গাঁট বাঁধিতে হইলে তানার প্রথম তিনটী সূতার প্রান্তভাগ লইয়া "কিনার পেঁচ" এবং সূতার খেইয়ের সহিত পাক দিতে হয়। ইহার পরের গাঁটটা তানার দুইটী সূতার প্রান্ত এবং কিনার পেঁচের সহিত দিতে হয়। কিনার পেঁচ ঠিক করা হইলে "বোধ খিচনা" আরম্ভ হইয়া থাকে। বাই সকল উপর নীচে গমন করিলে পড়েনের সূতা বাম হইতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় একইঞ্চি কার্পেট বুনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পড়নের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার পরেই গাঁট লাগান আরম্ভ হয়।

গাঁট লাগইবার প্রক্রিয়া কিরূপ তাহা বলিতেছি। একটুকরা উল সম্মুখবর্ত্তী সূতার নীচে এবং উপর দক্ষিণ হইতে বাম দিকে দিয়া এবং পরে পশ্চাৎ দিকের সমান সূতার নীচে দিয়া গলাইয়া উপরে লইয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া গাঁট বন্ধনানন্তর ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হয়। ছুরিটা দক্ষিণ হস্তে, এবং উল বাম হস্তে থাকে। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সম্মুখস্থ সূতা পুরতঃ টানিয়া উলকে নীচে দিয়া গলাইয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উপরে লইয়া আসা হয়। পরে পশ্চাৎ শ্রেণীর সহ কারী সূতা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পুরতঃ টানিয়া সূতাকে উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে হইবে সূতার প্রান্তভাগ সম্মুখে আসিলে ফালতু সূতাটা দক্ষিণ হস্তস্থিত ছুরি দ্বারা কাটা হয়। "কমনের" প্রান্তভাগ উপরিস্থিত কড়ির দিকে আসিলে অর্থাৎ "দম বলা" হইলে গাঁট বাঁধা সুরু হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীতে গাঁট বাঁধা সমাপ্ত হইলে, পড়েন সেই "দমে" নিক্ষেপানন্তর পিটিয়া না দিলে চলে না। "বাইকে" চালিত করিয়া পড়েনের সূতা অন্য দিক দিয়া লইয়া গিয়া পাঞ্জা দ্বারা পিটিয়া দিতে হইবে। "বাই"কে উপর উঠাইয়া কার্পেটের বহিঃনিক্রান্ত প্রান্তভাগ অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া কাঁচি দ্বারা কাটিতে হয়। এইরূপে কার্পেট বুনা হইয়া থাকে।

ভিন্ন-ভিন্ন উলের উপকরণে গাঁট বাঁধিয়া তাঁতিরা নমুনা প্রস্তুত করে। কার্য্য সমাধা হইলে, এক ব্যক্তি রুল করা কাগজ হইতে নমুনা কিরূপ হইবে, তাহা বলিয়া দেয়। এই নমুনায় কোথায় গাঁট বা-কোথায় কিরূপ রং লইতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া চিহ্নিত থাকে। নমুনা সহজ হইলে ও পরিচিত থাকিলে, তাঁতিরা মন হইতে যথাস্থানে গাঁটাদি লাগাইয়া কার্পেট তৈয়ার করে।

উত্তম কার্পেটে তানা বা পড়েনের সূতা সম্পূর্ণ লুকায়িত থাকে। বিচার করিবার

জন্য কার্পেটের বিপরীতভাগ দেখিতে হয়। গাঁটকে উত্তমরূপে না ঠুকিলে তানা বা পড়েনের সূতা প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব।

কার্পেটের প্রস্থ অনুযায়ী গড়ে প্রত্যেক দুই ফিটে একজন করিয়া তাঁতি নিযুক্ত হয়। কার্পেটের কিনারাভিমুখে উত্তম কারিকরগণ উপবিষ্ট হইয়া মধ্যস্থিত কারিকরগণের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। নিপুণ কারিকরগণ প্রথমে একই বর্ণের গাঁট বাঁধে। মনে কর দুইটা লাল গাঁটের পর তিনটা সবুজ ও তৎপরে ৪টা লাল গাঁট বাঁধিতে হইবে। তাঁতি কিন্তু দুইটা লালের পর তিনটা সবুজ গাঁট দিবে না। সবুজের স্থান ছাড়িয়া প্রথমে সমস্ত লাল গাঁট বাঁধিয়া লইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাসের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেতে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসে ধঞ্চে, পাট অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালের বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেতে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, পপি, স্টাটারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান—এখন সীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত টেঁপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেঁপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শস্যক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাগ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারন্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমরান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিয্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁটাল, প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সবগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।